কথা কল্পনা কাহিনী

(দশম স্তবক)

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

উৎসর্গ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

সূচীপত্র

চিত্ত ও চিত্র

অলৌকিক

এই গল্প-গ্রন্থমালার প্রথম স্তবকে তেত্রিশটি, দ্বিতীয় স্তবকে আটত্রিশটি তৃতীয় স্তবকে সাইত্রিশটি, চতুর্থ স্তবকে পঁয়ত্রিশটি, পঞ্চম স্তবকে চৌত্রিশটি, ষষ্ঠ স্তবকে পঁয়ত্রিশটি, সপ্তম স্তবকে উনত্রিশটি, অষ্টম স্তবকে ত্রিশটি এবং নবম স্তবকে তেত্রিশটি বিভিন্ন রসের গল্প সংকলিত হয়েছে। মূল্য—প্রথম ২২·০০, দ্বিতীয় ৪০·০০, তৃতীয় ২২·০০, চতুর্থ ২৪·০০, পঞ্চম ২৪·০০, ষষ্ঠ ২৫·০০, সপ্তম ৩০·০০ অষ্টম ৩০·০০ নবম ৩০·০০।

অ-দৃশ্য

এ কাহিনীর মধ্যে কতটা সত্য আর কতটা কল্পনা—দোহাই আপনাদের, তা জানতে চাইবেন না। কারণ আমার পক্ষেও তা হলপ ক'রে বলা শক্ত হবে, ইচ্ছা করলেও বলতে পারব না। গল্পটা হ'ল বেলাদির, বেশির ভাগই তাঁর মুখে শোনা। তিনিও কিছু একদিনে সব বলেন নি। তাঁর সঙ্গে আমার এই আট-দশ বছরের পরিচয়—দাদা এখানে বদলী হয়ে আসার পর—এর মধ্যেও সব সময় দেখা হয় নি। যখন এসেছি—হয়ত মাসখানেক দেড় মাস থেকেছি—সেই সময়েই একটু একটু ক'রে নানা দিনে জীবনের নানা ঘটনা বলেছেন। ইতিহাসের মতো ক'রেও তো আর বলেন নি, ফলে অনেক সময় আগেরটা পরে জেনেছি—পরেরটা আগে। তাঁরও বয়স হয়েছে, পঞ্চাশ বছর বয়সে পনেরো বছরের কথা মনে থাকলেও, সবটা যে ঠিক ঠিক অবিকল মনে থাকে'তা আমি বিশ্বাস করি না। অথচ অধিকাংশ মানুষের মনে সেই অহঙ্কারটা থাকে, বেশ জোর দিয়েই বলেন তাঁরা। কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে চটে যান। বেলাদিরও সে অহঙ্কারটুকু ষোল আনা আছে। বলেন, 'বাঃ, আমার জীবনের কথা আমি জানব না তো জানবে মোড়ের ঐ মাতাপ্রসাদ রুইও'লা ? আর এ কী ভোলবার মতো কথা ? তোমার যদি জীবনে এই রকম কোন ঘটনা ঘটত, যার ওপর তোমার জীবন সুখদুঃখ ভবিষ্যৎ সব নির্ভর করছে—যার দ্বারা জীবনটাই অন্য খাতে বয়ে গেল, সে ঘটনার কথা তুমি ভুলতে পারতে ?'

কেমন ক'রে বোঝাব তাঁকে যে ভুলতেও যেমন পারতুম না, সবটা হুবহু মনে রাখাও সম্ভব হ'ত না। খুব ভালো দোকানে তোলা ফোটোগ্রাফও দীর্ঘদিনে বিবর্ণ হয়ে যায়—একটু একটু ক'রে। মহাকাল তাঁর অদৃশ্য রঙের তুলি নিয়ে বসে আছেন, খুব ধীরে ধীরে হ'লেও তাঁর হাতের পোঁচ অমোঘ—স্মৃতির ফোটোতে কিছুটা রঙ লাগতে বাধ্য। আমার অন্তত এমন আশ্চর্য স্মৃতি-শক্তির অহঙ্কার নেই। অনেক সময়—নিজের জীবনেই দেখেছি—একটা মিথ্যা কথা বার বার বলতে বলতে নিজেরই কেমন বিশ্বাস হয়ে গেছে সেটা—পরবর্তী কালে যেন সে ঘটনাটা সত্যি সত্যিই ঘটেছিল এমনি ভাবে নিখুঁত ছবির মতো দেখেছি মনের পর্দায়।

যাক্‌গে—বেলাদির গল্প বলতে বসেছি ; এ কাহিনীর যেটুকু আমার চোখে দেখা নয় তা তাঁর মুখে শোনা। সে অংশের দায়িত্ব তাঁরই। আর এটাকে সবটাই বানানো গল্প বলে মনে করলেই বা ক্ষতি কি ?

আমি যে কথা দিয়ে শুরু করছি সেটা অবশ্য বেশী দিনের কথা নয়, এক বছরের বেশী হয়নি এখনও—সুতরাং বেশ পরিষ্কারই মনে আছে।

অনেকদিন পরে দাদার ওখানে গেছি, বেশ ভাল লাগছে। বৌদির যত্ন তো আছেই—আরও একটা বড় কারণ ভাল-লাগার—বহুদিন পরে এমন নিটোল আলস্যে দিন কাটছে। খুশী-খুশী আছে মনটা। পশ্চিমের শীত যেন একটু একটু

ক'রে চেখে চেখে অনুভব করছি। সেদিন সকালেও বিছানাতে শুয়েই পর পর দু'কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে—তবু উঠতে ইচ্ছা করছে না—এই অবস্থা, বেলাদি একেবারে ঘরে এসে ঢুকলেন, 'এই যে নীরেন, তোমার কাছেই এসেছি ভাই। আচ্ছা, এখানের বড় হাসপাতালে কারুর সঙ্গে জানাশুনা আছে?'

ব্যস্ত হয়ে উঠলুম, 'আমার সঙ্গে আর কি ক'রে থাকবে, হয়ত দাদার সঙ্গে—। কিন্তু কেন বলুন তো, কারুর অসুখ-বিসুখ নাকি?'

'হ্যাঁ ভাই। আর বলো কেন! বোধ হচ্ছে—যা শুনছি—তোমাদের মুখুজ্জে মশাইয়েরই বোধহয় টি. বি. হয়েছে।'

'সে কি!' বলে উঠে বসি তাড়াতাড়ি। কিন্তু প্রশ্নটা নিতান্তই যান্ত্রিক। তাতে উদ্বেগ যতটা ছিল, বিস্ময় ছিল তার চেয়ে ঢের বেশী।

মুখুজ্জে মশাইয়ের অসুখে উনি উদ্বিগ্ন হবেন, বিস্ময়টা সেই জন্যেই।

মুখুজ্জে মশাই হলেন ওঁর স্বামী। স্বামীর টি. বি. বা ক্ষয়রোগ হ'লে স্ত্রীর উদ্বেগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বেলাদির ক্ষেত্রে নয়। যে সব কারণে স্বামীর সম্বন্ধে উদ্বেগ থাকে মেয়েদের, স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রেম, প্রীতি থাকে—সে সব কারণ কোনদিন ছিল কি না—তাও বোধহয় বেলাদির মনে পড়ে না। অথচ এমনটা হবার কথা নয়। বেলাদি প্রথম কৈশোরে কী আশ্চর্য রূপসী ছিলেন তা তাঁর আজকের চেহারা দেখলেও বেশ বোঝা যায়। এখনও যথেষ্ট রূপ তাঁর। বাঙ্গালীর ঘরে এ রূপ দুর্লভ। রঙ্, চোখ-মুখ, চুল, গঠন—সব জড়িয়ে আজও তাঁকে 'ডাকের সুন্দরী' বলা যায়—এই পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বয়সেও। বড়লোকের আদুরে মেয়ে—বড়লোকেরই একমাত্র ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। মুখুজ্জে মশাই তখন ডাক্তারি পড়ছেন পাটনার মেডিকেল কলেজে—ওঁর মামা পাটনার বড় ডাক্তার—তাঁর আওতায় থাকলে পড়াশুনো ভাল হবে বলেই মামা নিজে নিয়ে গিয়েছিলেন পিতৃহীন ভাগ্নেকে। ওঁর চেহারাও নাকি খুব ভাল ছিল তখন—বেলাদি বলেন—এখনকার রোদপোড়া 'মনের-কালি-মুখে-ফুটে-ওঠা' পার্কাসিটে চেহারা দেখলে নাকি ওঁর বাইশ বছর বয়সের চেহারা কিছুমাত্র ধারণা করা যাবে না। সত্যি কথা বলতে কি, ওঁর চেহারা দেখেই নাকি বেলাদির বাবা একেবারে যাকে বলে আড় হয়ে পড়েছিলেন ওকে জামাই করবেন বলে। বেলাদির বাবা গোরখপুরের বড় উকীল ছিলেন, কী একটা মামলা করতে লক্ষ্ণৌ আসেন—সেইখানে, মক্কেলের বাড়িতেই মুখুজ্জে মশাইকে দেখেন। চেহারা দেখে তো মুগ্ধ হলেনই—তার ওপর যখন শুনলেন যে ছেলের হুসেনগঞ্জে আর উদয়গঞ্জে দুখানা বাড়ি আছে, কোম্পানির কাগজ আছে (কত টাকা তা না জানলেও বেশ মোটা টাকার যে আছে সে কথা সর্বজনবিদিত), মায়ের সুদী কারবার আছে এবং আর প্রায় এক বছর পরেই ছেলে ডাক্তার হয়ে বেরোবে—তখন আর কারুর কোন কথা শুনলেন না—আরও দুদিন চেপে বসে থেকে মুখুজ্জে মশাইয়ের মা অর্থাৎ তাঁর হবু বেহানের কাছ থেকে একরকম 'কথা' আদায় ক'রে তবে ফিরে গেলেন। মেয়ে যে তাঁর দেখলেই পছন্দ হবে এ বিষয়ে

বেলাদির বাবা নিঃসন্দেহ ছিলেন।

হ'লও তাই।

দেনা-পাওনার কথা কিছুই তোলেন নি বেলাদির শাশুড়ী, তিনি লোক চিনতেন। বেলাদির বাবা প্রায় সওয়াশো ভরি সোনা, একসেট সম্পূর্ণ হীরের গহনা এবং লক্ষ্ণৌ শহরে একখানা নতুন বাড়ি মেয়ের নামেই কিনে যৌতুক দিলেন। আনুষঙ্গিক উপহারাদির তো কথাই নেই। দানের রুপোর বাসন ছাড়াও, ফুলশয্যার বাসনও সমস্ত রুপোর এবং চন্দনের বাটি সোনায় গড়িয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়াও বরযাত্রীদের যাবতীয় খরচা দিয়ে গোরখপুরে নিয়ে গিয়ে জামাই-আদরে তিন দিন রেখেছিলেন।

এ বিবাহে তিনি তাঁর বিত্তের পরিচয়টা যতটা দিয়েছিলেন, বুদ্ধির পরিচয় ততটা দেন নি। এতটা তাড়াতাড়ি না করাই উচিত ছিল তাঁর। অন্তত একটা বছর অপেক্ষা ক'রে মুখুজ্জে মশাইয়ের পরীক্ষাটা চুকে যাবার পর বিয়ে দিতে পারতেন। কারণ, মুশকিল হ'ল এই যে বিয়ের পর মুখুজ্জে মশাই আর কিছুতেই পাটনা যেতে রাজী হলেন না। বেলাদিকে এক মিনিটও চোখের আড়াল করা সইত না তাঁর। এমন কি উনি বাপের বাড়ি গেলে মুখুজ্জে মশাইও পরের দিন গিয়ে হাজির হতেন। শ্বশুর গতিক দেখে সস্নেহ তিরস্কার কি অনুযোগ করলে বলতেন, 'কী আর হবে পাশ ক'রেই বা, আমি ডাক্তারি করব না সে বিষয়ে ডিটারমিন্‌ড্‌—আমি ওষুধের বিজনেস্‌ করব। তার জন্যে যেটুকু দরকার—সে আমার হয়েই গেছে—'

কোন একমাত্র-ছেলের মা-ই ছেলের বধূপ্রীতি প্রীতির চোখে দেখেন না। বেলাদির শাশুড়ী হেমাঙ্গিনী দেবীও কিছু নিয়মের বাইরে নন। বিশেষ যদি সে পত্নীপ্রেম প্রায় উম্মত্ততার পর্যায়ে পেঁছয় তো শাশুড়ীও ক্ষেপে উঠতে বাধ্য। স্বামীর প্রীতি যত বাড়ে, প্রেমের বিকাশ যত প্রকট হয়—শাশুড়ীর বিদ্বেষও তত উগ্র হয়। তার ওপর হেমাঙ্গিনী দেবীও ঠিক সাধারণ মেয়েছেলে নন, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা অত্যন্ত প্রবল এবং বর্তমান কাগজের ভাষায় 'আগ্রাসী'। শুধু ঝগড়াঝাঁটি বা কান্নাকাটি ক'রে নিজে-নিজেই জ্বলবার লোক তিনি নন, জ্বালাবারই ব্যবস্থা করলেন। পুত্র-বধূর ভাগ্যেই আগুন জ্বাললেন তিনি। বেলাদির সম্বন্ধে তাঁর বিদ্বেষের ছুতোটাও ভাল হ'ল, বৌ আসতেই পাগল হয়ে ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে দিল, ভবিষ্যৎ নষ্ট করল চিরদিনের মতো—এ তো সর্বনাশিনী বৌ।

এই সময় বেলাদির একটি সন্তান সম্ভাবনা হয়ে ছিল। বেলাদি বলেন তাঁর শাশুড়ীই তাঁকে বিষ খাইয়ে সেটা নষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন। প্রকাশ্যেই নাকি বলতেন, 'তুই ভেবেছিস ছেলের মা হয়ে একেবারে রাজরানী হয়ে বসবি, ছেলের মায়ায় বেটা আর কোনদিকে তাকাবে না, তোর গিন্নিগিরি কায়েম হবে—আর আমি ভিখিরীর মতো তোর হাততোলায় দিন কাটাব? তা হ'তে দেব না। এ সে মেয়ে নয়।'

কথার-কথা বলেই ভেবেছিল সবাই, এমন কি বেলাদিও। রাগের মাথায়, রীষে পাগল হয়ে মানুষ কত কীই বলে, তাই বলে কি আর সত্যিসত্যিই কেউ এমন

করে। হাজার হোক, ও'রই নাতি হবে তো। কিন্তু সত্যি-সত্যিই সে গর্ভ নষ্ট হয়ে গেল। যেদিন সাধ খেলেন সেদিনও সুস্থ শরীর; সেদিন বিধবা শাশুড়ী নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে পারেন নি বলে পরের দিন নিজে রেঁধে যত্ন ক'রে খাওয়ালেন—তার পরের দিনই মরা ছেলে প্রসব করলেন বেলাদি। সুন্দর ফুটফুটে ছেলেই হ'ত বেঁচে থাকলে; কিন্তু বিষে নাকি নীল হয়ে গিয়েছিল একেবারে।

এতেই অব্যাহতি দেন নি—হেমাঙ্গিনী। ইতিমধ্যেই তিনি কাশীতে গিয়ে বোনের বাড়ি সাত আট দিন বসে থেকে বিস্তর খুঁজে-পেতে একটি অল্পবয়সী বিধবা ঝি নিয়ে এসেছিলেন। মাইনে প্রকাশ্যে যা দিতেন তা ছাড়াও কিছু দেবার ব্যবস্থা ছিল নাকি। এল যখন তখন তার পরনে থান কাপড়, হাত শুধু, ছোট ক'রে চুল ছাঁটা—নিবিড় বৈরাগ্যের সজ্জা। বাড়তি ঝি রাখার কৈফিয়ৎ দিলেন হেমাঙ্গিনী, 'আমার বয়স হচ্ছে, নিজস্ব একটা হাত-নুড়কুৎ লোক না হ'লে চলে না।'

অতঃপর তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন ঝিকে যত্ন ক'রে তার চেহারা ফেরাতে। বলতেন, 'কেন মা এই বয়সে নেড়ীবুড়ি হয়ে থাকবি। কীই বা তোর বয়স, আর বাপু চুল কাটিস নি তুই—বিচ্ছিরি দেখায়!' চুলছাঁটা বন্ধ হ'ল, সাবান কিনে দিলেন, ভাল গন্ধ-তেল কিনে দিলেন প্রসাধন ও রূপসজ্জার জন্য। থান কাপড় ঘুচিয়ে কালা-পাড় শাড়ির ব্যবস্থা করলেন, শেষ পর্যন্ত স্যাকরা ডাকিয়ে দুগাছা পেটি গড়িয়ে দিলেন তামার ওপর সোনা দিয়ে—তার কোলে কাঁচের রেশমী চুড়ির ব্যবস্থা করলেন।...অল্প বয়স, স্বাস্থ্য ভাল—দেখতে দেখতে একমাথা চুল পিঠ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল—তখন হেমাঙ্গিনী প্রত্যহ তাকে ধরে খোঁপা বেঁধে দিতে শুরু করলেন। যুবতী ঝিকে যৎপরোনাস্তি লোভনীয় ক'রে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না।

তারপর—বেলাদির ঐ ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে স্বাস্থ্যের অজুহাতে, বৌকে দিনকতক সাবধানে রাখা উচিত বলে—বেলাদিকে নিজের কাছে শোওয়াতে শুরু করলেন। বললেন, 'ছেলের তো কোন হ্রস্বিদীর্ঘি জ্ঞান নেই—ওর থেকে দূরে রাখাই ভাল।' বৌ রইল তাঁর কাছে, ছেলেকে হাতের কাছে পান জল এগিয়ে দেয় কে, সে ভার পড়ল নতুন ঝিয়ের ওপরই। হেসে হেসে বেলাদিকে বলতেন ঐ ঝিকে দেখিয়ে—'এই বিষবৃক্ষ পুঁতে লালন ক'রে বড় ক'রে রেখে দিয়ে গেলুম, তুই এর ফল ভোগ করবি বলে। আমার কথা না এ-জীবনে ভুলতে পারিস, তার ব্যবস্থা ক'রে গেলুম।'

ফল যা হবার তাই হ'ল। যে বাঘ একবার নর-রক্তের আস্বাদ পেয়েছে সে বাঘ নর-রক্তের গন্ধে চঞ্চল হবেই। মুখুজ্জে মশাইয়েরও প্রায় সেই অবস্থা। যতই হোক বেলাদি তখনও ছেলেমানুষ, চব্বিশ বছরের যুবতী মেয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জেতা তাঁর পক্ষে সেদিন সম্ভব হ'ল না। হেমাঙ্গিনীর আশার অতিরিক্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে বিষবৃক্ষে ফল ধরল। মুখুজ্জে মশাই সেই হরিমতী ঝিকে নিয়ে লক্ষ্ণৌতেই পৃথক বাসা করলেন।

হেমাঙ্গিনী যখন বিষবৃক্ষের কথা চিন্তা করেছিলেন তখন যে তার কোন কোন ফল তাঁকেও ভোগ করতে হতে পারে সেটা বোধ করি ভাবেন নি। যখন সে বিষয়ে অবহিত হলেন তখন সে বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করা তাঁরও সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। ব্যবসা করা মুখুজ্জে মশাইয়ের হয়ে উঠল না, সে চেষ্টাও তিনি করলেন না—পরমানন্দে পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়ে দিতে লাগলেন দু'হাতে। বলা বাহুল্য যে তাঁর কুপ্রবৃত্তি হরিমতীতেই থামল না। তবে তিনি পেশাদারী রূপাজীবাদের দিকে তাকান নি কখনও। একটির পর একটি দাসীকে নিয়েই তাঁর এই কতকগুলি আগাছা সংসার প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল।

অবশ্য একটা ব্যাপারে তিনি কিঞ্চিৎ সুবিবেচনা অথবা চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, বেলাদির কাছে আর কখনও ফিরে আসেন নি, আসতে চান নি। বাড়িতে একবার ক'রে প্রত্যহই আসতেন, কোন কোন দিন এখানে স্নানাহার করতেন, কখনও বা তাও করতেন না—বৈষয়িক কাজ অর্থাৎ টাকাকড়ি সংগ্রহের কাজ সেরেই চলে যেতেন, রাত্রে কোন দিনই ফিরতেন না। বেলাদির সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হয় নি, কিন্তু সে যা হ'ত ঐ স্নানাহারের সময়ই, ঐ প্রয়োজনে যেটুকু হওয়া দরকার—তার বেশী নয়। নগদ টাকা, কোম্পানির কাগজ দেখতে দেখতে যখন সব উড়ে গেল, তখন গহনার দিকে হাত বাড়ালেন মুখুজ্জে মশাই। এ বিষয়ে তাঁকে পক্ষপাতের অপবাদ কেউ দিতে পারবে না, মা ও স্ত্রীর গহনা যখন যেটা হাতের কাছে পেতেন সেইটেই বার ক'রে নিতেন। হেমাঙ্গিনী সুস্থ থাকলে হয়ত বাধা দিতে পারতেন, অন্তত নিজেরটা নিতে দিতেন না নিশ্চয়ই—কিন্তু তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়। ক্ষীণকণ্ঠে নাকে-কাঁদা ছাড়া কোন প্রবল অনুযোগও করতে পারতেন না, করতে গেলে শুনতেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি, 'কেন মা, এ-ই তো চেয়েছিলে। সংসারটা ভেঙে দেবার সময় মনে ছিল না বুঝি?···ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন, এখন আর আপসোস ক'রে লাভ কি। শুকনো কাঠে জল ঢাললে পাতা গজায় না।'

বেলাদি তখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেছেন। বয়স বেড়েছে, কিন্তু সে বোধটা হয় নি, তার সুযোগ নিতে পারেন নি। বাপের আদুরে মেয়ে—তাও অল্প বয়সে বাপের বাড়ি ছেড়েছেন, সংসার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হয় নি তখনও। এখানে এসে জাঁহাবাজ এবং দজ্জাল শাশুড়ীর দাপটে দিশাহারা হয়ে ভয়ে ভয়ে থেকে ভয়েই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। মুখুজ্জে মশাইও ঐ মায়েরই ছেলে, তাঁরও মেজাজ কম ছিল না। যে এক বছর ওঁদের প্রণয়-সম্বন্ধ ছিল, সে সময়ও স্বামীকে ভয় ক'রেই চলতেন বেলাদি। এখনও তাই স্বামীকে কোন বাধা দিতে বা কিছু বলতে পারতেন না। এক চলে যেতে পারতেন বাপের বাড়িতে—কিন্তু বেলাদির বাবা তাতে রাজী হলেন না। তাঁর তখনও আশা, এ দু'দিনের মোহ, বয়সকালে কারুর কারুর অমন হয়, মোহ কাটলে জামাই আবার ঘরবাসী হবে। যখন বাড়িতে আর দ্বিতীয় লোক

নেই, তখন মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে গেলে হয় এ সংসারেরই ঠাটপাট উঠে যাবে একেবারে—নয়ত ঐ বাইরের একটিকে এনে গৃহিণীরূপে বসিয়ে দেবে জামাই। যা-ই হোক, মেয়ের ফেরবার পথ বন্ধ হবে।

হেমাঙ্গিনী মারা যেতে অবস্থা আরও কঠিন হয়ে উঠল, এত বড় বাড়িতে বেলাদি আর একটি ঝি। তখন মুখুজ্জে মশাইয়ের ইচ্ছা যে বেলাদি বাপের বাড়ি চলে যান, অবশ্য গহনাগুলো রেখে, তাহলে একটা সংসার তিনি এখানেই নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু, বুদ্ধি যতই কম হোক—এতদিনে কিছুটা সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বেলাদি। তিনি বুঝেছেন যে ভাইদের সংসারে তাদের হাততোলায় ভাজেদের দয়ার পাত্রী হয়ে থাকার চেয়ে, এ সংসারে—অন্তত নামেও কর্ত্রী হয়ে থাকা ভাল। এখানে; আর যাই করুন, তাঁকে ছাড়া অপর কাউকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে পারবেন না মুখুজ্জে মশাই, এটা তো ঠিক!

অগত্যা শুরু হ'ল ওঁদের এক অভূতপূর্ব জীবনযাত্রা। অনেক ছিল, তাই যেতে যেতেও ঢের সময় লাগল। হেমাঙ্গিনীর গহনা, বেলাদির গহনা—তারপর আসবাবপত্র বিক্রী হতে লাগল। মুখুজ্জে মশাই রোজ সকালেই একবার ক'রে বাড়িতে আসেন, দুপুরের খাওয়াটা এখানেই সারেন, কিন্তু সংসারে এক পয়সাও দেন না। বেলাদিও এতদিনে কিছুটা সেয়ানা হয়েছেন, তিনি অল্পভার বহুমূল্য দু'একখানা অলঙ্কার গায়েব ক'রে ফেললেন। মুখুজ্জে মশাই অবশ্য খোঁজ রাখেন ঠিকই—মধ্যে মধ্যে খোঁজও করেন, 'কৈ, তোমার সে হীরের নাকছাবিটা দেখছি না তো? কানের সে পান্নার টব দুটো কোথায় গেল?' ইত্যাদি। কতকগুলোর কথা বেলাদি স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছেন সোজাসুজি, 'কোথায় গেল তা আমি কি জানি? কখন নিয়ে গিয়ে কাকে দিয়েছ, কবে কোন্‌টা বেচেছ আমি কি তারও হিসেব রাখব?' দু'একটা জিনিস বলে-কয়েই নিয়েছেন, 'ও আমার মার হাতের হীরের আংটি, ও আমি দেব না মরে গেলেও' কিংবা 'মুক্তোর কণ্ঠীটা দিদিমার স্মৃতি, ওটাতে আর হাত বাড়াতে দেব না। আর সে এ বাড়িতে নেইও, বহুদিন আগেই সরিয়ে রেখে এসেছি।'

গালাগালি করেন মুখুজ্জে মশাই, দাপাদাপি করেন—তবে সে সব গা-সওয়া হয়ে গেছে বেলাদির। তিনি চুপ ক'রে থাকেন।

এই ভাবেই চলেছে বছরের পর বছর। কিশোরী বেলাদি যুবতী হয়েছিলেন একদা, ক্রমশ প্রৌঢ়া হয়ে এলেন, তবু ইতিহাসের গতি পাল্‌টাল না। সংসারের খরচ চেয়ে পান না—অগত্যা বেলাদিকেও জিনিসপত্র বেচতে হয়। আগে তা থেকেও খানিকটা খাবলা মেরে নিয়ে চলে যেতেন মুখুজ্জে মশাই—পরে বুদ্ধিটা মাথায় গেল—যতদিন এবং যতটা পারতেন ধার ক'রে চালাতেন—মুদীর দোকানে, গয়লার কাছে, সব্‌জিওয়ালার কাছে—যখন তারা চোখ রাঙাতে শুরু করত তখনই যা হয় কিছু বেচে—তা খাট-আলমারিই হোক, আর বাসনকোসনই হোক—তৎক্ষণাৎ

তাদের ভাগ ক'রে দিতেন। ফলে আরও বেশ কিছুদিন ধার মিলত, উপবাস ক'রে থাকতে হ'ত না।...

যখন বিক্রী করার মতো আর কিছুই রইল না, তখন বাড়িতে হাত পড়ল। হুসেনগঞ্জের ভাড়াটে বাড়ি কবে বিক্রী হয়ে গেছে তা টেরও পান নি বেলাদি, তবে উদয়গঞ্জের বসতবাড়ি যে বাঁধা পড়েছে সেটা জানতেন। বার দুই বাঁধা দেবার পর বিক্রী করতে হ'ল। কোথায় যাবেন বেলাদি, সে প্রশ্ন করতে নির্বিকার মুখুজ্জে মশাই উত্তর দিলেন, 'চুলোয়!' অবশ্য ওঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে যে কিছু হবে না তা বেলাদিও বুঝেছিলেন। তাঁর বাবার কাছ থেকে পাওয়া যে বাড়ি, সেটা তাঁর নামেই ছিল, সেটা বিক্রী করা কি বাঁধা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট চাপ দিয়েছিলেন তাঁর মালিক —কিন্তু বেলাদি এই একটা বিষয়ে অনমনীয় ছিলেন, সেজন্যে কম ফৈজৎও সহ্য করতে হয় নি তাঁকে—তবু তিনি একটি সইও দিতে রাজী হন নি। তিনি স্থির বুঝেছিলেন যে এটুকু গেলে সত্যিসত্যিই চারবাগের রাস্তায় স্টেশনে যাবার পথে আঁচল পেতে ভিক্ষা করতে হবে, অথবা ভিখিরীর মতো দাদার সংসারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এই টানাহেঁচড়াতে মুখুজ্জে মশাইয়ের কিল-চড়ও খেতে হয়েছে দু'একদিন, তবুও সে বাড়ি হস্তান্তর করেন নি।

করেন নি তার কারণ—একেবারেই নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিলেন বেলাদি। বাবা মারা গেছেন অনেকদিন, হঠাৎ মারা গেলেন—উইল ক'রে মেয়েকে কিছু লিখে দিয়ে যাবার অবসর পান নি, কিন্তু তার আগে বেলাদির সামনেই বার বার তাঁর ভাইদের বলেছেন, 'তোদের জন্যে তো ঢের রেখে গেলুম—তা থেকে, একসঙ্গে থোক কিছু দিলে ঐ রাক্সটা কেড়ে নেবে, খুকীটাকে তোরা মাসে মাসে কিছু ক'রে দিস, চল্লিশ পঞ্চাশ যা তোদের বিবেচনায় হয়।' কিন্তু ভাইরা এখন পৃথক, এ ওকে দেখায়, ও একে। কেউ হয়ত তিন চার মাস অন্তর দশ পনেরো টাকা পাঠায়, কেউ হয়ত বছর গেলে একেবারে পুজোর সময় ত্রিশটা টাকা মনি-অর্ডার করে। বেলাদিও মুখ ফুটে কারও কাছে কিছু চান নি কোন দিন। কারণ নিজের কানেই শুনেছেন, ভাজেরা বলাবলি করছে, 'ঠাকুর কি ওকে ছেলেদের চেয়ে কিছু কম দিয়েছিলেন? কম ক'রেও ষাট সত্তর হাজার টাকা খরচ ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন, তার তুলনায় এঁরা আর এমন বেশী কি পেয়েছেন? ওর বরাত, তাই সব থাকতেও ভিখিরী, এ হ'ল গে ভগবানের মার। ওর দুঃখু কি ভায়েরা ঘোচাতে পারে!'

বেলাদি জানেন, এক একটি ভাই খুব কম ক'রেও পুরো দুটি লাখ টাকা ক'রে পেয়েছেন—নগদে, বাড়িতে, জমিতে, মূল্যবান শেয়ারে।

সুতরাং এই বাড়িটিই এখন ভরসা। আগে দু'ঘর ভাড়াটে ছিল, একজনদের তুলে দিয়ে একতলাটা খালি করিয়ে নিয়ে সেইখানেই চলে এলেন বেলাদি। ওপর-তলার ভাড়া ছিল নামমাত্র, বহুদিনের আগের ভাড়াটে তারা, মাত্র কুড়ি টাকা ভাড়া দিত, বলে-কয়ে প্রায় হাতে-পায়ে ধরে সেটা ত্রিশ টাকা করিয়ে নিয়েছেন। বেলাদি ভাবলেন—মন্দের ভাল, এবার স্বামীর সঙ্গে তো সম্পর্ক ঘুচল—যা পাবেন, এক-

বেলা নুনভাত খেয়েও শান্তিতে পড়ে থাকবেন।

কিন্তু, ইংরেজীতে যাকে বলে 'মালিককে বাদ দিয়ে শুয়োর গোনা' তাঁরও হিসেবটা সেই রকম দাঁড়াল। নিত্যকার মতোই অতি-প্রশান্ত মুখুজ্জে মশাই দেখা দিতে লাগলেন, এবং দুপুরবেলা স্নান ক'রে ভাত চাইতেও কুণ্ঠিত বোধ করলেন না। এ ভাত কোথা থেকে আসবে সে প্রশ্ন ক'রে কোন লাভ নেই। এক উপায় না দেওয়া—কিন্তু কোন্ হিন্দুর মেয়ে স্বামীকে অভুক্ত রেখে মুখে অন্ন তুলতে পারে? সুতরাং এ খরচটা স্থায়ীই হয়ে রইল—শুধু তাই নয়, এইবার মুখুজ্জে মশাই আরও একটি চাল চাললেন, বেলাদিকে রক্ষণাবেক্ষণ ও বাজারহাট করানোর অজুহাতে তাঁর অসংখ্য পুত্রসন্তানের একটিকে এনে এখানে তুলে দিলেন। বললেন, 'চাকরের মতো থাকবে, খাটবে-খুটবে খাবে। ফেলা ভাত দুটো দিও, তাতেই হবে।··· তোমারও তো লোক দরকার একটা।'

বোধহয় তাঁর তখনও ধারণা ছিল বেলাদির হাতে সব গিয়েও বেশ কিছু আছে, নগদে ও গহনাগাঁটিতে—সেগুলো এমনি তো বার করা যাবে না, নিজে খেয়ে ও একটা ছেলেকে খাইয়ে যা উসুল হয়।

স্বামীর মুখের ওপর প্রতিবাদ করতে পারলেন না তিনি; ছেলেটাকেও ঘাড় ধরে বার ক'রে দিতে পারলেন না। ফলে এবার বেলাদিকে কাজকর্মের চেষ্টা দেখতে হ'ল। কাজ আর জানেন কি—বোনা, সেলাই, ক্যারম-বোর্ডের জাল বোনা এই সবই ভরসা—তাতে মেহনত যত হ'ত, আয় তত হ'ত না। কিন্তু উপায় কি?

তবে এবার—এতকাল পরে, বাধ্য হয়েই মুখুজ্জে মশাই কিছু কিছু রোজগার শুরু করলেন। যেটুকু ডাক্তারি পড়া ছিল তার ওপর নির্ভর ক'রেই সামান্য কিছু সস্তাদামের ওষুধ এনে বেলাদিরই বাইরের ঘরে 'ডাগ্‌দার' সেজে বসলেন। ওখানে গিয়ে রোগী দেখালে পাঁচ আনা প্রণামী আর ওষুধের দাম—আর বাড়িতে নিয়ে গেলে আট আনা ফী এবং রিক্‌শাভাড়া। এতে কতটা কী হ'ত তা ঈশ্বর জানেন, তবে মধ্যে-মিশেলে কোন সব্‌জিওলা এলে কিছু আনাজ কিনে দিতেন, এক-আধ দিন দৈবাৎ হাতে দমকা কিছু এলে মাছও কিনতেন। এইভাবেই চলছিল ওঁদের। আমি গত বছর এসেও যা দেখে গেছি তাতেও ঐ ব্যবস্থাই অব্যাহত ছিল। আমাদের এ বাসা থেকে খান-তিনেক বাড়ি পরেই বেলাদির বাড়ি—যাতায়াতে অনেকবার দেখেছি মুখুজ্জে মশাই কড়া মেজাজে 'মুল্‌কী' দেহাতী রোগীদের ধমকাচ্ছেন।

তারপর একেবারে এখানে এই আসা আমার। এবং এই সংবাদ।

মুখুজ্জে মশাইয়ের জন্যে বেলাদির এত উদ্বেগের কারণটা তাই ঠিক আমার বোধগম্য হ'ল না। প্রশ্ন করলুম, 'উনি কি—এখানেই, মানে এ বাড়িতেই অসুস্থ হয়ে আছেন?'

'পোড়া কপাল! সে তো তাহলে তবু দেখতে পেতুম, বুঝতে পারতুম কতটা

কি হয়েছে। এ তো যা কিছু ঐ লছমীর মুখে শোনা, ও তো ঐ একফোঁটা বাচ্চা—তার ওপর না হিন্দুস্থানী, না বাঙ্গালী—কোন কথাটাই পরিষ্কার কইতে পারে না, কী বলতে কি বলে কিছুই বুঝি না।'

'তা সে যাকগে! আপনার কি ?···আমি বলি বুঝি আপনার বাড়িতেই পড়ে আছেন—নিজের গরজেই এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। দোরের ময়লা ফেলবি তো ফেল্, নইলে গন্ধে মর্।···যাদের লোক, তাদের কাছে আছে, তারা বুঝবে। আপনি এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ?'

বেশ জোর দিয়েই বলি কথাগুলো।

বেলাদি কেমন যেন ম্লান হয়ে যান। কাঁচুমাচু মুখ ক'রে বলেন, 'না, তা নয়।··· তবে কি জান, আমার একটা কর্তব্য আছে তো!'

'আপনার আবার কিসের কর্তব্য! তিনি তাঁর কর্তব্য কোন দিন করলেন না—যত কর্তব্য আপনারই ? যাদের নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন, যাদের পেছনে এই দু'তিন লাখ টাকার বিষয় উড়িয়ে দিলেন তারা বুঝুক। ওঁকেও একটু বুঝতে দিন. কত ধানে কত চাল!' আমি রাগারাগিই করি।

বেলাদি যেন আরও কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। মাথা হেঁট ক'রে বলেন, 'হ্যাঁ। তারাই বুঝবে বটে। যেখানে পড়ে আছেন সে তো এদেশী মেয়ে—আমাদের ওখানেই ঝিয়ের কাজ করতে এসেছিল। তখনও তার মরদ ছিল, সে হঠাৎ মারা যেতেই উনি—। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিই বা কি আর সামর্থ্যই বা কি। এখন তো শুনছি আবার তাকে খাটতেই বেরোতে হয়েছে, বড় দুটো ছেলেকেও কোন্ দোকানে নাকি কাজে লাগিয়েছে—ফাইফরমাশ খাটার কাজ, ওজন করা মাল খদ্দেরদের হাতে হাতে এগিয়ে দেওয়া—এই ধরনের কাজ। মাইনে বেশী নয়—কোনমতে জীবনধারণটা চলে বোধহয়।···সত্যি মিথ্যে জানি না, লছমী যা বলে—সে মেয়েটা নাকি এখন দুবেলা ওঁকে আপদবালাই আর দূর-ছাই করছে—গালাগাল দিচ্ছে।··· আর সত্যিই তো—তাকে খেটে খেতে হবে, রুগী দেখবে, না রান্নাবান্না করবে, না বাইরে কাজে যাবে! তাছাড়া ঐ সাংঘাতিক রোগের নাম শুনলে কেউ আর কাজ করতে দেবে বাড়িতে ?'

বুঝলুম বেলাদি আমার মূল প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন। মিছিমিছি তার পুনরুক্তি ক'রেও লাভ নেই। কোথায় কী একটা অদৃশ্য সূক্ষ্ম বন্ধন আছে এখনও —সেই বাঁধনেই টান পড়েছে, তাই এমন দিশাহারা হয়ে ছুটে এসেছেন।

আরও বুঝলুম, মানুষের মনে সমস্ত হিসাবনিকাশ দেনা-পাওনা বিচারবুদ্ধির ওপরেও কিছু একটা আছে, আমাদের প্রচলিত অভিধান খুঁজে যার সংজ্ঞা মেলে না, আমাদের অভিজ্ঞতা বা ধারণা দিয়ে যা মাপ করা যায় না।

অগত্যা উঠে পড়তে হ'ল। দাদাকে বলে দু'একটা সুপারিশ সংগ্রহ ক'রে দু'তিন দিন ঘুরে একটা হাসপাতালও ঠিক ক'রে ফেললুম। বেলাদি বেড-এর ওপরেই জোর দিয়েছিলেন, রোজ রোজ রুগী নিয়ে গিয়ে দেখানো তাঁর পক্ষে

সম্ভব নয়,' আর বাড়িতে রাখলে সেবাশুশ্রূষার প্রশ্ন আছে—সে-ই বা করে কে ?

হাসপাতালে বেড্ ঠিক ক'রে এসে প্রশ্ন করলুম, 'তারপর ? তাঁর সে আড্ডা থেকে রুগী উদ্ধার করবে কে ? আমার দ্বারা ওসব হবে না।'

মুহূর্ত-কয়েকের জন্যে যেন বিবর্ণ হয়ে গেলেন বেলাদি, সুন্দর শুভ্র ললাটে তাঁর দেখতে দেখতে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। তবু বেশীক্ষণ ইতস্ততও করলেন না, ঐ সামান্য একটু সময়ের মধ্যেই যেন সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মন স্থির ক'রে ফেললেন। শান্ত কণ্ঠেই বললেন, 'আমিই নিয়ে যাবো। কখন নিয়ে যেতে হবে বলো। তুমি—তুমি হাসপাতালের গেট্-এ থাকবে তো ?'

'আপনি ? আপনি যাবেন সেখানে ? আপনি রুগীকে নিয়ে যাবেন সেই বাড়ি থেকে ?' বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করি। কিছুতে যেন বিশ্বাস হয় না কথাটা।

'আর কে যাবে বলো ? আর কে আছে ?' উনি খুব সহজেই উত্তর দেন।

আমিও একটু চুপ ক'রে থেকে ভেবে নিই। কোথায় যেন একটা পৌরুষে বাধে, অথবা বেলাদির অবস্থাটা চিন্তা ক'রেই মন স্থির ক'রে ফেলি, 'চলুন, আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।'

জামাটা গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়ি ওঁর পিছু পিছু।

ছিতোয়াপুর অঞ্চলে—যেটাকে আগে শুয়োরপট্টি বলা হ'ত—সেইখানে খুঁজে খুঁজে একটা অন্ধকার গলিতে একখানা খাপরার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন বেলাদি।

রিক্‌শার আওয়াজ পেয়ে কতকগুলো অর্ধনগ্ন ও নগ্ন ছেলেমেয়ে এবং তাদের পিছন পিছন যৎপরোনাস্তি মলিন বস্ত্র পরিহিতা একটি হিন্দুস্থানী মেয়েছেলে বেরিয়ে এল। ভিতর থেকে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে একটা প্রশ্নও শোনা গেল, 'কৌন্ আয়া রে ?'

যে মেয়েছেলেটি এসে দাঁড়িয়েছিল—বেলাদির চেয়ে হয়ত কিছু ছোটই হবে বয়সে—তার চাউনি দেখে মনে হ'ল সে একেবারে পাথরে পরিণত হয়ে গেছে। তার চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে। অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, 'বহুজী !'

বেলাদি ওর দিকে চাইলেনও না ভাল ক'রে, আশ্চর্য কৌশলে ওকে না ছুঁয়েই পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

পিছু পিছু আমিও ঢুকলাম। মাটির ঘরে, একখানা ঝুলে-পড়া চারপাইতে একটা অত্যন্ত মলিন শয্যায় পড়ে আছেন মুখুজ্জে মশাই। বিস্ময়ে তাঁর কোটরগত চক্ষুও যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। স্বয়ং ভগবান সশরীরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেও এতটা বিস্মিত হতেন না তিনি বোধহয়—রোগশয্যার পাশে শাস্ত্রমতে-বিবাহিতা ধর্মপত্নীকে দেখে যতটা হলেন।

'তু-তুমি এখানে ?'

'তোমার জন্যে হাসপাতালে একটা বেড্-এর ব্যবস্থা করেছে নীরু, তোমাকে সেখানে ভর্তি ক'রে দেব বলে নিতে এসেছি।'

'নিতে এসেছ! তুমি!...হাসপাতালে? বেড্ পাওয়া গেছে?...কদিন আগেই তো ঘুরে এলুম, কেউ তো ঘাড় পাতলে না।...যত্ত সব হয়েছে ঘুষখোরের দল।'

কিছুটা চেঁচিয়ে, কিছুটা অর্ধস্বগতোক্তির মতো বলেন মুখুজ্জে মশাই। তারপর হঠাৎ যেন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, 'হাসপাতালে দিয়েই বা কি হবে? সেখানেও তো ওষুধ ইনজেকশ্যান সব কিনে দিতে হয় শুনেছি। সে দেবে কে? মিছিমিছি হাসপাতালে টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ কি? তুমি যোগাবে সে সব?...কেনই বা দেবে। ও কটা টাকা থাকলে তোমার আখেরে কাজ দেবে। বিধবার পুঁজি—'

তবু শান্তভাবেই উত্তর দেন বেলাদি, 'সে সব ভেবে দেখেছি বৈকি। এ হাসপাতালে ইনজেকশ্যান ওষুধ সব দেবে—দু'একটা ফুড আর টনিক কিছু কিছু দিতে হবে। সে হয়েই যাবে একরকম ক'রে—নাও উঠে পড়ো।'

অগত্যা উঠেই পড়তে হ'ল মুখুজ্জে মশাইকে। যেন কিছুটা ভয়ে ভয়েই উঠলেন। এর আগে তাঁর স্ত্রীকে এতটা সমীহ করতে আর কখনও দেখি নি। বোধ হয় বেলাদিও দেখেন নি। মুখুজ্জে মশাইও আজ স্ত্রীকে এক নতুন রূপে দেখলেন। ওঁর এই ব্যক্তিত্ব মুখুজ্জে মশাইয়ের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

এর পর তিন-চার মাস ধরে যে কাণ্ডটা করলেন বেলাদি, তার তুলনা নেই। অন্তত আমি তো আর এমনটি দেখি নি। অতি বড় স্বামীসোহাগিনীও বোধ করি স্বামীর জন্যে এতটা করে না। প্রত্যহ দু'বেলা হাসপাতালে যাওয়া, বাড়ি থেকে দু'বেলার খাবার—ভাত লুচি মাছ মাংস তৈরী ক'রে নিয়ে গিয়ে সময়মতো পেঁছে দেওয়া, খুঁজে খুঁজে বড় ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে তাঁর হাতে-পায়ে ধরে সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা করানো, টিন টিন ফুড আর বোতল বোতল টনিক কিনে দেওয়া—হাসপাতালে যা নেই এমন ওষুধও খুঁজেপেতে যোগাড় করা—পয়সা খরচ তো বটেই, এই বয়সে পরিশ্রমও যা করলেন তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। একটা মানুষ যেন সাত জন হয়ে খাটতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে সর্বস্বান্ত হ'তেও কিছু আর বাকী ছিল না।

তাঁর সর্বশেষ গোপন সঞ্চয়—তাঁর মার হাতের হীরের আংটি, যা স্বামীর দস্যুতা থেকে বাঁচাবার জন্যে পরের বাড়িতেই রেখে দিয়েছিলেন এতকাল, হাতে তো দেনই নি ভাল ক'রে—কোন দিন চোখেও দেখেন নি বোধ হয়—তাও বিক্রী হয়ে গেছে। আমার দাদাই তাঁর এক অফিসার মারফৎ বোম্বেতে পাঠিয়ে বিক্রী করিয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া তো সোনার যা ছিল সব ঝেড়েমুছে বিক্রী করেছেন, কানের ফুল কি হাতের আংটি বলতে একটা নেই। একগাছা ক'রে ব্রোঞ্জের চুড়ি ছিল, শেষ অবধি তাও বিক্রী করতে হয়েছে। এখন শুধু শাঁখা ভরসা, যদি কোন দিন তার একগাছা 'বাড়ন্ত' হয়, কাঁচের চুড়ি কিনে পরতে হবে।

অর্থাৎ এবার বাড়ি বিক্রী করা বা বাঁধা দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। সেই প্রস্তাবই করলেন বেলাদি। কিন্তু আমরা একেবারে রুখে দাঁড়ালুম। দাদা তো স্পষ্টই বললেন, 'আমরা ভাংচি দেব আপনি বিক্রী করার চেষ্টা করলে।' এ পাড়ার এই কজন বাঙ্গালী অধিবাসী ছাড়া এমন কোন বান্ধবও ওঁর নেই—যে দাঁড়িয়ে থেকে এসব করাবে। বেলাদি কান্নাকাটি করতে লাগলেন। আমি বললুম, 'কিন্তু বেলাদি, এও তো একদিন শেষ হবে। তখন? তখন তো পথে বসে ভিক্ষা করতে হবে।'

'সে যদি আমার অদৃষ্টে থাকে তো সে কি আর তোমরা আটকাতে পারবে ভাই।'

'তাহলে সেইটেই এখন শুরু করুন—বাড়িটা আপাতক থাক।'

সেইটেই করলেন বেলাদি, ঠিক পথে বসে নয়, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ভাইদেরই চিঠি দিলেন, দিলেন নিজের মিথ্যা অসুখের সংবাদ দিয়ে। নইলে তারা কিছুই দেবে না, বুঝতেও পারবে না ওঁর এই উদ্বেগ। স্বামীর অসুখের খবর দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলেন ওঁর এক খুড়তুতো দেওরের কাছে। ভদ্রলোক উনাওতে ওকালতি করেন। ইনিই নাকি—বেলাদি বলেন—ওঁর শ্বশুরবাড়ি-রূপ মরুভূমিতে একমাত্র ওয়েসিস ছিলেন। এখনও পর্যন্ত ইনিই যা কিছু খোঁজখবর নেন।

এ ভিক্ষার ফলও ফলল। তিন ভাই মিলে প্রায় চারশ' টাকার মতো, আর ঐ উকিল ভদ্রলোক একাই দুশ' টাকা পাঠালেন। এবং এই টাকাটা থাকতে থাকতেই হাসপাতাল থেকে ছাড় হয়ে গেল। আপাতত সেরে উঠেছেন মুখুজ্জে মশাই। ওঁরা কতকগুলো বড়ি দিয়ে দেবেন, সেইটে সপ্তাহে সপ্তাহে এনে খাওয়াতে হবে, আর কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই; এখন বাড়ি ফিরে একটু বিশ্রাম নিলে এবং একটু ভাল খাওয়া দাওয়া করলেই মাস-তিনেকের মধ্যে কর্মক্ষম হয়ে উঠবেন।...

ছাড়বার হুকুমটা বেরোবার পরই বেলাদি কেমন যেন গম্ভীর আর উন্মনা হয়ে গেলেন। সুগভীর ক্লান্তি আর সেই ক্লান্তিজনিত অবসাদও তার কারণ হ'তে পারে। মানুষ কোন গভীর উদ্বেগে যখন ছুটোছুটি করে তখন নিজের দিকে তাকায় না, তাকাবার দরকারও হয় না বিশেষ, কিন্তু শরীরের ক্ষতি যা হবার তা ঠিক হ'তে থাকে—উদ্বেগের কারণটা দূর হ'লে কিংবা কমে এলেই চড়াসুরে বাঁধা স্নায়ুর তার হঠাৎ ছিঁড়ে বা এলিয়ে যায়, যন্ত্রটা একেবারেই বিকল হয়ে পড়ে।

আমি নিজে অবশ্য লক্ষ্ণৌতে ছিলুম না তখন। মুখুজ্জে মশাই যেদিন ছাড়া পান, আমার বৌদি গিয়েছিলেন বেলাদির সঙ্গে। সেদিনের ঘটনা তাঁর মুখেই শোনা। বেলাদির সেদিন এত শরীর খারাপ যে তাঁকে ধরে ধরে গাড়ীতে তুলতে-নামাতে হয়েছিল। একটা টাঙ্গা নিয়ে গিয়েছিলেন ওঁরা। মুখুজ্জে মশাই তাঁর সামান্য কাপড়-জামা ও বাড়তি ওষুধ-পথ্য একটা থলিতে ভরে নিয়ে যখন এসে গাড়ীতে উঠলেন তখন তাঁকে রীতিমতো সুস্থই দেখাচ্ছে, মোটাও হয়েছেন বেশ—বেলাদির দিকেই বরং যেন চাওয়া যাচ্ছে না, তাঁকেই—অসুস্থ শুধু নয়, রীতিমতো

রুগ্ন দেখাচ্ছে।

তা নিয়ে মুখুজ্জে মশাই অবশ্য যথেষ্ট উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন। সাধারণভাবে বিশেষ কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন না ক'রে কতকটা স্বগতোক্তির মতোই বার বার বলতে লাগলেন, এবার 'ওর' দেহটার দিকে নজর দিতে হবে। তাঁকে ভাল ক'রে তুলে নিজে পড়বে তা তিনি হ'তে দেবেন না—ইত্যাদি।

তিনি একাই কথা বলে যাচ্ছিলেন। বেলাদি পিছনের লোহাটা ধরে চুপ ক'রে চোখ বুজে বসে ছিলেন—একটা কথাও বলেন নি। মুখুজ্জে মশাইও তাঁর আন্তরিক সদিচ্ছার ঝোঁকে এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নি গাড়িটা কোন্ দিকে যাচ্ছে। একেবারে ছিতোয়াপুরের দিকে ঘুরতে তাঁর খেয়াল হ'ল, 'একি, এ কোন্ দিকে যাচ্ছে? বাড়ি যাবে না—? এই টাঙ্গাওয়ালা, রোখো রোখো, ইধার ঘুমনে তুম্‌কো কোন্ বোলা? ইস তরফ নেহি, টাঙ্গা ঘুমায় লেও—'

'ঠিকই যাচ্ছে ও', এতক্ষণে কথা বলেন বেলাদি, ক্লান্ত-কণ্ঠে উত্তর দেন, 'আমিই বলেছি এখানে আসতে। আর কোথায় যেতে চাও বলো—?'

'তার মানে? বাড়ি যাবে না?'

'বাড়ি—মানে আমার বাড়ি? না, সেখানে বাইরের ঘরটাও ভাড়া দিতে হয়েছে—যেটায় তুমি বসতে। সবই ভাড়া বসেছে—আমি আর ঐ বাচ্চাটা কোনমতে ভেতরের ছোট ঘরটায় থাকি, সেখানে তোমার থাকার সুবিধা হবে না। তুমি এখানেই নেবে যাও। তোমাকে আর আমি বইতে পারবও না। আমার আর কিছুই নেই, ঐ ভাড়া থেকেই টেক্‌সো খাজনা দিয়ে কোনমতে জীবনধারণ করতে হবে, বোধহয় একবেলার বেশী জুটবে না।...শেষ এই দেড়মাস দু'মাস চালিয়েছি ভিক্ষে ক'রেই বলতে গেলে, সেই ভিক্ষের দরুনই এই গোটা পঁচিশেক টাকা অবশিষ্ট আছে—এটাও রেখে দাও। দু'বোতল ফুড্ কেনাই আছে—পারো তো আরও দু'এক বোতল কিনে রেখো। আর আমার কোন সাধ্য নেই—এই বুঝে নিজে একটু সাবধানে থেকো।'

সুগভীর শ্রান্তিতে শেষের দিকের কথাগুলো যেন জড়িয়ে গেল বেলাদির গলায়। মুখুজ্জে মশাই ব্যস্ত হয়ে কী যেন বলতে গেলেন, 'ও ছোঁড়াটাকে দূর ক'রে দিলেই তো হয়—সেই জায়গাতেই তো আমি—। তোমাকেও তো দেখা দরকার একটু—এই শরীর তোমার—' এই ধরনেরই কী সব কথা, বৌদির মনে নেই ভাল, কিন্তু ততক্ষণে সেই বস্তিতে গাড়ি এসে লেগেছে, সেদিনের মতো আজও ভিড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ শিশু বালিকার দল; পিছনে পিছনে অবগুণ্ঠনবতী সেই মেয়েছেলেটিও।

আর কিছু বলতে পারলেন না মুখুজ্জে মশাই। ঘটনাটার অপ্রত্যাশিততায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন কতকটা, সময়ও পেলেন না বিশেষ। অভিভূতের মতোই নেমে পড়লেন। এত দিন কি ভেবে রেখেছিলেন কে জানে, কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার দিনও যেমন কথা কইতে পারেন নি, আজ ফিরে আসবার দিনও পারলেন

-না। নিঃশব্দেই গাড়ি থেকে নেমে সেই অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন ঘরে গিয়ে ঢুকতে হ'ল তাঁকে।...

এবার গাড়ির মুখ ফিরল। বেলাদি মুখের ওপর—বোধ-হয় পড়ন্ত রোদটা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যেই—আঁচলটা টেনে দিয়ে কেমন নেতিয়ে পড়েছিলেন। তবু তার মধ্যেই ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন একবার, 'টাঙ্গাটা ছেড়ে দিয়ে একটা রিক্শা নিলে হ'ত না সুজয়া?'

বৌদি ধমক দিয়ে নিরস্ত করলেন, 'আপনি চুপ করুন তো! মোট হয়ত তিন-চার আনার সুসার হবে, তার জন্যে এত কাণ্ড না করলেও চলবে। নিজের বেলাতেই যত কৃচ্ছ্রসাধন আপনার!'

আর কিছু বলেন নি বেলাদি। বলার শক্তিও ছিল না বোধহয়। চোখ মেলে বসে থাকবারই যেন শক্তি ছিল না আর। গাড়ি যে তাঁর বাড়ি ছাড়িয়ে গিয়ে আমাদের বাসাতে থামল, তাও লক্ষ্য করলেন না।

বৌদি নিজেই ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ওঁকে হাত ধরে নামিয়ে আমাদের ঘরে বসালেন। তারপর ছুটে গিয়ে এক গ্লাস শরবৎ তৈরী ক'রে এনে বললেন, 'এটা খেয়ে ফেলুন তো! একটু সুস্থ হোন। তারপর চা-টা খেয়ে বাড়ি ফিরবেন।'

বেলাদি ঘাড় নাড়লেন। খুব ম্লান, ঈষৎ একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে যেন কতকটা অনুনয়ের ভঙ্গীতেই বললেন, 'আজ আর ওটা চলবে না ভাই, লক্ষ্মীটি, তুমিই ওটা খেয়ে নাও বরং।...আজ শুক্রবার—সংকটা ক'রে আছি তো, এমনিই ক'মাস করছি, মানসিক ছিল যে হাসপাতাল থেকে ভালয় ভালয় ফিরলে তার পরের যে বার পড়বে সেদিন এক চিম্‌টি পথের ধুলো খেয়ে মহাসংকট-বার করব—তা আজই যখন শুক্রবার পড়ে গেল, মায়েরই যোগাযোগ মনে হ'ল—তাই আজই সেটা সেরে নেব মনে করেছি। এমনিই একটু বসি তোমার পাখার তলায়, সন্ধ্যের মুখে বাড়ি গিয়ে ঐ একটু ধুলো মুখে দিয়ে এক ঢোঁক জল খেয়ে পালুনিটা সেরে নেব।'

এরপর স্বভাবতই কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হয় নি বৌদির। শুধু অবাক হয়ে চেয়ে ছিলেন বেলাদির মুখের দিকে। তারপর যখন কথা বলতে পেরেছিলেন—বলেছিলেন, 'ধন্যি দিদি, ধন্যি! এ যুগে জন্মানো কিন্তু উচিত হয় নি আপনার। আপনি সেই ত্রেতা যুগের মানুষ, সেই যুগেই ভাল মানাত আপনাকে। কী ক'রে যে ছিটকে চলে এলেন এই চোদ্দ পোয়া কলিতে—আশ্চর্য!...এই বরের জন্যে এত ছিষ্টি করতে ইচ্ছেও তো যায় আপনার!'

আবারও হেসেছিলেন বেলাদি। করুণ সলজ্জ হাসি।

বলেছিলেন, 'কার জন্যে কী করেছি ভাই, তা আমিও জানি না। শুধু এই জানি যে না ক'রে থাকতে পারি নি। এটাও বোধহয় মেয়েজন্মের একটা সাধ সুজয়া, এই কারুর জন্যে প্রাণপাত করা—আত্মত্যাগ করা। হয়ত সেই সাধই

মিটিয়েছি, নিজের গরজেই।'

বলতে বলতেই হু-হু ক'রে কেঁদে উঠেছিলেন বেলাদি। সর্বহারার বুকফাটা আকুল কান্না। জীবনের সর্বশেষ অবলম্বনটিও ভগবান কেড়ে নিলে মানুষ যেমন ক'রে কাঁদে—তেমনিই।

বৌদি বাধা দেন নি সে কান্নায়, প্রবোধ দেবারও চেষ্টা করেন নি। চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন শুধু। এটুকু বুঝেছিলেন যে এখন এই কান্নাটাই ও'র সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা, অবশিষ্ট জীবনের সর্বপ্রধান অবলম্বন।

ইচ্ছাপত্র

সাক্ষীদের দিয়ে ঠিক জায়গায় সই করিয়ে নিয়েও আর একবার য়্যাটর্নী সুকুমার-বাবু সাবধানে সইগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে কাগজপত্র ব্যাগে পুরে হাসি-হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালেন।

মালবিকা দেবী এতক্ষণ পর্যন্ত বসেই ছিলেন, পিঠের দিকে বালিশের স্তূপ রচনা ক'রে কোনমতে বসিয়ে রেখেছিলেন ডাক্তার, নিজেও নাড়ি ধরে বসে ছিলেন পাশে। অনেকবার ইতিমধ্যে বলেওছেন তিনি শুয়ে পড়তে, ও'র সই হয়ে গেছে যখন, তখন আর বসে থাকার দরকার কি? কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করেন নি মালবিকা। যেন নিঃশ্বাস রোধ ক'রে বসে ছিলেন তিনি; এমনিই নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু যেটুকু পারেন তাও যেন নিতে সাহস হচ্ছিল না তাঁর, পাছে সেই অবসরে কোথাও কোন ত্রুটি থেকে যায় তাঁর এই চরম ইচ্ছাপত্র বা উইলে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না।

সুকুমারবাবু উঠে দাঁড়াতে তিনি অকারণেই প্রশ্ন করলেন একবার, 'দেখুন, কোথাও কোন গোলমাল বা আইনের ফাঁক রইল না তো?'

'না না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সব ঠিক আছে। পার্ফেক্টলি অল রাইট। আচ্ছা, চলি এখন। এত তাড়ারও কিছু ছিল না, আমি জানি আপনি ভাল হয়ে উঠবেন ঠিক, এ উইলও হয়তো বদলাতে হবে। তবু, আপনার যখন ফ্যান্সি হয়েছে একটা, ক'রে দিলুম। আর কাজ করলে নিখুঁত ভাবেই করব—সাবধানে চলতে চলতে এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, বুঝলেন না! তাছাড়া স্বয়ং ডাক্তার দে সাক্ষী রইলেন, ও'র মতো চিকিৎসকের টেস্টিমনির বিরুদ্ধে কেউ একথা বলতে সাহসই করবে না যে আপনি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায়, অন্যের বিনানু-রোধে এ উইল সম্পাদন করেন নি। হা হা।'

ছোট্ট একটা নমস্কারের ভঙ্গী ক'রে সুকুমারবাবু বিদায় নিলেন। মালবিকাও একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এইবার। সঙ্গে সঙ্গে যেন রাজ্যের ক্লান্তি এসে চেপে ধরল তাঁকে, তিনি চিকিৎসককে ইঙ্গিত করলেন শুইয়ে দিতে।

নার্সও পাশেই ছিল। ডাক্তারে আর নার্সে মিলে বালিশ সরিয়ে সাবধানে

আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল তাঁকে। ডাক্তারের ইঙ্গিতে কয়েক মিনিটের জন্য অক্সিজেনের ফোঁদলটাও ধরা হল ওঁর নাকের সামনে। এই ক' মিনিট যা স্ট্রেন গেছে—সই করতে ও সই করা দেখতে—ওঁর পক্ষে এতটা বসে থাকাই তো একটা স্ট্রেন—তাতে এটুকু দরকার।

অবশ্য বেশীক্ষণ দরকার লাগল না। মালবিকা ইঙ্গিত করলেন ওটা সরিয়ে নিতে। প্রাথমিক ক্লান্তিটা কেটে এর মধ্যেই অনেকটা যেন সুস্থ বোধ করছেন। এতটা ভাল বোধ করেন নি অনেকদিন। বোধহয় মনের এই ভার, দুশ্চিন্তাটা কেটে যেতেই এতটা হালকা হয়ে গেছে দেহটা, বুকটা। ভার এই বিষয়ের। বিষয় তো কম নয়, দুশ্চিন্তা হওয়ার মতোই। তাঁর যে আর্থিক মূল্য এতটা—তা মালবিকাও জানতেন না। মোটামুটি যা তালিকা তৈরি করেছেন সুকুমারবাবু—নগদ টাকা, কয়েকখানা বাড়ি, বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ, গহনা—সব মিলিয়ে চুয়াল্লিশ লাখ টাকার ওপর দাঁড়িয়েছে। এছাড়া লণ্ডনের ব্যাঙ্কে টাকা আছে কিছু, ওখানের শহরতলীতে একখানা বাড়িও। কোথায় কত আছে তা এ পর্যন্ত খবরও নেন নি মালবিকা জানতে চান নি কোনদিন। বৃদ্ধ সরকার চিন্তা-হরণবাবু বুক দিয়ে আগলেরেখে ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সবটাই সুকুমারবাবুদের হাতে দিয়েছেন। ওঁদের ফার্মের সুনাম আছে, বিল ক'রে যতই নিন—ঠকিয়ে বা জুচ্চুরি ক'রে নেবেন না। তাই এসব ঝামেলা বইতে হয় নি কখনও। যখনই দরকার হয়েছে টাকা পেয়েছেন—যত দরকার হয়েছে তত। এটুকু জানতেন যে টাকার পরিমাণ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবেও না কখনও। সে ইঙ্গিত তাঁর বাবাই দিয়ে গেছেন। উইলখানা মেয়ের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'টাকা নিয়েই ভুলে থাকিস মা। আর তো কোন অভাব, কোন দুঃখ ঘোচাতে পারব না। তবে এই একটা দিকে নিশ্চিন্ত ক'রে দিয়ে গেলুম, তোর জীবদ্দশায় অভাব বলে কিছু বুঝবি না কোনদিন।'

এই বিপুল বিত্ত—এদেশের পক্ষে বিপুল বৈকি, বিলেত আমেরিকায় কোটি টাকার সম্পত্তিও অনেকের কাছে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয় নাকি, কিন্তু সেদেশে এদেশে ঢের তফাৎ—এতখানি সম্পত্তি কাকে দিয়ে যাবেন, এবারে অসুখে পড়ার পর থেকেই এই চিন্তাটা পীড়িত করছে তাঁকে। আইনত ঠিক কে তাঁর উত্তরাধি-কারী তা তিনি জানেন না। তাঁর স্বামীর ভাইপোরা আছে, ভাগ্নেরা আছে। তাঁর নিজের পিসতুতো ভাই—অর্থাৎ বাবার ভাগ্নে আছে। আইন-মতে এদেরই কেউ কেউ পাবে হয়তো। কিন্তু তারা কেউ মানুষ নয়, অপদার্থ। কেউ মদে-জুয়ায় যথা-সর্বস্ব উড়িয়েছে, কেউ ব্যবসা করতে গিয়ে। এখন সকলেই নিঃস্ব, সকলেই লোলুপভাবে চেয়ে আছে তাঁর এই সম্পত্তির দিকে—মানে তাঁর মৃত্যু টাঁকছে। তাঁর ভাসুরপোরা নাকি এবারের এই অসুখটার খবর পেয়ে এর মধ্যেই এই বিষয় দেখিয়ে বাজারে দেদার ধার করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। তবু তো তাঁর স্বামীর বিষয়—যেটুকু তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য, তার কিছুই নেন নি তিনি। সামান্য বলেই কলহ-বিবাদ বা মামলা-মোকদ্দমার মধ্যে যান নি। তাঁর কাছে সামান্য—তাই বলে নিতান্ত তুচ্ছ

করার মতো নয়। সব মিলিয়ে সেও কোন না লাখ-খানেক টাকার মতো হবে। তাও তো উড়িয়ে দিয়েছে ওরা।

না, এতটা সম্পত্তি তিনি ওদের দিয়ে যেতে পারবেন না।

দান ক'রে যাবেন? হাসপাতালে, রামকৃষ্ণ মিশনে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে? অথবা তিনটেতেই?

তাই করাই হয়তো উচিত। কিন্তু তাতেও মনটা সায় দেয় না। খুঁৎ খুঁৎ করে।...

ভাবতে ভাবতেই একদিন মনে পড়ে যায় কথাটা। ঋণ শোধ করতে পারেন তিনি এটা দিয়ে। এই বিত্তের মতোই বিপুল এক ঋণ তাঁর জমে আছে এক জায়গায়। পৃথিবীর কোন টাকা দিয়েই সে ঋণ বোধ হয় সম্পূর্ণ শোধ করা যায় না। তবে যথাসাধ্য করতে পারেন। অন্তত আংশিক শোধ হবে।

সেই ব্যবস্থাই করেছেন তিনি। আকুল হয়ে উঠেছিলেন, এই দুটো দিন অস্থির অধীর হয়ে অপেক্ষা করেছিলেন—এই দলিল সম্পাদন করার জন্য। এ যাত্রা যে তিনি আর উঠবেন না তা তিনি বেশ জানেন, বেশী দেরি আর নেই, সময় বেশী নেই হাতে। যা করতে হবে তা সত্বর, দ্রুত করতে হবে।

এখন, আজ অনেকটা নিশ্চিন্ত। কাজ শেষ হয়ে গেছে।

ঋণ শোধ হয়েছে তাঁর।

মালবিকা দেবী, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে অন্যের বিনানুরোধে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি, মায় এই বাড়ির আসবাবপত্র, তাঁর অলঙ্কার, জহরৎ—বিলাতের বাড়ি ও কয়েক হাজার পাউন্ড নগদ—তাঁর যা কিছু আছে যেখানে, মৃত পিতার উইল-অনুসারে তিনি যার একমাত্র ও অবিসম্বাদী অধিকারী, তার সবই তিনি উইল ক'রে দিয়েছেন এক সুবালা দত্তকে। তাঁর এক প্রাক্তন ড্রাইভারের স্ত্রীকে।

সে যদি না নেয়?

সে ব্যবস্থাও করেছেন মালবিকা দেবী, সে না নিলে তার নিকটতম উত্তরাধিকারী পাবে এসব। ঐ লাইনেই অর্শাবে এই সম্পত্তির উত্তরাধিকার।

সুকুমারবাবু যা-ই বলুন, আর যে তাঁর বেশী দিন নেই এ পৃথিবীতে—তা তিনি বেশ বুঝতে পারছেন। ছেলেবেলায় একটা গান শিখেছিলেন, ডি. এল. রায়ের লেখা গান—তাতে একটা পংক্তি ছিল, 'বুক এগিয়ে আসছে মরণ মায়ের মতো ভালবেসে'—আজ সেই পংক্তিটা মনে পড়ছে বার বার। আজ তিনিও যেন অনুভব করছেন হিমশীতল মৃত্যু, তাঁর এই কলঙ্কিত জীবনের পরিসমাপ্তি একটু একটু ক'রে তাঁর বুকের দিকে এগিয়ে আসছে। কে জানে, হয়তো আর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে এটুকু জীবনের স্পন্দনও, আচ্ছন্ন হয়ে যাবে এই অনুভূতি ও চৈতন্য। চিরকালের মতো ছেদ পড়ে যাবে একটা ব্যর্থ জীবনে।

অনুশোচনা?

কে জানে, তিনি যা ভাবছেন তাকেই অনুশোচনা বলে কিনা।

সম্ভবত অনুতাপ এটা নয়।

শুধুই ঋণ স্বীকার এটা, ঋণশোধের চেষ্টা।

ঐ মেয়েটির কাছ থেকে অনেক নিয়েছেন উনি। কিন্তু নিয়ে যে খুব একটা কিছু অন্যায় করেছেন তা এই শেষ মুহূর্তে, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও, ঠিক যেন মানতে পারছেন না। অন্যায় ওর প্রতি করা হয়েছে ঠিকই, তবে সে অন্যায় ও'র নয়। অন্যায় যদি কেউ ক'রে থাকেন তো সে ও'র বিধাতা। যিনি বিয়ের মাত্র এক বছরের মধ্যে বিধবা করেছিলেন ও'কে। যিনি ও'র বাবার বুকে মাতৃহারা কন্যার জন্য অগাধ স্নেহ দিলেও সংস্কার বিসর্জন দেওয়াতে পারেন নি। লেখাপড়া শিখিয়েছেন, গান-বাজনা শিখিয়েছেন, সঙ্গে ক'রে ইয়োরোপ আমেরিকায় নিয়ে গেছেন—কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও, বরং বলা যায় এত প্রাচুর্যের জন্যই, বিরাট একটা শূন্যতা যে মেয়ের জীবনে থাকা সম্ভব, তা তাঁর মাথাতে যায় নি।

মাথাতে যে যায় নি তার কারণ শুধুই হয়তো সংস্কার নয়, হয়তো তাঁর মানসিক গঠনও ছিল ঐ রকম। মেয়ের পাঁচ বছর বয়সের সময় যখন স্ত্রী-বিয়োগ হয় তাঁর—তখন তাঁরও মোটে ত্রিশ বছর বয়স। অনায়াসে আর-একটা বিয়ে করতে পারতেন। তা তিনি করেন নি—সে প্রস্তাবে কর্ণপাত পর্যন্ত করেন নি। এই দীর্ঘকাল—আরও ত্রিশ বছর বিপত্নীক জীবন যাপন করেছেন।

কিন্তু, মালবিকা মনে করেন, তৎসত্ত্বেও মেয়ের কথাটা তাঁর ভাবা উচিত ছিল। তাঁর বিরাট কর্মক্ষেত্র ছিল, পৈতৃক সম্পত্তি অবলম্বন ক'রে বিপুল ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন—ফলে কাজের অন্ত ছিল না তাঁর। দিনরাত কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন বলে জীবনের এই দিকটা তাঁকে পীড়িত করার সময় পায় নি। তা ছাড়াও তিনি তাঁর স্ত্রীকে পেয়েছিলেন পুরো আট বছর—মালবিকা ও'র স্বামীকে পেয়েছেন এক বছর। তাও ঠিক স্বামীসঙ্গ বলতে যা বোঝায় ছ' মাসের বেশী পান নি। বিদেশে কাজ করতেন স্বামী, মালবিকাও বিয়ের পর অনেকবারই, বাপের বাড়ি এসে কয়েকদিন ক'রে থেকে গেছেন। আর, বিপত্নীক হলেও একেবারে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেননি ও'র বাবা। তাঁর মেয়ে ছিল, তার সেবা, তার যত্ন পেয়েছিলেন। মালবিকার কী ছিল? বাবা যখন মারা গেলেন তখনও তো মাত্র প'য়ত্রিশ বছর বয়স ও'র। যৌবন তখনও বিদায় নেয় নি দেহ থেকে—জীবন সম্বন্ধে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা জাগিয়ে রেখেছে সে ও'র প্রতিটি রক্তকণিকায়।

সুতরাং পাপ বা অন্যায় কিছু করেছেন—একথা মানতে রাজী নন মালবিকা। তাহলে অনুতাপই বা করবেন কেন?···

আজ সমস্ত জীবনটা যেন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে ও'র চোখের সামনে। সবটা একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন উনি। মায়ের স্নেহ, স্বামীর ভালবাসা—মেয়েদের জীবনে যা কিছু পাওয়ার—তার কিছুই পাননি। কিন্তু অপরকে পেতে দেখেছেন। এই

বঞ্চিত হওয়া যে কতখানি তা বেশ বুঝেছেন। যা পেতে পারতেন তার কিছুই পান নি। তাই, যদি সংসারের বিপুল আনন্দ ভাণ্ডার থেকে—বিধাতার অন্যমনস্কতার অবসরে সামান্য, ওঁর প্রাপ্যের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র চুরি ক'রে নিতে পেরে থাকেন তো—সেটা অন্যায় বলে গণ্য হবে কি?

যদি বা হয়—মালবিকা অন্তত অনুতপ্ত হবেন না, ওঁর এই কৃতকর্মের জন্য।

আজ সবই দেখতে পাচ্ছেন। সব মনে আছে তাঁর। মোহন যেদিন প্রথম এসে দাঁড়াল তাঁর জীবনে, সেদিনের স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে এখনও চোখের সামনে।

পুরনো ড্রাইভারের হঠাৎ স্ট্রোক্ হওয়ায় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তিনি, ভাল বিশ্বস্ত একটি ড্রাইভারের জন্য। সেই সূত্রেই এসেছিল মোহন। ওঁর বাবার এক বন্ধুর কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে। সে ভদ্রলোক লিখেছিলেন যে, মোহন ভদ্রঘরের ছেলে, একটা পাশও করেছে—অদৃষ্টের ফেরে আর কতকটা দুর্বুদ্ধির জন্যেই এই কাজ নিতে হয়েছে তাকে। তাঁর এক পরিচিত লোকের গাড়ি চালাচ্ছে সে আজ দেড় বছর, ভালই চালায় শুনেছেন। তবে সেখানে মাইনে কম, কুলোচ্ছে না বলেই নতুন কাজ খুঁজছে সে। ইত্যাদি—

চিঠি পড়ে ভাল ক'রে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন মালবিকা।

শ্যামবর্ণের একহারা চেহারা, সামান্য একটু যেন বেশী ঢ্যাঙা মনে হ'ল তাঁর—বয়স খুবই কম, চব্বিশ-পঁচিশ বছরের বেশি হবে না। মুখ এখনও কাঁচা, প্রায় কচিই বলা যায়। অসাধারণত্ব বলতে কিছুই চোখে পড়ে না—এক চোখ দুটো ছাড়া। সাধারণ চোখ, কিন্তু এমন ঘন কালো চোখের পাতা খুব কমই দেখেছেন তিনি—দেখলে মনে হয় সর্বদা কাজল পরে আছে। একটু বেশী লাজুক মনে হয়েছিল প্রথমটা, কারণ ঠাণ্ডার দিনেও সমস্ত কপাল ঘামে ভরে গিয়েছিল তার, পরে বুঝেছিলেন ওটা ওর একটা ব্যাধি। বারোমাসই মুখটা ঘামত তার।

পছন্দ হয়েছিল মালবিকার, কথাবার্তা কয়েও খুশী হয়েছিলেন। বুদ্ধিমান ছেলে, বক্তব্যে কোন জড়তা নেই। যা বলে পরিষ্কার এবং স্পষ্ট, অথচ দুর্বিনীত কি উদ্ধত নয়।

এক কথায় ওর বর্তমান মাইনে থেকে চল্লিশ টাকা বাড়িয়ে মাসিক দেড়শো টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন তিনি।

ছেলেটি নাম বলেছিল মোহন, মোহন দত্ত। কায়স্থ দত্ত।

'তাহলে কবে থেকে আসছ?' মাইনের কথা চুকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন মালবিকা।

'যদি বলেন কাল থেকেই আসতে পারি। ওঁদের আমি বলেই রেখেছি, ভাল কাজ পেলে চলে যাবো। ওঁরাও তাতে কোন আপত্তি করেন নি।'

'বেশ, তাই এসো তাহলে।' এ প্রসঙ্গে ছেদ টেনে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার খবরের কাগজে মন দিয়েছিলেন, মনে আছে মালবিকার।

কিন্তু মোহনের বক্তব্য শেষ হয়নি তখনও।

সে বলল, 'কখন আসব বলুন। কখন কখন ডিউটি পড়বে আমার—'

'ডিউটি!' বিস্মিত হয়েছিলেন মালবিকা, 'ডিউটি আবার কি? আমি কি নিয়মিত কোথাও আপিস করি। আমার খুশীমতো বেরোনো।...তোমাকে এখানেই থাকতে হবে। রাত্রে বাড়ি যেতে পারো, আর—খুব দরকার থাকলে বা আমার বেরোনোর দরকার হবে না বুঝলে, চলে যেতে পারো। তবে দুপুরে যদি এখানে থাকতে হয় এখানেই খেতে পাবে।

একটু ইতস্তত করল মোহন, তারপর বলল, 'একটা কথা বলব?'

'বলো।' ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করেছিলেন মালবিকা।

'আমাকে এখানে কোথাও একটা ছোট্ট ঘর দেবেন? আপনাদের তো এখানে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার আছে দেখছি, সেখানেও যদি একটা ব্যবস্থা ক'রে দেন—আমার কোন আপত্তি নেই।'

'কেন বলো দিকি? তুমি এখন থাকো কোথায়? সেখানে কি অসুবিধা হচ্ছে?'

মুহূর্ত কাল চুপ ক'রে ছিল মোহন। তারপর বলেছিল, 'আমার—আমার স্ত্রী আছে। এখন সে-ই আদিগঙ্গার ধারে একটা বস্তিতে থাকি, একখানা ঘর ভাড়া করে। এখন যেখানে কাজ করি—সকালে তিন ঘণ্টা, বিকেলে পাঁচ ঘণ্টা ডিউটি—অতটা অসুবিধা হয় না।'

'তুমি বিয়ে করেছ? এই বয়সেই?'

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন মালবিকা।

উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা হেঁট করেছিল মোহন। কপালে ঘামের ফোঁটাগুলো আরও বড় বড় হয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়েছিল—এখনও মনে আছে মালবিকার।

তারপর একটু একটু ক'রে প্রশ্ন ক'রে জেনে নিয়েছিলেন ইতিহাসটা। এই বিয়ের জন্যেই মোহনকে বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। ভাল ঘরের ছেলে সে, বাবা সরকারী অফিসার। এই শহরেই ওদের পাকা বাড়ি আছে। কলেজের পড়া ভাল হয় নি বলে ফার্স্ট ইয়ার থেকেই পড়ায় ইস্তফা দিয়ে রোজগারের খোঁজে বেরিয়েছিল। এটা ওটা দালালি করত, আর বন্ধুদের সঙ্গে নানারকম ব্যবসার ফন্দি আঁটত। এই ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতেই একদিন এই উদ্বাস্তু মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হয়। বরানগরের দিকে টিন ও ছিটে বাঁশ দিয়ে তৈরী একখানা সামান্য ঘরে থাকত মামা-মামীর সঙ্গে। মামা ছুতোর মিস্ত্রি, আয় কম—ব্যয় বেশি। নিজের গোটা ছয়েক ছেলেমেয়ের সঙ্গে এই ভাগ্নী দুঃসহ বোঝা হয়ে উঠেছিল।

প্রথমটা শুধুই সহানুভূতি বোধ করেছিল—শান্ত এবং অবিরাম কর্মরত এই মেয়েটির জন্যে। ক্রমে সেটা প্রণয়ে পরিণত হ'তে দেরি হয় নি। ফলে বাবা-মাকে না-জানিয়েই পনেরো-ষোল বছরের মেয়েটিকে বিয়ে ক'রে বসল একদিন। বাবা-মা অজ্ঞাত-পরিচয় ছুতোর মিস্ত্রীর ভাগ্নীকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার করতে বা বাড়িতে স্থান দিতে রাজী হলেন না। মোহনও এর জন্য প্রস্তুত ছিল, সে বেরিয়ে এসে এই বস্তিতে ঘর ভাড়া করল। কিন্তু দালালী ক'রে যা পেত তাতে এতদিন নিজের

।লখারেটের খরচা উঠেছে মাত্র—তাতে সংসার চালানো যায় না। অগত্যা, বাধ্য হয়েই—এককালে যেটা শখ ক'রে শিখেছিল—গাড়ি চালাতে—সেইটেকেই পেশা করতে হ'ল। একশো দশ টাকা মাইনে—তার মধ্যে বস্তির ঐ ঘরের জন্যেই—আঠারো টাকা ভাড়া দিতে হয়। এ আয়ে ওর চেয়ে ভাল ঘর ভাড়া ক'রে থাকা সম্ভব নয়।…

ঘর খালি ছিল মালবিকার। খুশী মনেই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। এতে তাঁর ঢের সুবিধা—দিনরাত বাড়িতে থাকলে যে-কোন সময়ই গাড়ি পাবেন তিনি। ভদ্রঘরের ছেলেকে ঠিক চাকরদের ব্যারাকে বাস করতে দিতে মন সরে নি, রান্না-মহলের দিকে ছোট একটা ঘর প্রায় খালি পড়ে ছিল, সেইটেতেই থাকতে দিয়েছিলেন ওদের। খেতে দিতেও রাজী ছিলেন, কিন্তু মোহন সে বাধ্য-বাধকতায় যেতে চায় নি। ওদের রান্নার মতো একটু জায়গাও ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন তাই।…

এর সবটাই হয়তো অনুগ্রহ নয়। কৌতূহলও একটা প্রবল হয়ে উঠেছিল। কেমন সে মেয়ে—যার জন্যে একটা সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে ঘরবাড়ি ভবিষ্যতের আশা-ভরসা সব ছেড়ে এসে বস্তিতে বাসা বাঁধে! কী এমন আছে তার মধ্যে, কত বড় রূপসী সে?

এই কৌতূহল মেটাতেই—যা এতখানি বয়সে কখনও করেন নি মালবিকা, সময়ে-অসময়ে রান্না-মহলে যেতে শুরু করলেন। কিন্তু তাতে নিচের মহলে একটা অপ্রীতিকর আলোড়ন দেখা দিল। ঠাকুর-ঝিয়ের দল এই অভাবনীয় কাণ্ডে সন্ত্রস্ত বিহ্বল হয়ে উঠে প্রায় প্রকাশ্যেই নানারকম জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিল। অগত্যা ওদিকে যাওয়া বন্ধ করতে হ'ল। তাই বলে কৌতূহল কমল না। সে তার নিজের চরিতার্থতার নূতন পথ খুঁজে নিল অবিলম্বে। লাইব্রেরী ঘরের কোণের দিকে এমন একটা জানলা পাওয়া গেল যেখান থেকে নিচের ঐ ঘরটা সরাসরি দেখা যায়, অথচ তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না। সেখানে তাঁকে আশাও করে না কেউ। তিনি কখন লাইব্রেরী ঘরে থাকেন, কখন আপিস-ঘরে থাকেন, আর কখন নিজের ঘরে শুয়ে বই পড়েন—ভৃত্য-মহলের তা সব সময় জানার কথা নয়, তারা খবরও রাখে না।

সুতরাং নিশ্চিন্ত হয়েই দেখতে লাগলেন মালবিকা, দুচোখ ভরে।

প্রথমেই একটা অপ্রত্যাশিতের রূঢ় আঘাত খেলেন তিনি—মেয়েটির চেহারায়! আদৌ সুন্দর নয় সে। ঠিক কালো না হ'লেও ময়লা, রোগাটে ধরনের চেহারা; মুখশ্রী মন্দ নয় এই পর্যন্ত বলা যায়। চোখ দুটি যা একটু আয়ত—কিন্তু তাও খুব একটা কিছু লক্ষণীয় রকমের বড় নয়। বয়স কম, তবে সেটাও এমন কিছু লোভনীয় হবার কথা নয় মোহনের বয়সে।

তবে?

· এই তবেটাই আবিষ্কার করতে হয় অল্পে অল্পে। প্রথম গুণ যেটা নজরে

পড়ল—সে ওর অত অদ্ভুত খাটবার শক্তি। ভূতের মতো খাটতে পারে মেয়েটা। কিছুতেই যেন ক্লান্তি বোধ করে না, বিশ্রাম নেবার অবসর থাকলেও নিতে চায় না। ঝি নেই, রাখা সম্ভবও নয়। রান্না, বাসনমাজা, ঘর-মোছা, বিছানা তোলা ও রাত্রে পাতা—সবই করতে হয় তাকে। করেও সে নিঃশব্দে, মুখ বুজে। কাজ যেন তার হাতে পায়ে লাগে না। কাজ করে অতি সহজে—অনায়াসে। এজন্যে কোন নালিশও নেই তার, বরং যেন সুখী সে, নিজের সংসারে খাটতে পেরে। কাজকর্ম বোঝেও, গুছিয়ে করার অভ্যাস আছে। ঘরে আসবাব বা জীবনযাত্রার উপকরণ সামান্যই—কিন্তু যা আছে, যেটুকু আছে—সর্বদা সাজিয়ে গুছিয়ে ফিটফাট রাখে, এতটুকু মালিন্য বা আবর্জনা জমতে দেয় না কোথাও।

আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন মালবিকা—সে ওর স্বামীর প্রতি অসামান্য আসক্তি। সে যেন প্রতিনিয়ত মোহনকে পুজো করে মনে মনে। কিসে এতটুকু বেশী স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারবে—সে জন্যে তার চেষ্টা ও যত্নের অবধি নেই। অস্খলিত তপস্যা ওর—এই স্বামী-সেবাটা। প্রতিটি মুহূর্তে অতন্দ্র হয়ে থাকে যেন—পাছে ওর এই দেবসেবার এতটুকু সুযোগও বাদ চলে যায় ওর বিন্দুমাত্র অসতর্কতায়। এমনি খুব হাসিখুশী নয়—বরং, বোধহয় অতিরিক্ত শান্ত বলেই, একটু গম্ভীর দেখায়—কিন্তু যখনই যতবারই স্বামীর দিকে চোখ পড়ে ওর—সমস্ত মুখ যেন খুশিতে তৃপ্তিতে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ যদি এমন দিনেরাতে একশোবার দেখা হয় তো একশোবারই—এই প্রতিক্রিয়া হয় ওর ওপর। আর মোহন যদি কখনও কিছু ঠাট্টা-তামাশা করে তো কথাই নেই—একেবারে হাসিতে ফেটে লুটিয়ে পড়ে সুবালা। আর সে সময়—মাত্র সেই সময়ই আশ্চর্য সুন্দর দেখায় ওকে।

ঠাট্টা-তামাশাটা অবশ্য মালবিকার অনুমান। কথা কিছু শোনা যায় না—এত দূর থেকে। শুধু মোহনের চোখে কৌতুক আর সুবালার মুখের হাসি দেখে আন্দাজ করেন তিনি।

প্রথমটা ভেবেছিলেন দু'চারটে দিন দেখলেই কৌতূহল মিটে যাবে তাঁর। অতি স্বল্প বেতনের কর্মচারী, যার জীবনের সঙ্গে ও'র জীবনের কোথাও কোন সমতা নেই, তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রবৃত্তি বেশীক্ষণ থাকবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু তা হ'ল না। যতই দেখেন ততই আরও উদগ্র হয়ে ওঠে সে কৌতূহল, আগ্রহ বেড়ে যায়। আরও দেখতে ইচ্ছা হয়।

ক্রমশঃ ওদের এই প্রণয়-লীলা যেন নেশার মতো পেয়ে বসল তাঁকে। কারও পায়ের আওয়াজ পেলে চোরের মতো নিঃশব্দে পালিয়ে আসেন—নইলে সমস্তক্ষণই একটা মোড়া নিয়ে মাথা নিচু ক'রে বসে বসে দেখেন এই জানলা থেকে। আর, তিনি বিশেষ কোথাও বেরোন না বলেই, এদের প্রণয়-লীলাও চলে অব্যাহত। গাড়ি চালাতে হয় না বলে অখণ্ড অবসর পায় মোহন। সে অবসরের সবটাই কাটায় ঐ এতটুকু ঘরে। এক মিনিটও কোথাও নড়তে চায় না, চায় না বাইরে বেরোতে।

বাজারে যায় দুদিন তিনদিন অন্তর, তাও যেন খুব অনিচ্ছায়। আর গেলেও বাজার দোকান সব সেরে ফিরে আসে আধ ঘণ্টার মধ্যে। বাকী সমস্ত সময়টাই শুধু সুবালার কাছাকাছি বসে থাকে। সে রান্না করতে গেলে মোহনও সঙ্গে যায়—সামান্য একটু জায়গার মধ্যেই উনুনের ধারটিতে বসে থাকে। গল্প যেন ওদের ফুরোয় না। সুবালা স্বামীকে এতটুকু পরিশ্রমও করতে দিতে রাজী নয়, তাই মোহন কিছু করতে এলেই ঘোরতর প্রতিবাদ করতে থাকে—নইলে সে স্ত্রীর কাজও অর্ধেক ক'রে দিত। ওর যেন আর কোন শখ নেই, জীবনে কোন আকাঙ্ক্ষাও নেই—এই স্ত্রীর সাহচর্য ছাড়া। ওরা কোনদিন বেড়াতে যায় না কোথাও, সিনেমা দেখে না। আর কিছুই চায় না—পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকতে চায় শুধু। মোহন ফষ্টি-নষ্টি করে, সুবালা শান্তভাবে কাজ ক'রে যায়। আর মাঝে মাঝে দুজনেই দুজনের মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সে সময় সুবালাকে দেখে মনে হয়, প্রত্যক্ষ কোন দেবতা এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে, এমনই সশ্রদ্ধ এবং তৃপ্ত একটা ভাব ফুটে ওঠে ওর সমস্ত ভঙ্গীতে।

দেখতে দেখতে এই দেখার নেশাটা মালবিকার মনে বহুদিনের, প্রায়-ভুলে-যাওয়া একটা অতৃপ্তি আর হাহাকার জাগায়। ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে তাঁর অন্তর। আর সেই নিরুপায় ব্যর্থ আকুতি ক্রমশ একটা অহেতুক বিদ্বেষে পরিণত হয়।

প্রথমটায় মনে হয়—দেন দূর ক'রে ওদের, এই নিভৃত সুখের বাসা ভেঙে যাক। বুঝুক সংসারটা শুধুই কপোত-কপোতীর মতো প্রেমগুঞ্জন করার স্থান নয়। তারপরই আবার মনে হয়, যে হাতের কাজ জানে, সে কি আর বসে বসে উপবাস করবে, সে আবার কোথাও না কোথাও কাজ জুটিয়ে নেবে, আবার কোথাও এমনি সুখনীড় রচনা করবে। এত ভাল আশ্রয় হয়তো পাবে না, তা না পাক—ওদের যা মনোভাব, বস্তিতে খোলার ঘরেও ওরা নিভৃতে স্বর্গ রচনা করতে পারবে।

আবার ভাবেন খুব খাটাবেন মোহনকে, সারাদিন অকারণে ব্যস্ত রাখবেন, দেখবেন কেমন ক'রে দিনরাত এই জোড়ের পায়রার মতো মুখোমুখি বসে থাকার সুযোগ পায়। দু-একদিন করেও দেখেন কিন্তু বিশেষ ফল হয় না, সুবালার মুখের প্রশান্তি এতটুকুও নষ্ট হয় না—মোহনও কোন অনুযোগ করে না।

দিনের সময়াভাবটা রাত্রে পুষিয়ে নেয়, বহুরাত্রি অবধি জেগে গল্প করে বসে বসে। ফলে মালবিকারই অসুবিধা বেশী, ওদের ঘরের আলো না-নেভা পর্যন্ত তিনিও ছুটি পান না।

সুতরাং কিছুই করা হয় না। শুধু নিজের অন্তরের বিষে নিজেই জ্বলে-পুড়ে মরেন কালীয় নাগের মতো। বরং আজকাল মনে হয়, এও বোঝেন যে সম্ভবত এসব তাঁরই বিকৃত চিন্তার ফল—তবু মনে করতেই যেন ভাল লাগে, নিজের বিদ্বেষের অনুকূল হয়—দৈবাৎ কখনও সুবালার সঙ্গে চোখাচোখি হ'লে সে যেন ঈষৎ করুণার চোখেই চায় তাঁর দিকে, তাঁকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে।

আর সেই সহানুভূতি বা করুণার অন্তরাল থেকে নিজের অসামান্য স্বামী-সৌভাগ্যের অহঙ্কার—সতর্কতা সত্ত্বেও—ফুটে বেরিয়ে আসে।

এই চিন্তাটাই সবচেয়ে অসহ্য বোধ হয়।

তাঁরই এক নগণ্য ভৃত্যের স্ত্রী কৃপার চোখে দেখছে তাঁকে! এত স্পর্ধা তার, এত দুঃসাহস! এত কিসের অহঙ্কার ওর? এই তো ড্রাইভার স্বামী, তারই এত অহঙ্কার।

এ গর্ব যদি চূর্ণ করতে না পারেন তো ধিক্ তাঁকে। ধিক্ তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধিতে, ধিক্ তাঁর অপরিমিত অর্থে।

এই জ্বালাতে ছটফট করতে করতেই একদিন কথাটা মাথায় গিয়েছিল তাঁর। যে স্বামীর জন্যে এত দেমাক, সেই স্বামীকেই কেড়ে নেবেন ওর কাছ থেকে—যেমন ক'রেই হোক। তখন আর পাপ-পুণ্য-সংস্কার কোন কথাই ভাববার অবকাশ ছিল না। ছিল একটিই লক্ষ্য—একটিই মাত্র পণ। যেমন ক'রে হোক ঐ মেয়েটার উদ্ধত চাহনি মাটিতে মিশিয়ে দেবেন—উজ্জ্বল চোখ দুটো ম্লান ক'রে দেবেন চিরজীবনের মতো।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বহুদিন পরে নিজেকে দেখেছিলেন ভালো ক'রে। রূপ খুব বেশী না হলেও নিতান্ত কম ছিল না তাঁর—সে রূপের বাহ্যিক চেহারাটা আজও বজায় আছে; যৌবনও একেবারে বিদায় নেয় নি, প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়ে এখনও যেন ইতস্তত করছে। তবু এ সম্বন্ধে কোন মোহ রাখেন নি তিনি, এতে যে হবে না তাও বুঝেছিলেন। যাতে হয়—যুগ যুগ ধরে দেশে দেশে পুরুষ যা দিয়ে মেয়ে ভুলিয়েছে—তিনিও তাই দিয়েই পুরুষ ভোলাবেন। সেই পথই ধরলেন তিনি, অর্থাৎ টাকার পথ।

প্রথমেই একটা চেনা দোকান থেকে দামী বিলিতী ঘড়ি আনিয়ে দিলেন, বললেন, 'পরো, তোমাকে দিলুম।' মোহন দেখা গেল চেনে এ-সব জিনিস, হাতে নিয়ে চমকে উঠেছিল সে। বলেছিল, 'এ তো পাঁচশো সাড়ে-পাঁচশোর কম নয়।' হেসে সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন মালবিকা, 'ছশো পঁচিশ। আমি যখন হাতে করে দিচ্ছি, খেলো জিনিস দেব কেন?'

আত্মমর্যাদা জ্ঞানের সব সতর্কতা সত্ত্বেও মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বা আনন্দ চাপতে পারে নি মোহন, লোভ ও খুশিতে দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার। ধন্যবাদ দেবার চেষ্টা করে নি, তবে ধন্য যে হয়েছে সেটা কপালে ঠেকিয়ে দান গ্রহণ করার ভঙ্গীতে জানিয়ে দিয়েছিল। ভেতরে নিয়ে গিয়ে সুবালাকে দেখাবার সময় মালবিকা নিজের অভ্যস্ত খুপরিতে ছিলেন—বহুদিন পরে একটা বিজয়গর্ব অনুভব করলেন তিনি, সুবালার মুখে আনন্দের চিহ্ন ফুটল না দেখে।

মেয়েরা মেয়েদের চেনে—বোধ করি সে এই প্রথম উপহারের মধ্যেই নিজের সর্বনাশের সঙ্কেত দেখতে পেয়েছিল।

সেই শুরু।

অপেক্ষা করতে জানেন মালবিকা, কতটা শোভন আর কতটা অশোভন সে কাণ্ডজ্ঞান তখনও লোপ পায় নি। আরও দশ-পনেরো দিন অপেক্ষা ক'রে—এক-দিন সাহেবপাড়ার এক বিখ্যাত দোকানে গিয়ে সবচেয়ে যা মহার্ঘ্য পোশাক তারই ফরমাশ দিলেন। মোহন প্রবল প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু তিনি কর্ণ-পাত করেন নি সে প্রতিবাদে, বলেছিলেন, 'আমার গাড়ি চালাও, একটু ফিটফাট স্মার্ট না থাকলে চলবে কেন?'

তারপর থেকে উপহার বর্ষণের ব্যবধান কমে আসতে লাগল। ক্রমাগতই নানা মূল্যবান বস্তু কিনে দিতে লাগলেন তিনি। চক্ষুলজ্জার খাতিরে সুবালার জন্যও দু'একটা অলঙ্কার কি ভাল শাড়ি কিনে দিতেন মধ্যে মধ্যে—কিন্তু সেগুলো যে সে পারতপক্ষে পরে না—গয়না তো নয়ই—তা তিনি জানতেন। এই সব বিলাস-দ্রব্যে অভ্যস্ত হয়ে যেতে বেশী দেরি লাগল না মোহনের। এত না হ'লেও কিছু কিছু এই ধরনের জিনিস ব্যবহার করেছে সে—এর আরাম এবং মূল্য সে জানে। অল্পবয়সে এসব দেখাবার ইচ্ছাটাও স্বাভাবিক, শুধু পরকে দেখিয়েও তৃপ্তি পাওয়া যায়। ক্রমশ এটাকে তার প্রাপ্য বলেই মনে করতে শুরু করল। তার যে এখনকার এক-একটা গেঞ্জির দামে দেড়শো টাকা মাইনের ড্রাইভারের পুরো শার্ট একটা হয়েও কিছু বাঁচে—সে-কথা খেয়ালও থাকে না আর।

আর, এর ফলেই ওদের সুখের বাসায় একটু একটু ক'রে ভাঙন ধরে। সুবালা এই উপহারের আসল অর্থটার দিকে স্বামীর চোখ ফেরাতে চেষ্টা করে—তাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা যে লোকের উপহাস এবং আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছে—বার বার বোঝাবার চেষ্টা করে। সে কথাটা মোহনও যে একেবারে বোঝে না তা নয়, কিন্তু সুবালার নিত্য অনুযোগে বিরক্ত হয় অকারণ ঈর্ষা বলে মনে করে। মনকে বোঝায়—সেই সঙ্গে এক একদিন সুবালাকেও বোঝাবার চেষ্টা করে—'আমি তো কোন অন্যায় করি নি, মেয়েছেলেটার লোভকে একটু একটু আশকারা দিয়ে যদি কিছু মোটামুটি আদায় ক'রে নিতে পারি, মন্দ কি? যারা পাচ্ছে না তারাই হিংসে করছে, সে তো করবেই।' কিন্তু সুবালার মন মানে না, ফলে এক-একদিন রীতি-মতো কলহ বেধে যায়। সুবালাকে কী অবস্থা থেকে উদ্ধার ক'রে এনেছে মোহন, আর তার জন্যে কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছে, সে-খোঁটা দিতেও ছাড়ে না। সুবালার চোখের জলে তার সেই দেবতার বিসর্জন ঘটে যায়, স্বামীর দিকে চাইবার সময় দৃষ্টির সেই স্তুতি আর জ্যোতি খুঁজে পাওয়া যায় না। মোহন তো স্ত্রীর মুখের দিকে চাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে, তার তরফ থেকে মুগ্ধ দৃষ্টির আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শুধু বিদ্বেষ চরিতার্থ করার হলে এখানেই থামতে পারতেন মালবিকা। যথেষ্ট জয়লাভ হয়েছে তাঁর, যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছেন। কিন্তু এখন অন্য নেশাতে পেয়ে বসেছে তাঁকে।

এবার শুরু করলেন পরিচিত পাড়ার বাইরে গিয়ে পিছনের আসন বদলে

মোহনের পাশে বসতে। মোহনকে সঙ্গে ক'রে বড় বড় বিলিতি হোটেল-রেস্তোঁরায় ডিনার খেতে যাওয়া নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে উঠল ক্রমশ। মোহনের এখন যা বেশ-ভূষা তাতে সেটা বেমানানও হ'ত না আদৌ। তারপর এটাও সয়ে যেতে, একদিন কলকাতা থেকে দূরবর্তী একটা জায়গায় ডাক-বাংলো ব্যবস্থা ক'রে চলে গেলেন সেখানে রাত্রিবাস করবার জন্য। প্রথম যখন প্রস্তাবটা উত্থাপন করেন মালবিকা—সামান্য একটু দ্বিধা, একটু বিব্রতভাব দেখা গিয়েছিল—কিন্তু প্রবল কোন আপত্তি তোলে নি মোহন। মুখে কিছুই বলে নি। সেখানে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নাম লিখিয়ে এক-ঘরে রাত্রিবাস করার প্রস্তাবেও—কপালের ঘামের ফোঁটা-গুলো একটু বড় বড় হয়ে উঠেছিল মাত্র—তবে সেও সাময়িক। প্রতিবাদও করে নি, বাধাও দেয় নি।

অর্থাৎ সুবালার সর্বনাশ সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

এখানেও থামতে পারলেন না মালবিকা। অধঃপতনের গতি দ্রুত—দ্রুততর করে তুললেন তিনি। এই লুকোচুরিতে মন ভরল না তাঁর, একদা মোহনকে সঙ্গে নিয়ে বিলেত চলে গেলেন। সেখান থেকে ফ্রান্স, রিভিয়েরা।

মোহনের কাছে এ আশাতীত, কল্পনাতীত সৌভাগ্য। পৃথিবী যে এমন বিপুল, বিত্তশালী লোকের জন্য ভোগ ও বিলাসের এত আয়োজন যে আছে, তা সে জানত না, জানার কথাও নয়। এবার নেশাটা তাকে পেয়ে বসল। মদে চুর হয়ে থাকতে লাগল দিনরাত, আনুষঙ্গিক তো আছেই। মালবিকা 'ওকে ভারতীয় প্রিন্স' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, যে পরিমাণ টাকা খরচ করত তাতে 'প্রিন্স' বলে মনে না করারও কোন কারণ নেই। পঙ্গপালের মতো মেয়ে এসে পড়ল—যাদের 'ভ্যাম্প' বলে ওদেশে, সেই রক্তশোষণকারিণীর দল। তাদের হাতে পেয়ে প্রায়-অতিক্রান্ত-যৌবনা মালবিকার কথা মনে থাকবে বা সে-চিন্তা কোন বাধা হয়ে উঠবে, তা সম্ভব নয়। অনুযোগ-অভিযোগ কলহ-বিবাদ কিছুতেই কিছু হ'ল না। মালবিকা টাকা বন্ধ করার চেষ্টা করলেন—পারলেন না। কখন যে মোহনই তাঁর মালিক হয়ে উঠেছে, তিনি হয়েছেন তার দাসী—তা তিনি নিজেই বোঝেন নি। আজ সুবালার অবস্থাটা বুঝতে পারলেন তিনি, বোধ করি তার ব্যথাও।

অবশেষে, সম্ভবত তাঁর পিতার পুণ্যেই বেঁচে গেলেন তিনি। হঠাৎ একটি মার্কিন মেয়ে—'ইন্ডিয়ান প্রিন্স'-এর মোহে পড়ে গেল। এমনই মোহ যে মোহনের কালো চামড়াও কোন বাধা সৃষ্টি করল না, তার কাজল কালো চোখেই বোধ করি পাগল হয়ে গেল মেয়েটি। অথবা একটা 'প্রিন্স'-কে জয় করতে পারার গৌরবে সামান্য দৈহিক অসামঞ্জস্যর কথাটা চিন্তাই করে নি। যাই হোক, মালবিকা অব্যাহতি পেলেন, কোথায় নিয়ে গেল সে মোহনকে জানতেও পারলেন না। জানার খুব চেষ্টাও করলেন না আর।......

দেশে ফিরে শুনলেন সুবালা তাঁর বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে বহুদিন। তার জন্যে

মাসিক খরচের একটা ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন—তার এক পয়সাও নেয় নি। তাঁর দেওয়া শাড়ি-গয়নাগুলো পর্যন্ত এ বাড়িরই ঝি-চাকরদের বিলিয়ে দিয়ে গেছে। প্রথম কোথায় যেন রান্নার কাজ নিয়েছিল, তারপর কাজের ফাঁকেই কোন্ সেলাইয়ের ইস্কুলে গিয়ে সেলাইয়ের কাজ শিখেছে। এখন এক সেলাই কল কোম্পানির কাছেই চাকরি করে—কল চালানো শিখিয়ে বেড়ায় বাড়ি বাড়ি। তাতেই তার দিন চলে যায়।

মালবিকা আর অপমানের ওপর আঘাত করার চেষ্টা করেন নি, তার দুঃখ অপনোদনের জন্যও ব্যস্ত হন নি। তিনি জানতেন, সে চেষ্টা করলেও কোন ফল হবে না। তাঁর কাছ থেকে এক পয়সাও নেবে না সে। সুবালার কঠিন আত্মমর্যাদা-জ্ঞান, সে কোন পরিচিত লোকের কাছে মালবিকার নামে একটা অনুযোগ পর্যন্ত করে নি।

সেই থেকেই এই ঋণ বহন করছেন তিনি। সুবালা যদি তাঁকে গালি-গালাজ করত—শাপ-শাপান্ত করত, তাহলেও যেন কতকটা শান্তি পেতেন। একেই বুঝি বলে অদৃষ্টের পরিহাস। যে সুবালার দর্পচূর্ণ করার জন্য এত প্রয়াস তাঁর, সেই সুবালার কাছেই তাঁর সমস্ত অহঙ্কার চিরদিনের মতো চূর্ণ হয়ে গেল, তার কাছে আর কোনদিনই মাথা তুলতে পারবেন না।

কে জানে ওঁর মৃত্যুর পরও সে এই ক্ষতি ভুলতে পারবে কি না, তাঁর এই ক্ষতিপূরণ-প্রয়াস তেমনি শান্ত নীরব উপেক্ষায় সরিয়ে দেবে কিনা। সুকুমার-বাবুর কাছেই একটা চিঠি লিখে রেখে গেলেন তিনি—তাঁর মৃত্যুর পর সে চিঠি সুবালার কাছে পেঁৗছে দেবেন উনি—এই কথা আছে। না, ক্ষমা-ভিক্ষা ক'রে নয়—ক্ষমা মালবিকা চান নি, ও-সব নাটুকে প্রবৃত্তি নেই তাঁর—শুধু এইটুকুই বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে জিৎ সুবালারই হয়েছে, হয়েছিলও। সুবালা যা পেয়েছে—যে ক'দিনই পেয়ে থাক, পরিপূর্ণভাবেই পেয়েছে। মালবিকা কিছুই পান নি, কোনদিনই কিছু পান নি। তাঁর সমস্ত জীবনটাই বঞ্চিত হওয়ার ইতিহাস। তিনি মোহনকে টাকা দিয়ে কিনতে গিয়েছিলেন—কিছুদিনের জন্য কিনেছিলেনও—কিন্তু সেটা পাওয়া নয়। পাওয়ার সুখ কেনা জিনিসে পাওয়া যায়ও না। সুবালা যা পেয়েছে সে পাওয়া কি, তা ইহজীবনে মালবিকার জানার সুযোগই ঘটল না। তাঁর হাহাকার আর তৃষ্ণা, তাঁর বিষের প্রদাহ সমান আছে—শীতল জল বলে যা পান করতে গিছলেন, কাছে গিয়ে দেখেছেন তা দুর্গন্ধ পাঁক ছাড়া কিছু নয়। কিনেও ধরে রাখতে পারেন নি, আর একজন বেশি দাম দিয়ে নিয়ে গেছে।—সুবালা এককালে ওঁকে করুণার চোখে দেখত, হয়তো আজও তাই দেখে—সেই করুণাতেই যেন গ্রহণ করে তাঁর আন্তরিক উপহার। আশা করছেন, যে জীবনে কিছুই পেল না, তাকে এইটুকু তৃপ্তি দিতে সুবালা কুণ্ঠিত হবে না।···

মালবিকা দেবী পাশ ফিরে আরাম করে শুলেন। সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন ক'রে তন্দ্রা নামছে তাঁর—তিনি জানেন, বেশ জানেন, এ ঘুম আর ভাঙবে না। তার জন্য তিনি দুঃখিতও নন। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতেই চান এবার।

বার-তিনেক আদ্যন্ত পড়ার পর চিঠিখানার মর্মার্থ কতকটা বোধগম্য হ'ল আরতি-মঞ্জরীর। পত্রপ্রেরককেও চিনতে পারলেন যেন। কিন্তু তবুও আরও একবার পড়া দরকার। একটু নিরিবিলি, নিভৃতে। মুখ তুলে দেখলেন দাসী রামরতিয়া তখনও ঈষৎ-বিস্মিত ঈষৎ-কৌতূহলী দৃষ্টিতে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ ধরনের চিঠি এ বাড়িতে আসে না কখনও। অন্তত ওপরতলায় না। পোস্টকার্ডে চিঠি আসে শুধু তাদের—দাসদাসীদের। বিশেষ এই রকম নোংরা লেখা, কাটাকুটি—এমন চিঠি এঁদের কেউ লিখবে, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। তাই মুনিমজী মালেকার চিঠি বলা সত্ত্বেও বিশ্বাস হয় নি রামরতিয়ার, এখনও, মাইজী দুবার তিনবার পড়বার পরও না।

আরতি মুখ তুলে তার সেই কৌতূহলী দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন একবার। সেইটুকুই যথেষ্ট, রামরতিয়া বাতাসে মিলিয়ে গেল—চোখের পলক ফেলার আগেই!···নিশ্চিন্ত হয়ে আবার চিঠিটায় মন দিলেন আরতিমঞ্জরী।

কিন্তু একবার নয়, আরও দুবার পড়লেন চিঠিখানা। চিঠিটা হাতে নিয়ে কতকটা অন্যমনস্কভাবে উলটে পালটে যেন দেখলেন তার আকৃতিটা। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে চারিদিকে চেয়ে দেখে নিলেন একবার।

নতুন দিল্লীর উপকণ্ঠে নতুন পত্তন করা পাড়ায় বিরাট বাড়ি তাঁদের। ধনী-পাড়া এটা, চারদিকেই বড় বড় বাড়ি, তবু তার মধ্যেও তাঁর বাড়িটা অগ্রগণ্য। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়ি, সামনে প্রশস্ত বাগান, 'লন্'। পিছনে প্রশস্ততর 'কিচেন গার্ডেন'। দুটো আউট হাউস—চাকরদের মহল একটা, আলাদা। তিনটে গাড়ি তাঁদের, অপেক্ষাকৃত ছোট গাড়িটা স্বামী ব্যবহার করেন, বড় বিলিতী গাড়িটা তাঁর। ঐ তো এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছেন, গাড়িটা তার বিপুল দেহ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁরই মর্জির অপেক্ষায়। এ ছাড়াও একখানা গাড়ি আছে, মাঝারি আকারের, কোনদিন যদি এই দুখানা গাড়ির কোনটা বিগড়ে বসে, অথবা রং করা বা এমনি কোন কাজে কি সার্ভিসেও যায়—তাহলে সেই সামান্য মাত্র সময়ও না দুজনের কেউ যান-শূন্য থাকেন—তার জন্যেই এই অতিরিক্ত তৃতীয়ার ব্যবস্থা। হ্যাঁ, লোক তাঁরা এখানে দুজনই, স্বামী আর স্ত্রী, কিন্তু তা হ'লে কি হবে, স্ত্রীকে কোনও দিন সামান্য একটা গাড়ির জন্য স্বামীর ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় বা টেলিফোন ক'রে গাড়ি পাঠাতে বলতে হয়—এটা মিঃ বাগচী পছন্দ করেন না।

আর সত্যিই, ঈশ্বর যখন কোন অভাব রাখেন নি তাঁদের, এটুকু অসুবিধাই বা সহ্য করবেন কেন তাঁরা?

অভাব তাঁদের নেই—এটা সত্য কথা। একথা স্বীকার করলে কেউ দুর্বিনয়

ভাববে না, না করলে বরং মিথ্যাবাদী ভাববে।

যখন তাঁর বিয়ে হয়—স্বামী অবিনাশ বাগচী সাধারণ গ্র্যাজুয়েট মাত্র, সামান্য একটা ইউরোপীয়ান ফার্মে অতি সাধারণ চাকরি করছেন। কিন্তু তারপর স্রেফ, অধ্যবসায়, স্থির বুদ্ধি এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে এদিকেও যেমন লেখাপড়া করেছেন—আইন তো পাস করেইছেন—ওদিকেও তেমনি টপাটপ অফিস বদলে শেষ পর্যন্ত প্রকান্ড এক বিলাতী ফার্মে সর্বোচ্চ পদ অবধি উঠে গেছেন—অবশ্য ভারতীয়ের পক্ষে যতটা ওঠা সম্ভব। তবু সে-ই তাঁর উন্নতির শেষ নয়। চাকরি ক'রে ভদ্রলোক যত টাকা রোজগার করেছেন চাকরি ছেড়ে করেছেন তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী। নিজের পুরনো অফিসের সঙ্গেই চার-পাঁচ রকমের কারবার ক'রে গত পাঁচ-ছ বছরে ফুলে-ফেঁপে লাল হয়ে গেছেন বলতে গেলে। এত টাকা নিয়ে ঠিক কি করবেন তাও বোধহয় ভদ্রলোক জানেন না।

আরও মজা, তিনটি ছেলে তাঁর—তিনজনই কৃতী। একজন থাকে বম্বেতে, একজন চন্ডীগড়ে, আর একজন আমেদাবাদে। বড়টি উকিল, এই বয়েসেই নিজের উপার্জনে বিরাট বাড়ি করেছে আমেদাবাদে। বম্বেতে যে থাকে—তার কোয়ার্টার দেখলে তাঁদেরও তাক্ লেগে যায়। চন্ডীগড়ে যে থাকে—তারই অবস্থা ওদের মধ্যে একটু খাটো, তাও সে সব মিলিয়ে তিন হাজার টাকার মতো পায় মাসে, ছোট-বড় মিলিয়ে ছখানা ঘরের কোয়ার্টার। এক কথায়, তারা কেউই তাঁদের অর্থের মুখাপেক্ষী নয়।

আবারও একবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলেন আরতিমঞ্জরী। যেদিকেই চোখ ফেরান—প্রাচুর্যের চিহ্ন, স্বাচ্ছন্দ্যের সহস্র উপকরণ। এই বিরাট বাড়ি, ঐ বিস্তৃত বাগান, দামী গাড়ি, সামনের প্রশস্ত রাজপথে অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়া-মানুষের আনা-গোনা—সব জড়িয়ে বড় সুন্দর ছবি, বড় তৃপ্তিদায়ক। এর মধ্যে অভাব কি দুঃখের কোন স্থান নেই। আরতির জীবনেও তাই। আজ পর্যন্ত কোন শোক পান নি উনি, এক বাবার মৃত্যু ছাড়া। তাও যথেষ্ট পরিণত বয়সেই মারা গেছেন বাবা। মা আজও জীবিত, তিনি যথেষ্ট সুখে আছেন। ছোট ছেলের কাছে আছেন তিনি, ও'র সে ভাইকেও অবিনাশবাবুই বর্তমানে মোটা মাইনের চাকরি ক'রে দিয়েছেন তদ্বির ক'রে। তাঁরও কোন অভাব-অভিযোগেব কারণ নেই।

এর মধ্যে—আরতির বর্তমান জীবনের মধ্যে সত্যিই এই কদর্য হস্তাক্ষরে লেখা পোস্টকার্ডের চিঠিটা বড় বেমানান। এ চিঠি তাঁর হাতে ক'রে ছোঁওয়াই উচিত নয়, পড়া তো দূরের কথা। কিন্তু তবু চিঠিটা যে তিনি বেশ যত্ন ক'রে বারবার পড়লেন তাই নয়—পড়া শেষ হ'লেও চিঠিটা ফেলে দেবার কথা মনে হ'ল না তাঁর, কার্ড-খানা হাতে ধরেই সামনের বড় পাঁচতলা ফ্ল্যাট-বাড়িটার দিকে চেয়ে বসে রইলেন। তাঁর যে স্নান করার সময় হয়ে গেছে, ঝি বাথরুমে রূপসজ্জার বিবিধ বিচিত্র

উপকরণ সাজিয়ে কিছু উৎকণ্ঠিত হয়েই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, সে সব কোন কথাই মনে রইল না তাঁর।

আসলে চিঠিখানা শুধুমাত্র কোন সমাচার কি প্রার্থনা নিয়ে আসে নি—ধনীর কাছে এই ধরনের যে সব চিঠি আসে যাচ্ঞা কি ভিক্ষা নিয়ে ; এ যেন কেবলমাত্র চিঠিও নয়, আরতিমঞ্জরীর জীবনের একটা বিস্মৃত পরিচ্ছেদ—অতীতকালের একটা খণ্ড ভগ্নাংশ ঐ চিঠিটার রূপ পরিগ্রহ ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে।...এই পুনরাবির্ভাবের জন্য কোন প্রস্তুতি ছিল না তাঁর, মনের মধ্যে কল্পনা ছিল না ; সেই জন্যই আরও এত অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

চিঠির আকৃতি যেমন—তেমনি প্রকৃতি অর্থাৎ ভাষাও।

অন্য কেউ দেখলে পত্রলেখককে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ মনে করত। আরতিমঞ্জরীও তাই করেছিলেন প্রথমটা। বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল তাঁর—পত্রপ্রেরকের পরিচয়টা মনে করতে। হয়ত শেষ পর্যন্ত মনে পড়তও না—কারণ অত মাথাই ঘামাতেন না, বার বার পড়ে স্মৃতির দোরে মাথা খুঁড়ে মনে করবার চেষ্টা করতেন না—যদি না সম্বোধনেই অতি অন্তরঙ্গ পরিচয়ের প্রমাণ থাকত।

ক্ষুদি-ক্ষুদি আঁকা-বাঁকা হরফে লেখা—

"ভাই আরু, তোমাকে এতদিন পরে চিঠি লিখিতেছি, সেজন্যে কিছু মনে করিস নি। এতদিন ঠিকানা জানতুম না, বেঁচে আছিস কি না তাও জানতুম না। হঠাৎ তোমার একখানা চিঠি আমেদাবাদ থেকে রিডাইরেক্‌ট্‌ হয়ে দিল্লী যাচ্ছিল, হাতে পড়তে মনে হ'ল এ তোমারই চিঠি। ঠিক এ নাম আর কাহারও শুনি নাই। তাই আন্দাজে এ চিঠি লিখিতেছি, যদি তোর এ ঠিকানা হয়—একটা উত্তর দিস। আমার ভাই বড়ই দুর্গতি, সেই যে পালিয়েছিলুম, লেখাপড়া আর হয় নাই। সে আশাও তো ছিল না। বহু জায়গা ঘুরিয়া সাত ঘাটের জল খাইয়া শেষ অবধি এই আর. এম. এস-এ কাজ পেয়েছিলুম। এখনও সেই চাকরি করিতেছি। শর্টারের চাকরি। বিয়ে-থা হয় নি, এমনিই একটা ঘর বেঁধেছিলুম, সেও একটা মেয়ে রেখে মারা গেছে। সে মেয়ে বড় হয়েছে—বিয়ে দিতে পারি নাই। সেই মেয়েই এখন আমার রাঁধুনী আর ঝি, গিন্নী বলিতেও সে। এধারে চাকুরির মেয়াদ শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাঁচবও না রে বেশীদিন আর। ডাইবেটিস্‌, প্রেসার—নানান রোগ। যদি জানাও যে চিঠিটা পেলে বড় আনন্দ হবে। তোমার কথা যে কত ভাবি তাহা তুমি জানো না। মাঝে মাঝেই মনে হয়। মনে হয় হয়ত বেঁচে নেই। হয়ত খুব দুঃখে আছে। চিঠি দিও। ভালবাসা নিও। ইতি—বসন্ত।"

চিঠির শেষে ঠিকানাও দেওয়া আছে একটা। আজমেঢ়ের ঠিকানা।

এতবার পড়ার আগেই অবশ্য মনে পড়েছে আরতিমঞ্জরীর। বারতিনেক পড়ার পরই। নাম পদবী সবই মিলছে। এ যে সেই বসন্ত, বসন্ত মল্লিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই আর। চরিত্রও, যেটুকু মনে আছে—ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। তার পক্ষেই এই রকম চিঠি লেখা সম্ভব।

কিন্তু এই কি তার পরিণতি ?

বসন্ত—বাসিদার এই হ'ল শেষ পর্যন্ত !

এর জন্যেই কি এতকাল, সম্ভোগের এই সহস্র উপকরণের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ সুখী হ'তে পারেন নি আরতিমঞ্জরী ? ভাতে কাঁকর থাকলে যেমন, অজস্র সুস্বাদু ব্যঞ্জন ও উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, আহার ঠিক তৃপ্তিদায়ক মনে হয় না—তেমনিই একটা অদৃশ্য অকারণ অতৃপ্তি কোথায় যেন প্রতিনিয়ত তাঁর জীবনযাত্রার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম গোপন কাঁটার অস্তিত্ব জীইয়ে রেখেছিল। একটা অস্বস্তিবোধ ছিল আগাগোড়া।

প্রেম ?

ভালবাসা ?

বাল্যপ্রণয় ?

আধুনিক যুগে যা নিয়ে রাশি রাশি গল্প উপন্যাস চলচ্চিত্র তৈরী হচ্ছে ?

তিনি কি এতকাল এক পরপুরুষের স্মৃতি মনে জাগিয়ে রেখে নিত্য অন্তরের মণিকোঠায় তারই আরতি করেছেন—স্বামীকে প্রতারণা করেছেন—দেহে না হোক, মনে ?

না, তা নয়। সে সব কিছু নয়। নাটক বা উপন্যাসের কোন উপাদান নেই তাঁর এ চিন্তায়।

শুধুই একটা অস্বস্তি, শুধুই একটা সূক্ষ্ম—আবার পুরাতন শব্দেরই পুনরাবৃত্তি করতে হয়—অকারণ অপরাধবোধ। স্থান-কাল-পাত্র সবই কোথায় কোন্ বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেছে—কিছুই আর স্পষ্ট মনে নেই—স্বামীপুত্রের অসামান্য সাফল্যে সব অতৃপ্তিই ধুয়ে মুছে গেছে জীবন থেকে, শুধু সেই আকার-হীন অস্বস্তি আর অপরাধবোধটা, কারণহীন কুণ্ঠাটা থেকেই গেছে।

কিন্তু যাকে কেন্দ্র ক'রে, যাকে উপলক্ষ ক'রে এই অতৃপ্তি আর অস্বস্তি—সে এ-ই ?...

বিস্মৃতির ভারী কুয়াশাটা কেটে গেছে একটু একটু ক'রে, দীর্ঘকালের কালো পর্দাটা গেছে সরে। এখন সবই মনে পড়ছে তাঁর। সব। সেদিনের সে সুতীব্র বেদনা আবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করছেন যেন।

পাড়ার ছেলে শুধু নয়—পাশের বাড়ির ছেলে। নিকট আত্মীয়ের চেয়েও অন্তরঙ্গ। যে বন্ধুত্ব আত্মীয়াধিক আপন করে সেই সখ্যতাই ছিল আরতির বাবা ভোলানাথবাবু আর বসন্তর বাবা কৃষ্ণপ্রসন্নবাবুর মধ্যে। সুতরাং এই দু'বাড়ির ছেলেমেয়ের আসা-যাওয়া মেলামেশায় আপত্তিকর কিছু কেউ দেখতে পায় নি।

বাসিদা ছিল আরতিমঞ্জরীর থেকে মাত্র বছর-দুই বছর-দেড়েকের বড়। শুধু যে বাসিদাই তাঁকে 'তুই-তোকারি' করত তা নয়—তিনিও আড়ালে আবডালে 'তুই' বলতেন। দৈবাৎ গুরুজনদের কানে গেলে সেজন্যে বকুনিও খেয়েছেন। একেবারেই পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো ছিলেন তাঁরা। অন্য সম্পর্কের কথা তাই কেউ কোন-

দিন ভাবে নি। আরতিমঞ্জরীও না।

অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের দেবদাস ও পার্বতীর উপমা এখানে অচল।

তেমন কিছুই এখানে কোনদিন ঘটে নি। শুধু একটা ব্যাপারে দেবদাসের সঙ্গে বসিদার সামান্য একটু মিল ছিল। বসন্তর লেখাপড়া বিশেষ হয় নি। ইস্কুলের বিভিন্ন ক্লাসে কয়েকবার ফেল ক'রে উনিশ বছর বয়সে প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল সে, তাতেও ফেল করে। নাছোড়বান্দা কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু আবারও তাকে পরীক্ষার হালে জুতে দিয়েছিলেন, আশা করেছিলেন যে ইস্কুলের ক্লাস-প্রমোশনের মতো এটাতেও বার-দুই-তিন চেষ্টা করলে পাস করতে পারবে।

হয়ত পারতও—হ'ল না যে, তার জন্যে পরোক্ষে আরতিই দায়ী। কারণ এই সময়ই ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। সে বিয়েতে—মানে বিয়ের সময়ই কদিন—বসন্তর পাঠে বিঘ্ন ঘটবে এইটেই সকলে ভেবেছিল। একেবারে বন্ধ হবে, কেউ মনে করে নি। আরতির বিয়েতে বসন্তর আনন্দ হবে, ফুর্তি-আমোদ করবে এই কথাই সকলে জানত। কার্যক্ষেত্রে উল্‌টোটাই ঘটল। হঠাৎ ওর বিয়ের আগের দিন থেকে কোথায় উধাও হয়ে গেল বসি—আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না তার।

তাতেও প্রথমটা অত বিচলিত হন নি আরতি। তাঁর জীবনে তখনও অবধি কোন পুরুষের আবির্ভাব হয় নি, অন্তত প্রেমিকরূপে নয়। হ'লেও তেমন কিছু অনুভব করেন নি। সুতরাং অনেকখানি আশা ও আনন্দ নিয়েই তিনি আসন্ন বিবাহের দিকে চেয়ে ছিলেন, আগামী দাম্পত্যজীবনের দিকে। শুভদৃষ্টির সময় যেটুকু দেখা—স্বামীকেও পছন্দ হয়েছিল। খুশির পাত্র কানায় কানায় ভরা ছিল, তাই—কৃষ্ণপ্রসন্ন বা তাঁর স্ত্রীর উদ্বেগ ও আকুলতা অতটা বিচলিত করতে পারে নি। এমনি কোথায় গেছে—পাগল তো—দুদিন বাদে ঘুরে আসবে ঠিক।...

একেবারে বরকন্যার বিদায়ের মুহূর্তটিতেই আঘাতটা এল। একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না আরতিমঞ্জরী, সুদূর কল্পনাতেও এ সম্ভাবনাটা দেখা দেয় নি ওঁর মনে। বসন্তর ছোট্ট ভাগ্নেটা—হাবলা সেই ভিড়ের মধ্যেই এসে এক ফাঁকে চিঠিটা দিয়ে গেল। ভাল ক'রে পড়া গেল না, তবু যেটুকু পড়তে পারলেন তা-ই যথেষ্ট। আর সামান্য দু'ছত্র তো চিঠি, পড়তে সময় বেশী লাগার কথা নয়। লেখা ছিল, 'আরু, তোমাকে পাইবার যোগ্য আমি নই, তবু তোমাকেই মনে প্রাণে চাহিয়াছিলাম। হয়ত সময় পাইলে যোগ্য হইতে পারিতাম। তোমাকে ছাড়া এ জীবনের কোন দাম নাই। তাই এখানে আর থাকা হইল না। এ জীবনে তুমি পরের হইলে—যদি পরজন্ম থাকে তোমাকে পাইবই। ইতি—'

নিজের সুখের পাত্র যখন পরিপূর্ণ থাকে তখন সাধারণত পরের বেদনা অতটা স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু আরতিকে করেছিল। কিছুকালের জন্য খুবই বিচলিত হয়েছিলেন তিনি। তার বেশির ভাগই হয়ত বিস্ময়, কিন্তু হতভাগ্য বুদ্ধিহীন বাল্যসঙ্গীর জন্য দুঃখও কিছু বোধ করেছিলেন। সেদিনের সেই বিদায়-ক্ষণের যে চক্ষের জল অবিরলধারে ঝরে তাঁর বেনারসী শাড়ি সিক্ত ক'রে তুলেছিল,

তার সবটাই মা-বাবা-ভাইয়ের জন্যে নয়—ঐ হতভাগাটারও কিছু ভাগ ছিল তার মধ্যে। হয়ত বা বেশিটাই।·

তবু তখনও আরতি ভেবেছিলেন যে বসন্ত ফিরেই আসবে পর্যন্ত। উদ্যম বা মনের জোর কোনটাই নেই যার—সে কোথায় কি জীবিকার সংস্থান করবে ? এ বয়সে এমন অনেক ছেলেই পালায়—পাড়াঘরে জানা-শুনোর মধ্যে অনেকের কথাই জানেন—আবার দু-চার দিন পরেই মাথা হেঁট ক'রে লাজুক লাজুক মুখে ফিরে আসে। বসন্তকেও তাই আসতে হবে। কদিন বাদেই ফিরবে নিশ্চয়।

কিন্তু বসন্ত এল না। এল না শুধু নয়—কোথাও থেকে তার কোন খবরও পাওয়া গেল না। বেঁচে রইল কি কোথাও গিয়ে আত্মহত্যা করল তাও জানতে পারল না কেউ। চিঠির যা ভাষা—বিশেষ শেষ ছত্রের—তাতে এ আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। আরতিমঞ্জরীরও ক্রমে ক্রমে সেই আশঙ্কাই প্রবল হয়ে উঠল। কৃষ্ণপ্রসন্ন গোটা দুই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, আরতি গোপনে তাঁকে চিঠি লিখে আরও কয়েকটা বিজ্ঞাপন দেওয়ালেন। তবুও কোন ফল হ'ল না। না এল বসন্তর কোন চিঠি, না পাওয়া গেল তার কোন খবর।

ফলে যে দায়িত্ব কোনমতেই তাঁর ওপর চাপানো যায় না, সেই দায়িত্বের গুরু-ভারেই পীড়িত বোধ করতে লাগলেন আরতিমঞ্জরী। কৃষ্ণপ্রসন্ন আর তাঁর স্ত্রী দিন দিন শুকিয়ে বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন—সে অপরাধও মনে হ'ল তাঁরই। ওঁদের মুখের দিকে চাইতে পারেন না তিনি। পাছে ওঁদের দুঃখের কথা শুনতে হয়—সেজন্যে বাপের বাড়ি আসারই কোন উৎসাহ বোধ করতেন না। তাঁর মনে হ'ত মুখে কিছু না বললেও বসন্তর বাবা-মা মনে মনে ওঁদের বড় ছেলেকে এইভাবে হারাবার জন্য তাঁকেই দায়ী করেন। ওঁদের নীরব দৃষ্টিতে কেবলই যেন তিরস্কারে রভাষা ফুটে উঠতে দেখতেন তিনি। অসম্ভবও হয়ত নয়—কারণ হাবলা মামার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা না করলেও, অর্থাৎ সে চিঠি কাউকে না পড়ালেও চিঠি যে একটা বসন্ত দিয়ে গেছে—এবং দিয়ে গেছে আরতিকেই—তা ও'রা জানতে পেরেছিলেন। চিঠিতে কি লেখা ছিল তা চক্ষুলজ্জায় পড়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করতে পারেন নি—তবে কিছুটা অনুমান করতে পারেন নি কি আর ?···

তারপর বহুদিন গত হয়েছে। সবাই ভুলেছে বসন্তর কথা। এমন কি তার বাবা-মায়ের মনেও ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে তার স্মৃতিটা। তাঁরা বাকী সন্তানদের সুখ-দুঃখ-ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ভর দিয়েছেন ক্রমশ। তাঁদের এবং বাকী সকলেরই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে বসন্ত আর বেঁচে নেই। হয় আত্মহত্যা করেছে, নয় তো স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যু ঘটেছে তার। না হ'লে এতদিনেও কোন যোগাযোগ করল না কেন ? কাজকর্ম কোথাও কিছু পেয়ে থাকলে সগৌরবে সেটা জানাত। কিছু না পেলে ফিরে আসত নিশ্চয়ই। বেঁচে নেই বলেই আর কোন খবর পাওয়া যায় নি।

ভুলে ছিলেন আরতিমঞ্জরীও। ভোলাই স্বাভাবিক। যার জীবনে শুধুই ক্রমোন্নতি, শুধুই অন্তহীন সুখসৌভাগ্যের বর্ণচ্ছটা—তার ব্যস্ত জীবনের তৃপ্ত মনে এতকাল ধরে একটা স্বল্পবুদ্ধি হতভাগা বাল্যসাথীর চিন্তা থাকা সম্ভব নয়।

ছিলও না।

একেবারে যে কখনও মনে পড়ত না তা নয়—তবে সে কদাচিৎ কখনও। কবির ভাষায় 'কোন দিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে'—কখনও মার-কাছ-থেকে-পাওয়া চিঠিতে তাঁর বাপের বাড়ির উল্লেখ থাকলে এক-আধবার মনে পড়ত হয়ত। কিন্তু কর্মহীন অবকাশই যার জীবনে নিতান্ত দুর্লভ—তার এসব চিন্তা-বিলাসের সময় কৈ?

না, স্মৃতি আর ছিল না।

তবে অস্বস্তিটা ছিল।

কেন যে ছিল তা আরতিমঞ্জরীও হয়ত বুঝতেন না ঠিক।

সেটা কি কোন অতৃপ্তি? তবে কি অবিনাশবাবুকে স্বামীরূপে পেয়ে মন ভরে নি তাঁর?

না, না। কে বললে সে কথা। বহু সৌভাগ্যে এমন স্বামী মেলে। শুধু বিত্তশালী সার্থক মানুষ বলে নয়—অবিনাশবাবুর মতো এত বিবেচনা, এত ভালবাসা কটা স্বামীর কাছে মেলে? আজও তিনি যেন স্ত্রীর প্রণয়মুগ্ধ—এমনই সজাগ সতর্ক তিনি স্ত্রীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে।

তবে এ অস্বস্তির কারণ কি?

ব্যর্থ প্রণয়?

না, নিজের মন খুব ভাল ক'রেই জানেন আরতি দেবী, বসন্তর প্রতি কোনদিন প্রণয়াসক্ত হন নি তিনি।...

তবে যে কি, আরতিমঞ্জরী তার কোন উত্তর খুঁজে পান নি। আসলে নিজের মনই ভাল ক'রে বিশ্লেষণ করে দেখেন নি তিনি। অবসরও পান নি, হয়ত প্রয়োজনও মনে করেন নি। নইলে বুঝতেন যে এটা শুধুই কৃতজ্ঞতা। যতই অযোগ্য ও অপদার্থ হোক, যতই নির্বোধ বা মূর্খ হোক—কোন মেয়েকে ভালবেসে যদি কেউ নিজের জীবন নষ্ট করে, রুদ্ধ ক'রে দেয় নিজের হাতে ভবিষ্যতের সকল সার্থকতার পথ—তাহলে সে মেয়ে সেই লোক সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা বোধ করতে বাধ্য। কোন বান্দা তাঁর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে জানলে স্বয়ং নূরজাহানও বোধহয় কৃতজ্ঞতা বোধ করতেন, একটু ব্যথা অনুভব করতেন সেই নফরের জন্য। আরতিমঞ্জরী তো সামান্য মানুষ।

সত্যিই হয়ত তাঁর এই অস্বস্তির অন্তরালে—মনের অবচেতনে একটা ব্যথাও ছিল। কে জানে তাঁকে পেলে হয়ত ওর জীবনের গতি পালটে যেত, হয়ত তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রাণপণে লড়াই করত, হয়ত সেও—ঠিক অবিনাশবাবুর

মতো না হলেও বিত্তশালী হয়ে উঠত এতদিনে। কিছুই যে হ'ল না, একটা তরুণ প্রাণ অকালে ঝরে গেল—সেজন্যে প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে তিনি দায়ী বৈকি!

ব্যথা যে ছিল তা আজ স্পষ্ট টের পেলেন আরতি দেবী। একটা অব্যক্ত অ-বর্ণনীয় যন্ত্রণায় সমস্ত মনটা টনটন ক'রে উঠল তাঁর, কিছুক্ষণের জন্য যেন সমস্তটা বর্ণহীন মনে হ'ল। এই বাড়ি, ঐ গাড়ি—বিলাস ও আরামের সহস্রবিধ উপকরণ—শহরের বহুবিচিত্র কর্মব্যস্ততা—সমস্তই যেন অর্থহীন হয়ে গেল তাঁর কাছে।

এতটা জানতেন না তিনি।

এতদিনের এই অস্বস্তির মধ্যে কল্পনার যে বিরাট একটা প্রাসাদ রচনা ক'রে রেখেছিলেন মনে মনে, সেইটেই বুঝতে পারেন নি। সঙ্কোচ বা অপরাধবোধের মধ্যেই যে আত্মতৃপ্তি ও আত্ম-অহঙ্কারের একটা নিত্য-উৎস ছিল সেটা কল্পনাও করেন নি কোনদিন। করলে লজ্জার সীমা থাকত না।

আজও লজ্জা পেতেন তিনি যদি বুঝতে পারতেন যে এই মনের সহস্র তারে মোচড় দেওয়া ব্যথাটা তাঁর একটি গোপন মধুর আশাভঙ্গেরই বেদনা। তাঁর জন্য যে একটি মহৎ সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে বলে এতকাল ভেবে এসেছিলেন—আসলে তার মধ্যে কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তাঁর জন্য সে নষ্ট হয় নি। তাঁর ধ্যানেও জীবন কাটায় নি। অন্য নারী এসেছে তার জীবনে—সেও বিবাহিতা স্ত্রী নয়, হয়ত বা সাধারণ পণ্যজীবা বারবিলাসিনী কেউ—তাকে নিয়ে ঘর করেছে সে, সুখী, তৃপ্ত হয়েছে। সেই স্ত্রীলোকটারই মেয়ে নিয়ে এখনও সংসার করছে, সেই মেয়ের জন্যে তার উদ্বেগের শেষ নেই। নেহাৎই তুচ্ছ সাধারণ মানুষ, অকিঞ্চিৎকর তার জীবনযাত্রা। এর জন্যে সামান্য মাত্র ছায়াও যদি তাঁর এই পরিপূর্ণ বর্ণোজ্জ্বল জীবনে পড়ে থাকে তো সেইটেই লজ্জার কথা।

কিন্তু এদিকটা এমনভাবে বিচার ক'রে দেখতে পারলেন না তিনি।

সুখী জীবন মনের অতলে তাকাতে অভ্যস্ত হয় না বিশেষ। তাই আশাভঙ্গের বেদনা, ব্যর্থতার লজ্জা একটা উগ্র উষ্মার রূপ ধারণ করল। অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন তিনি—ঐ অপদার্থ নির্লজ্জ লোকটার ওপর। মনে হ'ল লোকটা বিষম ঠকিয়েছে তাঁকে—দীর্ঘকাল ধরে প্রতারণা করেছে! অপদার্থ শুধু নয়, জুয়াচোর, প্রতারক!

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোস্টকার্ডখানা দুমড়ে মুঠির মধ্যে চেপে ধরলেন—তাকে দলিত পিষ্ট ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে, বারান্দার নিচে কাঁকর ফেলা রাস্তায়। এটাও এ-বাড়ির পক্ষে অশোভন ব্যতিক্রম, তাড়াতাড়ি এক দারোয়ান গিয়ে সেটি কুড়িয়ে নিয়ে, ভেতরবাড়ির ডাস্টবীনে ফেলে দিয়ে এল। 'মাইজী' যে ফেলেছেন তা সে দেখতে পায় নি, নিশ্চয় কোন 'মাহারীন' বা দাসীর কাজ। কার কাজ জেনে নিয়ে মুনিমজীর গোচর ক'রে শাসন করাতে হবে—মনে মনে স্থির ক'রে রাখল।

উঠে পড়লেন আরতিমঞ্জরী। অনেক দেরি হয়ে গেছে—অযথা বহু বিলম্ব। আর নয়। একটা বাজে লোকের চিন্তাতে নিজের জীবনযাত্রা বিড়ম্বিত ক'রে লাভ নেই।

তাঁর কিছু পূর্বের ধ্যানমগ্ন ভাবটা দূর হতে তাঁর নিজস্ব দাসী রামরতিয়াও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। এতক্ষণ সে এবং দোতলার অন্যান্য দাসী-চাকররা যেন ভয়ে ভয়ে নিঃশ্বাস রোধ ক'রে ছিল। মাইজীর এ রকম স্তম্ভিত অবস্থা তারা দেখে নি কখনও, নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ পেয়েছেন ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

সহজ হয়ে এল অতঃপর এ-বাড়ির দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও। অন্যান্য দিনের মতোই স্বচ্ছন্দগতিতে চলতে লাগল সাংসারিক কাজকর্ম। সহজ হয়ে উঠেছেন আরতিমঞ্জরীও। সহজ ভাবেই স্নান সেরে নিলেন, স্নানের পর সামান্য প্রসাধন করেন—সে অভ্যাসেরও পরিবর্তন ঘটল না। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে প্রতিদিনের মতোই স্বামীর অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবিনাশবাবু ব্রেক-ফাস্টের আগেই স্নান সেরে নেন, দুপুরে বাড়ি ফিরে একেবারে লাঞ্চের টেবিলে বসেন। যেদিন ফিরতে দেরি হবে বোঝেন—স্ত্রীকে ফোন ক'রে দেন। একসঙ্গে বসে বেশী ক'রে ডিনার খেয়ে পুষিয়ে দেবেন এই অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির ক্ষতি—টেলিফোনেই এই অঙ্গীকারের ছলে রসিকতা ক'রে স্ত্রীর ক্ষোভ দূর করার চেষ্টা করেন। ক্ষোভ তাঁর অনুপস্থিতির জন্য তত নয়—যতটা একা বসে খাওয়ার জন্য, তা অবিনাশবাবুও বোঝেন, তবু যেন নিজেকে কুণ্ঠিত বোধ করেন কোন কারণে আসতে না পারলে।...

আজ এখনও তেমন কোন ফোন আসে নি। সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ফিরবেন মনে হচ্ছে।

আরতিমঞ্জরী দোতলার বারান্দায় তাঁর অভ্যস্ত এবং প্রিয় আসনটিতে এসে বসলেন। এ বারান্দায় ছাদ আছে—কিন্তু সামনেই অনেকখানি খোলা বারান্দা। নিচের পোর্টিকো ও সংলগ্ন সিঁড়ি জুড়ে এই ছাদটা। এর ধারে ধারে অজস্র ফুল-গাছের টব, চামেলি ও বোগেনভিলিয়ার লতা উঠে গেছে এই ভেতরের বারান্দার ছাদ পর্যন্ত। অনেকটা চাঁদোয়ার মতো রচনা করেছে। ভারী ভালো লাগে আরতি দেবীর—এখানে বসে সামনের বাগান—বাগান ছাড়িয়ে দূর রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতে।

দুপুরের দিকে নতুন পাড়ার রাস্তা জনবিরল বা যানবিরল হয়ে আসে। পথিক তো থাকেই না, মাঝে মাঝে ক্বচিৎ কখনও স্কুটার বা গাড়ি যাতায়াত করে এক-আধখানা। পথে কুকুর বা ষাঁড়—এ ধরনের কোন অবাঞ্ছিত প্রাণীও দেখা যায় না; পথের ধারে কোন খাদ্য নেই, খাবারের দোকান কি বাজার বসে না, তারা খাবে কি? যা কিছু প্রাণের লক্ষণ পাওয়া যায়—শুধু দূরাগত বেতার-সঙ্গীতে এবং দুপুরের আতপ্ত পশ্চিমাবাতাসে ঝিলমিল করা গাছের পাতায়। তবু পথের দিকেই চেয়ে বসে থাকেন আরতি দেবী। সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে, বিলাসে ও আরামে পূর্ণ

এই পৃথিবীর দিকেই চেয়ে থাকতে ভাল লাগে আসলে। এই বাড়ি বাগান রাস্তা—রাস্তার ওপারে নবনির্মিত বাড়ির সারি—সেই বিপুলা পৃথিবীরই প্রতীক হয়ে গেছে তাঁর কাছে।...

বসে থাকতে থাকতে নিষ্ক্রিয় মন আবার কখন সেই বসিদার কথাতেই ফিরে আসে—তা বুঝতেও পারেন না আরতিমঞ্জরী।

কী ছন্নছাড়া হতভাগা জীবন হয়ে গেল লোকটার। অথচ সম্ভ্রান্ত ভদ্র বংশে জন্মেছিল, বাড়িতে থাকলে পাসটাস না করলেও একটা কোন ভাল চাকরি-বাকরি জুটে যেত, ভদ্রঘরে বিয়ে-থা ক'রে সংসারী গৃহস্থ হ'তে পারত। কেন এমন করল বসিদা, নিজের জীবন নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলল! পালিয়ে গিয়েছিল ঠিকই—অনায়াসে তো আবার ফিরে আসতে পারত। এমন কি চক্ষুলজ্জা! বাবা-মায়ের কাছে আবার এত লজ্জা কিসের ?

কেন এমন করল সে। কেন, কেন ?

তবে কি, একটা বড় রকমের আঘাত পেয়েছিল বলেই আর বাড়ি ফিরতে পারল না ? আত্মহত্যার মতো ক'রেই জীবনটা নষ্ট করল সে—ইচ্ছে ক'রে, সাধ ক'রে ? আরতি কি তা হ'লে অবিচারই করছেন লোকটার ওপর ? একটা বাজারের মেয়ে-ছেলে—অথবা ঐ ধরনের একটা মেয়েকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল বলে যে নিদারুণ ঘৃণা বোধ করছেন আরতি—এক রকমের প্রবঞ্চনা বলে মনে হচ্ছে—সেটাও কি এই জীবন লণ্ডভণ্ড ক'রে দেওয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া নয় ? বেঁচে থাকাটাই যার কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে, ভবিষ্যৎ শব্দটারই কোন অর্থ নেই আর—তার কাছে মন্ত্রপড়া আনুষ্ঠানিক বিবাহেরই বা মূল্য কি ? বিয়ে ক'রে ঘর বাঁধাতেই বরং তার আপত্তি হবার কথা। সমাজের ওপর—নিজের অদৃষ্টের ওপর প্রতিশোধ নিতেই তো চাইবে সে। জীবনকে সহজ স্বাভাবিক খাতে বইতে দেওয়া মানেই তো অদৃষ্টকে স্বীকার ক'রে নেওয়া, ব্যর্থতার বেদনাকে অস্বীকার করা।

আর, একজনের প্রেমে ঘর ছেড়ে ভিখারী হয়ে বেরিয়ে গেছে বলেই সে চিরকাল ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে হবে—তার কোন মানে নেই। মনের ক্ষুধা ছাড়াও দেহের ক্ষুধা থাকতে পারে। চিন্তাটা বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে—তাই বলে কখনও কোন সময়ে ইন্দ্রিয়ের তাগিদ বোধ করবে না, এমন কোন নিয়ম নেই।...

সে যাই করুক—এখনও যে ভালবাসে, এখনও যে ওর এই আশাহীন আনন্দ-হীন জীবনে ধ্রুবতারার মতো তাঁরই চিন্তার প্রদীপখানি জ্বালিয়ে রেখেছে—সে কথা তো নিজেই জানিয়েছে। এ চিঠিতে আর যা-ই হোক—মিথ্যা কিছু নেই। মিথ্যে কথা গুছিয়ে লেখার মতো বিদ্যা বা বুদ্ধি কোনটাই যে ওর নেই—এই চিঠিই তো তার প্রমাণ।

বসন্তর কথা ভাবতে ভাবতে, তার বিশ্বস্ততার প্রমাণ উপস্থিত করতে করতে কখন যে আবার নিজের কৈশোরে ফিরে গেছেন—ফিরে গেছেন নিজের বিবাহের রাত্রিটিতে—তা আরতিমঞ্জরী বুঝতেও পারেন নি। সে রাত্রে বসন্ত যে ব্যথা

পেয়েছিল, যে নিদারুণ আঘাতে ভীরু অসহায় দুর্বল ছেলেটা অমনভাবে চির-কালের মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল—সেই আঘাতের পরিমাণটাই নিজের মন দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করেন তিনি। এমন ভাবে—এমন একাগ্র ভাবে কথাটা কখনও ভেবে দেখেন নি, ভাবার সময়ও পান নি—তাই এমন কষ্টকর অনুভূতিও হয় নি এর আগে। বুকের মধ্যে যেন দৈহিক যন্ত্রণা অনুভব করেন, চোখ ফেটে জল আসে তাঁর। সেই সঙ্গে কোথায় যেন একটা সুখ, একটা গর্বও বোধ করেন। 'কাহার প্রাণের বেদনায় আমার মূল্য আছে'—কবির গানের এই পংক্তিটির সম্পূর্ণ অর্থ উদ্ভাসিত হয় মনের মধ্যে।

ছটফট ক'রে উঠে পড়েন আরতিমঞ্জরী।

চারিদিকে তাকান চিঠিখানার জন্য।

উত্তর দিতে হবে। তার আগে আর একবার পড়া দরকার। ঠিকানা—ঠিকানাটা চাই যে।

কিন্তু চিঠিটা দেখা যায় না।

তখন মনে পড়ে তিনিই দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিয়েছিলেন নিচে।

কাউকে বলবেন খুঁজে আনতে ?

বড়ই লজ্জা বোধ হয়। একেই তো সামান্য একটা পোস্টকার্ডের চিঠি নিয়ে—তাঁর পক্ষে অন্তত—যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করেছেন। ঝি-চাকররা সেটা লক্ষ্য করেছে নিশ্চয়ই—বার বার পড়া আর বিহ্বল হয়ে বসে থাকা। তারপর সেই চিঠি অবজ্ঞায় ফেলে দিয়ে এতক্ষণ পরে কুড়িয়ে আনতে বললে ওদের মহলে অনেক আলোচনার সৃষ্টি হবে।

আরতি নিজেই উঠে পড়েন। কোথায় আর পড়বে—নিচের বাগানেই পড়েছে নিশ্চয়।

পায়ে পায়ে নেমে আসেন নিচে।...

ঐশ্বর্যের মধ্যে, আড়ম্বরের মধ্যে বাস করার অর্থই হচ্ছে—অসংখ্য দাসী-চাকরের মধ্যে বাস করা—আর তার অর্থ ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি। স্বাধীনভাবে কিছুই করার উপায় নেই—যখন তখন যা-খুশি করা যায় না—গোপনে তো নয়ই। তুমি যেদিকেই যাও, যা-ই করো—তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। না হ'লে তাদের মস্তিষ্ক ইচ্ছামতো কল্পনা ও রটনা করবে, সে আরও অসহ্য। এই পুরাতন সত্যটা আজ আর একবার নতুন ক'রে অনুভব করলেন আরতিমঞ্জরী।

উঠে দাঁড়াতেই রামরতিয়া ছুটে এল। সিঁড়ির মুখে ব্রিজনন্দন। নিচে নেমে আসতেই দেওপ্রসাদ সামনে এসে দাঁড়াল। প্রত্যেককেই বলতে হ'ল যে তাঁর কোন 'খাশ কাম' নেই, তাঁর 'তবিয়ৎ'ও খারাপ হয় নি, এমনিই বাগানে অনেক দিন নামেন নি, তাই দেখতে আসছেন। আর আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে সাহেবের দেরি হচ্ছে বলেই এগিয়ে দেখতে যাচ্ছেন—

কিন্তু বাগানে সে চিঠি পড়ে নেই।

থাকার কথাও নয় অবশ্য, থাকলে তিনিই তিরস্কার করতেন। তিনজন মালী আছে তাঁর, তাদের একজনের কাজই হচ্ছে সামনের বাগান, তাঁর মধ্যকার চক্রাকার কাঁকরফেলা রাস্তা, গাড়ি-বারান্দা ও সিঁড়ি—সব সময় পরিষ্কার রাখা।

সামনে পড়ে নেই। গাড়ি-বারান্দার কোণে—বোগেনভিলিয়া ও চামেলির কাণ্ডের আড়ালে যে রঙকরা সুদৃশ্য ডাস্টবিনটা আছে—সেটাও এক বার উঁকি মেরে দেখলেন। এমনি বেড়াতে বেড়াতে—নিতান্ত নিস্পৃহ উদাসীন ভাবে, যেন ভৃত্যদের কারও কোথাও কর্তব্যে কোন অবহেলা ঘটছে কিনা—এইটেই দেখতে চান তিনি।

এর পর যে পথ খোলা আছে তা হচ্ছে, ভেতরের ডাস্টবিনটা দেখে আসা—অথবা মালীদের কাউকে দেখতে বলা। কিন্তু এর কোনটাই করা সম্ভব হ'ল না। বিস্তর কথা উঠবে, বিস্ময় ও জল্পনা-কল্পনার শেষ থাকবে না। একসময় চুপিচুপি গিয়ে দেখা যায় না তা নয়—কিন্তু সেখান থেকে উঠিয়ে নেবেন কি ক'রে—অন্তত দশ-বারো জোড়া চোখের সামনে দিয়ে?

আর সময়ও মিলল না অবশ্য, অবিনাশবাবু এসে পড়লেন।

দূর থেকেই ব্যস্ত ও অনুতপ্তকণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, 'বড্ড দেরি হয়ে গেল, না? তোমার ক্ষিদে পেয়েছে খুব, মুখটা শুকিয়ে গেছে।...চলো চলো—'

অগত্যা ওপরে উঠে আসতে হ'ল। খাওয়ার টেবিলে বসে আবারও অবিনাশবাবু বললেন, 'তোমার চোখ দুটো ছলছল করছে কেন? জ্বরটর আসে নি তো? কৈ দেখি গাটা—। না, গা তো ঠাণ্ডা। শরীর খারাপ মনে হচ্ছে কিছু?...দেখো—আমাকে লুকিও না।'

সেই প্রথম বয়সের মতোই আকুলতা স্বামীর কণ্ঠে।

মনে মনে লজ্জিত হন আরতি দেবী। এমন স্বামী যার—তার পক্ষে কোন পরপুরুষের কথা চিন্তা করাও অন্যায়। তা হোক না সে কোন হতভাগ্য অপদার্থ—হোক না একান্ত কোন ভক্ত।

সুতরাং কিছুই করা হয় না।...

সমস্ত অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা অন্যমনস্ক হয়ে থাকেন শুধু।...

চিঠি একটা লেখা যায় অবশ্য, "আর. এম. এস্—আজমেঢ়"—এই ঠিকানা দিলে কি আর পাবে না—নিশ্চয়ই পাবে বসিদা।

কিন্তু কি লিখবেন তিনি?

মধ্যাহ্নের সে ব্যাকুলতা সন্ধ্যায় আর নেই। স্থির বুদ্ধিতে সবটা ভেবে দেখবার অবসর পেয়েছেন তিনি। কী লিখবেন, কোন্ আশ্বাস বা সান্ত্বনা দেবেন? তাকে আসতে লিখবেন? এই পরিবেশে তার মতো লোক! ছিঃ! সেও লজ্জা পাবে, তিনিও পাবেন। তাছাড়া কীই বা পরিচয় দেবেন তার? পরমায়ুর অনেকখানিই

অতিক্রান্ত ক'রে এসেছেন এটা ঠিক—তবু এখনও হয়ত অনেক বাকী। তা ছাড়া মনের বয়স নেই। সন্দেহেরও না। বসন্তদা যা বোকা, তার কথাবার্তার ধরন—আগেই যেখানে-সেখানে যা-তা কথা বলে ফেলত দুমদাম ক'রে—এখন তো, চিঠি পড়ে যা মনে হয়, আরও আলগো হয়ে গেছে। অবিনাশবাবুর যদি এ ধারণা হয়ে যায় যে তাঁদের বাল্যপ্রণয় ছিল তাহলে এ বয়সেও ওঁদের জীবন বিষাক্ত হয়ে যাবে। সে যেখানে অত ভালবাসত, ওঁর জন্য জীবনটা ছারখার ক'রে দিলে—সেখানে আরতি তাকে একটুও ভালবাসেন নি—এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে! এরকম ঘটনা অপর কারুর প্রসঙ্গে শুনলে তিনিই অবিশ্বাস করতেন। আর, একবার এ ধরনের সন্দেহ মনে দেখা দিলে কতটা কি হয়েছিল—প্রণয়টা কতদূর এগিয়েছিল—স্বভাবতই স্বামীর মন সেই পরিমাপে ব্যস্ত হয়। কিছু যদি না-ই থাকবে—এতকাল পরে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? শুধুই দয়া, অনুকম্পা—এ কি স্বামী বিশ্বাস করবেন?···

এক কিছু টাকা পাঠাতে পারেন।

মেয়ের বিবাহের জন্য, সাহায্য হিসেবে।

কিন্তু সে তো ভিক্ষা।

এতকাল পরে বসিদাকে ভিক্ষা দেবেন, সাহায্য ক'রে পাঠাবেন?

না, তাতেও মন সায় দেয় না।

এমন দান তিনি অজস্র করেন, অবিনাশবাবু কখনও প্রশ্নও করেন না—দু-চার কেন, পাঁচ-দশ হাজার টাকা দিলেও তিনি প্রশ্ন করবেন না কোনদিন—তাঁর নিজের নামেই তো ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা জমা আছে, কেউ টেরও পাবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে নিজেরই মনে যে বাধা আছে।

ভালবাসার মূল্য শোধ দেবেন তিনি আর্থিক ভিক্ষায়? ছিঃ! এতকাল পরে বেচারীকে এতখানি অপমান করতে মন সরে না।···

সুতরাং কিছুই করা হয় না।

শুধু অনেক রাত্রে একবার নিচে নেমে টর্চ ফেলে ভেতরবাড়ির উঠানে জঞ্জাল-ফেলা টবটা দেখে আসেন—কিন্তু সে তখন বিকেলের আনাজের খোসায় উনুনের ছাইতে ভর্তি হয়ে আছে—তলায় কোথাও যে দোমড়ানো মোচড়ানো পোস্টকার্ড-খানা পড়ে আছে কিনা—তা দেখার আর উপায় নেই।···

যেমন নিঃশব্দে নেমেছিলেন তেমনি নিঃশব্দেই ওপরে উঠে আসেন আবার।

নিঃশব্দেই দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়েন।

ওপাশের খাটিয়াতে অবিনাশবাবু গাঢ় ঘুমে অচেতন, স্ত্রীর এই আসা বা যাওয়ার কিছুই টের পান না।

সেই অজস্র ভুল বানান আর মিশ্রক্রিয়াপদে পূর্ণ চিঠিটা নিরুত্তরিতই থেকে যায়।···

কেবল, সেদিন ও তার পরের বহু দিন ও বহু রাত্রি পর্যন্ত আরতিমঞ্জরীর চোখে ঘুম ও মনে প্রশান্তি ফিরে আসে না।

এই- প্রশ্ন মনে হয় তাঁর—এ জীবনে কিছু পাওয়া বাকী রয়ে গেল, আর সেটা খুব তুচ্ছ কিছু নয়।

মনে হয়—কে জানে এই বিচিত্র উপমাটাই বার বার মনে আসে কেন—সারা জীবন তিনি যেন একটা মহার্ঘ্য হোটেলে বাস ক'রে গেলেন, গৃহসুখ যাকে বলে—তা তাঁর মিলল না।

এই-ই প্রথম সন্দেহ হয় যে—ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্যে কোন বৈচিত্র্য নেই, জীবনে এসবের মূল্যই সর্বাধিক নয়। মনে হয় তাঁর—দরিদ্রের সামান্য গৃহে প্রাত্যহিক জীবনের যে দুঃখ-সংঘাত, তারও একটা স্বাদ আছে, সে স্বাদটা ইহজন্মে তাঁর পাওয়া হ'ল না। তাতে তিনি বঞ্চিত রয়ে গেলেন।

এমন কি ঐ যে হতভাগ্য লোকটা একটা জীবন দু হাতে ছড়িয়ে বিলিয়ে নষ্ট করল, সেও যা পেল তা তিনি কোনদিন পান নি, পাবেনও না। অনেক কিছু পেয়েছেন তিনি—তবু, এই অপূর্ণতাটুকুই বা অস্বীকার করবেন কেমন ক'রে?

অসূয়া

ব্যাপারটা বুঝি একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গিয়েছিল কাল ; কিন্তু কাল রাত্রে অতটা বুঝতে পারেন নি। বোঝবার অবস্থা ছিল না। এখনও ঠিক নেই। তাই পণ্ডিতের কথাগুলোর গূঢ়ার্থ বা ব্যঙ্গার্থ বুঝতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। অনেকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। শ্রুতিধর তিনি, দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন নেই—বুঝতেই সময় লাগছে এই যা। সাবধানে মনে মনে কথাগুলো স্মরণ করছেন। আপাত-নিরীহ কথাগুলির মধ্যে অন্তরের 'ঝালটা' চাপা থাকে নি—সেই বিষটাই কিসের এবং কেন, মনে করার চেষ্টা করছেন শুধু।

আসলে মন যে মাধুর্যরসে ডুব দিয়েছিল কাল, মন-মধুপ তাঁর যে মধুতে অবগাহন করেছিল, সেই মধুর নেশাটাই এখনও কাটে নি। এ নেশা তাঁর নতুন নয়, বস্তুত এই নেশাতেই তো মশগুল হয়ে থাকেন আজকাল অহোরাত্র—তবু কালকের নেশা একটু স্বতন্ত্র রকমের, এ মধু আরও মধুর, আরও মাদকতাময়। তিনি নিজেই বলেন তাঁর ভক্তদের, পার্ষদদের প্রায়ই বলেন—'এ পৃথিবীর এ জীবনের যা কিছু শ্রেয় যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু জ্যোতির্ময়—তার মিলিত সরোবরের সর্বশ্রেষ্ঠ শতদল হ'ল কৃষ্ণনাম, আর সেই শতদলের মধু হ'ল তাঁর প্রেম। সেই প্রেমে ডুব না দিতে পারলে এ জীবনের সার্থকতা কি? সর্বাধিক যা প্রেয়, সবচেয়ে যা ঈপ্সার বস্তু তাতেই তো বঞ্চিত হয়ে রইলে?'

শিক্ষা দিয়েছেন ঠিকই, প্রত্যহই দেন, কিন্তু কাল প্রথম মনে হ'ল এতকাল তিনিও বঞ্চিত ছিলেন। যাকে মধু বলে ভেবে এসেছেন সে গুড় ছাড়া কিছু নয়। আসল মধুর আস্বাদন হয়েছে কাল। আর সে আস্বাদ এখনও মনের রসনায় লেগে

আছে, তার নেশা তার ঘোর এখনও সকল ইন্দ্রিয়কে অবশ ক'রে সকল চৈতন্যকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে বলেই এই নিতান্ত স্থূল বাস্তব কথাগুলো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে। ঈষৎ বুঝি রূঢ় এবং কর্কশও শোনাচ্ছে কথাগুলো। মনের পর্দায় বড় সজোরে আঘাত করেছে। যা দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত ঐশ্বর্য—তাকে পথের ধুলোয় ফেলে কাদা মাখিয়েছে পণ্ডিত, মাখাচ্ছে এখনও।

অনেকক্ষণ থমকে থেমে রইলেন চৈতন্য ভারতী। মনে মনে কথাগুলোর বহুদূরপ্রসারী অর্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'কী বললে, আর একবার বলো তো দামোদর।'

অখিল ধর্মশাস্ত্র যাঁর কণ্ঠাগ্রে—একবার মাত্র শুনলেই সমস্ত কথা যাঁর মুখস্থ হয়ে যায়, তাঁর মুখে এ কী অস্বাভাবিক অনুরোধ! দামোদর যদি কিছুমাত্র প্রকৃতিস্থ বা স্বরূপে থাকত তা হলে এতেই চৈতন্য হ'ত তার। কিন্তু সে তখন কালীয় নাগের মতোই নিজের বিষে নিজে জ্বলছে, এই সামান্য মৃদু প্রশ্নের অন্তরালে কী মর্মবেদনা থাকতে পারে, একবারও মাথাতে গেল না তার। সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'বলছি যে প্রভুর সুনাম এবার খুব বাড়বে, দিগদিগন্তে আরও জোর ছড়িয়ে পড়বে তাঁর সন্ন্যাসের মহিমা। এই—আর কি বলব!'

নেংড়ানো বহির্বাসখানা আরও জোরে নেংড়াবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে উত্তর দিল পণ্ডিত। তারপর বারকতক সেটা ঝেড়ে নিয়ে সামনের দড়িটাতে টাঙিয়ে দিল শুখোতে। মনে শান্তি নেই তার—তা দেখলেই বোঝা যায়, যে কাজ করছে তাতেও মন নেই। বিষ সঞ্চিত হয়েছে বহু দিন ধরে, তিলে তিলে—এখন তা উদ্গীরণের সময়, একসঙ্গে সবটা বেরিয়ে আসতে চাইছে, আর কোন হিতাহিত বা লঘু-গুরু বিবেচনা রাখতে দিচ্ছে না। হিতাহিত বিবেচনা বা এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার সম্পর্কজ্ঞান রাখতে দিচ্ছে না!

আরও একটু চুপ ক'রে রইলেন চৈতন্য। সে চুপ ক'রে থাকা কোন অপরাধ-বোধে নয়, বা কোন সংকোচেও নয়। আসলে আত্মদমন করতে লাগলেন। সব রিপুকে কঠোর হস্তে দমন করেছেন তিনি শুধু এই দ্বিতীয় রিপু ক্রোধটাকেই এখনও নির্বীর্য করতে পারছেন না। ঈশ্বর তাঁকে পুরুষসিংহ করে পাঠিয়েছেন মর্ত্যে, কান্তাপ্রেমের মহিমা আরও বর্ধন করতে বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহই শুধু দেন নি, সিংহের হুঙ্কার এবং উষ্মাও দিয়েছেন। সেটা এখনও একেবারে চিত্তবিলীন করতে পারেন নি, কখনও কখনও সে তাঁর প্রভু হয়ে ওঠে।

ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, আবার মিলিয়ে গেল সে কুঞ্চন। মনের ও মুখের প্রশান্তি ফিরে পেলেন। একটু বুঝি ক্ষীণ হাসিও দেখা দিল মুখে। তারপর তেমনি ঠাণ্ডা মেজাজেই প্রশ্ন করলেন, 'অর্থাৎ নিন্দা হবে খুব—কিন্তু কারণটা কি জানতে পারি গোসাঁই? হঠাৎ এমন কি গর্হিত কুকর্ম করলুম?'

'ঐ যে—ঐ ছোঁড়াটা—ঐ মধুসূদন, ওকে নিয়ে যা বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন তার কতদূর কি কদর্থ হতে পারে তা ভেবে দেখেছেন কি?' সমুদ্রের ঢেউ-এর

মতোই সগর্জনে যেন আছড়ে পড়ে কথাগুলি।

'না, তা দেখি নি। ছেলেমানুষ, বালক—নারায়ণ। আমাকে ভালবাসে, আমাকে না দেখে থাকতে পারে না, বারে বারে ছুটে আসে। সে তো অমন অনেকেই আসে, রঘুনাথও তো সব ফেলে সব বাধা সব বন্ধন ছিন্ন ক'রে ছুটে এসেছে এর আগে, কৈ তখন তো আপত্তি করো নি!' আস্তে আস্তে বললেন সন্ন্যাসী, 'পুত্রের মতোই বাৎসল্যরসের উদ্রেক হয় যাদের দেখলে, যারা ভালবাসে, সেবা করতে চায়—ভক্ত যারা—তাদের তাড়াবই বা কোন প্রাণে, আর কেনই বা তাড়াব।……তাও, তুমি তো চেষ্টাও কম করো নি; আমি সবই লক্ষ্য করেছি, বাধাও দিই নি কিছু। কিন্তু পারলে কি তাড়াতে? তুমি যা পারলে না আমি তা পারব কেমন করে পণ্ডিত?'

'রঘুনাথে আর মধুসূদনে ঢের তফাৎ প্রভু'—এবার সম্পর্ক এবং মানুষটার প্রাপ্য মর্যাদার কথা মনে পড়েছে দামোদরের—'যদি মধুসূদনকে প্রশ্রয় দেবেন তো ছোট হরিদাসকে ত্যাগ করলেন কোন্ অপরাধে? সে তো সাধারণ কোন প্রকৃতি নয়, মস্তবড় এক সাধিকার কাছে গিয়েছিল আপনার জন্যই চাট্টি চাল ভিক্ষা করতে। সেই অপরাধে ইহজীবনে আর তার মুখ দেখলেন না। আর এই মধুসূদনের মা, অল্পবয়সী পরমাসুন্দরী বিধবা যুবতী, আপনিও বয়সে যুবা, কন্দর্পকান্তি পুরুষ—ঐ বিধবার ছেলের সঙ্গে যদি এত মাখামাখি করেন—আর তাতে যদি কু-লোকে কোন কদর্য ইঙ্গিত করে, খুব একটা দোষ দিতে পারেন কি? যে কেউ যে-কোন দিনই কথাটা তুলতে পারে যে, ছেলেটা উপলক্ষ—লক্ষ্য ঐ মেয়েটা!'

যেন কঠোর এক মর্মভেদী আঘাতে শিউরে উঠলেন চৈতন্য ভারতী। কে যেন তপ্ত শলাকা পুরে দিল তাঁর কানে, অস্ফুট একটা আর্তনাদ ক'রে দু'হাতে কান ঢাকলেন তিনি। কেঁপে উঠল তাঁর সর্বাঙ্গ, কাঁপতেই থাকল কিছুক্ষণ ধরে। শুভ্র সুগৌরকান্তি দেখতে দেখতে অঙ্গারবর্ণ ধারণ করল। সেদিকে চেয়ে, আঘাতটা কি গুরুতর হয়েছে, সম্পর্কের সীমা যে লঙ্ঘন ক'রে গিয়েছেন একেবারে, সেই সঙ্গে ধৃষ্টতার সীমাও—এই প্রথম বুঝতে পেরে লজ্জায় আর অনুশোচনায় মাথা নামালেন দামোদর।

কিন্তু অমানুষিক মনোবলে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ ক'রে, মনে মনে তাঁর দয়িতের প্রসন্ন মধুর মূর্তি ধ্যান ক'রে সে আঘাতও সামলে নিলেন চৈতন্য ভারতী। ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এই জন্যই তোমাকে এত পছন্দ করি পণ্ডিত! তুমি ছাড়া এত স্পষ্ট, এত রূঢ় সত্য আর কেউ বলতে পারত না। তুমি আমাকে বহুবারই বহু শিক্ষা দিয়েছ, আমার গুরুর কাজ করেছ বার-বার। তোমাকে আমি নমস্কার করি। বহুবারের মতো এবারও এক শোচনীয় পরিণাম থেকে রক্ষা করলে আমাকে। ধন্য ধন্য!'

এই বলে, সত্যসত্যই দুহাত তুলে নমস্কার করলেন চৈতন্য ভারতী তাঁর এই

প্রধান ভক্ত ও সেবক, নিত্যসহচরকে। কিন্তু তার পর আর দাঁড়ালেন না, স্নানার্থে দ্রুত সমুদ্র-উদ্দেশে যাত্রা করলেন। অন্য দিন পণ্ডিত যায় সঙ্গে—অন্তত প্রায়ই যায়, আজ আর তাকে যেতে বললেন না, সেও—কে জানে কেন—সাহস করল না যেতে।

কথাগুলোতে কোন খাদ নেই, এতকালের এত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় এটুকু জেনেছে সে তার প্রভুকে—কিন্তু তবে সংসারাশ্রমের নামে ডাকলেন কেন হঠাৎ আজ, এতদিন পরে? তবে কি তার সন্ন্যাসেও কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি ঘটেছে? সন্ন্যাসীর যা উচিত নয় এমন কোন আচরণ ক'রে ফেলেছে সে হঠাৎ?

সমুদ্রতীরে পেঁছিেও, তখনই জলে নামতে পারলেন না চৈতন্য ভারতী। আজ এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে অনেক, অন্যদিন এমন সময়ে, এমন সময় কেন—এর অনেক আগেই সূর্য অনুদয়ে স্নান সেরে নিজের কুটিরীতে গিয়ে প্রবেশ করেন, পূর্বাকাশ লাল হয়ে ওঠবার ঢের আগে। লোকজনের যাতায়াত শুরু হয়ে গেলে আর ভাল লাগে না আসতে। কিন্তু আজ দেরি হয়ে গেছে। পূর্বাকাশ বেশ লাল হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই, খুব তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ফিরতে না পারলে স্নানার্থী বহু ভক্তই বেরিয়ে পড়বেন, আর তাঁদের এড়াতেও পারবেন না। সেই বিরক্তিকর প্রণামের ঘটা, সেই অকারণ কুশল প্রশ্ন।

তা হোক। তবু নির্জন বেলাভূমির বালুকারাশির ওপর স্থির হয়েই বসলেন। মনটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখা দরকার। মন এবং শরীর দুই-ই ক্লেদাক্ত লাগছে, গা ঘিন-ঘিন করছে ঠিকই—কিন্তু কোন ব্যাপারেই ধামাচাপা দেওয়ার পক্ষপাতী নন তিনি। বিশেষ, পরকে যদি বা ক্ষমা করেন, নিজেকে ক্ষমা করার অভ্যাস নেই তাঁর। মনের অগোচর পাপ নেই—প্রশংসাচ্ছলে প্রচ্ছন্ন একটু তিরস্কারই ক'রে এসেছেন পণ্ডিতকে, যে পণ্ডিত তাঁর ছায়া-সহচর, সেবক শুধু নয়, সত্যকারের বন্ধু এবং সৎপরামর্শদাতা। কথাটা যত রূঢ় আর কদর্যভাবেই বলে থাক, সেটা বিচার না ক'রে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।...

ঘটনাটার সূত্রপাত কবে হয়েছিল মনে করার চেষ্টা করেন। মনে পড়েও। মাঘী পূর্ণিমার দিন, আজ থেকে কিছু কম চার মাস আগে। হঠাৎই এসেছিল ছেলেটি তাঁর সামনে। গজোদ্ধার বেশ সেদিন জগন্নাথ মহাপ্রভুর, তখনও সাজানোর দেরি ছিল, তিনি সপার্ষদ কীর্তন গাইছিলেন যথারীতি বাইরের প্রাঙ্গণে। লোকে লোকারণ্য, তারই মধ্যে কখন সবাইকে ঠেলে সরিয়ে ভক্তদের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে এমন কি পণ্ডিত ও গোবিন্দের কড়া নজর এড়িয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর, চিত্রার্পিতের মতো এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল তাঁর মুখের দিকে—অনিমেষ নয়নে। তিনিও দেখেছিলেন, প্রথমটা দেখেই ছিলেন শুধু, অতক্ষণের উদ্দণ্ড নৃত্য আর কীর্তনের ক্লান্তিতে মাঘ মাসেও অবিরল স্বেদধারা নেমেছিল ললাট বেয়ে, সে লোনা জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, তা ছাড়া প্রেমাশ্রু তো ছিলই—নামের নেশাও বোধ করি কাটে নি তখনও—সুতরাং চোখ দেখলেও মন লক্ষ্য করে নি অনেকক্ষণ।

যখন লক্ষ্য করলেন, তখন মনে পড়ল অনেকক্ষণ থেকেই মুগ্ধ বিহ্বল নয়নে চেয়ে আছে ছেলেটি, পলক পড়ছে না ওর চোখে।

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনিও।

বা, বা, এ কে রে, কাদের ছেলে! এ যে তাঁর প্রাণের ঠাকুর কিশোর-বেশে দেখা দিতে এসেছেন তাঁকে। তবে কি তাঁর সাধনার সিদ্ধি মিলল এত-দিনে, সে সিদ্ধি কি এইভাবে বাৎসল্যের রূপ ধরে নিজে থেকে এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে?

বারো তেরো বছরের ঋজু অথচ নবনীতকান্তি ছেলে একটি, গৌরবর্ণ নয় ঠিক—তবে অতি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, স্নিগ্ধ উজ্জ্বল, তা তাঁর প্রাণের ঠাকুরেরও তো এই বর্ণ,—নাক মুখ চিবুক কপোল সুঠাম সুডৌল—যেন কোন শিল্পীর কল্পনা মূর্তি-পরিগ্রহ করেছে তাঁর সামনে। সুন্দর, অতিসুন্দর। হাত দুটি, দাঁড়াবার ভঙ্গীটি পর্যন্ত মনোহারী, সুকুমার। ব্রাহ্মণ-কুমার, বুকের উপর উপবীতটি পড়ে রয়েছে, তারও জ্যোতি যেন খুলেছে ঐ কণ্ঠে ও বক্ষে। এখনও পাঠ সমাপ্ত হয় নি —কানে কুণ্ডল, পরনে কাষায় বস্ত্র।

নিজের অজ্ঞাতসারেই দুই বাহু বিস্তার ক'রে এগিয়ে গিয়েছিলেন তার দিকে, ইচ্ছা ছিল বুকে তুলে নেবেন—কিন্তু তার আগেই ছেলেটি তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়েছিল, দুহাতে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে উত্তরীয় দিয়ে মুছিয়ে নিয়েছিল তাঁর দুই পায়ের শ্রম-জল।

কিন্তু সেও ক' মুহূর্তের জন্যই বা। সঙ্গে সঙ্গে বহু পরুষ-কঠিন হাত ঠেলে সরিয়ে নিয়েছিল ছেলেটাকে, কোথায় সে ভীড়ে ছিটকে পড়েছিল, সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে আর তাকে দেখতে পান নি। অবশ্য আর বিশেষ মনেও ছিল না, কারণ প্রায় তখনই বেশ সম্পূর্ণ হয়েছ—দর্শন খুলে গিয়েছ শ্রীমন্দিরের। প্রেমাবেশে সেইদিকেই ছুটে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি ভুললেও ছেলেটি ভোলে নি। পরের দিন ভোরবেলা এসেছিল তাঁর কাছে। তিলকসেবা ইত্যাদি শেষ ক'রে তুলসীবৃক্ষে জল দিয়ে তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়েছিলেন—পণ্ডিত আর গোবিন্দ দুই সেবকেই নিজেদের জপে নিমগ্ন, সেই অবসরে কখন সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ভিতরের প্রাঙ্গণে এসে পৌঁচেছে। অথবা ব্রহ্মচারী সুকুমার বালক দেখেই কেউ বাধা দেয় নি।

সেদিনও ছেলেটিকে দেখে বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠেছিল তাঁর হর্ষে—প্রভু-মিলনের সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত হয়েছিল, পুলক অশ্রুস্বেদকম্প—ক্ষণে ক্ষণে ভাবান্তর হয়েছিল তাঁর। তবে কি তাঁর প্রাণের ঠাকুরের উদয় হয়েছে কৈশোর-লীলায়, তবে কি যমুনাপুলিনের তীরে তীরে শ্রীদাম-সুদাম-সুবলকে নিয়ে বাঁশী বাজিয়ে গোধন নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন আবার?

পুলক হর্ষ—সেই সঙ্গে বুঝি আশাভঙ্গের বেদনাও।

অস্ফুটস্বরে বলেছিলেন, 'কিন্তু—কিন্তু আমি যে তোমাকে দয়িত, কান্তরূপে চেয়েছিলুম ঠাকুর!'

ছেলেটি বুঝতে পারে নি সে কথা, বোঝবার কথাও নয়। সেদিনও সে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে পা দুটি সবলে বুকে চেপে ধরে বলেছিল, 'আমি কাল সারারাত ঘুমোতে পারি নি গোঁসাই—তোমাকে না দেখে থাকতে পারি নি, তাই এমন ক'রে ছুটে এসেছি। তুমি রাগ করলে না তো?'

স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল ঠিকই, সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রাগ করেন নি। ঐ ছেলের ওপর কি কেউ রাগ করতে পারে। বরং জোর ক'রে পা থেকে তুলে আদর ক'রে বুকে টেনে নিয়েছিলেন, নাম-ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

নাম শুনেছিলেন মধুসূদন, বাঁশীর মতো সুমিষ্টকণ্ঠে নামটি উচ্চারিত হ'তে দুই কান জুড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর। ব্রাহ্মণ সন্তান, নিকটেই বাড়ি। শৈশবে পিতৃহীন, বিধবা বেওয়ার একমাত্র সন্তান।

এই বয়সেই পিতৃহীন শুনে আরও স্নেহার্দ্র হয়ে উঠেছিলেন। মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন, 'রাগ করি নি বাবা, তবে আমি সন্ন্যাসী, তুমি গৃহীর সন্তান। বিশেষ ক'রে তোমার ওপর তোমার বিধবা মার অনেক আশা-ভরসা—তুমি আমার কাছে আর এমনভাবে এসো না। আসতে নেই। তাছাড়া আমাদের এতে সময় নষ্টও হয় তো। তুমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে উঠে মার দুঃখ দূর করো—তবে ভগবানকে ভুলো না, অবসর সময়ে কৃষ্ণনাম করো, তা'হলেই আমার প্রীতি লাভ করতে পারবে।'

কিন্তু ছেলেটি শোনে নি সে কথা। সে আবারও এসেছিল। বোধ করি প্রত্যহই আসে, অহোরাত্র আসতে চেষ্টা করে, কাছে থাকতে চায় তাঁর। কিন্তু প্রথম দিনের বিবরণ শুনে চৈতন্যের সেবকরাও সতর্ক হয়ে উঠেছে, বিশেষ ক'রে পণ্ডিত। কড়া-পাহারা রেখেছে সে। ত্রিসীমানায় দেখলেই বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাড়িয়ে দেয়। 'ধ্যানে আছেন' 'জপে আছেন' 'এখন বিঘ্ন করো না' 'এসব উনি পছন্দ করেন না—বিরক্ত হন' ইত্যাদি বলে নিবৃত্ত করে। কিন্তু ছেলেটি সে তিরস্কার, সে অনাদর গায়ে মাখে না, বোধহয় লজ্জা ঘৃণা কিছুই নেই তার। দিনরাত অনন্যমনা হয়ে ফাঁক খোঁজে আর ফাঁক পেলেই তাঁর কাছে এসে প্রণাম করে, পায়ের কাছে বসে, কখনও উনি শুয়ে থাকলে পা দুটি কোলে বা বুকে তুলে নেয়।

রাগ করতে পারেন না সন্ন্যাসী, বিরক্তও হ'তে পারেন না। কে জানে কেন—একে দেখেই সেই বৃন্দাবনের চিরকিশোর গোপালকে মনে পড়ে যায়, অপূর্ব এক স্নেহরসে বিভোর হয়ে যান। এ রকম হয়েছিল আরও একবার, এই কিছুদিন আগেই—এক কিশোর রাজপুত্রকে দেখে কৃষ্ণস্মৃতি জেগে ছিল তাঁর। তবে সে এর থেকে বয়সে কিছু বড়ই হবে, ষোল-সতেরো বছর বয়স—ঠিক যেন তাঁর ধ্যানের গোপীপ্রাণেশ্বর রাধাকান্ত মুরলীমনোহর। আর কিছু মনে ছিল না, রাজা বা রাজ-বংশীয় যে কারও মুখ দেখতে চান নি, বিষয়ী লোকের সংসর্গ যে বিষ—তা একবারও মনে পড়ে নি। ছুটে গিয়ে বুকে চেপে ধরেছিলেন, চিরবিরহী হিয়া তৃপ্ত হয়েছিল

ক্ষণিকের জন্য। ভ্রম ? তা এমন ভ্রম হ'লেই বা দোষ কি, তাঁর অনুভূতিটা তো সত্য।*

কিন্তু এ ভ্রম নয়, ক্ষণেকের মোহও নয়। ভাল লাগে তাঁর। বাল-গোপালের কথা মনে পড়ে যায়। এই বয়সে পীতধড়া মোহন-চূড়া পরে কালিন্দীর কূলে কূলে যখন ধেনু চরাতেন আর বয়স্যদের সঙ্গে খেলা করতেন—তখন এমনিই দেখাত তাঁকে। বার বার তাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতেন। শুধু যদি ছেলেটা অত ভক্তি না করত, যদি তাঁর কাছে আবদার করত, সেবা চাইত, জোর করত—তা'হলে আর কোন বাধা ছিল না সেই বাল্যলীলা রসাস্বাদনে। কিন্তু মধুসূদন বার বার প্রণাম ক'রে, হাতজোড় ক'রে ভক্তিবিহ্বল চোখে ভয়ে ভয়ে চায়, অতি দীন ভিক্ষুকের মতো পদসেবা করার অধিকার প্রার্থনা করে। কী যে লোভ ওর—তাঁর এই দুটি পায়ের ওপর। রাগ ক'রে তিরস্কার ক'রে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে কিছুতে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেন না। তিনি যে সন্ন্যাসী, তাঁর যে কারও সেবা নিতে নেই—এ কথাটা কিছুতে বোঝাতে পারেন না ওকে। আর ওর সভয় সসঙ্কোচ দীন ভাবেই তাঁর ভুল ভেঙে যায় বার বার। লীলারসাস্বাদে ব্যাঘাত ঘটে।

তবু জোর ক'রে তাড়াতে পারেন না। মানুষ বটে, তেমনি ভক্তও। নিষ্পাপ বালক—ওর ভক্তিতে প্রেমে কোন খাদ নেই, ওর দৃষ্টিতে যে প্রেম-ভক্তি তা যেমন বিশুদ্ধ তেমনি নির্মল। ভাল লাগে তাঁর, আদর করেন তাই, প্রশ্রয় দেন, আশীর্বাদ করেন—'জগন্নাথে তোমার অচলা মতি হোক।' কোনদিন যদি ঘরে কোন সামান্য প্রসাদ এসে যায় তো তাও হাতে দেন একটু-আধটু। আর একটুতেই যেন মধুসূদন কৃতার্থ হয়ে যায়। এদের তাড়না কি তর্জন গায়ে মাখে না একটুও। প্রহারও যে ভাগ্যে না জোটে এমন নয়—কিন্তু সে তথ্যটুকু সযত্নে চেপে যায় সে চৈতন্য ভারতীর কাছে। একদিন তাঁকে ক্রুদ্ধ হ'তে দেখেছিল। ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে হুঙ্কার শুনে ঃ সিংহনাদ কেমন জানে না—বজ্র গর্জনের মতো মনে হয়েছিল তার। এটা সে বুঝেছে, ভক্তরা যা করে তা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতি-প্রেমবশতই করে—তার জন্য তিরস্কারের কারণ হওয়া ঠিক নয়।

এটুকু সে এই বয়সেই কেমন ক'রে যেন বুঝতে পেরেছিল যে তার প্রতি কোন

---

* "সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল বরণ।
কৈশোর বয়স দীর্ঘ-চপল-নয়ন ॥
পীতাম্বর ধড়া, অঙ্গে রত্ন আভরণ।
কৃষ্ণ স্মরণের তিঁহো হৈলা উদ্দীপণ ॥
তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণ স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিলা ॥......
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মৃতি হয় সর্বজনে ॥
(চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।)

নির্যাতন সন্ন্যাসী সহ্য করবেন না। মানুষের শিশু আর বনের পশু—সত্যকারের আদর বুঝতে কখনও ভুল করে না।

এইভাবেই চলছিল, হঠাৎ কাল ছেলেটা সব গোলমাল ক'রে দিল। কাল রাত্রে চটক পাহাড় থেকে কীর্তন সেরে নিজের গম্ভীরায় ফিরে দেখেন—মধুসূদন কখন চুপি চুপি সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে এককোণে ঢুকে বসে আছে, একেবারে কোণের ছায়ার সঙ্গে মিশে।

ক্লান্ত সন্ন্যাসী বিরক্ত বোধ করেছিলেন। ঈষৎ রূঢ়কণ্ঠেই বলেছিলেন, 'এ কি, তুই এত রাত্রে এখানে কেন? যা পালা বলছি!'

একে তো বহু দুঃখে অনেক কসরৎ ক'রে ঢুকতে হয়েছে—তায় এই সম্ভাষণ, মুখ শুকিয়ে উঠেছিল মধুসূদনের, চোখে জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু সে জল তখন পড়তে দেয় নি সে, শুধু বলেছিল, 'আজ তোমার খুব কষ্ট হয়েছে—আমি দেখেছি, আজ আমাকে একটু কাছে থেকে সেবা করতে দাও।'

'রাত্রে আমার কাছে কাউকে থাকতে দিই না মধুসূদন—দামোদর, গোবিন্দ, ওরাও কেউ থাকে না—তা কি শোন নি। যাও, বাড়ি যাও। আর সেবা, দেহের সেবা আমি নিই না, ওতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। বৈরাগী সন্ন্যাসীর এ দেহটার কথা চিন্তা করতে নেই, একে আরাম দিতে নেই। পারো তো ভগবানের সেবা করো, সেই আমার সেবা করা হবে!'

'তাই তো আমি চাই। তুমিই আমার ভগবান, আমার গুরু, আমার গোসাঁই—সব।'

'ছিঃ, মানুষকে ও কথা বলতে নেই।'

'মানুষ কে বলে। সবাই তো বলে তুমি ভগবান। তুমি তো এত কৃষ্ণ কৃষ্ণ করো, তিনিও তো মানুষ হয়ে জন্মেছিলেন!'

'তুমি এখন যাও মধুসূদন—আমি তোমাকে সে সব কথা বোঝাতে পারব না—এখন আমি ক্লান্ত!' বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই বলেন চৈতন্য।

এবার মধুসূদনের চোখে জল এসে যায়। সে হঠাৎ ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে মাথা খোঁড়ে ওঁর সামনে পাথরের ওপর। কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'মানুষ তো ভিখিরীকে ভিক্ষেও দেয় কত কি জিনিস—তুমি আমাকে এটুকু দিতে পারছ না। তুমি তো ভক্তদের সব আশা পূর্ণ করো শুনেছি—তবে আমাকে এমন করো কেন—কেন?'

'আরে আরে, করে কি, করে কি ছেলেটা!' ত্রস্তে-ব্যস্তে ছেলেটাকে কোলে তুলে নেন সন্ন্যাসী, নিজের সামান্য বহির্বাস টানাটানি ক'রে ওর চোখের জল মুছিয়ে দেন। কোমল কণ্ঠে বলেন, 'এই দ্যাখো পাগল ছেলে—এতে কাঁদবার কি আছে। এসব করতে নেই তাই বলেছি।'

আরও যেন আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে মধুসূদন, 'না, তুমি আমাকে বড় হেনস্থা করো, ঘেন্না করো আমাকে। সবাইকে সব দিতে পারো, শুনেছি তোমার কাছে জানালে কারও কোন মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ থাকে না। শুধু আমার এই সামান্য সাধটা

মেটাতেই তোমার যত কষ্ট হয়।'

'তা নয়, তা নয় রে পাগল। যদি সত্যিই তোর অন্য কোন সাধ হ'ত তো মেটাতুম। এ যে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমারই সাধ মেটানো একরকম। এ যে আমার আরামের ব্যবস্থা। লোকে কি বলবে?'

'বলুক গে। আমার মুখ চেয়ে এটুকু সহ্য করতে পারবে না? ভগবান ভক্তদের জন্য কত কী সহ্য করেন বলো তো। তুমিই তো কত গল্প করো ওদের কাছে, আমি কি শুনি না।'

অগত্যা হাল ছাড়তে হয় তাঁকে। এ পাগলকে তিনি কি বোঝাবেন। ওর ঐ সুন্দর নিষ্কলঙ্ক ললাটে এখনই কঠিন আঘাতের ছাপ পড়ে গেছে, আয়ত সুন্দর চোখ দুটিতে বেদনা ও অশ্রুর লালিমা ফুটে উঠেছে। বুঝি এই চোখের জল দেখেই এই ম্লান মুখের দিকে চেয়েই মা যশোদা কোন দিন শাসন করতে পারেন নি তাঁর নীলমণিকে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়েন তিনি। শুধু বলেন, 'মনে থাকে যেন—এই শেষ। আর কোনদিন এমন আবদার ক'রো না মানিক।'

এবার আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল মধুসূদনের। সে সাগ্রহে সেই ওর কাছে পরম লোভের বস্তু, ঈপ্সিত পা দুখানি সযত্নে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে দুটি পায়ে দুটি চুমো খেয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে পদসেবা করতে শুরু করেছিল।

সারাদিনের পরিক্রমা আর নৃত্যের ফলে সত্যিই বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল, নরম কচি হাতের এই সেবায় দু'চোখ বুজে এল সন্ন্যাসীর দেখতে দেখতে। অবিরাম নাম জপ করেন তিনি যতক্ষণ জেগে থাকেন, সে ঠোঁট দুটি নড়তে নড়তে বন্ধ হয়ে গেল—প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন তা তিনি জানেন না। তবে বেশীক্ষণ নয়। পাঁচ-ছ দণ্ডের বেশী ঘুমোন না কোনদিনই, উঠে নাম জপ করতে বসেন। গভীর রাত্রে মন অন্তর্মুখী হয়, ভগবানের নাম করার এই-ই প্রকৃষ্ট অবসর। তা'ছাড়া মূল্যবান মানব জন্ম যদি ঘুমিয়েই কাটাবেন তো কাজ করবেন কখন? আজও ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন, পায়ে একটা প্রবল বাধা অনুভব করলেন, ওঠা হল না। বিস্মিত হলেন তিনি, কঠোর শ্রমের পর অল্পক্ষণের ঘুম—তাই গাঢ় নিদ্রা হয় তাঁর, সে নিদ্রার অবসরে সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন তিনি, আবার শুয়ে পড়ে স্থান কাল অর্থাৎ তিনি কোথায় কী ভাবে আছেন, রাত্রে শুতে যাবার সময়কার ঘটনা কী ঘটেছিল—মনে করার চেষ্টা করলেন। কয়েক বিপল সময় কাটতে মনে পড়ল ও কিছু পূর্বের বিহ্বলতা কেটে গেল সম্পূর্ণ। তখন আস্তে আস্তে একটি হাতের কনুইতে ভর দিয়ে খানিকটা উঠে বাধাটা কোথায় এবং কিসের দেখতে চেষ্টা করলেন।

সামান্য একটি প্রদীপ জ্বলছিল ঘরের কোণে—সেটি রাত্রে আর নেভানো

হয়নি, এখনও জ্বলছে। কিন্তু প্রদীপ সামান্য হলেও প্রায়-গবাক্ষহীন ঘরে তার নিবাত-নিষ্কম্প শিখা থেকেই যথেষ্ট আলো পাওয়া যাচ্ছিল, তাতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার চোখে পড়ল। ওঁর পা টিপতে টিপতে উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখেই হোক বা নিজের দৈহিক ক্লান্তি ও বালকের পক্ষে স্বাভাবিক তন্দ্রালুতার কারণেই হোক—মধুসূদন সেই পাথরের মেঝেতেই—তাঁর পা দুটিকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অকস্মাৎ মনের মধ্যে একটা প্রবল বাৎসল্য অনুভব করলেন চৈতন্য ভারতী।

আহা ছেলেমানুষ—না জানি কী সুগভীর শ্রান্তিতেই এভাবে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কত রাত অবধি জেগে তাঁর পা টিপেছে কে জানে। তিনি অতবড় মানুষটা আরাম খেতে খেতে ঘুমিয়েছেন, আর ঐ দুধের বালকটা জেগে বসে সেবা করেছে তাঁর। রাত্রে খাওয়াও হয়নি নিশ্চয়। কে আর সে খোঁজ করেছে, কে-ই বা খেতে দিয়েছে। ও যে এখানে আছে জানেই না তো কেউ। তাঁরই কথাটা মনে করা উচিত ছিল। কীর্তনের সময় নিশ্চয় ছেলেটাও চটক পাহাড়ে ছিল, নইলে তাঁর কষ্ট হয়েছে জানবে কি ক'রে। তখনই খোঁজ করা উচিত ছিল খাওয়ার কথা। স্বরূপের ভাঁড়ারে খোঁজ করলে হয়ত আজও দু-একটা ঝালের নাড়ু বেরোবে—গৌড়বঙ্গ থেকে আনা নাড়ু। ওগুলো খারাপ হয় না, বহুদিন থাকে। চাই কি জগন্নাথের প্রসাদী খয়েরচুরও দু-একটা থাকতে পারে।···ইস্, খুব অন্যায় হয়ে গেছে!

আস্তে আর একটু ওঠবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। অঘোরে ঘুমোচ্ছে, তবু বন্ধন এতটুকু শিথিল হয় নি, দুই হাত দিয়ে প্রাণপণে যেন আঁকড়ে ধরে আছে পা দুটো। আস্তে আস্তে গায়ে হাত দিলেন, না—জোর ক'রে না টানলে খোলা যাবে না বাহু-বন্ধন। যথার্থ প্রেমের বন্ধনই বুঝি এই। এইভাবে না বাঁধতে পারলে ভগবানকে বাঁধা যায় না।

ঘামছে ছেলেটা। বৈশাখ মাসের গরমে এই বন্ধ ঘরে তো ঘামবেই। তার ওপর প্রদীপ জ্বলছে একটা। এ তাঁরই সহ্য হয়, অপরে সইতে পারবে কেন। আত্মনিগ্রহ করবেন বলেই তো এই ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন। তবু তো শুকনো কলাবাসনার একটা যা হোক শয্যামতো আছে তাঁর—ছেলেটা একেবারেই কঠিন নিরাবরণ পাথরে পড়ে। কালো পাথরের ওপর সোনার তনু পড়ে আছে, যেন কালো দীঘির জলে স্বর্ণপদ্ম ফুটে আছে একটি—

এখন ওর হাত ছাড়িয়ে বাইরে গেলেই মধুসূদনও উঠে পড়বে। বেচারী বড় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছে—এটাও ঠিক। কী করবেন বুঝতে পারেন না সন্ন্যাসী। শেষে স্থির করেন ওকে ভাল ক'রে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে কিছু পরে নিজের কাজে মন দেবেন। শয্যা বলতে ওঁরই বা কি, উনিও মাটিতেই শুতেন, এখন নিতান্ত ভক্তদের নির্বন্ধাতিশয্যেই এইটুকু শয্যা স্বীকার করতে হয়েছে। দুখানি জীর্ণ বহির্বাসের খোলে শুকনো কলাপাতার গুঁড়ো। নখে ক'রে কলাপাতা চিরে

চিরে চিরে সরু ক'রে শুকানো হয়েছে। অবশ্য পাথরের তুলনায় নরম বৈকি।

চৈতন্য ভারতী ছেলেটিকে জোর ক'রে টেনে বিছানার ওপর নিয়ে এলেন। হাত ছাড়িয়ে নিতে রীতিমতো কষ্ট করতে হ'ল তাঁকে—তারপর তো সহজ, লঘুভার ঐটুকু ছেলে—ঘুমে সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে থাকলেও, কতটুকুই বা ওজন?

পা থেকে বাঁধন খোলবার সময় ছেলেটা জেগে উঠেছিল, তার বিহ্বল চোখে বুঝি একটা শঙ্কাও—ছোট ছেলেদের সবচেয়ে প্রিয় ও বহুদিনের ঈপ্সিত খেলনা হারাবার শঙ্কার মতোই—ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সে কয়েকটি অনুপল মাত্র। তার মধ্যেই সন্ন্যাসী কাছে টেনে নিয়েছেন তাকে, সঙ্কীর্ণ শয্যাতে ভাগ ক'রে শোওয়াতে একেবারে বুকের কাছেই টেনে আনতে হয়েছে। মধুসূদনের কাছে এ সুদুর্লভ সৌভাগ্য; তবে জাগ্রত অবস্থায় যা অবিশ্বাস্য মনে হয়—ঘুমের ঘোরে তা অতি সহজে মেনে নিতে পারে মানুষ। মধুসূদনও, যেন এই স্নেহ এবং আদর তার প্রাপ্য এইভাবেই চৈতন্য ভারতীর একটি হাতে মাথা রেখে তাঁকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে কোলের মধ্যে গুটি-সুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়ল আবার তৎক্ষণাৎ। শুধু তারই মধ্যে মুখে একটি অনির্বচনীয় তৃপ্তি ও সুখের দীপ্তি ফুটে উঠল, সেই সঙ্গে নির্ভরতারও। আর উপবাস-ক্লিষ্ট মুখে সেই দীপ্তিটুকু যেন একটা নূতনতর মহিমা ও শ্রী এনে দিল।

হে রাধে! হে জগবন্ধু মাধব! এ আবার কী নূতন লীলা তোমার! মনে মনে আকুলভাবে প্রশ্ন করতে থাকেন বার বার। কিন্তু জোর ক'রে তখনও ছাড়িয়ে উঠে পড়তে পারেন না। ওর ঘুমটা আর একটু গাঢ় হবার জন্য অপেক্ষা করেন। আর নিজের অনিচ্ছা ও অজ্ঞাতসারেই এই একেবারে নূতন অভিজ্ঞতাটুকু উপভোগ করতে থাকেন। নূতন এবং অনাস্বাদিত-পূর্ব অভিজ্ঞতা। ইতি-পূর্বে ভক্ত-আলিঙ্গনে, দেবদর্শনে হরিকথা শ্রবণে-কীর্তনে বহুবার পুলক সঞ্চার হয়েছে তাঁর দেহে, রোমাঞ্চ জেগেছে—স্বেদ-অশ্রু-কম্প দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে তো এমন নয়। এ আরও কিছু, অনেক বেশী কিছু। আঃ, ছেলেটি তাঁর বুকের কাছে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে এ এক কী ভাষার অতীত, কল্পনার অতীত, আনন্দ বোধ হ'ল তাঁর। সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল হর্ষে, প্রতিটি রোম কণ্টকিত হয়ে উঠল আনন্দে।

তবে কি, তবে কি—এই বাৎসল্য! একে কোলে পেয়ে কি তিনি পুত্রলাভের আনন্দই লাভ করলেন? এই জন্যই কি তবে গৃহীরা সন্তান সন্তান ক'রে পাগল হয়? 'পুত্র-গাত্রস্য সংস্পর্শ'—কালিদাস যাকে বলেছেন, এ কি তাই। তবে কি তিনি সন্ন্যাসীর যা একান্ত নিষিদ্ধ—সেই মায়াজাল সাধ ক'রে অঙ্গে জড়িয়ে নিজের সর্বনাশের আনন্দে নিজেই দিশাহারা হয়ে পড়ছেন!

কথাটা কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল ক্রোধ ও আত্মধিক্কারে মন ভরে গেল তাঁর। ক্রোধ তাঁর নিজের ওপর, আর এই ছেলেটার ওপরও। তিনি সরোষে ওর বাহুবন্ধন ছিন্ন ক'রে উঠে বসতে গেলেন।

আর সেই টানে ছেলেটির আবারও ঘুম ভাঙল।

এত কাছ থেকে কোন দিন তার আরাধ্যের, তার দেবতার মুখের দিকে চাইতে পারে নি মধুসূদন। সাহস বা কল্পনাও করেনি চাইবার। এমনভাবে বুকের এত কাছে আসতে পায় নি। এমনভাবে বুক দিয়ে অনুভব করতে পারবে তাঁকে—কোনদিন চিন্তাও করে নি। সুখে আশ্বাসে আবেশে সে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে হাসল। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে সে হাসি যেন কোন্ দেবদুর্লভ পুষ্পপরাগ-অঞ্জন লাগিয়ে দিয়ে গেল। হেসে হেসে সে আবারও চোখ বুজল, আরও নিবিড়-ভাবে ওঁকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল আবার!

সন্ন্যাসীর আর ওঠা হ'ল না।

প্রদীপের স্বল্প আলো, কিন্তু তাঁর পক্ষে তা-ই ঢের। তিনি নতুন চোখে দেখলেন ছেলেটিকে।

এ মোহ নয়, এ মায়া নয়। এই মুহূর্তে তাঁর ইষ্ট, তাঁর সর্বস্ব তাঁর প্রাণের কিশোরকেই দেখছেন তিনি।

কখনও কখনও, কোটিকল্পে হয়ত একদিন, ভক্তে আর ভগবানে এমন মিলন ঘটে। তাঁর অদৃষ্টে আজ সেই যোগ ঘটেছে।

সামান্য বাৎসল্যে, সামান্য মানবিক মায়ায় এ পুলক সঞ্চারিত হয় নি তাঁর দেহে। এটুকু জ্ঞান তখনও আছে তাঁর।

তিনি আরও ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন। সকালে বুঝি কে একটি তিলক এঁকে দিয়েছে ওর চারু ললাটে, ঘামে ভিজে গেলেও মুছে যায় নি একেবারে। তার মাঝ-খানে—দুই ভ্রূর মধ্যে বোধ করি কীর্তনের সময় কে দিয়েছে একটি চন্দনের ফোঁটা। গলাতে একটি মালাও আছে—হয়ত প্রসাদী মালা, তাঁরই অঙ্গের চাপে বিমর্দিত হ'লেও একেবারে শুষ্ক বিগত-শোভা হয়নি তার ফুলগুলো। ঈষৎ লীলায়িত দীর্ঘ কেশ পিছনদিকে ফেরানো—শুধু দুই এক গাছি স্বেদবিন্দুর সঙ্গে ললাটে জড়িয়ে গেছে। মরি-মরি—এ রূপ এ শ্রী কোথা থেকে আজ তাঁরই জন্য আহরণ ক'রে আনল এ বালক। এই তো এতদিন ধরে দেখছেন, কৈ এমন তো কখনও চোখে পড়ে নি তাঁর। এই তো, এই তো তাঁর কৃষ্ণকেশব, এই তো তাঁর বাল-গোপাল, কিশোর শ্রীকৃষ্ণ। যুগে যুগে বুঝি এইভাবেই ভক্তকে তাঁর সঙ্গরসাস্বা-দনের সৌভাগ্য দান করতে, শত নিগ্রহ শত অনাদর শত লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে বার বার ছুটে আসেন এইভাবে—

তার পর আর কিছু মনে নেই চৈতন্য ভারতীর।

কৃষ্ণ প্রেম যে কী বস্তু—এতদিন মুখে বলে এসেছেন বার বার, কিন্তু মনে হ'ল নিজেও এই প্রথম বুঝলেন। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' বলতে কি বোঝায় তাও আজ প্রথম উপলব্ধি করলেন। আর সেই সঙ্গে উপলব্ধি করলেন, "এ মাধুর্যামৃত সদা যেই পান করে, তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে।"

আজ সম্যক বুঝলেন, কোন একভাবে তাঁকে আরাধনা করাই ভুল। 'তিনি'ও যে নব নব রসাস্বাদন করতে চান ভক্তের প্রেমের। দয়িত, কান্ত, কান্তা, পুত্র, সখা,

দাস, প্রভু,—এ একাকার হয়ে না গেলে যে 'তাঁকে' ভালবাসা যায় না পুরোপুরি। 'আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন'। মহাজ্ঞানবান চৈতন্য ভারতীও এই একটি বালক, যাকে শিশু বলাই উচিত—তার মধ্যে—বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর মতো ভগবৎ-প্রত্যক্ষ করলেন। কখনও মনে হ'তে লাগল—এ তাঁর পুত্র, কখনও মনে হ'ল তিনিই এর পুত্র। কখনও মনে হ'ল এ তাঁর দাসানুদাস, কখনও মনে হ'তে লাগল তিনিও এর ক্রীতদাস। কখনও ইচ্ছা হ'ল অকারণে একে নিপীড়ন করেন, কখনও মনে হ'ল এর হাতে নিপীড়িত হওয়ার মতো সুখ আর নেই।

আরও বুঝলেন, এতকাল বৃথাই তাঁর সম্বন্ধে দিব্যোন্মাদ অবস্থা বলে এসেছে লোকে। সে উন্মত্ততার সুখও এই প্রথম টের পেলেন। 'হে কৃষ্ণ', 'হে সখা' বলে সবলে ও সবেগে বুকে চেপে ধরলেন মধুসূদনকে, যেন নিষ্পেষিত ক'রে নিজের বুকের মধ্যে পুরে নিতে চাইলেন। তার কপোল ও ললাটে মুখ ও মাথা ঘষতে লাগলেন, থর-থর ক'রে কেঁপে উঠতে লাগল তাঁর দেহ। অবশেষে সেই ভাবেই মূর্ছা গেলেন এক সময়।

মধুসূদনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সেই প্রথমেই। কিন্তু সে বাধা দেয় নি। এ অবস্থা সে দেখেছে। ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত অবস্থা এটা, এখন ওঁর আর বাহ্যজ্ঞান নেই। এখন বাধা দিতে যাওয়া বৃথা, ওঁকে ডাকা বা কথা বলা নিষ্ঠুরতা। এক হরিনামে, কৃষ্ণ-কথায় বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনা যায়, কিন্তু সে ক্ষমতা নেই। কঠিন আলিঙ্গনে দমবন্ধ হয়ে যাবার মতো হয়েছে, মুখের ওপর মুখ চেপে অজ্ঞান হয়ে গেছেন, শুধু থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে দেহখানা কিন্তু হাতের বন্ধন শিথিল হচ্ছে না।

শিথিল হওয়া বুঝি সে চায়ও না। এমন-ভাবে সত্যিই কোনদিন ওঁর সেবার অধিকার পাবে, ওঁকে আলিঙ্গন করতে পারবে, এ কে ভেবেছিল। আর কি কোন-দিন এ সৌভাগ্য হবে? চৈতন্য ভারতী ওর কাছে সাক্ষাৎ ভগবান, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। ওরও যে আজ সেই ঈশ্বর মিলন ঘটেছে। এর পরিপূর্ণ সুধা যে সেও পান ক'রে নিতে চায়……।

এইভাবে কতক্ষণ কাটত, কতক্ষণ কেটেছে কে জানে। শেষের দিকে বোধ করি নিঃশ্বাসের অভাবেই—মধুসূদন মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। শেষরক্ষা করলে সেবক গোবিন্দ। পূর্বাকাশে ঊষার লক্ষণ, অথচ সন্ন্যাসী এখনও স্নানে গেলেন না, এমন সময় তো ফিরে আসেন প্রত্যহ। তবে কি জপে বসে অজ্ঞান হয়ে গেলেন? তবু তখনই ঘরে ঢুকতে সাহস হ'ল না, ভয় ও সঙ্কোচে খানিকটা ইতস্ততঃ করল। কিন্তু শেষ অবধি আশঙ্কাই প্রবল হয়ে উঠল, ঘরে ঢুকে দেখল, ঐ কাণ্ড—দুজনেই মূর্ছিত, কাঠ হয়ে পড়ে আছে, তখন সে ডাকল পণ্ডিতকে। দুজনে মিলে কানের কাছে নাম সঙ্কীর্তন ক'রে সন্ন্যাসীকে প্রকৃতিস্থ করল, ছেলেটাকে বাইরে এনে মুখে-চোখে জল দিয়ে জ্ঞান করিয়ে গোবিন্দ বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল।

সেই মধুর থেকেও সুমধুর লীলারসাস্বাদনের আবেশ কাটে নি তখনও,

পণ্ডিতের কর্কশ কণ্ঠ বিশ্বের তিক্ততা দিয়ে যেন আঘাত করল ভারতীকে। তিনি কমণ্ডলু নিয়ে দ্রুত এসে সমুদ্রের ধারে বসলেন। নির্জনে নিজের মনটার দিকে একবার তাকানো দরকার। যতই হোক দামোদরও সন্ন্যাসী, পণ্ডিত—তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী। সত্যিই তাঁর তরফ থেকে কোন অন্যায় অশোভন কিছু হয়ে যাচ্ছে কিনা, হয়েছে কিনা পর্যালোচনা ক'রে দেখা দরকার।

কিন্তু না, যতই ভাবলেন, যতই নিজেকে পরীক্ষা করলেন, চিরে চিরে দেখলেন নিজের আচরণ, নিজের মন—ততই মন ঘুরে-ফিরে বালকটির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল, প্রীতিরসে পূর্ণ হয়ে গেল। সত্যিই ব্রাহ্মণকুমার কিংবা স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তা তিনি জানেন না—তবে ব্রহ্ম-রসাস্বাদের নিমিত্ত যে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তিনি উদ্দেশে বালককেও প্রণাম করলেন।

তবে আর না। দামোদর সাধারণ লোকের মনোভাব যা হতে পারে, যা হওয়া সম্ভব, তা-ই ব্যক্ত করেছেন মাত্র। তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—আপাত স্বাধীন; তবু তাঁরই দায়িত্ব সর্বাধিক। ইতিপূর্বে বহুলোককে তিনি কঠোরভাবে বিচার করেছেন—কিন্তু সেও তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই লোকাচারের মুখ চেয়েই। নইলে —তিনি ভাল করেই জানেন, অন্তরে তারাও নির্মল। বিশেষ ক'রে ছোট হরিদাসের কথাটাই বেশী ক'রে মনে পড়ছে তাঁর……

আর দ্বিধা করলেন না চৈতন্য ভারতী। সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেক-ক্ষণ ধরে স্নান করলেন, বহু স্নানার্থী এসে পড়েছে—তা পড়ুক, যতক্ষণ না পণ্ডিতের কথাগুলোর গ্লানি কাটে ততক্ষণ তিনি উঠতে পারবেন না।……

স্নান সেরে এসে সারাদিন ধরেই জপ করলেন। আজকাল ভোজনের পরিমাণ কমিয়ে নাম-মাত্রে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন, তাও আজ গ্রহণ করলেন না। মহাপ্রসাদ বলে মাথায় ঠেকালেন মাত্র।

সন্ধ্যায় ভক্তরা এল। শ্রীমন্দিরে কীর্তন হবার কথা আজ—যিনি মূল গায়েন, যিনি নায়ক, তাঁরই দেখা নেই যে। কিন্তু সেবক ডাকতে দিল না, বলল, 'শরীর খারাপ, কাল থেকেই একরকম উপবাস চলছে, সারাদিন জলবিন্দু স্পর্শ করেন নি। এখন ডেকো না, যাবার হয় নিজেই যাবেন। যদি না যান বুঝতে হবে গুরুতর কোন কারণ ঘটেছে। তোমরা ডাকলে বিশেষ—কীর্তনে 'না' বলবেন না, কিন্তু তাতে তোমাদেরই অন্যায় হবে।'

সুতরাং তারাও কেউ ডাকতে বা মৃদঙ্গের শব্দ করতেও সাহস করে নি। উৎকণ্ঠিত ভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল শুধু বাইরের প্রাঙ্গণে।

অবশেষে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর তিনি নিজেই বেরিয়ে এলেন গোফার আসন ছেড়ে। উপবাসের ক্লান্তি তো একটা থাকবেই—কিন্তু তবু মনে হ'ল দৃষ্টি বেশ প্রসন্ন, উৎফুল্লই। কে জানে এতক্ষণ তিনি শুধুই জপ করছিলেন, না আত্মাকে বাইরের জগৎ থেকে গুটিয়ে নিয়ে মানস-যমুনায় কেলি করছিলেন দয়িতের সঙ্গে, অথবা স্মৃতির সরোবরে একটি বিশেষ প্রেমারবিন্দে মধুপান করছিল

তাঁর মনমধুপ।

'চলো' বলে বেরিয়ে এসে কীর্তন ধরলেন সন্ন্যাসী।

কীর্তনের শেষে ক্লান্ত হয়ে থামতেই প্রথম যার দিকে দৃষ্টি পড়ল চৈতন্য ভারতীর—সে হ'ল বালক মধুসূদন। একটু দূরে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে আছে, কাছে আসতে ঠিক যেন সাহস হচ্ছে না, দূরে যেতেও মন সরছে না। চৈতন্য ভারতীই প্রথম দেখলেন, এবং ইঙ্গিত ক'রে কাছে ডাকলেন।

মধুসূদন ছুটে কাছে এল। বাধাও কিছু ছিল না। আর গুরু যাকে ডাকছেন স্বয়ং—তাকে কে বাধা দেবে। কাছে এসে বোধ করি সেদিনও সে পা দুটি জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল—চৈতন্য ভারতীই তার দুটি হাত ধরে ফেললেন, তারপর সেই পাথরের ওপর বসে পড়ে, ওকে সামনে বসালেন। সকলে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল, নিঃশ্বাস রোধ ক'রে দামোদর অপেক্ষা করতে লাগল পরবর্তী ঘটনার।

চৈতন্য ভারতী ডাকলেন, 'মধুসূদন, তুমি আমাকে খুব ভালবাসো, না?'

মধুসূদন বারেক চারিদিকের সহস্র উৎসুক কৌতূহলী মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মাথা নিচু করল। তারপর প্রায় অস্ফুটস্বরে বলল, 'তা তো জানি না। তবে আপনাকে না দেখে থাকতে পারি না, আর দেখলেই আপনার সেবা করবার জন্য প্রাণটার মধ্যে আকুলি-বিকুলি করে।'

'নারায়ণ। নারায়ণ।' আপন মনেই স্মরণ করলেন চৈতন্য ভারতী। তারপর অনুচ্চ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে আবার বললেন, 'তা'হলে আমার যাতে অনিষ্ট হয় তা তুমি নিশ্চয় চাও না!'

প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ল মধুসূদন, না, নিশ্চয়ই না।

'তবে তুমি আর কাল থেকে আমার কাছে এসো না। আর কোনদিনই না। খুব যেদিন মন খারাপ হবে, ঠাকুরকে ডেকো—আমাকে কাছে পেলে, আমার সেবা করলে যেমন আনন্দ হ'ত, তেমনিই হবে। যাও বাবা, এখন বাড়ি যাও!'

স্তম্ভিত, চিত্রার্পিতের মতো বসে রইল মধুসূদন অনেকক্ষণ। আর যাই হোক, এ আদেশ, এ নিষ্ঠুর নির্দেশ আশা করে নি সে—বিশেষত কাল রাত্রের অতখানি স্নেহ, অতখানি প্রশ্রয়ের পর। কথাটা বিশ্বাস হ'তেই কিছুটা সময় লাগল তার। তবে কেমন ক'রে যেন বুঝল যে এ-ই চরম, অলঙ্ঘনীয়। অনেকক্ষণ পরে উঠে আস্তে আস্তে দুদিকের দ্বিধাবিভক্ত ভক্তদের ভীড়ের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে বেরিয়ে গেল। চৈতন্য ভারতীর দিকে আর তাকালও না, তাঁকে প্রণাম করারও চেষ্টা করল না।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকে চেপে নিলেন নীরবে।…

প্রথম দিকটায়, কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই, একটু বিজয়গর্ব অনুভব করছিল দামোদর পণ্ডিত, অতটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু খানিক পরে আশপাশের অন্তরঙ্গদের ঈষৎ-বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে সেটা বুঝল, বুঝল যে, মনের খুশিটা মুখে বেশ স্পষ্ট হয়েই ফুটে উঠেছে। তখন লজ্জার পরিসীমা রইল না। ছি ছি, ঐটুকু

দুখের বালকের ওপর বিজয়-গর্ব। যদি উনিও লক্ষ্য ক'রে থাকেন, না জানি কি ভাবছেন। সে নতমস্তকে অপরাধীর মতো পিছিয়ে গেল খানিকটা ইচ্ছা করেই।

বাসায় ফিরে হাত-পা ধুয়ে গম্ভীরায় ঢুকে দামোদরকে ডেকে পাঠালেন চৈতন্য ভারতী। ভেতরে আসতে অদূরে বসতে ইঙ্গিত ক'রে মুখের জপটা একটু এগিয়ে নিয়ে বললেন, 'তোমার মতো প্রকৃত হিতকারী বন্ধু আমার একটিও নেই। তা'ছাড়া তোমার মতো সকল দিকে দৃষ্টি, বুদ্ধি-বিবেচনা-প্রজ্ঞা, কারও মধ্যে বিশেষ তো দেখি না। আমাকে তুমি অনেকবার অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করেছ। সেদিন মঠে যা বাঁচিয়েছিলে—তা ভুলি নি। সেই জন্যেই তোমাকে একটি দুরূহ কাজের ভার দিতে চাই। তুমি যদি এ ভার নাও, তবেই আমি যথার্থ নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।'

যেখানে প্রবল না হোক, মৃদু তিরস্কার আশঙ্কা ছিল, সেখানে এই প্রশংসায় খুশী হবারই কথা। খুশীই হোল পণ্ডিত আর সেই ঝোঁকে বলে ফেলল, 'নিশ্চয়ই নেব, আপনার আদেশ প্রাণ দিয়েও পালন করব—আপনি নিশ্চিন্ত হোন।'

'আমাকে বাঁচালে। একটা বড় গ্লানি থেকে মুক্তি দিলে। সন্ন্যাসীর পিছটান থাকার কথা নয়—কিন্তু তবু গর্ভধারিণী মার চিন্তায় আমি সাধন-ভজনে ষোল-আনা মন দিতে পারি নি। তিনি আমার চিন্তায় পাগলের মতো হয়ে থাকেন—সেইটে জেনেই আরও নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না কিছুতে। তুমি যদি দেশে গিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ ভার নাও, তাহলে আমার সর্বাধিক উপকার করা হয়, চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে। আমাকে এই ভিক্ষাটুকু দেবে ভাই পুরুষোত্তম?'

অনেকক্ষণ কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল পণ্ডিত দামোদর। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আপনার আদেশ সর্বথা এবং সর্বদা আমার শিরোধার্য। আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমি কালই রওনা দেব। মা শুধু নন, ওঁদের সকলের ভারই আমি নিলাম। আমার এ দেহ না যাওয়া পর্যন্ত কোন চিন্তা নেই।...... কিন্তু চিরদিনের মতো বিদায় হওয়ার আগে আমিও একটি ভিক্ষা চাইছি, আশা করছি অধম সেবকের এটুকু কৌতূহল নিবৃত্তি করতে দ্বিধা করবেন না।...... আমাকে পরোক্ষে নির্বাসনই দিলেন, সেবা থেকে বঞ্চিত করলেন—কিন্তু কেন? সে কি ঐ ছেলেটার জন্যে?'

'না। ওটা আমারই অন্যায় হচ্ছিল, সে ত্রুটি আমি সংশোধন ক'রে নিলাম, দেখলে তো।'

'তবে এ দণ্ড কেন? আমি জানি আপনি মিথ্যা বলবেন না—এতটুকু বুঝেছি যে এখানে থেকে আপনার সেবা ও সন্ন্যাস গ্রহণের যোগ্যতা দুইই আমি হারিয়েছি। কিন্তু কী সে অপরাধ বা স্বভাবদোষ জানতে পারি কি? জানলে সংশোধনের চেষ্টা সহজ হয়।'

চৈতন্য ভারতী ওর মুখের দিকে চেয়ে স্থির অকম্পিত কণ্ঠে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'অসূয়া।'

আর কোন প্রশ্ন করল না দামোদর, প্রতিবাদও করল না। দীর্ঘকাল নীরবে নতমস্তকে বসে থেকে, দূর থেকেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে তেমনি নিঃশব্দেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জীবন আরো বড়

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বোধ হয় এমন মুহূর্ত এক-আধবার আসে—যখন সব ছেড়ে ছুড়ে 'দুত্তোর' বলে কোথাও বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। আমারও সেবার সেই রকম একটা মুহূর্ত এসেছিল। আমিও বেরিয়ে পড়েছিলাম 'দুত্তোর' বলে—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাজকর্ম ঘরবাড়ী আত্মীয়স্বজন সব কিছু ছেড়ে সটান হাওড়া স্টেশনে হাজির হয়ে সামনেই তখন যে গাড়ীখানা ছাড়ছিল. সেইটেতে চড়ে বসেছিলাম।

টিকিট কেটেই চড়েছিলাম অবশ্য। ভাগ্যক্রমে গাড়ীখানার গন্তব্যস্থান আমার মানসিক অবস্থার সঙ্গে মানানসই ছিল। সেটা 'দেরাদুন এক্সপ্রেস'—হরিদ্বার হয়ে যাবে। সুতরাং হরিদ্বারেই নামব স্থির ক'রে ফেলেছিলাম।

কিন্তু হরিদ্বারে পৌঁছে রূঢ়ভাবে স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। যে হরিদ্বারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, এ সে হরিদ্বার নয়। একেই দেশবিভাগের ফলে পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুতে ভরে গেছে, তার ওপর সেটা গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস, দিল্লী ও আশপাশের শহর উজাড় ক'রে পাঞ্জাবী বন্ধুরা এসেছেন ওখানে। হিমালয়ের ওপর উঁচু পাহাড়ী স্বাস্থ্যনিবাস এঁদের তত পছন্দ নয়—হরিদ্বারটাই এঁরা বোঝেন ভাল। বোধ হয় 'রথ দেখা কলা বেচা' দুটোই হয় বলে। তীর্থে আসার পুণ্যটাও মেলে, আবার গঙ্গার বরফগলা ঠান্ডা জলে স্নান ক'রে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাহ থেকেও অব্যাহতি পান। কিন্তু সে ভীড় আমার কাছে তখন অসহ্য। কোনমতে একটা বেলা থাকতেই যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে এল। আবারও 'দুত্তোর' বলে ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং সামনেই ছিল হৃষীকেশের বাস, তাইতে চড়ে বসলাম।

ভীড় হৃষীকেশেও ঠেল মেরেছে কিন্তু সেটা হরিদ্বারের মত অতটা অসহ্য হয়ে ওঠে নি। একটা দিন 'কালিকমলীওয়ালা ধরমশালাতে' কাটাবার পরই গঙ্গার কাছা-কাছি একখানা ভাল ঘর পেয়ে গেলাম। সেটাও এককালে একটা কী ধর্মশালা ছিল বোধ হয়—বিবর্ণ পাথরে এখনও দাতার নাম লেখা আছে। কিন্তু বর্তমানে প্রতিষ্ঠাতার উৎসাহ ও খবরদারীর অভাবে যাত্রী-তোলা বাড়ীতে পরিণত হয়েছে। চৌকিদার সুবিধামত এক-আধখানা ঘর ভাড়া দিয়ে নিজের এবং বাড়ীর খরচা চালায়। যাই হোক, আশ্রয়টা মিলল ভালই—শুকনো খটখটে ঘর, প্রাকৃতিক-কৃত্যের ব্যবস্থা ভাল, হাতার মধ্যেই কুয়া আছে এবং সবচেয়ে যেটা বড় গুণ—সেটা হ'ল খুব নিরিবিলি। ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে আর ছাদে উঠলেই সামনে ত্রিবেণীর

ঘাট, খরস্রোতা গঙ্গা ও পরপারে শিওয়ালি গিরিশ্রেণীর অভ্রংলিহ মহিমা চোখে পড়ে। সকালে গঙ্গার ধারে যাওয়া হয়ে উঠত না, ভোর থেকেই ছাদে উঠে সামনের ঐ অপূর্ব দৃশ্যের দিকে চোখ মেলে বসে থাকতাম—যতক্ষণ না পাশের বড় আমগাছটার ছায়া সরে গিয়ে চড়া রোদ এসে পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত। একই দৃশ্য নিত্য দেখেও পুরনো বা একঘেয়ে হ'ত না—এমনই তা স্বপ্নময়, জাদুমাখানো।

এক কথায় বেশ ভাল লাগছিল এই নির্জনবাস। দুপুরে বাজারে গিয়ে হোটেল থেকে ভাত খেয়ে আসতাম—রাত্রে পুরীর ওপর দিয়ে চলত। কয়েকদিন পরে এক রুটির দোকান আবিষ্কার করলাম—সে রাত্রে প্রতিখানি রুটি এক আনা হিসাবে ধরে তার সঙ্গে প্রচুর 'উরুদ্‌কী দাল' এবং একটা 'ভরতা' বা ভাজা মশলামাখানো ঘ্যাঁট তরকারী বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে লাগল। পাঠানোর খরচা বা 'চারজ্‌' দৈনিক মাত্র এক আনা। চায়ের দোকান সামনেই—চা দুধ দহি পাঁউরুটি ক্ষীরের লাড্ডু এবং তার সঙ্গে জিল্যাপি সবই সেখানে মিলত। অর্থাৎ এক কথায় জৈবিক আরামের কোন ত্রুটি রইল না কোথাও।

এখানে এসে প্রথম চার-পাঁচ দিন সহবাসী বা এই বাড়ীর অপর ভাড়াটেদের দিকে আদৌ তাকাই নি। তারা আছে এইমাত্র। যাত্রীতোলা বাড়ী—হরেক জাতির হরেক রকম মানুষ থাকবে, এটা ধরে নিয়েই তো এখানে উঠেছি। কিন্তু হঠাৎ একদিন এই নির্বান্ধব দেশে বাংলা বুলি কানে যেতে সচকিত হয়ে উঠলাম। সচেতনও হলাম নিকটতম প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে। দেখলাম আমার পাশের ঘরেই যে দম্পতিটি থাকেন—বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা, তাঁরাই বাঙ্গালী। বেশ সৌম্য ও সম্ভ্রান্ত-দর্শন মানুষ, কথায়-বার্তায় আচারে-ব্যবহারে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট।

ক্রমে আলাপও হ'ল ওঁদের সঙ্গে। না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ বাড়ীতে অন্য যে সব যাত্রীরা ছিলেন তাঁরা দু-একদিনেব মধ্যে সকলেই চলে গেলেন—রইলাম আমি আর ওঁরা।

অনেক লোকের মধ্যে একক বা নিঃসঙ্গ বরং থাকা যায়—এক বাড়ীতে তিনজন লোক দীর্ঘকাল ধরে বাস করবে অথচ কথাবার্তা হবে না—এটা সম্ভব নয়।

আলাপটা শুরু করলেন অবশ্য ওঁরাই। একদিন মহিলাটি আমার ঘরের বাইরে থেকে ডেকে বললেন,—'বাবা, তোমাকে তুমিই বলছি কিছু মনে ক'রো না। তুমি আমার ছেলের বয়সী। আমাদের সকালে চা হয়, অথচ তুমি রোজ বাইরে গিয়ে চা খেয়ে এস—এটা বড় খারাপ লাগে। তুমি সকাল আর বিকেলের চা-টা আমাদের সঙ্গেই খেও।'

দু-এক বার 'না-না—কী আর কষ্ট, এখানে কাজটাই বা কি' এই ধরণের আপত্তি করলাম কিন্তু তিনি সেটা গায়ে মাখলেন না। বললেন, 'এই এক পেয়ালা চায়ের জন্যে তোড়জোড় ক'রে বাইরে যাওয়া তোমার যে খুব খারাপ লাগে তা আমরা বুঝতে পারি—তবু ভরসা ক'রে বলতে পারি নি। উনি বলেন, ওরা আজ-

কালকার ছেলে, কী না কী মনে করবে। আজ আমি মরীয়া হয়ে বললুম—মনে আর কি করবে, এক পেয়ালা চা বৈ তো নয়। এ তো মানুষ অপরিচিত লোকের কাছে হামেশাই খায়—খাওয়ায়। তা হ'লে ঐ কথাই ঠিক রইল কিন্তু। তুমি বরং কিছু খাবার এনে ঘরে রেখে দিও, আমাদের তো সকালে চায়ের সঙ্গে কিছু খাওয়ার পাট নেই—তোমার অসুবিধা হবে।'

বললেন বটে কিন্তু তিনিই সে ব্যবস্থাটার ভারও নিলেন। প্রতিদিনই দেখতাম চায়ের সঙ্গে কিছু-না-কিছু খাবার সাজিয়ে দিচ্ছেন। অনুযোগ করলে বলতেন, 'না, ঘরে ছিল তাই—নইলে কি আর তোমার জন্যে কিনে আনতুম!'

আলাপটা ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। ভদ্রলোকের নাম শেখরবাবু—কথা কয়ে বুঝলাম, খুবই উচ্চ-শিক্ষিত মানুষ। সরকারী দপ্তরে কী একটা বড় চাকরি করতেন। সেকালের এম-এ, কিন্তু কলেজী শিক্ষারও বেশী কিছু ছিল তাঁর। দেখলাম সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস—জ্ঞানের বহু ক্ষেত্রেই তাঁর রীতি-মত দখল আছে। বিশেষ বই পান না বা সঙ্গে আনেন নি—তবে যা দু'-এক একখানা বই আছে, সবই ইউরোপীয় দর্শনের ভারী ভারী দুরূহ বই। ও'র স্ত্রীর কথাবার্তার মধ্যেও শিক্ষার ছাপ পাওয়া যেত—তবে তিনি কতদূর পড়েছিলেন সেটা কিছুতেই ভাঙতে চাইতেন না, প্রশ্ন করলে বলতেন, 'হ্যাঁ! আমাদের আবার পড়াশুনো, তুমিও যেমন!'

কয়েকদিন চা খাবার পর ও'রা ও'দের সংসারে ভাত খাবার কথাটাও পেড়ে-ছিলেন কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী হই নি। অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়, এই বলেই মনকে বুঝিয়ে লোভ সম্বরণ করেছি। হ্যাঁ—লোভই বলব। যে হোটেলে খেতাম তারা খুব নোংরা নয়, আমাদের দেশের তুলনায় পরিষ্কারই বরং—কিন্তু তবু মাসিমার (শেখরবাবুর স্ত্রীকে ইদানীং মাসিমা বলেই ডাকতে শুরু করে-ছিলাম) পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না। ছোট্ট একটি আঙোটিতে কাঠ-কয়লা ধরিয়ে ঘরেই ডাল ভাত ফুটিয়ে নিতেন। একাদশী অমাবস্যায় রুটিও করতেন—কিন্তু কড়া, চাটু, খুন্তি, সাঁড়াশি প্রত্যেকটি বাসন ঝকমক করত, পালিশ-করা সোনারুপোর বাসনের মত। এক কোণে সামান্য ভাঁড়ার সাজানো থাকত—তারও বিন্যাসে যথেষ্ট সুরুচির পরিচয়। ঘরে আসবাব বলতে খুবই সামান্য। একটি বিছানা আর দুটি ট্রাঙ্ক—কিন্তু সমস্তর মধ্যেই এমন একটা পরিচ্ছন্ন শুচিতা ছিল যে ঘরে ঢুকলে চোখ জুড়িয়ে যেত। ও'র ঐ হেঁসেলে খাওয়ার জন্য লোভই হ'ত মধ্যে মধ্যে। কিন্তু সব কাজই মাসিমা নিজে হাতে করতেন—মায় বাসন-মাজা পর্যন্ত—এই জন্যই সে লোভকে প্রশ্রয় দিই নি। ও'রা সকালে ঐ যা একবার রান্না করতেন। চা-ও দুবেলা দুকাপ ছাড়া নয়—এক কথায় ওঁদের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সংযত এবং নিয়মের গণ্ডীতে বাঁধা।

এরই মধ্যে একদিন কথাটা আমার মনে হ'ল। হঠাৎই হ'ল। ওঁদের কথা ভাবতে

ভাবতে একসময় মনে পড়ল ওঁদের ছেলেমেয়ে কেউ আছে কি না তা তো জানা হয় নি। আলাপ হয়েছে যথেষ্ট, ঘনিষ্ঠতাও কিছু হয়েছে—পরিচয়টা তো হয় নি এখনও। অথবা বলা যায়, এক-তরফাই হয়েছে! ওঁরা আমার সব কথাই জেনেছেন, আমিই এখনও কিছু জানতে পারি নি।

এ ধরণের চিন্তা মাথায় ঢুকলে তা যাওয়া শক্ত। আমারও মাথা থেকে গেল না কথাটা। ক্রমশ সেটা একটা সংশয়ে পরিণত হ'ল। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কী যেন একটা রহস্য-ঢাকা ওঁদের জীবন, কোথায় যেন কী একটা গোলমাল আছে। ওঁদের কোন ইতিহাস ওঁরা কিছুতেই বলতে চান না কেন?

একটা কথায় সন্দেহটা বাড়ল আরও।

সেদিন এমনিই কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনারা কদ্দিন আছেন আর এখানে?'

তার জবাবে মেসোমশাই বলেছিলেন, 'বর্ষা না পড়া পর্যন্ত তো আছিই।'

'তার পর কোথায় ফিরবেন? কলকাতাতে?'

একটু মৃদু হেসে মেসোমশাই উত্তর দিলেন, 'কলকাতা আমরা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি বাবা! বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্ক নেই।'

'একেবারেই নেই? তবে কোথায় থাকেন?'

'এই এদিকেই। আসল কথা আমার পছন্দ কাশ্মীর, তোমার মাসিমার পছন্দ এই জায়গাটা। তাই আমরা একটা রফা ক'রে নিয়েছি, কিছুদিন ক'রে কাশ্মীরে থাকি; কিছুদিন হৃষীকেশ। এর নীচে আর নামি নি দীর্ঘকাল।'

একটু বিস্মিত হলাম। প্রশ্ন করলাম, 'তা আপনার আত্মীয়-স্বজন? মানে ছেলেমেয়ে—কেউ নেই?'

সামান্য কিছুকাল মৌন থেকে মেসোমশাই বললেন, 'আছে বৈ কি, সবাই আছে। তারা বড় হয়েছে, তাদের নিজস্ব জীবন শুরু হয়েছে—তার মধ্যে আর আমাদের কি দরকার? থাকলেই অশান্তি। যতদিন তাদের প্রয়োজন ছিল ততদিন থেকেছি, এখন তারা চায় তাদের মতো ক'রে থাকতে। আমরাও কর্তব্য শেষ ক'রে অবসর নিয়েছি, আমরাই বা আমাদের মতো থাকব না কেন? আর তো অল্প ক'টা দিনই আছে জীবনে—এই ক'টা দিন উপভোগ ক'রে নিই না—আমাদের খুশী-মতো, পছন্দ-মতো!'

বুঝলাম যে ছেলে-বৌদের সঙ্গে বনে না মাসিমার, সম্ভবত খুব বড় একটা ঝগড়াঝাঁটির পর চলে এসেছেন সংসার ছেড়ে। বাঙ্গালী সংসারের সেই পুরাতন ইতিহাস। একটু মমতাও হ'ল শেখরবাবুর ওপর। শান্তির জন্য, ছেলেবৌদের শান্তি দেবার জন্য এমন স্বেচ্ছানির্বাসিত হয়ে থাকতে হয়েছে তাঁকে! মাসিমার স্বাধীনতা থাকলে এতদিন থাকতে পারতেন না, আবারও ফিরে যেতেন, আবারও ঝগড়া বাধাতেন। পারেন নি মেসোমশাইয়ের জন্যেই। তবু একটু বিস্মিত বোধ না ক'রেও পারলাম না—মাসিমার কথা ভেবে। আচ্ছা চাপা লোক তো! এ সব

ক্ষেত্রে মেয়েরা অশান্তির কথাটা একেবারেই চেপে রাখতে পারে না—সামান্য পরিচয়ের পরই ঘরের সব ময়লা পরের সামনে বার করতে বসে। ওঁর আচারে-আচরণে কথায়-বার্তায় কিন্তু এ ধরণের সামান্য মাত্র আভাসও পাওয়া যায় না।

এর পর ওঁদের সম্বন্ধে আর একটু কৌতূহল বোধ করতে লাগলাম, একটু বেশীই সচেতন হয়ে উঠলাম হয়ত।

আর তার ফলেই, ধীরে ধীরে আর একটি বিচিত্র তথ্যের দিকেও নজর পড়ল।

ওঁদের ভাবভঙ্গীটা—বিশেষ ক'রে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারটা আদৌ স্বেচ্ছা-নির্বাসিত সংসার-উত্ত্যক্ত বুড়ো কর্তা-গিন্নীর মতো নয়। বরং ধরন-ধারণ দেখলে মনে হয় সদ্যবিবাহিত কোন দম্পতি মধুচন্দ্রমা যাপন করতে এসেছে।

কেন এ কথাটা মনে এল তা ঠিক ক'রে বলা শক্ত। কোন বিশেষ একটা ব্যবহারে মনে আসে নি অবশ্যই। তবু কী যে একটা ছিল ওঁদের আচরণে, পরস্পরের সম্বন্ধে অকারণ আকুলতায়, পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকবার এক প্রকার মুগ্ধ ভঙ্গীতে—যাতে ক'রে কথাটা ঘুরে ফিরেই মনে আসতে লাগল—উদ্ভট বলে একেবারে মুছে ফেলতে পারলাম না মন থেকে। এ বয়সের দম্পতি আরও ঢের দেখেছি, এককালের গাঢ় প্রণয়ের রঙ্ যে তাঁদের ব্যবহারে লেগে থাকে না তা নয়—কখনও কখনও বিদ্যুতের মত চকিত চমকে পুরাতন বহ্নির সে স্ফুলিঙ্গ চোখে মুখে হাসিতে কথায় বেরিয়েও আসে—কিন্তু সে ঠিক ও জিনিস নয়। সে বিকাশ ঘটে দৈবাৎ, কথনও সখনও। দিন-রাতের অধিকাংশ সময়ই তাঁরা পরস্পরকে সহ্য করেন এই মাত্র। দীর্ঘকাল একত্রে বাস করতে করতে উভয়েই উভয়ের সাহচর্যে অভ্যস্ত হয়েছেন, শুধু এইটুকু। নইলে স্ত্রীরা বেশীর ভাগই ডুবে যান তাঁদের সংসারে এবং পরকালের ভয়ে অর্থাৎ পূজাপাঠে। সংসারের বাইরে থাকতে হলে যে সময়টা সংসারে কাটত সেটা পুরোই কাটান, সেই সংসারের অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে-বৌ এদের দুর্ব্যবহারের নালিশ জানাতে জানাতে। বাইরের শ্রোতা না থাকলে সে অভিযোগ-অনুযোগের সমস্ত তরঙ্গ বুক পেতে নিতে হয় স্বামী বেচারীকেই। তা নইলে তাঁদের অবস্থা আরও খারাপ। নিজেকে সংসারে তো বটেই—স্ত্রীর কাছেও অবহেলিত বোধ করতে থাকেন অনবরত। বই কাগজ রাজনীতি এই সবের মধ্যে ডুবে নিজের নিঃসঙ্গতা কাটাতে চেষ্টা করেন খানিকটা, কিন্তু পারেন না। যাঁদের জীবন নিছক চাকরিতে কাটে নি—তাঁরা কেউ কেউ অবশ্য জীবনের-বৃত্তিটাকেই বেশী ক'রে আঁকড়ে ধরেন। কিন্তু সে যাই হোক, অন্য কোন বয়স্ক সংসার-নির্বাসিত দম্পতির চোখেই তো এ রকম নব-প্রণয়মুগ্ধ দৃষ্টি দেখি নি।

হয়ত নিজের মনের চিন্তাটাই বাইরে তথ্যকে বিকৃত ক'রে দেখে। আমারও তাই হয়েছে. হয়ত সাধারণ ঘটনাতে অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করছি—সামান্য কথার অসামান্য ব্যাখ্যা করছি।

এক এক সময়ে মনকে শাসন করবার চেষ্টা করতাম এই ব'লে।

কিন্তু এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ একটা দৃশ্য চোখে পড়ে গেল।

সেটা পূর্ণিমা কি চতুর্দশীর রাত—ঠিক মনে নেই। তবে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না ছিল, এটা মনে আছে। মাঝরাত্রে কি কারণে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় প্রধানত সেই জ্যোৎস্নার আকর্ষণেই বাইরে এসেছিলাম।

এসময় এখানে বাইরে বা ছাদে শোওয়াই রীতি, কিন্তু সন্ধ্যার পর একটু একটু ক'রে ঠান্ডা পড়ত বলে আমি আর সে হাঙ্গামা করি নি। মাসিমারাও ঘরেই শুতেন। ও'রা বলতেন, 'আমরা একে বাংলা দেশের লোক, তায় বিদেশে থেকেছি বেশির ভাগ, বাইরে শোওয়া সহ্যও হয় না, একটু ভয়-ভয়ও করে। আর দরকারই বা কি। এমন কিছু গরম তো লাগে না রাত্রে।'

আজ বাইরে বেরিয়ে কিন্তু আর নিচে থাকতে ইচ্ছা হ'ল না। ভিতরের উঠানে গাছের ছায়া, রাস্তাতে বাড়ীর। এক গঙ্গার ধারে গেলে জ্যোৎস্নাটা পুরোপুরি পাওয়া যায়—কিন্তু এখন একা গঙ্গার তীরে গিয়ে বসা হয়ত ঠিক নিরাপদ নয়। তার চেয়ে ছাদে ওঠাই ভাল। ছাদে অবারিত পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না, তাতে অবগাহন ক'রে, ডুবে বসে থাকতে পারব—গঙ্গার উপলাহত গলিত রজতধারার দিকে, ওপারের আধো ছায়াময় রহস্য ঢাকা স্তব্ধ পর্বতশ্রেণীর দিকে চেয়ে।

মোহাবিষ্টের মত চলেছিলাম ওপরের দিকে, সহসা অতর্কিতে, একেবারেই নিজের অজ্ঞাতে চোখটা পড়ে গেল পাশের ঘরের দিকে। জানলা এধারেও খোলা, ওধারেও। ওপাশের জানলা দিয়ে অনেকখানি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ও'দের বিছানায়। একই বিছানায় শুতেন ও'রা তা জানি, তবু ঠিক এ দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। দেখলাম মাসিমা নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছেন মেসোমশাইকে, আর তিনিও ঘাড়টা একটু হেলিয়ে মাসিমার কপালে নিজের গালটা চেপে শুয়ে আছেন।

সাধারণ একটা দৃশ্য, বিশেষত দুজনেই গাঢ় ঘুমে অচেতন। দোষের কিছুই নয়—কিন্তু অন্তত প'য়ষট্টি বছরের এক পুরুষ ও পঞ্চান্ন বছরের এক নারীর পক্ষে বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নেই।

অস্বীকার করব না। চোখ রগড়ে ভাল ক'রেই দেখেছিলাম আবার। তারপর অভিভূতের মতই উঠে গিয়েছিলাম ছাদে। প্রথম প্রণয়ের যে কথাটা এতদিন ধরে মাথার মধ্যে ঘুরছিল—যে চিন্তাটাকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছিলাম ক'দিন—সেইটাই আবার নতুন ক'রে মাথা তুলল। সে জোর পেয়েছে এবার, কারণ এইমাত্র যা দেখে এলাম তাতে আমার ঐ উদ্ভট ধারণাটাই সমর্থিত হ'ল।

ঘুম এল না আর কিছুতেই। বাকী রাতটা চাঁদের আলোর সেই উন্মত্ত-উৎসবের মধ্যেই বসে কাটিয়ে দিলাম। চোখের সামনে প্রকৃতির বিপুল সেই ঐশ্বর্য-সমারোহ তেমনিই খোলা রইল। তবু কোন দিকেই মন দিতে পারলাম না, ঘুরে ফিরে চিন্তাটা একটি জোড়া মানব-মানবীর অজ্ঞাত এবং বিচিত্র জীবনরহস্যেই বার বার পাক খেতে লাগল।

সাংসারিক লোকের জীবনে বৈরাগ্য ক্ষণস্থায়ী। আমারও বৈরাগ্যের ঘোর ক্রমে কেটে এল। মাসখানেকের মধ্যেই বাড়ী ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

সেদিন সেই কথাটাই বলছিলাম মাসিমাকে। সন্ধ্যায় গঙ্গার ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরে ছাদে গিয়ে বসেছি, মাসিমা উঠে এলেন। তাঁর পুজো-পাঠ সারা হয়ে গেছে বোধ হয়, এবার ছাদে বসে জপ করবেন। মেসোমশাই এ সময়টা ভরতমন্দিরে আজকাল পাঠ শুনতে যান—রাত ন'টা নাগাদ বাড়ী ফেরেন। মাসিমা এই সময়টা রোজই ছাদে এসে বসেন।

কথাপ্রসঙ্গে বললাম, 'আমি ভাবছি কালই বাড়ী ফিরে যাব মাসিমা।'

'কালই?' চমকে উঠলেন যেন মাসিমা, 'কেন—হঠাৎ? কোন চিঠিটিঠি এল নাকি বাবা জরুরী?'

'হ্যাঁ—কাজকর্মে বড় গোলমাল হয়ে গেছে, এতদিন না থাকার জন্যে অনেক-গুলো টাকা লোকসান হয়েছে—আর না গেলেই নয়।'

'তাহলে তো যেতেই হবে—উপায় কি!' মাসিমা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে জপ ক'রে নিয়ে আবার বললেন, 'বেশ ছিলুম বাবা, একটা মাস বড় ভাল কাটল। তুমি চলে গেলে খুব ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকবে।'

'আপনারাই বা ক'দিন? মেসোমশাই তো বলছিলেন—আর হপ্তাতিনেক পরেই এখানকার বাস তুলবেন। কাশ্মীরে গিয়ে এ সময়টা ভালই লাগবে।'

'তা হয়ত লাগবে। তবে তোমার মেসোমশাই যেখানে বাড়ী নিয়ে রেখেছেন সে বিষম নির্জ্জন। আমাদের মালীটা ছাড়া ছ' মাসে বোধ হয় একটা লোকের মুখও চোখে পড়ে না। নির্জ্জনতা আমিও ভালবাসি, তবে ঠিক অতটা—। মধ্যে মধ্যে যেন হাঁপ ধরে।'

'আপনারা কি আর কোন দিনই বাংলা দেশে ফিরবেন না—মানে বাড়ীতে?'

'না। আর কি করতে ফিরব বাবা! সে পাট আমরা চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছি। আর সেখানে আমাদের কোন দরকার নেই। আত্মীয়স্বজন সকলকার কাছেই আমরা মৃত।'

আমি একটু হাসলাম, শব্দ ক'রেই হাসলাম। বললাম, 'এটা তো আপনার অভিমানের কথা হ'ল মাসিমা। এর কোন মূল্য নেই—ছেলেবৌদের ওপর রাগ ক'রে চলে এসেছেন, এখন মনে হচ্ছে সংসার বিষ। কিন্তু চিরকাল কি আর সে রাগ থাকবে? ফিরতেই হবে একদিন।'

মাসিমা যেন চমকে উঠলেন। বললেন, 'কে বললে আমরা রাগ ক'রে এসেছি বাবা! রাগারাগি ঝগড়া আমি কোনদিনই কারুর সঙ্গে করি না।'

'তবে!' এবার বিস্মিত হবার পালা আমার, 'তবে হঠাৎ এমন ক'রে চলে এলেন যে। মেসোমশাই বলছিলেন আপনাদের ছেলেমেয়ে সব আছে—তবে তাদের ফেলে এমন নির্জ্জন-বাস—বা অজ্ঞাত-বাস করতে এলেন কেন?

'সে অনেক কথা বাবা !' অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মাসিমা।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর কে জানে কেন—কী খেয়াল হ'ল, হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মাসিমা, কিছু মনে করবেন না তো ?'

'কী কথা বাবা ?' শান্ত কণ্ঠেই বললেন বটে মাসিমা, কিন্তু আমার কেমন মনে হ'ল—গলাটা একটু কাঁপা-কাঁপা।

'আপনাদের তো ছেলেমেয়ে আছে বলছেন, বয়সও হয়েছে অনেক, সাধারণত বয়স বেশী হলে আর ছেলেপুলে থাকলে—স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। কিন্তু আমার যতদূর মনে হয়—আপনারা আজও দুজনেই যেন দুজনের মধ্যে ডুবে আছেন—এর রহস্যটা কি ? আমার এ কৌতূহল খুব অশোভন, এ প্রশ্নও ধৃষ্টতা—কিন্তু জানেন তো আমি গল্প লিখি—জিজ্ঞাসা না ক'রে থাকতে পারলুম না !'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন মাসিমা। অন্ধকারেই লক্ষ্য করলাম, মালা ঘোরাও বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর। মিনিট-কতক পরে আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি গল্প লেখ—না ? তাই তোমার এত সাফ নজর।'

তারপর আর একটু থেমে—বোধ হয় মনে মনে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিয়েই বললেন, 'হাতে জপের মালা—তীর্থস্থানে বসে মিছে কথা বলব না বাবা, মিথ্যা শ্রদ্ধাতেও আমার লোভ নেই ;—তাছাড়া অন্যায় করলেই লোক গোপন করতে চায়, অন্যায় কিছু করেছি বলে মনে করি না আমরা। তোমার কাছে সত্য কথাই বলব—তোমার মেসোমশাই আর আমি বিবাহিত নই !'

কবির কল্পনা নয়—সত্যি-সত্যিই, সামনে বাজ পড়লেও এত হতবাক হয়ে পড়তুম কি না সন্দেহ ! এ উত্তর তো আমি সুদূরতম কল্পনাতেও আশা করি নি। এ কী হ'ল ! এ যে যাকে বলে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাওয়া—তাই !

আমি চুপ ক'রে রইলাম। কী-ই বলব ? এর পর কী কথা কইব !

কিন্তু কথা কইলেন আবার মাসিমাই। তেমনি শান্ত সহজ নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠ। বললেন, 'এর পর তোমার কিছু জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কথাটা আমিই খুলে বলছি। যখন শুরু করেছি তখন শেষ অবধি বলাই ভাল। আর তুমি তো লেখক—হয়ত তুমি বুঝবেও।'

আমার তখন প্রতিবাদ করাই উচিত ছিল, কিন্তু পারলাম না ; চুপ ক'রেই বসে রইলাম।

এক মিনিট মৌন থেকে মাসিমাই পুনশ্চ শুরু করলেন, 'তোমার মেসোমশাই-য়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় বিবাহের পরে—বন্ধুত্বের সূত্রে। আমার স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন উনি। যদিও ওঁর মতো উদার শান্ত ভদ্র মানুষের যে কী ক'রে আমার স্বামীর মতো লোকের অমন বন্ধুত্ব হ'ল তা আজও আমার কাছে

বিস্ময় হয়ে আছে। আমার স্বামী ছিলেন ঠিক ওঁর বিপরীত—সব দিক দিয়েই, কেবল শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়া। তিনিও এম. এ. পাশ করেছিলেন, সসম্মানেই করে-ছিলেন, কিন্তু শিক্ষার এমন শোচনীয় ব্যর্থতা আর কখনও দেখি নি বাবা! জমি-দারের ছেলে, অল্প বয়সে বাবা মারা যেতে অনেক পয়সাই হাতে পেয়েছিলেন, হয়ত শুধু বসে খেলে আজও সে পয়সার কিছু থাকত কিন্তু তিনি গেলেন সেই পয়সা বহুগুণ বাড়াতে। একটার পর একটা ব্যবসায়ে নামলেন কিন্তু প্রত্যেকবারই সে কারবার উঠে গেল। আমি স্ত্রীলোক, কখনও কর্মক্ষেত্রে নামি নি—তবে এটা তোমাকে বলে দিচ্ছি বাবা, একেবারে অসাধু লোক শেষ পর্যন্ত কখনও দাঁড়াতে পারে না। অর্থাৎ তাঁর মানসিক গঠনটাই ছিল এমন যে, তিনি কখনও সোজা কাজ করতে পারতেন না—ব্যবসায় নেমে প্রথম দিন থেকেই অসাধু পথে চলতেন।

'ব্যবসা যখন একে একে অনেকগুলিই দেখা হ'ল তখন তিনি ধরলেন চট্ ক'রে বড়লোক হবার সেই সর্বনেশে রাস্তা। শেয়ার মার্কেটে ঢুকলেন—এবং সেখান থেকে কয়েক মাসের মধ্যেই বেরিয়ে এলেন একবারে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে। তখন আমার পর পর তিনটি সন্তান হযে গেছে, সংসার খুব ছোট নয়—মাসে বেশ কিছু ক'রে টাকার দরকার। চাকরি করলে করতে পারতেন—অন্ততঃ একটা প্রফেসারী বা মাস্টারী তো পেতেনই—লেখাপড়াটা সত্যিই শিখেছিলেন—কিন্তু তিনি সে ধাব দিয়েই গেলেন না। তিনি ধরলেন এক অদ্ভুত পেশা—যেখানে যত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন ছিল সকলকার কাছে ব্যবসার নাম ক'রে টাকা ধার করতে শুরু করলেন। তার মধ্যে কতক টাকা দিতেন সংসারে—কতক টাকার জুয়াখেলা ও তার আনুষঙ্গিক ব্যবসা চলত।

'একসময় সে পথও বন্ধ হয়ে এল—কারণ একই লোক বার বার ঠকতে চায় না। দুশো পাঁচশো থেকে দু টাকা পাঁচ টাকায় পোঁছে—একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল রোজগার। তখন তিনি পুরোপুরি ধরলেন এঁকে, এই নির্বোধ বন্ধুটিকে। আগেও বহুবার নিয়েছিলেন কিন্তু সে থোক্ থোক্ টাকা—এখন একেবারে মাসিক বন্দোবস্ত ক'রে ফেললেন। এছাড়াও ওঁকে নানারকমে দোহন করতেন, সেটা পরে জানলুম। আমার স্বামী কী ক'বে টের পেয়েছিলেন, আমি টের পাবার অনেক আগেই পেয়ে-ছিলেন যে—আমার সম্বন্ধে এঁর কিছু দুর্বলতা আছে, উনি আমাকে একটু বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন। সেই দুর্বলতারই পূর্ণ সুযোগ নিতে লাগলেন তিনি—আজ আমার অসুখ, বড় ডাক্তার দেখাতে হবে—কাল দামী ওষুধ চাই—এমনি নানা অজুহাতে মধ্যে মধ্যেই মোটা টাকা আদায় করতেন। যেদিন সেটা টের পেলুম, এঁর কাছে অনুযোগ করলুম। তাতে উনি জবাব দিলেন, আমারও একটু সন্দেহ হয়েছিল উমা, কিন্তু যদি সত্যি হয়—যদি সত্যিই টাকার অভাবে তোমার চিকিৎসার ত্রুটি হয়—এই ভয়ে না দিয়ে পারি নি। তাতে আমি বলেছিলাম : আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করতেও তো পারতেন। তখন শুনলুম এমনই সব রোগের নাম করেন তিনি যে—সে রোগের কথা পরপুরুষকে মেয়েরা বলতে পারে

না। আমার লজ্জা পাবার ভয়েই উনি সে প্রসঙ্গ কোন দিন তুলতে পারেন নি।

'আমি মাথার দিব্যি দিয়ে এলুম যে, আমার কোন অসুখের খবরেই যেন এরকম বাড়তি টাকা তিনি না দেন। কিন্তু আমার স্বামীর এদিকে মাথা খুব সাফ—তিনি টাকাটা অন্যভাবে বার করার পন্থাও শীগ্‌গিরই আবিষ্কার ক'রে ফেললেন। অমানুষিক নির্যাতন চলতে লাগল আমার ওপর—এমনিও যথেষ্ট চলত কিন্তু এখন যেন সমস্ত সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। আর সেই নির্যাতনের সংবাদটি যাতে ঠিক ঠিক ওঁর কানে পেঁছিয়, সুচারু কৌশলে সে ব্যবস্থাটাও ক'রে ফেললেন। তাতে যা ফল তিনি আশা করেছিলেন তাই হ'ল—ইনি অর্থাৎ তোমার মেসোমশাই আমার স্বামীকে ডেকে গোপনে টাকা দিয়ে রফা ক'রে নিলেন। এর পর থেকে যখনই দমকা কিছু টাকা নেবার প্রয়োজন হ'ত—তিনি এই পন্থাতিই অবলম্বন করতেন, আর তাতে ফলও ফলত। আমি নিজে কখনও এঁকে সে নির্যাতনের কথা জানাই নি, নীরবে মুখ বুজে সব সহ্য করেছি। কিন্তু যে জানাবার সে জানাত। এ রহস্যটাও আমি অনেক পরে জেনেছিলাম, বাধাও দিয়েছি ঢের, অনেক দিব্যি দিয়েছি কিন্তু কোন ফল হয় নি। বার বার, শুধু আমাকে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে উনি সর্বস্বান্ত হয়েও টাকা যুগিয়েছেন আমার স্বামীকে। আমার কষ্ট হচ্ছে—এ কল্পনাও উনি সহ্য করতে পারতেন না।

'এই ভাবে চলল দীর্ঘকাল। বহু বৎসর এই দীনতা, এই লাঞ্ছনা এবং অপমানের মধ্যে কাটিয়েছি বাবা। ইনি বিবাহ করেন নি—কেন করেন নি, তা আমি জানি। পাছে আমার সংসার না চলে, আমার ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে না পারি—এই ভয়েই করেন নি। আমাদের সব খরচাই যোগাতে হ'ত ওঁকে, আর উনি হাসিমুখেই তা যোগাতেন। আমি অনেক নিষেধ করেছি, অনুরোধ করেছি—আমার ভার ভাগ্যদেবতার ওপর ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে আমাদের জীবন থেকে, বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হ'তে—কিন্তু উনি তা শোনেন নি। তখনকার দিনে দেড় হাজার টাকা মাইনে পেতেন—সবই ঐ অপদার্থ অমানুষ লোকটাকে ধরে দিয়ে নিজে কপর্দক-শূন্য হয়ে যেতেন। এক এক সময় নিজের একটা ধুতি কেনবারও টাকা থাকত না।

'সব দুঃখ সব লাঞ্ছনা একটা আশাকে ধরে সহ্য করেছিলাম বাবা! মনে করেছিলাম ছেলেরা বড় হ'লে, মানুষ হ'লে আমার দুঃখ ঘুচবে। ছেলেরা বড় হ'ল, লৌকিক অর্থে হয়ত মানুষও হ'ল—কারণ সকলেই লেখাপড়া শিখে কোন না কোন ভদ্র জীবিকার পথ ধরল—কেবল আমার দুঃখই ঘুচল না। বিচিত্র কারণে—হয়ত আমার পূর্বজন্মের পাপের ফলেই—এই সব ক্ষেত্রেই পূর্বজন্ম মানতে হয় বাবা, নইলে এ জন্মে এত অবিচার পাবার মতো কোন পাপ তো করি নি—ছেলে-গুলো সব গেল বাপের দিকে। বাপের কিছু কিছু বদ্ স্বভাবও পেলে। তাঁর মতো অতটা না হ'লেও, তারা প্রত্যেকেই কটুভাষী, কুটিল, সন্দিগ্ধ এবং অর্থলোভী হয়ে উঠল। বড় ছেলেটি দু'বছরের মধ্য তিনবার অফিস বদলাল—প্রত্যেকবারই চুরির সন্দেহে অফিসে গোলমাল হ'ল। চুরি প্রমাণ করতে পারে নি

কিন্তু চোর কে তা জেনেছে। আমি জানি এর পরিণাম কি, শেষ পর্যন্ত তাকে জেলে যেতেই হবে।

'যাক গে সে কথা। তাদের ভাগ্য তারা বুঝবে, তাদের জন্যে আমি চিন্তা করি না। নিজের কষ্টও সয়ে সয়ে মনের ওপর কড়া পড়ে গেছে, তা আর বিচলিত করতে পারে না। কিন্তু আর এক নতুন উপসর্গ দেখা দিল। ও'র পেনসন্ হয়ে গেল—আয় গেল কমে। আর ঠিক সেই সময়টাই পর পর কয়েকটা অসুখে পড়লেন—তাতে ডাক্তারে ওষুধে অনেক খরচা হয়ে গেল। আমার স্বামীর দিকে হাতটা বন্ধ করতে হ'ল। আমার স্বামী গেলেন ক্ষেপে। সংসারের জন্যে আর দরকার ছিল না। কারণ ছেলেরা রোজগার করছে—দরকার ছিল তাঁর নিজের। আর সে সব দরকারের তো শেষ নেই! শেষে যখন শুনলুম ইনি নিজের পেন্সন খানিকটা বেচে তাঁর চাহিদা মেটাতে চাইছেন, তখন একদিন এঁর পা ছুঁয়ে দিব্যি করলুম যে তা হ'লে আমি নিজের গলা ও'র সামনেই বঁটি দিয়ে কেটে ফেলব। তাতে কাজ হ'ল—ইনি পিছিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি উঠলেন ক্ষেপে। নির্যাতনের পদ্ধতি বদলাল, ছেলেরা বড় হওয়ায় গাযে হাত তুলতে পারতেন না, কিন্তু গালি-গালাজে সেটা পুষিয়ে নিলেন। ছেলেদের চাকরদের সামনেই কুৎসিত ইঙ্গিত করতে লাগলেন এঁকে জড়িয়ে। যখন টাকার দরকার ছিল আর সে টাকা ওখান থেকে আসত—তখন তিনিই এক একদিন আমাকে আভাসে ইঙ্গিত উৎসাহিত করেছেন, এঁর অসুখের সময় এ র বাড়ীতে গিয়ে দেখে আসতে বা একা এঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে। কিন্তু সে প্রস্তাবের মধ্যে যে অপমান আছে সেই অপমানের জন্যেই আমি কখনও তা করি নি—ইনিও কখনও সে ধরণের দাবীর কথা ভাবতে পারেন নি। তখনও পর্যন্ত প্রণাম করা ছাড়া এঁকে স্পর্শ করি নি।...আজ এত কাল পরে এই প্রকাশ্য দুর্নামে আমি কাঠ হয়ে গেলাম।

'শেষে চরমে উঠল একদিন, যেদিন খবর পেলাম ইনি তিন দিন জ্বরে শয্যা-গত, তার মধ্যেই ও'ব চাকরটি বাড়ীর কী খবর পেয়ে দেশে চলে গেছে। এ-পাড়া ও-পাড়া। শুনেই সাগু তৈরী ক'বে মেজছেলেটাকে বললুম—এটুকু পৌঁছে দিয়ে অফিস যা, আর বলিস আমি সন্ধ্যার সময় আবার খানিকটা তৈরী ক'রে নিয়ে যাব তোদের কারুর সঙ্গে। তার জবাবে সে বলল, আর কেন মা, কেলেঙ্কারি তো ঢের হ'ল—এবার এসব ছাড় না! আমরা বড় হয়েছি, আমাদের যে লজ্জা করে!

'আমি কিছুক্ষণ কোন কথা কইতে পারি নি—এটা বেশ মনে আছে। তার পর বললুম, কী বলছিস ঠিক ক'রে স্পষ্ট ক'রে বল দিকি! সে মুখটা গোঁজ ক'রে বললে, এর আর বলাবলি কি, আমাদের কি আর কিছু বোঝবার বয়স হয় নি এখনও? বাবা ঢের সহ্য করেছেন—এখন বুড়োবয়সটায় ওঁকে একটু শান্তি দাও না! আমি শুধু বললাম—একটু সময় লাগল বলতে—বললাম, যদি বোঝবার বয়স হ'ত সত্যিই তো বুঝতিস যে তোদের দেহের প্রত্যেকটি বিন্দু রক্তের জন্যেও তোরা তাঁর কাছে কত ঋণী। কিছুই বুঝিস নি—যে বীর্যে তোদের জন্ম—তাতে

মহত্ত্ব কৃতজ্ঞতা কিছু বোঝবার কথা নয়, সেইটেই ভুলে গিয়েছিলুম। আর সহ্যের কথা—সহ্য আমিই ঢের করেছি, এবার সেইটেই বন্ধ করতে চাই, ছুটি চাই।

'সেই শেষ। তখনই এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসেছিলাম। এবং জোর ক'রে সেই জ্বর অবস্থাতেই ওঁকে নিয়ে চলে এসেছিলাম চিরদিনের মতো কলকাতা ছেড়ে। লজ্জা? না লজ্জা নয় বাবা—ঘেন্না। পাছে কোনদিন ওদের মুখ দেখতে হয়, ওদের নাম কানে আসে এই ভয়েই চলে এসেছি চিরদিনের মতো। উনি আসতে চান নি—সংস্কার বাধা দিয়েছিল কিন্তু আমি যখন পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা ক'রে ফেললুম তখন রাজী হলেন। আমার কষ্ট উনি একটুও সইতে পারেন না।'

এই বলে থামলেন মাসিমা। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন, 'সব কথাই তোমাকে খুলে বললুম বাবা, এর পর ঘেন্নায় কথা না কইতে চাও না কয়ো—আমি ক্ষুণ্ণ হব না। তেমনি লজ্জিতও হব না আমাদের আচরণের জন্যে। কোন অন্যায় করেছি এ আমি মনে করি না। একটা দেবতার মত মানুষের ওপর ভগবান আর মানুষে মিলে কেবলই অবিচার ক'রে যাবে—এ আমি সইতে রাজী নই। তাছাড়া স্বামীর ঋণ স্ত্রীর শোধ করাই উচিত—সেই ঋণই আমি শোধ করছি। ওঁর জীবনের বাকী ক'টা দিন যদি একটু সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে সামান্য কিছুও মধুর ক'রে তুলতে পারি তো অনেকখানি ঋণের একটুখানি শোধ হবে। সেই চেষ্টাই করব—যে ক'টা দিন আমি বাঁচি বা উনি বাঁচেন।'

এই বলে তিনি আবারও চুপ করলেন। এবার জপের মালা আবার নড়ল। সম্ভবতঃ জপেই মন দিলেন আবার।

রাত গভীর হয়ে এসেছে, অন্ততঃ হৃষীকেশের পক্ষে। পথ-ঘাটে লোক চলাচলের শব্দ এসেছে বিরল হয়ে। চারিদিকে নেমেছে একটা সুমধুর শান্ত স্তব্ধতা। শুধু—সন্ধ্যার পর থেকে একটা বাতাস ওঠে এখানে—তারই সাঁ সাঁ শব্দ উঠছে চারিদিকের গাছপালার পল্লবমর্মরে। আর তার সঙ্গে শোনা যাচ্ছে দূরাগত উপলাহত গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি। একটা অপূর্ব পবিত্র পরিবেশ।

আমি হেঁট হয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বললাম, 'অনেক দিনই আপনার পায়ে হাত দিতে সাধ হয়েছে মাসিমা—সাহস হয় নি। আজ সেই সাধটা মিটিয়ে নিলাম।'

তিনি চিবুক স্পর্শ ক'রে কল্যাণাশীর্বাদ জানালেন।

বাসর শয্যা

ব্যবস্থাটা মন্দ লাগে নি অশোকের। ফ্লোরেসেন্ট বাতির কটকটে আলোটা আর যা-ই হোক, নববধূর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পক্ষে খুব অনুকূল নয়। ওর বিশ্বাস ওতে কিছুটা স্বপ্নভঙ্গ হয়। কোন কোন সবজী যেমন কুয়াশাতেই পরিপুষ্ট হয়

তেমনি রোম্যান্স বস্তুটা আধা-আলোতেই জমে ভাল। উজ্জ্বল আলো রূঢ় বাস্তবের মতই—স্বপ্ন বা রোম্যান্সের চিরশত্রু, কঠোর আঘাতে কেবলই তথ্য-সচেতন করতে চায়।

তাই এ বাড়ীর কোন এক প্রাচীনা মহিলা যখন সেই প্রায়-শেষরাতে ইলেকট্রিক আলোগুলো নিভিয়ে একটি ঘৃতের প্রদীপ জেলে দিয়ে চলে গেলেন, অশোক বেশ উৎফুল্ল হয়েই উঠেছিল। ওদের সংস্কারে অবশ্য এটা নেই, পশ্চিমবঙ্গের ছেলে সে —জন্মাবধি দেখে এসেছে যে বাসর ঘরে হৈ-হল্লা ক'রে রাত জাগতে হয়। 'বাসর জাগা' মেয়েদের একটা উৎসবের ব্যাপার। অশোক নিজেও সেইটে পছন্দ করে, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বহুবার সে এ নিয়ে তর্কও করেছে, বলেছে, 'একবারে অপরিচিত মেয়ে ও পুরুষ গ্রন্থিবন্ধনের দুঘণ্টার মধ্যেই প্রণয়লীলা শুরু করবে এ কল্পনাটাই রিভোল্টিং। ঘরের জিনিস ঘরে আসুক, দুটি অপরিচিত মানুষ বহু-লোকের ভীড়ে মাঝে মাঝে চকিতে এক আধবার পরস্পরকে চুরি ক'রে দেখে নিক —দুটো একটা কথা চলুক অপরকে উপলক্ষ ক'রে—তারপর নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই পরম ঈপ্সিত ক্ষণটি উপস্থিত হোক—তবে তো বুঝব চিরজীবনের মত অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবন্ধ হ'ল যে দুটি নবীন প্রাণ, তাদের প্রথম পরিচয়ের শুভলগ্নটির উপযুক্ত পৃষ্ঠপট রচিত হ'ল। তা নয়, সারাদিন উপোষ ক'বে থেকে দুজনেই ক্লান্ত বিরক্ত, একবার দেখেও নি হয়ত কেউ কাউকে, অমনি শুরু হয়ে গেল প্রণয়-লীলা—না ভাই মাপ করো, ও আমার ভাল লাগে না। সব জিনিসেরই একটা উপযুক্ত ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড থাকা দরকার। যেখানে বরকনে দুজনেই দুজনের পরিচিত—অর্থাৎ লভ-ম্যারেজ—সেখানকার কথা আলাদা কিন্তু যেখানে নেগোসিয়েটেড ম্যারেজ—অভিভাবকদের স্তরে বিবাহ ঠিক হয়—সেখানে প্রথম পরিচয়টা ফুলশয্যার রাত অবধি মুলতুবি থাকাই ভাল।"

এ তর্কের শেষ নেই, কেউ ওকে সমর্থন করেছে কেউ করে নি। বড় বেশী কবিয়ানা করে অশোক, এ অভিযোগ উভয় পক্ষই করেছে। পূর্ববঙ্গের বন্ধুরা পুরাণ উপকথা থেকে নজীর তুলে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে—বাসরঘরে প্রথম পরিচয়ের রীতিটাই এদেশের সনাতন রীতি।

কিন্তু সে সবই তর্কের খাতিরে তর্ক। অশোকের পছন্দ-অপছন্দর ওপর অভিভাবকরা কেউ বিশেষ জোর দেন নি। সম্ভবত অশোক নিজেও না। বিয়ে যখন সে পূর্ববঙ্গের মেয়েকেই করছে তখন তাদের বাড়ীর আচার-অনুষ্ঠানে তাদের মতই মানা উচিত। ওর বাবার আবার বিশেষ ক'রে এ বিষয়ে অত্যন্ত আধুনিক মতবাদ। তিনি বলেন, 'একই দেশের লোক আমরা—পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে ভেদ থাকা উচিত নয়। বিশেষ ক'রে যখন এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি—তখন আমাদের, মানে পশ্চিমবঙ্গের লোককেই সব সংস্কার ত্যাগ ক'রে ওদের আপন ক'রে নিতে হবে। তাছাড়া আমাদের রীতিনীতিই ভাল আর অভ্রান্ত—এ অহঙ্কারই বা আমাদের থাকবে কেন।'

অশোকের বাবা অমূল্যবাবু কোন কথা মুখে বলে নিরস্ত থাকার লোক নন। তিনি অগ্রণী হয়ে—কাজেও ক'রে দেখালেন। পরিবারের প্রায় তাবৎ লোকের অমতে শহরতলীর এক উদ্বাস্তু কলোনী থেকে এই মেয়েটিকে নির্বাচন করলেন পুত্রবধূ রূপে। এঁরা প্রথমে মেয়ে দেখাতেই রাজী হন নি। ধনী পিতার শিক্ষিত রূপবান পুত্র—শিবপুরের পাসকরা ইঞ্জিনীয়ার, খুঁটির জোর থাকায় পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই মোটামাইনের চাকরি পেয়ে গেছে—এ ছেলের জন্যে অনায়াসে পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করতে পারে—এমন পাত্রীপক্ষের অভাব নেই। শুধু ছেলের উপযুক্ত বরাভরণ এবং দানসামগ্রী যোগাতেই হয়ত এদের সামান্য কুঁড়েটুকু বিক্রি হয়ে যাবে। মেয়ের বাবা এই কলোনীরই এক ইস্কুলে মাস্টারী করেন, এক পয়সারও সঙ্গতি নেই আর। পূর্ববঙ্গ থেকে যা আনতে পেরেছিলেন তা সব দিয়েও এই সামান্য বাড়ীটুকু শেষ হয় নি—বিস্তর দেনা আছে মাথার ওপর। গহনাপত্রের কথা তো উঠছেই না—'ঘটি'দের সঙ্গে কাজ করতে গেলে যা তত্ত্ব-তাবাস করতে হয়, সেইটেই তো একটা ভয়াবহ ব্যাপার।

কিন্তু অমূল্যবাবু আগেই বলে দিয়েছিলেন, আমরা যে কিছু চাইব না তাই নয়—দিলেও নেব না। মেয়েকে শাড়ী এবং সামনের হাতে একটা কিছু বালা বা ব্রোঞ্জের চুড়ি যা হোক—এবং ছেলের ধুতি চাদর আংটি—এই পর্যন্ত আপনারা দিতে পারেন। তার বেশি দিলে আমি সেখানে রেখে আসব।

সেই ভরসাতেই এঁরা এগিয়েছিলেন। অমূল্যবাবু আরও বলে দিয়েছিলেন, 'আমরাও গায়ে-হলুদে দই মাছ কাপড় ছাড়া কিছু পাঠাব না—আপনারাও ফুল-শয্যাতে শুধু ফুল মিষ্টি আর কাপড় দেবেন। তাহলে কোন পক্ষেই কোন কথা উঠবে না।' শুধু একটি ব্যাপারে অমূল্যবাবু একটি অনুরোধ করেছিলেন—বিবাহটা কলকাতায় কোথাও এসে দিতে। এঁরা তাতে আপত্তি করেন নি। মেয়ের মামা যে বাড়ীতে ভাড়া থাকেন, সে বাড়ীর অপর ভাড়াটেরা সহযোগিতা ক'রে সেই বাড়ীতেই বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। চল্লিশ জন বরযাত্রী খাওয়াবেন এঁরা, এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন এবং আত্মীয়স্বজন মিলে দু'একখানা হাল্‌কা গহনা দিয়েও সাজিয়ে দিয়েছেন মেয়েকে। অমূল্যবাবু আপত্তি করলে মেয়ের বাবা বলেছেন, 'আমরা তো দিইনি—পাঁচজনে দিয়েছে। কলোনীর লোকেরা চাঁদা ক'রে কানের গহনাটা দিয়েছে, মাস্টার মশাইরা দিয়েছেন হেয়ার পিন্—এমনি ভাবেই এসেছে সব। স্নেহের উপহার—কাজেই আমি আর আপত্তি করতে পারি নি।'

অর্থাৎ বিয়েটা বিয়ের মতোই হয়েছে।

অশোক অবশ্যই গহনা টাকা বা বরাভরণ নিয়ে মাথা ঘামায় নি। ঘামাবার কথাও নয়। বিধাতা তার কোন অভাবই রাখেন নি যখন কোন জিনিসে, তখন শ্বশুর কি দিলে না দিলে সে হিসাবটা তার কাছে তুচ্ছ। তার উৎকণ্ঠা ছিল মেয়েটি সম্বন্ধেই—কিন্তু পাকাদেখার পর ফিরে এসে মামা পিসেমশাই কাকার দল যখন সকলেই ওর বাবার পছন্দর প্রশংসা করলেন—তখন আর কোন উদ্বেগ রইল না।

পাত্রী—বাবা আর মামা দুজনে দেখেই পছন্দ করেছিলেন। ওর মা একবার ক্ষীণ-কণ্ঠে বুঝি ছেলেকে দেখাবার কথাটা পাড়তে গিয়েছিলেন, স্বামীর কাছে ধমক খেয়ে চুপ ক'রে গেছেন। অমূল্যবাবু বলেছেন, 'ওসব ফিরিঙ্গিয়ানা আমার কাছে চলবে না। আমি পছন্দ ক'রে দিচ্ছি সে-ই ঢের। কেন, আমি কি কানা ? না কি ছেলের জ্ঞান বুদ্ধি আমার চেয়ে বেশী ? আমার বাবার পছন্দ ক'রে দেওয়া মেয়ে নিয়ে আমি যদি বত্রিশ বছর কাটিয়ে দিতে পেরে থাকি, আমার ছেলে পারবে না ?'

অশোক অবশ্য নিজে দেখবার খুব পক্ষপাতীও নয়—সে বলে, 'নিজে না দেখলে তবু সারপ্রাইজ থাকে। অনেক সময় আনপ্লেজাণ্ট সারপ্রাইজও অদৃষ্টে মেলে হয়ত—কিন্তু তবু তা সারপ্রাইজ। নিজে দেখলে আর কৌতূহল থাকে না, বিয়ের রঙ অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। শুধু আমি যাদের বিশ্বাস করি, যাদের মতামতের ওপর আমার কিছু শ্রদ্ধা আছে—এমন কজন সার্টিফাই করলেই আমি খুশী !'

একটা আশঙ্কা ছিল তার খুব বেশী—সেইটেই সে আগেভাগে মামাকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়েছে, 'কেমন দেখলে বড় মামা—র‍্যাদার বলো কেমন শুনলে, কথাগুলো খুব বাঁকা নয় তো ?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'দূর পাগল ! বলতে গেলে তো কুষ্ঠেরই লোক ওরা—ওদের কথা মিষ্টি কত ! বলি ওটা তো নদে জেলা ছিল ক-দিন আগেও। ঐ তো ঐখানে বসেই তোমাদের রবিঠাকুর ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা লিখেছে—'

'ব্যাস ! ব্যাস ! কবিতায় আমার কাজ নেই—ঝগড়া করার সময় আমাদের মতো বুলিতে ঝগড়া করলেই আমি খুশী !'

না, অশোক পাকা দেখার পর থেকে নিশ্চিন্তই হয়েছিল। সেই সঙ্গে একটু বেশী উৎসুকও। ভালো জিনিস উপহার পাবে শুনলে ছোট ছেলেরা যেমন উৎসুক হয়, তেমনি। সেই জন্যই মেয়ের কোন প্রবীণা আত্মীয়া যখন নিয়ম-মাফিক ঘৃত-প্রদীপ জেবলে, আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেলেন—বর ও কনেকে বাসর-শয়নের সুযোগ দিয়ে, তখন অশোকের মনে হ'ল—এ পক্ষেও কিছু বলবার আছে, এ প্রথাটাও একেবারে মন্দ নয়।

অশোকের অধীরতার আরও একটা কারণ ছিল।

শুভদৃষ্টির সময় ওর মনে হয়েছিল যে, মুখটা ওর চেনা-চেনা ; এর আগে কোথায় যেন একবার দেখেছে। তখন অবশ্য চকিতে দেখা—বহু লোকের ভীড়ে, ঠেলা-ঠেলিতে—কোলাহলে বিদ্রূপে রসিকতায় সে সময়টা মনে একরকমের বিভ্রান্তি আসে, তার ওপর পাত্রীও মুখ তুলতে বা চোখ মেলতে চায় না সে সময়—সুতরাং সে দেখার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া যায় না। তবু ঐ ধরনের একটা ধারণা মনের মধ্যে রয়েই গেছে সেই থেকে। কোথায় যেন একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই মুখ-খানার সঙ্গে—একটা বিস্বাদ, অপ্রীতিকর স্মৃতি, তাই চোখে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে

কেমন একটা তিক্ত স্বাদ লাগল মনে। অথচ সে তিক্ততার কোন বাহ্য কারণ নেই। অসামান্য সুন্দরী হয়ত নয়—তবে যে তার জীবনে জীবসঙ্গিনী এবং আপাতত প্রথম-প্রণয়ভীতা নববধূরূপে আসছে, সে যে বেশ সুশ্রী দেখতে—অশোকের পছন্দসই রকমেরই সুশ্রী—তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে রূপে মন ভরে যাওয়ারই কথা।

কে জানে, অন্য কোন পরিচিত মেয়ের সঙ্গে মুখের সাদৃশ্য আছে হয়ত—এমন বিচিত্র সাদৃশ্য অনেকের সঙ্গে অনেকের থাকে। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ভিন্নভাষাভাষী বিভিন্ন প্রান্তের লোকের মধ্যেও থাকে।

কিন্তু যার সঙ্গে, যে মুখের সঙ্গে এর এমন সাদৃশ্য—সেটাই বা কার? কখন কি উপলক্ষে পরিচয় হয়েছিল তার সঙ্গে? কেনই বা মনে মনে এ কষায় স্বাদ অনুভব করছে অশোক?…এই কথাগুলোই সেই থেকে ভাবছে সে, সব ক্রিয়া সব অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকেই ভাবছে, আর কিছুতেই মনে পড়ছে না বলে কেমন এক রকমের অস্বস্তি বোধ করছে।

সেই জন্যেই তার আরও আগ্রহ, আরও ঔৎসুক্য।

নির্জন নিভৃতে সে আর একবার ভাল ক'রে দেখতে চায় নববধূর মুখখানা।

ওধারে তখনও কিছু কোলাহল আছে, উৎসবগৃহের কর্মক্লান্ত গৃহবাসীর জটলা—তা থাক। এদিক থেকে সবাই বোধ হয় সরে গেছে। শেষ পদধ্বনি মিলিয়ে গেছে মিনিট দুই তিন আগে। অশোক আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দরজার খিলটা তুলে দিয়ে এল— অমনি কানপেতে শুনেও এল—বাইরে কারও আড়ি-পাতার ফিসফিসানি অথবা রেশমী শাড়ীর খসখসানি শোনা যাচ্ছে কিনা। তারপর ফিরে আবার বিছানায় বসে মৃদু কোমল বাহুবন্ধনে বধূকে জড়িয়ে কাছে টানতে গেল—

ও পক্ষের লজ্জা তো আশাই করা যায়। সেটা থাকবে—এবং থাকা উচিতও। কিন্তু এ যেন—অন্তত অশোকের তাই মনে হ'ল—এ যেন বড় বেশী কাঠ হয়ে আছে না?

আর একটু কেন—অনেক খানিই জোর দিতে পারত অশোক। আর ওর ব্যায়াম-পুষ্ট সে হাতের টান সামলানো ঐটুকু মেয়ের পক্ষে সম্ভবও হ'ত না। কিন্তু প্রথম পরিচয়টা গায়ের জোরে করা শোভন নয়। অশোকই আর একটু সরে একেবারে কাছে এল এবং আরও নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরল বৌকে।

কিন্তু এ কি, এত কাঁপছে কেন মেয়েটা? থর থর ক'রে কাঁপছে—আর সেই সঙ্গে কি কাঁদছেও?

এ কি সবটাই লজ্জা? লজ্জায় কি এত কাঁপে? আর কান্নাই বা কেন? আজ-কালকার মেয়েরা কি কাঁদে?

এসব অশোকের অভিজ্ঞতার বাইরে। তার অপর দু-চার জন বন্ধুর মুখে যা শুনেছে তার সঙ্গে মেলে না এসব। সে একটু বিব্রতই বোধ করল।

আস্তে আস্তে ডাকল, 'মিনতি!'

মনে হ'ল—অন্তত আলিঙ্গনের মধ্যে যা অনুভব করল ওর অবস্থা—আরও কেঁপে উঠল ও।

না—তাহ'লে লজ্জাই! অশোক মনে জোর এনে—ডান হাতে জোর ক'রেই মিনতির ওদিকে ফেরানো মুখখানা এদিকে ফিরিয়ে আলোর দিকে তুলে ধরল। আবারও ডাকল—'মিনতি'!

কাঁদছেই সে, বহুক্ষণ ধরেই হয়ত নিঃশব্দে কাঁদছে। নবোঢ়ার সুকুমার কপোলের পত্রলেখা সে অশ্রুতে ধুয়ে মুছে গেছে অনেকক্ষণ। এ কান্নার মূলে শুধুই কি আসন্ন আত্মীয়-বিয়োগ আশঙ্কা? তাহলে মুখ এমন বিবর্ণ, এমন রক্তহীন কেন? লজ্জা কি সুখের বিন্দুমাত্র চিহ্নও তো নেই এতে। বরং যেন কোন এক অজ্ঞাত আতঙ্কেই এমন পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে।

এ কি শ্বশুর-বাড়ী সম্বন্ধেই ভয় শুধু!

ঘৃত-প্রদীপের সামান্য আলো—তবু ছোট ঘরে সে আলো খুব কম নয়। অস্বাভাবিক বিবর্ণতা ভুল বোঝবার কোন কারণ নেই।

ভয়! ভয়েই দিশাহারা হয়ে গেছে বেচারা। অকস্মাৎ একটা প্রবল মমতা বোধ করল অশোক ওর এই 'প্রথম প্রণয়ভীতা' বধূ সম্বন্ধে। আরও কোমলকণ্ঠে বলল, 'মিনতি, তোমার ভয় করছে আমাকে—?'

এবং তারপর ঝুঁকে-পড়া মুখটা আবার তুলে নিজের দিকে ফিরিয়ে পরম স্নেহে ও মমতায় সেই পুষ্পকোরকের মতো বিকশিত দুটি ওষ্ঠে দাম্পত্য-জীবনের প্রথম চুম্বন অঙ্কিত করতে গেল সে—

আর তখনই মনে পড়ে গেল। স্মৃতিটা বিদ্যুতের স্পর্শের মতোই যেন এক নিমেষে দেহের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একটা প্রচণ্ড বিস্ময় ও সুতীব্র বেদনার অনুভূতি জাগিয়ে চলে গেল।

চিনতে পেরেছে সে। আর ভুল হবে না। সংশয়ের এতটুকু অবকাশ নেই আর।

অধরোষ্ঠের এই বিচিত্র সুন্দর গঠন, আর ওষ্ঠের উপরে এই মুক্তাবিন্দুর মত ঘাম জমে থাকা—তাকে সেদিনও মুগ্ধ করেছিল। মুগ্ধ করেছিল বলেই বার বার চেয়ে দেখেছিল—আর তাই এত ভাল মনে আছে। অন্তরের সুগভীর লজ্জা ও বেদনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ মুখখানা। আর সেই জন্য শুভদৃষ্টির সময় থেকেই এই কষায় স্বাদ অনুভব করছে সে।

নিবিড় বাহুবন্ধন আপনিই শিথিল হয়ে আসে—সেই বৈদ্যুতিক অনুভূতিটা মস্তিষ্ককে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই। চিবুক থেকেও হাতটা নেমে আসে আপনা-আপনিই। উদ্যত চুম্বন যেন চাবুক খেয়ে ফিরে যায়। অস্পষ্ট আর্তনাদের মতই অশোকের কণ্ঠ থেকে স্বর বেরিয়ে আসে—'টুকু!'

যেন এই ডাকটুকুর জন্য, এই কণ্ঠস্বরটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিল মিনতি —অশোকের সদ্য-পরিণীতা নববধূ, সে মূর্ছাহতের মতোই নিঃশব্দে আছড়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে, বিছানায় মুখ চেপে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

টুকু!

ওর জীবনের সবচেয়ে বড় লজ্জা ও অপমান, বৃহত্তম কলঙ্কের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নামটা। এখনও সেকথা মনে হ'লে দিনের আহার ও রাত্রের নিদ্রা চলে যায়। জীবনে কোন আনন্দের স্বাদ থাকে না।

সেই টুকুই ওর নবপরিণীতা বধূ মিনতি! বাবা যাকে অনেক খুঁজে অনেক যত্ন ক'রে নির্বাচন করেছেন! বহু অর্থ ব্যয় ক'রে নিয়ে আসছেন গৃহলক্ষ্মী ক'রে!

বেশী দিনের কথাও তো নয়। মাত্র দু' বছর হয়েছে হয় তো। অথবা অতও নয়। প্রথম নজরেই ওর চেনা উচিত ছিল।

সেদিনের কথাটা তো স্পষ্ট মনে আছে।

কুণাল। কুণাল সেনই ওর জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্গ্রহ, ওর জীবনের বড় অভিশাপ।

ইণ্টারমিডিয়েটের একটি বছর মাত্র পড়েছিল কুণালের সঙ্গে। এক বছরও পুরো নয়। কেন না তার আগে আরও দুবছর ধরে ঐ ক্লাসেই আছে কুণাল—ইণ্টারমিডি-য়েটের ফলাফল বেরোবার পর সে আবার ক্লাসে আসে, তার পর টেস্ট পর্যন্ত—কটা মাসই বা।

তবু ঐ কটা মাসের মধ্যে কুণালের অদ্ভুত প্রভাব পড়েছিল অশোকের ওপর। হয়ত বেশী বয়সই তার একটা কারণ। কুণাল ম্যাট্রিকটাও পাশ করেছিল বছর তিনেকের চেষ্টায়। বয়স যা তার চেয়ে বেশীই দেখাত বরং—লম্বা চওড়া বিরাট চেহারা ছিল কুণালের। অনেক বেশী বয়সের জোয়ান একটা লোক যদি যেচে বন্ধুত্ব করতে আসে তো অল্প-বয়সী ছেলেরা তার ব্যক্তিত্বে একটু অভিভূত হয়ে পড়বেই। তাছাড়া অশ্লীল রসিকতা এবং নোংরা অভিজ্ঞতার অসংখ্য কাহিনী সর্বদা যেন তার রসনাগ্রে যুগিয়ে থাকত। সতের বছরের ছেলের পক্ষে সে-ও একটা প্রবল আকর্ষণ। অশোক ধনীর সন্তান কিন্তু বাপের শাসনে মানুষ হয়েছে সে। সাধারণত সতের বছরের ছেলেরা আজকাল যতটা পাকে ততটা পাকবার সময় ও সুযোগ পায় নি। সেইটেই যেন এখন পুষিয়ে নিতে চাইল ও। কুণালের গল্প-রসিকতা-ইঙ্গিত দুই চোখ ও কান দিয়ে পান করতে শুরু করল।

আই-এস-সি পরীক্ষার পরই অবশ্য ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। কুণাল আবারও ফেল করল এবং অশোক সসম্মানে পাস ক'রে—শিবপুরে ভর্তি হ'ল। কিন্তু যোগাযোগটা তাতে বিচ্ছিন্ন হ'ল না একেবারে। কারণ কুণালের লেখাপড়ার আশা ওর বাবা-মাও এতদিনে ছেড়ে দিয়েছেন, কলেজে নামটা লেখানো আছে বটে—বাড়ীতে পড়াবার প্রোফেসর আর নেই। পড়ছে কিনা, কলেজে যাচ্ছে কিনা তাও তাঁরা আর প্রশ্ন করেন না! অতএব সে এখন বেপরোয়া। অর্থের অভাব তারও ছিল না—উপার্জনের চেষ্টা করার তাগাদা তো ছিলই না। সে প্রায় প্রত্যহই পয়সা খরচ ক'রে শিবপুর যেতে আরম্ভ করল। প্রথম প্রথম শুধু অশোকের টানেই যেত

অবশ্য কিন্তু শিগগিরই ওদের হোস্টেলেও কুণালের একটি বিরাট ভক্তচক্র গড়ে উঠল। কুণাল কলকাতার আড্ডা ছেড়েই দিল বলতে গেলে।

অশোকের একটা সুবিধা এই ছিল যে, এই আড্ডা ওর কাছে মুখরোচক হয়ে উঠলেও সর্বস্ব হয়ে ওঠে নি। সে লেখাপড়াটা নষ্ট করে নি এবং স্ত্রীলোক-ঘটিত আলোচনা যতই প্রিয় বোধ হোক, আলোচনার বাইরে সে পদার্পণ করে নি কখনও। তবে কুণালের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এ বিষয়ে তার সংস্থানও ছিল বিস্তর। সে বহুদিন থেকেই এসব শুরু করেছে এবং ভদ্র-অভদ্র কিছুরই তার অভাব ছিল না। ওর হোস্টেলের বহু ছেলেকেই এ দিকে পথ দেখিয়েছে কুণাল। কিন্তু অশোকের এ বিষয়ে অত্যন্ত একটা বিতৃষ্ণা ছিল, তাছাড়া একটু রুচি-বাগীশও ছিল ও। পণ্য-মূল্যে যে স্ত্রীলোক পাওয়া যায় বা সহজে মেলে, সে রকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হওয়ার কথা ভাবতেই পারত না। আর প্রণয় বাদ দিয়ে শুধু সম্ভোগ—তাতে ছিল তার আরও অরুচি।

ইদানীং কুণাল তাকে প্রায়ই তাতাত যে সম্ভ্রান্ত ভদ্র-ঘরের মেয়েও সে সরবরাহ করতে পারবে। শহরের আশে-পাশে উদ্বাস্তু সমাগম হওয়াতে এ বিষয়ে খুব সুবিধাই হয়ে গেছে কুণালের।

একদল লোক—তারাও উদ্বাস্তুই—স্বদেশবাসীর দুর্গতির সুযোগে বেশ দু পয়সা উপার্জন করছে—সেইসব লোকের মধ্যস্থতাতেই কুণালের এত সুবিধা হয়ে গেছে। এই সব মেয়েদের কেউ আসে অভাবে—তারা অভিভাবকদের জ্ঞাতসারেই আসে—কেউ আসে স্বভাবে। উপার্জনটা তারা নিজেরাই করতে চায়।

কিন্তু এসব তথ্য নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না কুণালের। কোন রুচির ঔৎকট্যও ছিল না। আর অশোকের জন্য কিছু তার সম্ভোগও আটকাত না। কিন্তু ওর এইটুকু ব্যবধান রক্ষা, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার এই সামান্য চেষ্টা—এটাকে কুণাল তার ব্যক্তিগত পরাজয় বলেই মনে করত। তাই তার চেষ্টার শেষ ছিল না, অশোকের এই সংযমের বাঁধটুকু ঘুচিয়ে দেবার।

অশোক অবশ্য বহুদিন অবধি তার রুচিতে ও যুক্তিতে দৃঢ় ছিল। ভদ্রই হোক আর সম্ভ্রান্তই হোক—অর্থের বিনিময়ে যাকে ভোগ করা যায় তার সম্বন্ধে রুচি বা স্পৃহা কোনটাই নেই অশোকের। ওতে যে আনন্দ পায় পাক—অশোক কিছু-মাত্র আনন্দ পাবে বলে মনে করে না।

শেষ পর্যন্ত—এই মাত্র দু বছর আগে, এক অত্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তে অশোক আত্মসমর্পণ করল কুণালের কাছে। তখন তার ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, পরীক্ষা দিয়ে বাবার পরামর্শে এবং তাঁরই প্রদত্ত অর্থে মাস-দুই বাইরে ঘুরে এসেছে সে। ফেরার পথে দিল্লীতে নেমে বাবার চিঠি নিয়ে একটা চাকরির তদ্বিরও ক'রে এসেছে—এক কথায় তখন আর কোন কাজ নেই হাতে। সবটাই ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, কর্মহীন বেকার বলে মনে হচ্ছে নিজেকে। নিত্য সিনেমায় গিয়ে বা খেলা দেখেও সময় কাটতে চাইছে না—এই অবস্থা। ঠিক সেই সময়ই

একদিন কুণাল এসে বলল, 'অশোক, গুড্‌লাক ! যেমনটি তুই চাস ঠিক তেমনি একটি মাল আছে। ফ্রেশ জিনিস, ফ্রেশ ফ্রম দ্য গার্ডেনস্‌ বলতে পারিস—য়্যান্ড ভার্জিন অলসো !'

'হ্যাঁ। ভার্জিন তো বটেই ! তোমার কাছে যখন এসেছে তখন ভার্জিন না হলে চলে !'

বাঁকা বিদ্রূপ অশোকের কণ্ঠে।

কুণাল উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, 'মাইরি বলছি, বলিস তো তোর গা ছুঁয়ে বলতে পারি। ওর বাবা ইস্কুল মাস্টার, ভেরি কনজারভেটিভ ! সম্ভ্রান্ত বংশ ওদের—এতটুকু বেচাল ওদের বাড়িতে কেউ কখনও বরদাস্ত করে নি। নিতান্ত অভাবে পড়েই—একেবারে চরম অবস্থায় পড়ে এ পথে পা বাড়াচ্ছে। তাও বাবা জানে না—জানলে ও পয়সায় খাবার আগে আত্মহত্যা করত। দ্যাখ—এ জিনিস আর পাবি না। ঐ যে কি তোদের সাহিত্যিকরা বলে না—অনাঘ্রাত কুসুম না কি, এ সেই জিনিস। আর কী বলব, এক্‌স্‌কুইজিট্‌লি বিউটিফুল। যদি মিলিয়ে না পাস তো আমার কান কেটে দিস। আর তাহলে তোর সামনে কোনদিন এ সব কথা তুলব না—দিব্যি গেলে বলছি !'

লোভ হয় বৈকি !

মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে অশোক প্রশ্ন করে, 'বয়স কত ?'

'সেটা একটু কমই অবশ্য। ষোল, সতের বড় জোর। ক্লাস টেন-এ পড়ে। তবে আমার মতো রসিক ও অভিজ্ঞ লোকের কথা যদি শুনতে চাও তো বলব—জাস্ট দ্য এজ !'

তবু চুপ ক'রে থাকে অশোক। আর সেই চুপ ক'রে থাকাটাকেই সম্মতিলক্ষণ বলে বুঝতে কুণালের দেরি হয় না। সে অকারণেই মুখটা ওর কানের কাছে এনে গলাটা নামিয়ে বলে, 'কিন্তু ব্রাদার যেতে হ'লে আজই—সময় মোটে নেই। দুদিনের কড়ারে ভগ্নিপতির বাড়ী এসে আছে—বেশীদিন থাকতে পারবে না।'

অশোক তবুও ইতস্তত করে।

কুণাল একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তা হলে গেট রেডী। আমি ওধারের ব্যবস্থা ক'রে এসে তোকে ডেকে নিয়ে যাব—এক ঘণ্টার মধ্যে—'

'দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হোস নি কুণাল !'

'আর কোন কথা নয়—নাউ অর নেভার !'

'কিন্তু খরচ হবে কত তা তো বললি না !'

'সে জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। তোর পদস্খলনের অনারে সে খরচাটা আমিই দেব !'

কাঁটায় কাঁটায় এক ঘণ্টার মধ্যে এসেছিল কুণাল। অশোকের তখন হাত-পা মৃদু মৃদু কাঁপছে, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। কুণাল কতকটা তাকে হাত ধরেই টেনে বার করল বাড়ী থেকে। বাইরে কুণালের গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, সেই গাড়ীতে

উঠল ওরা।

গাড়ীতে উঠে প্রথম কথা কইল অশোক, 'কিন্তু স্থান!'

'সেইটেই মানে ইয়ে—আমার তো রাঁদেভূ একটা ঠিক করা আছে, কলকাতার একটা হোটেলে ঘর নেওয়া আছে—মানে গেলেই পাব। কিন্তু সে কি—'

'না ভাই, সে আমি পারব না। হোটেলের মনিব থেকে চাকর পর্যন্ত সবাই ব্যাপারটা জানবে আর স্টেয়ার করবে আমার দিকে—সে অসহ্য!'

'ওর ভগ্নিপতির ঘর অবশ্য ছেড়ে দিতে রাজী আছে সে—এক ঘণ্টার জন্যে, কিন্তু সেও পাঁচজনের বাড়ী।'

'না, না—সে চলবে না। থাক তবে—'

অশোক যেন নামতে উদ্যত হয়।

'আরে, আস্তে। ব্যস্ত হচ্ছিস কেন। উপায় অনেক আছে। এখনও কোন কোন সিনেমায় বক্সের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাও লাগবে না। আমার গাড়ীই তো আছে। চল তোদের একটু নির্জন দেখে গঙ্গার ধারে এক জায়গায় পৌঁছে দিই, আমি ঘণ্টা দুই এদিক ওদিক কাটিয়ে নেব এখন—তারপর তুই গাড়ী চালিয়ে চলে আসিস পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে, ওখানেই আমি থাকব—নয়ত আমি একটা ট্যাক্সি ক'রে চলে যাব'খন।'

অগত্যা অশোককে চুপ ক'রে বসে থাকতে হ'ল।

পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি চৌরঙ্গীর একটা নির্জন জায়গা থেকে তুলে নেওয়া হ'ল মেয়েটিকে। দুজন অপেক্ষা করছিল—মেয়েটি এবং তার সঙ্গে যৎপরোনাস্তি ময়লা জামা-কাপড়-পরা শীর্ণ চেহারার একটি লোক।

কথাবার্তা যা কিছু সব হয়েই ছিল বোধ হয়—কারণ কোন পক্ষই কোন কথা কইল না। কুণাল নিঃশব্দে গোটা দুই দশ টাকার নোট গুঁজে দিল লোকটির হাতে —মেয়েটি নিঃশব্দে গাড়ীতে উঠে বসল।

গাড়ী ছুটল গঙ্গা-তীরের রাস্তাটা ধরে।

কুণাল একেবারে দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার পর অশোক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখল ভাল ক'রে। একেবারে এক পাশে ঘাড় গুঁজে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। নিতান্তই নবোঢ়া বধূটির মতো।

উপমাটা মনে হ'তে হাসি পেল অশোকের। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে হ'ল, হয়ত কুণালের কথাই সত্য, হয়ত এ একেবারেই প্রথম এ ব্যাপারে। একেবারে কাঁচা। কাঁচা আর অনভিজ্ঞ।...সে আস্তে আস্তে—কতকটা আজকের মতোই—বাঁহাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে মৃদু আকর্ষণে টেনে এনেছিল এবং আজকের মতোই ডান হাত দিয়ে চিবুকটা ধরে মুখখানা তুলে ধরেছিল।

মুখটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল অশোক। সেই সঙ্গে লুব্ধও হয়েছিল কিছু। এতটা সে সত্যিই আশা করে নি। এতক্ষণ মুখটা কিছুই দেখা যায় নি—শুধু

ওর গৌর বর্ণ এবং একটি সুগঠিত গ্রীবার আভাস পেয়েছিল মাত্র। এখন মুখ তুলে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে বুঝল যে রংটা ওর এমন কোন গৌরবই নয়। এর চেয়েও ফরসা রং বাঙালীর মধ্যেও পাওয়া যায় ঢের। সাধারণ গৌরাঙ্গী—এই মাত্র বলা চলে। কিন্তু মুখখানা এমনই সুশ্রী—সুডৌল ও সুকুমার, ললাট থেকে শুরু ক'রে চিবুক পর্যন্ত এমন মানানসই এবং সুবিন্যস্ত যে—সেদিকে চাইলে চোখ ফেরানো যায় না সত্যি-সত্যিই। আবার দেখতে ইচ্ছা করে, বারবারই দেখতে ইচ্ছা করে।

মেয়েটি সেদিনও থর থর ক'রে কাঁপছিল। ঘেমে উঠেছিল সেই হেমন্তের দিনেও। মুখ লজ্জায় অরুণবর্ণ ধারণ করেছিল। সবটাই ভাল লেগেছিল অশোকের। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল বিকশিত পুষ্পকোরকের মত বিচিত্রগঠন ওর ঠোঁট দুটি। একটু কিশলয়ের মত রঙীন আভা, তার ওপর মুক্তার মত সাজানো ঘামের বিন্দু।

কোন প্রসাধন ছিল না। তবু সেদিকে চেয়ে চেয়ে অশোকের মনে হয়েছিল—এ মেয়ে যদি এভাবে না এসে জীবনসঙ্গিনী রূপে আসত তো ধন্য হয়ে যেত সে।

অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল অশোক, লজ্জায়-নুয়ে-পড়তে-চাওয়া-নিমীলিত-চক্ষু সেই অপূর্ব সুন্দর মুখের দিকে। সেই আশ্চর্য ওষ্ঠাধরে চুম্বন করতে গিয়েছিল সেদিনও—কিন্তু শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে এসেছিল। মমতা বোধ হয়েছিল তার মেয়েটি সম্বন্ধে। সত্যিই ফুলের মতো মনে হয়েছিল ওকে তার। অনাঘ্রাত পবিত্র ফুলের মত। এ ফুল নষ্ট করতে ইচ্ছা হয় না বোধহয় কোন ভদ্র মনেরই। অশোকেরও হয় নি। উদ্বেলিত প্রচণ্ড আবেগ প্রাণপণে দমন ক'রে মুখ-খানা ছেড়ে দিয়েছিল মেয়েটির। বাহুবন্ধনও ছাড়িয়ে নিয়েছিল। তার পরিবর্তে ওর দুটি কোমল ও ক্ষুদ্র হাত টেনে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'তোমার নামটি কি?'

নিতান্তই সাধারণ প্রশ্ন। কতকটা কনে দেখতে যাবার মতই। প্রশ্নটা ক'রে নিজেরই হাসি পেয়েছিল অশোকের।

কিন্তু ওর উত্তর দিতে দেরি হয়েছিল। আরও বেশী কাঁপছে সে তখন। বোধহয় সেই জন্যেই গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না।

'কৈ বললে না তোমার নাম। কী বলে ডাকব?' আবারও প্রশ্ন করে অশোক। আর কীই বা প্রশ্ন করবে—তাও ভেবে পায় না।

'নাম—নাম বলতে জামাইবাবু বারণ করেছেন। আমার নাম বাবার নাম, ঠিকানা কোনটাই বলতে পারব না।'

আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলল সে। যেন লজ্জায় অপমানে এবং কিছুটা ভয়েও গলা বুজে আসছে তার।

'বেশ তো, অন্তত ডাক-নামটা বল। কিছু একটা ধরে ডাকতে হবে তো।'

'আমার ডাক-নাম টুকু।' একটু চুপ ক'রে থেকে বলে মেয়েটি।

তারপর দুজনেই চুপ ক'রে থাকে।

কাঁপছে অশোকও। প্রবৃত্তির সঙ্গে শিক্ষার, আবেগের সঙ্গে ভদ্র সংস্কারের লড়াই চলেছে তখন ওর মধ্যে।

অবশেষে মমতারই জয় হয়। সেই সঙ্গে দারুণ একটা বিশ্বেষ ঘনিয়ে ওঠে যেন ভেতরে ভেতরে। কার ওপর তা ঠিক জানে না। কুণাল, ঐ লোকটা, এর অভিভাবক —সকলেরই ওপর হয়ত। সেই সঙ্গে বুঝি নিজের ওপরেও।

হঠাৎ বলে ফেলে সে, 'টুকু, তোমার বাবা শুনেছি ইস্কুল মাস্টার, ভদ্রলোক। তোমার মতো এইটুকু মেয়েকে দিয়ে টাকা রোজগার করাতে লজ্জা করে না তাঁর? এর চেয়ে ভিক্ষে করাও তো ভাল।'

এইবার ভেঙে পড়ে টুকু। হেঁট হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে সে।

কিন্তু তাতে যেন অশোকের রক্ত আরও চড়ে যায়। হয়ত অত্যধিক মমতাই তার এই উষ্মার মূলে—কে জানে! সে টুকুর কাঁধটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে, 'ওঠো, মুখ তোল, জবাব দাও। তোমার কান্না দেখবার জন্যে এত পয়সা খরচ করি নি আমরা। আমার কথার উত্তর দাও।'

যেন ভয় পেয়ে যায় টুকু। ভয়ে ভয়েই মুখ তোলে। চোখের জল মুছে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে।

'কৈ, জবাব দিলে না!' কঠোর কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করে অশোক।

'বাবা—বাবা এসব জানেন না। জানলে হয়ত আমাকে কেটে ফেলবেন।'

'তবে এ কাজ করতে এসেছ কেন? এ কি তোমারই ইচ্ছা। টাকা চাও? গয়না গড়াবে?'

ঘৃণা,—সেই সঙ্গে অবিশ্বাস, সংশয়—এক প্রকারের হতাশাও ফুটে ওঠে অশোকের গলায়।

আর একটু হেঁট হয়ে পড়ে টুকু। তবু আস্তে আস্তে বলে—'আমার—ঐ যে যিনি সঙ্গে এসেছিলেন—উনি আমার ভগ্নিপতি। ওঁর টি-বি নাকি রোগ হয়েছিল। যথাসর্বস্ব চলে গেছে চিকিৎসাতে। আর সেই সময়ই চাকরিও গিয়েছে। আমার বোনের পাঁচটি ছেলেমেয়ে। একটা পঁচিশ টাকার টিউশানি ভরসা। খেতে না পেয়ে পেয়ে আবারও ওঁর ঐ কঙ্কালসার চেহারা হয়ে গেছে। আর কোথাও কিছু পান নি। অনেকের কাছ থেকেই সাহায্য চান—দেয়ও তারা কিছু কিছু—কিন্তু তাতে কুলোয় না, অথচ এমনি পথে দাঁড়িয়েও তো ভিক্ষে করা যায় না একেবারে। তার ওপর ডাক্তার জামাইবাবুকে একটা ওষুধ খেতে বলেছে—তার দশ টাকা দাম। কোন উপায় না পেয়ে দিদি—আমার এখানে সম্বন্ধ ঠিক করেছে, এবার মেয়ে দেখাতে হবে—বলে আনিয়েছে। কে নাকি পাড়ার লোক এই ব্যবস্থা করেছে, দু-তিন দিনে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করিয়ে দেবে বলে। আমার দিদিই—'

'তোমার দিদি এই প্রস্তাব করলে আর তুমি রাজী হয়ে গেলে। বাঃ!'

'দিদি আমার পায়ের কাছে মাথা খুঁড়তে লাগল। হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে

লাগল। জামাইবাবুও কান্নাকাটি করছিলেন। যদি সত্যি ওঁর অসুখ আবার বাড়ে, ওদের পথে বসে ভিক্ষে করতে হবে।'

টুকুর দু চোখ দিয়ে আবারও জল ঝরে পড়ে।

কাঠ হয়ে বসে থাকে অশোক। অনেক, অনেকক্ষণ।

ঐ নতমুখী মেয়েটার ওপর রাগ করতে চায়, কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতে চায় কিন্তু কিছুই যেন পারে না। মমতা—অপরিসীম মমতা ওর সমস্ত কঠোরতা ছাপিয়ে উঠেছে—ফুলের মত সুকুমার মেয়েটা সম্বন্ধে। সেই মমতাই ওর সম্ভোগের প্রবৃত্তিও যেন নষ্ট ক'রে দেয়!

দূরে ট্যাক্সির শব্দ হচ্ছে না? বেশ অন্ধকারও তো হয়ে এসেছে চারদিক। সময় হয়ে গেল বুঝি। অশোক ঘড়ির দিকে তাকায়।

কুণালই আসছে ট্যাক্সি ক'রে। দূর থেকেই রুমাল নাড়ছে।

অশোক জোর ক'রে যেন নড়েচড়ে বসল। পকেট থেকে কতকগুলো দশটাকার নোট বার করল। তারপর টুকুর শিথিল অনড় হাতে সেগুলো গুঁজে দিয়ে বলল, 'এই টাকাটা নিয়ে যাও দিদিকে দিও। কিন্তু আর এ কাজে রাজী হয়ো না। আমি ছেড়ে দিলুম, অপরে ছাড়বে না। এ পথে তুমি নেমো না কোনদিন। তার চেয়ে গলায় দড়ি দিও।'

কথা শেষ করার আগেই কুণাল এসে পড়ে।

কোন কথা হয় না কোন পক্ষে। দরকারও ছিল না। কুণাল আবার স্টিয়ারিং ধরে বসে। চৌরঙ্গীর সেই খানটিতেই অপেক্ষা করছিল টুকুর ভগ্নিপতি। টুকুকে নামিয়ে দিল কুণাল।...

আবারও গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে গঙ্গার ধারে এসে পড়ল ওরা। এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে কুণাল প্রশ্ন করল, 'তারপর! বল্ কি রকম হ'ল; এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন লাগল।'

অশোক একটু হেসে বলল, 'ওটা এ যাত্রাও হ'ল না বন্ধু, এবারও ব্যর্থ হ'ল তোমার আয়োজন!'

'তার মানে! হোয়াট ডু ইউ মিন?' কুণাল সোজা হয়ে ওঠে একেবারে।

অশোক একটা একটা ক'রে সব কথা খুলে বলল। কাহিনী শেষ ক'রে বলল, 'এর পর—ওই কথা শোনবার পর আমার আর প্রবৃত্তি হ'ল না ভাই। তুই কিছু মনে করিস নি। তোর এত আয়োজন বৃথা হয়ে গেল!'

অকস্মাৎ হো-হো ক'রে হেসে উঠল কুণাল, 'ওঃ! হোয়াট এ ফুল ইউ আর! হোয়াট এ বিগ গ্রেট ফুল! তুই কি মনে করছিস তোর ঐ টাকাটা পেয়েই ওদের য়্যাপেটাইট্ শান্ত হবে? ওটা তো পেলই—আর যে দুটো দিন হাতে আছে, সে দুটোই বা ছাড়বে কেন? ওদের তো এতবড় হাঁ—সমুদ্র খাবার তৃষ্ণা। ঐতে কখনও মেটে?...যা বলেছে সবই সত্যি, অবস্থা ও-ই বটে। ছ-মাসের বাড়ীভাড়া বাকি।

সেই জন্যেই আরও এই ব্যাকুলতা।...তুই বড্ড ভুল করলি অশোক। ও মেয়েটা নষ্ট হবেই—মিছিমিছি তুই এই পাগলামি ক'রে বসলি। যাঃ। তুই বলেই—নইলে আমি কি আর ছেড়ে দিতুম।'

'এখনও তো সময় আছে, যা না।'

বিরস কণ্ঠে বলে অশোক। সেই মুহূর্তে কেমন যেন একটা বিজাতীয় ঘৃণা বোধ হয় কুণাল সম্বন্ধে—এই সমস্ত প্রসঙ্গটা সম্বন্ধেই।

কুণাল তা বোঝে না। বলে, 'দূর পাগল। অতগুলো টাকা দিলি তুই ওই কন্ডিশনে। তারপরও রোজগার করায় যদি—সেটা কি আর আমাকে জানতে দেবে? এটুকু চক্ষুলজ্জা বোধ হয় এখনও ওদের আছে। আমার জানা মানেই তোর জানা ...না, সব মাটি ক'রে দিলি তুই। অমন লাভ্‌লি মালটা।'...

বাইরে কোথায় কাক ডেকে উঠল না?

চমক ভেঙে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল অশোক। সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছে। ভোরই হয়ে এল।

সেই থেকে এতক্ষণ পাথরের মতো বসে ছিল সেও, আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে। স্মৃতির রোমন্থনে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল বুঝি। কটু, কষায়-স্বাদ স্মৃতি।

টুকু এখনও কাঁদছে। তেমনি উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে এখনও। মনে হচ্ছে এ কান্নার বুঝি শেষ হবে না ওর জীবনে।

অশোক আস্তে আস্তে মৃদু কোমল হাতে ওর দুই কাঁধ ধরে টেনে তুলল। চাপা গলায় বলল, 'রাত শেষ হয়ে গেল যে। চোখ মুছে ঠিক হয়ে বোস। এখনই ওঁরা এসে পড়বেন হয়ত সিঁদুর পরাতে, ছিঃ, কী মনে করবেন বল তো।'

টুকু কেমন একরকম বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। যেন কথাগুলো তার মাথাতেই ঢোকে না?

'শুনছ। টুকু?'

তেমনিই বিহ্বল ভাবে চায় সে। এবার অশোকের মুখের দিকেই চায়।

চোখ দুটিও সুন্দর, আজ লক্ষ্য করে অশোক। কিন্তু অবিরাম কান্নায় কি অবস্থাই হয়েছে সে চোখের।

'এই—চোখ মোছ না। ওঁরা এসে পড়বেন যে।'

'কিন্তু—কিন্তু সিঁদুর পরিয়ে কি হবে? আপনি তো আমাকে গ্রহণ করতে পারবেন না।' আবারও উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে টুকু।

'এই দ্যাখো পাগল। গ্রহণ করতে পারব না কি। গ্রহণ তো করেইছি কাল, অগ্নিসাক্ষী ক'রে।'

জোর ক'রে এবার ওকে নিজের বুকের ওপর টেনে আনে অশোক, নিজের রুমাল দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে দেয়।

'কী করেছ বল দিকি অনর্থক কেঁদে কেঁদে। ওঁরা কী ভাববেন।'

তবুও টুকু প্রকৃতিস্থ হ'তে পারে না। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বলে, 'আমি, আমার তো এখন, গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর পথ থাকবে না। আপনি, আপনি ত্যাগ করলে ও'দের কী বলব আমি ?'

অশোক এবার জোর ক'রে ওর মুখখানা তুলে ধরে বহুদিনের ঈপ্সিত অসমাপ্ত চুম্বন এঁকে দেয় ওর সেই বিকশিত পুষ্পের মত বিচিত্র-গঠন ওষ্ঠাধরে। তারপর বলে, 'ত্যাগ করব তো এত কষ্ট ক'রে গ্রহণ করতে এলুম কেন। আমার—আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমিই বা করবে কেন টুকু ? অপরাধ শুধু তোমার নয়—সমান ভাবে আমাদেরও। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পার—আমিও পারব। ঐ ও'রা এসে পড়লেন বুঝি। মুখটা মুছে নাও দিকি চটপট, এই যে, আমার রুমালটা নাও!'

কৃত-কর্ম

প্রথমে অতটা কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে নি। দামাল ছেলে দরজা খোলা পেয়ে কখন হয়ত সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেছে, হয়ত এতক্ষণে কারুর বাগানে কিংবা বাড়ির মধ্যে ঢুকে ব'সে আছে—এই ভেবেই সকলে কতকটা নিশ্চিন্ত ছিল।

কিন্তু একে একে পাড়ার সব বাড়িই খোঁজা হ'ল ; পাড়ার বাইরেও—ওধারে বাস্ স্ট্যান্ড, বড় রাস্তা, এধারে রেল লাইনের ধার, মায় বাজার পর্যন্ত খুঁজে আসা হ'ল—ছেলে কোথাও পাওয়া গেল না।

এবার সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। পাড়ার ছেলেরাও এগিয়ে এল অনেকে। কিন্তু কোথায় খুঁজবে ? আবার একবার ক'রে সব জায়গাগুলো ঘুরে আসা হ'ল। শোনা গেল—পাড়ার নার্সারী ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের দলের সঙ্গে নাকি একদিন অনেকদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, শেষে ইস্কুলের ঝি দেখতে পেয়ে নাকি আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। সুদূর আশা, তবু একজন সে-ইস্কুলও ঘুরে এল। না, সেখানেও নেই হাবুলি।

একজন চলে গেলেন থানায় খবর দিতে। আর একজন গিয়ে কোথা থেকে দুটো জেলে ধরে নিয়ে এলেন। পুকুরটা ঠিক বাড়ির সামনে নয়—কাছেও নয়, তবু পাড়ার মধ্যে তো—একবার খোঁজ করা দরকার। কিন্তু ঘণ্টা-দুই ধরে জল তোলপাড় করার ফলে জলটাই শুধু ঘোলা থকথকে হয়ে উঠল—ছেলে উঠল না।

সকাল গড়িয়ে মধ্যাহ্ন এল, মধ্যাহ্ন পৌঁছল অপরাহ্নে।

ছেলের খবর পাওয়া গেল না কোথাও।

নীরব অশ্রুপাত শুরু হয়েছিল অনেকক্ষণ থেকেই—এইবার কান্নার রোল উঠল। ছেলের মা মিনতি আছাড়-পিছাড় খেতে লাগল, মিনতির মা মেঝেতে

মাথা ঠুকে ঠুকে কপাল ফুলিয়ে ফেললেন। মিনতির দাদা যোগেশবাবু চেঁচিয়ে কাঁদলেন না বটে, কিন্তু কাঁদলে ঢের ভাল হ'ত, তিনি যেন থম্‌থমে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। ছোট ভাই রমেশই এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত ছিল, সে বেশী হৈ-চৈ করে নি, হা-হুতাশও করে নি—বরং সকলের সঙ্গে সমানে ঘুরে বেড়িয়েছে সকাল থেকে, তবে তারও চোখ দুটো বিকেলের দিকে জবাফুলের মতই রক্তাভ হয়ে উঠল।

সকালের রান্না শুকিয়ে পচে উঠল। বিকেলে সে চেষ্টাও কেউ করলে না। এই শোকার্ত আবহাওয়ায় ঠাকুর-চাকররাও কিছু মুখে তুলতে পারল না। এককথায় বাড়ীসুদ্ধই সেদিন উপবাসী রইল।

শুধু ওদের বাড়ীতেই যে শোকের ছায়া নামল তাই নয়, সমস্ত পাড়াটাই থম্‌-থম্‌ করতে লাগল। শুধু দুঃখ নয়, সহানুভূতি নয়—কেমন একটা আতঙ্কের ছায়াও নেমে এল সকলের মুখে-চোখে। দিনে-দুপুরে পাড়ার সকলকার সামনে থেকে অমন জলজ্যান্ত সুস্থ ছেলেটা উবে গেল একেবারে!

এমন ঘটনা অপরের বাড়িতেই বা ঘটতে কতক্ষণ?

যে ক'জনের কথা বললাম সে ক'জন ছাড়া এ বাড়িতে আরও একজন ছিলেন।

তাঁরই সবচেয়ে বেশী বিচলিত হবার কথা, কিন্তু তিনিই ছিলেন সবচেয়ে অবিচলিত।

তিনি হলেন রামকমলবাবু—হাবুলির বাবা।

তবে তাঁর আচরণে কেউ বিস্মিত হন নি। কারণ বিচলিত তিনি কখনও কোন কারণেই হন না—আর সেইটেই যে সবচেয়ে বড় দুঃখ।

এ বাড়ীর জামাই, একমাত্র জামাই। অনেক খুঁজে খুঁজে রূপবান বিদ্বান জামাই এনেছিলেন এঁরা—পাস-করা ইঞ্জিনিয়ার ছেলে। বিয়ের সময় কী একটা সরকারী চাকরিও করতেন। সবদিক দিয়েই ঈপ্সিত পাত্র।

বিয়ের পর বছরখানেক পর্যন্ত সে-চাকরি করেছিলেন রামকমলবাবু—তার পরই 'ভাল লাগে না' ব'লে কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে এসে বসলেন। তখন অতটা অসহ্য হয় নি—কারণ তখনও বাড়ি একটা ছিল, কাকা-জেঠার সঙ্গে মিলিত সংসার—জমিজমা ও তাঁদের কাজ-কারবারের আয়ে এক রকম ক'রে চলেই যেত। তাছাড়া তখনও সবাই ভাবছেন যে আর একটা কাজ জুটিয়ে নেবে শিগ্‌গিরই।

কিন্তু তার কিছু পরেই এল স্বাধীনতা, পার্টিশন। সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সবাই একসঙ্গে আসে নি—ফলে এক-একজন এক-একধারে ছড়িয়ে পড়ল। রামকমলের কাকা গেলেন দিল্লী, জ্যাঠা ভাগলপুর। অপর পোষ্যরা যে যেখানে পারল আশ্রয় খুঁজে নিল। সংসারটার আর নতুন ক'রে একজায়গায় দানা-বাঁধা সম্ভব ছিল না—তেমন গরজও ছিল না কারুর।

যোগেশবাবুরা যখন দেশ ছেড়ে আসেন তখন মিনতি ওঁদের কাছে ছিল—ওঁদের সঙ্গেই চলে এল কলকাতায়। সেই সূত্রে রামকমল কলকাতায় পেঁাছে শ্বশুর-

বাড়ীতে উঠবেন—সেইটেই স্বাভাবিক। কারণ ও'র বাবা-মা ছিলেন না, কাকা-জ্যাঠাদের সঙ্গে সম্পর্কটা এত নিবিড় নয় যে, দেশভুঁই ছেড়ে এসে নিজেদের অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেও বেকার ভাইপোকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইবেন। তাছাড়া তাঁদের নিজেদের সংসারও তো ছোট নয়।

সেই যে শ্বশুরবাড়ীতে এসে উঠলেন রামকমল, আর কোথাও নড়লেন না।

অবশ্য তাতে খুব একটা অসুবিধা ছিল না। যোগেশবাবু দেশে থাকতে ব্যবসাই করতেন—পার্টিশনের অল্পদিন পরেই চলে এসেছিলেন ব'লে সে ব্যবসার অনেকখানিই এখানে আনতে পেরেছিলেন। টাকাকড়ি গহনাপত্রও কিছু ছেড়ে আসতে হয় নি। শুধু বাড়িটা আর জমিজমা আনতে পারেন নি, কিন্তু সে এমন কিছু নয়। এখানে এসে এই বাড়িটি কিনেছেন, ব্যবসাও মন্দ চলছে না—সুতরাং আর্থিক অভাবে বিব্রত হবার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া ভায়েরা এখনও কেউ বিয়ে করে নি, একটা বোন আর তার স্বামীকে পুষতে তাঁদের নারাজ হবার কথা নয়।

সর্বোপরি মিনতির মা এখনও বেঁচে এবং তিনিই এখনও পর্যন্ত সংসারের গৃহিণী।

তবুও—ইদানীং রামকমলকে নিয়েই অশান্তির শেষ ছিল না বাড়িতে। সেটা তাঁর অবস্থিতির জন্যে নয়—নিষ্ক্রিয়তার জন্যে। কিছুই করেন না তিনি, কিছু করতে চানও না। কিছু যে করেন না—সেজন্য কোন উদ্বেগ নেই তাঁর, নেই কোন সঙ্কোচ। চক্ষুলজ্জা বস্তুটি বিশেষ না থাকায় কোন অসুবিধাও হয় না। স্বচ্ছন্দে সম্বন্ধী বা শাশুড়ীর কাছ থেকে হাতখরচের টাকা চেয়ে নেন। সিগারেট লাগে তাঁর দৈনিক তিন প্যাকেট। চা ইত্যাদির খরচও কম নয়। জামা-জুতো সম্বন্ধে শৌখীনতা আছে যথেষ্ট। মানে, অবস্থাপন্ন ঘরের জামাই যে ভাবে থাকে, সেই ভাবেই তিনি থাকতে চান।

কাজের যে যোগাড় হয় না বা কাজ পাওয়া যায় না, তা নয়। যোগেশবাবু বিস্তর কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলোর কোনটাই তাঁর পছন্দ হয় নি। যোগেশবাবুর নিজের কারবারে বেরোতে বলেছিলেন, তার উত্তরে এতখানি জিভ কেটে বলেছেন, 'ছিঃ। শালার কর্মচারী হয়ে থাকব। তার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়াও যে ঢের ভাল।'

ছোটখাটো ব্যবসা করবার পরামর্শ দিয়েছেন যোগেশবাবু বা ও'দের অপর আত্মীয়-স্বজন ; উদাসীনভাবে রামকমল উত্তর দিয়েছেন—'টাকা কোথায় ? ব্যবসা করব, মূলধন চাই না ?'

সে টাকাও যখন যোগেশবাবু দিতে চেয়েছেন, তখন জবাব মিলেছে, 'একে তো বসে, খাচ্ছি, তারপর টাকা কিছু ডোবাই আর কি।…ব্যবসা কি করলেই হ'ল, তার শিক্ষা চাই না ? অভিজ্ঞতা চাই না ?'

অর্থাৎ বিবেচনা সব ব্যাপারে আছে—নেই শুধু শ্বশুরবাড়ী বসে খাওয়ার ব্যাপারটাতেই। এইখানে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার।

ক্রমশ অসহ্য হয়ে ওঠে বৈকি।

সবচেয়ে অসহ্য হয় মিনতিরই। তার যেন লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়—সীতার মত মাটির নিচে সেঁধোতে ইচ্ছা করে। রোজগার না করুক, যদি সংসারেরও কোন কাজে আসত। তাহ'লেও তবু একটু মুখ থাকত মিনতির। কুটি ভেঙ্গে দুখানা করতেও চায় না। কোনদিন বাজার যেতে বললে বলে, 'হ্যাঁ—বাজার দিয়েই শুরু হয় বটে ; তারপর ? শেষ হবে বোধহয় সম্বন্ধীর জুতো-বুরুশে ? ঘর-জামাই-এর আর কি পরিণাম বলো !…তা তবে এ লোক সে বান্দা নয়। সেরকম যেদিন বুঝবে একটু আগে থাকতে ব'লো—সোজা পথে গিয়ে দাঁড়াব। বলি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম তো কেউ ঘোচায় নি।…আর এত লেখাপড়া শিখেছি, একটা পঁচিশ টাকার টিউশ্যনীও কি জুটবে না ? তাহ'লেই আমার একটা পেট চলে যাবে।'

'বেশ তো, দয়া ক'রে সেই টিউশ্যনীটাই করো না এখন !' হয়ত বলে মিনতি, 'তাহলেও তো অন্তত মুখ থাকে একটু। আর কিছু না হোক—সিগারেটের জন্যে হাত পাতাটাও বন্ধ হয়।'

উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে রামকমল জবাব দেন, 'তা হয় না মিনু, এখানে থেকে তা হয় না।…বড়লোক সম্বন্ধীর বাড়ীতে বাস ক'রে যদি কুড়ি-পঁচিশ টাকার টিউশ্যনী করতে যাই, লোকে বলবে কি ?'

'বড়লোকের বাড়ী থাকার দরকার কি ? চলো না, একটা কোথাও ঘরভাড়া ক'রে আমরা চলে যাই। মাটির ঘরেও থাকতে রাজী আছি আমি। একা সব কাজ করব, ঝি-চাকরও দরকার নেই। সকাল সন্ধ্যে দুটো টিউশ্যনী ক'রে তুমি পঞ্চাশটা টাকাও যদি নিয়ে আসতে পারো—তাতেই আমি চালিয়ে নেব।'

'হুঁ। দুনিয়াটা যদি অত সহজ স্থান হ'ত মিনতি দেবী, তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। বড়লোকের মেয়ে, দশটা দাসীচাকরের মধ্যে মানুষ হয়েছ, কাজ কাকে বলে তাই জান না।…না, ওসব সাদা হাতী নিয়ে গিয়ে আমি সামান্য ঘরে তুলতে পারব না।…হোক্ হোক্…আর দুটো দিন যাক্ না। কোনমতে ক'টা দিন চোখ বুজে কাটাও না। ভগবান কি আমার এ্যায়সা দিনই রাখবেন চিরকাল ? আমি কি আর সুদিন পাব না ?'

'কিন্তু সে সুদিনটা কোন পথে আসবে আমাকে বোঝাতে পার ? সে কি আপনিই পায়ে হেঁটে আসবে ? কিছু না করলে কোনদিনই তো কিছু হবে না !'

'আরে বাবা. খোদা যব দেতা, ছপ্পর ফুঁড়কে দেতা। ওসব বড় বিচিত্র রহস্য। তোমার আমার কি সাধ্যি তাঁর মরজী মেজাজ বুঝি !' ব'লে নিশ্চিন্তে সিগারেটে টান দিতেন।

এই একটা বিষয়ে অবশ্য খুব বিবেচনা ছিল, খুব দামী সিগারেট অভ্যেস করেন নি, কম দামের সিগারেটই ওঁর প্রিয়।…

ক্রমশ অসহ্য হয় মিনতির মারও।

তাঁর এখানে অভাব নেই সত্য কথা—কিন্তু মেয়েকে চিরদিন ঘরে পোষবার জন্যেই কি তিনি এত টাকা খরচ ক'রে ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন? ওর কাকা আর জেঠা দশটি হাজার টাকায় ঘা দেয় নি তাঁর? সেই চড়া দামে এই অচল টাকা কিনেছেন তিনি?

যোগেশবাবু বিরক্ত হ'লেও তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে চলেন, রমেশ ছেলেমানুষ—সে সোজাসুজি জামাইবাবুকে এড়িয়ে যায়। একটা লোকের অক্ষমতা ও অপদার্থতাও ক্ষমা করা যায়, সে যদি নিরীহ ভাবে থাকে। সবচেয়ে অপদার্থ লোক যদি জীবন, সংসার ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশ দেবার চেষ্টা করে অহরহ—সবচেয়ে সেইটেই অসহ্য লাগে। রামকমলের সে অভ্যাসও আছে। তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী, এ বিষয়ে তাঁর নিজের বিশ্বাসের এতটুকু অভাব ছিল না।

ইতিমধ্যে পর পর তিনটি মেয়ে হয়ে মারা গেছে মিনতির। অনেক কাণ্ড ক'রে অনেক ডাক্তার দেখিয়ে এই চতুর্থ সন্তানটিকে বাঁচানো হয়েছে। সে সম্বন্ধেও এতটুকু সচেতনতা নেই রামকমলের। টাকা তাঁরা দেবেন—শুধু সঙ্গে ক'রে মিনতিকে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে নিয়ে যেতেও রামকমল নারাজ। কথা উঠলেই 'সময় নেই', 'শরীর খারাপ', 'ভাল লাগছে না' ব'লে কাটিয়ে দেন। সেটার জন্যে রমেশকে না ধরলে চলে না।

সবচেয়ে অসহ্য লাগে 'সময় নেই' কথাটা শুনলেই। এত নির্লজ্জও মানুষ হ'তে পারে!

আর এই কথাটা উপলক্ষ ক'রেই পরশু কুৎসিত রকমের একটা কাণ্ড হয়ে গেছে।

হাবুলিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবার কথা। কদিন ধরেই শরীরটা খ্যাঁৎখ্যাঁৎ করছে ওর; হয়ত অন্য বাড়ী হ'লে এটুকু নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না, কিন্তু একে মিনতির সেই 'ঘরপোড়া গোরু'র অবস্থা, তায়—এ বাড়ীতে হাবুলিই একমাত্র শিশু ব'লে বোধহয়—সে মামা-দিদিমা সকলেরই নয়নের মণি। সুতরাং তার একটু অসুখ হ'লেই ওঁরা বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এবারও যোগেশবাবু ডাঃ চৌধুরীকে দেখাবার কথা বলেছিলেন, কিন্তু মিনতিই বারণ করেছে, 'রোজ রোজ সামান্য কারণে একগাদা টাকা খরচা করবার দরকার কি? গোবরাতে ছেলেদের অমন বড় হাসপাতাল হয়েছে, সেইখানে দেখিয়ে আনলেই তো হয়। এই তো পাড়ার কত লোক ছেলেমেয়ে দেখিয়ে আনছে সেখান থেকে। ডাঃ চৌধুরী নিজেও তো সেখানে দেখেন শুনেছি।'

কথাটা যোগেশবাবুরও মনে লেগেছিল। কিন্তু সেদিন তাঁর বিষম কাজের চাপ, তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, রমেশেরও কলেজ—অগত্যা বিপন্ন বোধ ক'রেই

তিনি কখনও যা করেন না তাই ক'রে বসেছিলেন—রামকমলের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। নিজেই মুখ ফুটে বলেছিলেন, 'এইটুকু করো ভাই, হ্যাঙ্গামা কিছুই নেই—ট্যাক্সী ক'রে যাবে আসবে, শুধু সেখানে একটু অপেক্ষা করা।'

অম্লানবদনে উত্তর দিয়েছিলেন রামকমল, 'যেতে পারলে খুবই আনন্দিত হতাম, আর আমারই তো যাওয়া উচিত, কিন্তু আজ যে আমার মোটে সময় হবে না দাদা।'

হয়ত অন্য কোন কথা বলতে গিয়েই সময়ের কথাটা বেরিয়ে গেছে ; কিম্বা হয়ত যোগেশবাবু নিজে এসে অনুরোধ করাতেই ঘাবড়ে গিয়ে বেফাঁস ব'লে ফেলেছেন রামকমলবাবু।

কিন্তু কারণ যা-ই হোক, মুখের কথা আর হাতের পাশা প'ড়ে গেলে আর তার দায়িত্ব এড়ানো যায় না।

চিরসতর্ক যোগেশবাবুও ধৈর্য রাখতে পারেন নি সেদিন। ব'লে ফেলেছিলেন, এবং বলেছিলেন একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই,—'তোমার আবার সময়ের কি অভাব হ'ল রামকমল, তোমার কাজটা কী যে সময় নেই বলছ? কাজকর্ম কোথাও ধরেছ নাকি!'

কথাটা বলা ঠিক হয় নি তা রামকমল সম্ভবত বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝেছিলেন, কিন্তু তখন আর উপায় কি? তাই আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলেন, 'এসব কথার অর্থ কি? আপনার বাড়ীতে আছি ব'লেই আপনাকে আমার সব কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?...আমার সময়ের হিসেব চান আপনি কোন্ সাহসে?'

যোগেশবাবু এর উপযুক্ত উত্তর দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন, কিন্তু সামলাতে পারেন নি মিনতির মা। তিনি রণরঙ্গিনী মূর্তিতে বেরিয়ে এসেছিলেন, 'বলি, কৈফিয়ৎ যদি চায়ই, কী হয়েছে তাতে। বড় ভাইয়ের মত তোমার, ওর পয়সাতেই সপরিবারে ব'সে খাচ্ছ—ওকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হ'লেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নাকি?...আর সত্যি কথাই তো, জোয়ান পুরুষ, কাজ করো না কর্ম করো না, বসে খাও—নিজের ছেলেটাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবার কথা বললে বলো সময় নেই। একথা যে শুনবে সে-ই হাসবে যে!'

একটা কথা থেকে অজস্র কথার সৃষ্টি হতে দেরি হয় না। মিনতিও সেদিন খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়েছিল—মনের সব ঝাল মিটিয়ে। যোগেশবাবুই যেন ফ্যাসাদে প'ড়ে গিয়েছিলেন। দু-পক্ষকেই থামাতে চেষ্টা করেন, কেউ কথা শোনে না।

মিনতির মা তাঁর ব্যাকুল মিনতির জবাবে বরং বলেছিলেন, 'তুই থাম্ যোগাই, ওকে আমার আর চিনতে বাকী নেই। তুই ভাবছিস রাগ ক'রে চলে যাবে ও?... তাহ'লে তো বাঁচি। বুঝি যে ঐটুকু আত্মসম্মান জ্ঞানও আছে অন্তত।...আর তাতে আমার মিনুর দুঃখ হ'তে পারে, কিন্তু নিত্য অপমানের হাত থেকে তো রেহাই পাবে!'

রামকমল তাঁর অভ্যস্ত উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন, 'হবে হবে—রেহাই

দেব এবার শিগ্‌গিরই।...বেশীদিন দুঃখ পেতে হবে না আপনাদের।'

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রামকমলবাবুর আত্মসম্মান জ্ঞানের আর কোন বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় নি।

সেদিনটা অবশ্য বাড়ীতে খান নি। বেরিয়ে পড়েছিলেন প্রায় তখনই। মিনতিকে অগত্যা লাজলজ্জার মাথা খেয়ে সামনের বাড়ীর একটি ছেলের সঙ্গেই হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। রামকমল সেই যে বেরিয়েছিলেন, ফিরেছিলেন একেবারে গভীর রাত্রে। খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল কিন্তু খান নি।

তার পরের দিন থেকে আবার সেই আগেকার নির্বিকার নিরুদ্বিগ্ন সহজ জীবনযাত্রা। বারকতক চা খাওয়া, সিগারেট খাওয়া, চাকরকে দিয়ে তেল মাখানো, দিনের বেলা ঘণ্টাতিনেক টানা ঘুম—কোনটাই বাদ যায় নি। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু বাড়ীর লোক কারুর সঙ্গেই বেশী কথা কইছিলেন না। যেটুকু কথা—ছেলের ও চাকরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মিনতির মা তিক্ত হাসি হেসে যোগেশকে বললেন, 'দেখ্‌লি তো। তুই তো ভেবে মরছিলি।'

তারপর আজকের এই কাণ্ড।

সকলেই ছুটোছুটি করছে, হৈ-চৈ—খোঁজাখুঁজি ; পাড়ার অনাত্মীয় লোকেদের পর্যন্ত উদ্বেগ-বিলাপের অবধি নেই ; তার মধ্যে রামকমলই শুধু নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ। তাঁর মনের সহজ প্রশান্তি যেন এতটুকুও নষ্ট হয় নি। সকালে বারদুই চা খাওয়া হয়েই গিয়েছিল, তাই খুব একটা অসুবিধাও হয় নি। আর যে পাওয়ার আশা নেই তা তিনি বুঝেছিলেন, সে চেষ্টাও আর করেন নি। বাইরের বারান্দায় তাঁর অভ্যস্ত চেয়ারটিতে ব'সে অত্যন্ত আলস্যের ভঙ্গীতেই সিগারেট খাচ্ছিলেন। সিগারেট ফুরিয়ে যেতে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাকরদের কাউকে দেখতে না পেয়ে একবার শুধু উঠে গিয়ে একটা টিন কিনে এনেছিলেন, আর কাউকে ফরমাশ করবার চেষ্টা করেন নি।

তাঁর কাছ থেকে কোন সাহায্য কেউ আশাও করে নি অবশ্য। এটুকু তাঁকে সবাই চিনে নিয়েছিল, এমন কি পাড়ার লোকরাও। শুধু অবুঝ মায়ের প্রাণই স্থির থাকতে পারে নি—মিনতি ছুটে এসে বলেছিল, 'তুমি কী গো! এখনও চুপ ক'রে বসে আছ! তুমি মানুষ না পাথর! ছেলেটাকে একটু খোঁজও করতে পারছ না!'

মুখ থেকে সিগারেটটা নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরেই জবাব দিয়েছিলেন রামকমল, 'এতগুলো লোক খুঁজছে, পাড়াসুদ্ধ সবাই—করণীয় যা এসব ক্ষেত্রে তার তো কোনটারই ত্রুটি হচ্ছে না। এর মধ্যে আমি আর বেশী কি করতে পারব বলো? অকারণ অস্থিরতা প্রকাশ ক'রে লাভ আছে কিছু?'...

বৃথা জেনেই মিনতি আর কিছু বলে নি, ললাটে করাঘাত ক'রে চলে গিয়েছিল।

সেদিন স্থির হয়ে থাকলেও পরের দিন থাকতে পারলেন না রামকমল। ভোর-বেলা চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন, ফিরলেন একেবারে বিকেলবেলায়।

তিনি কোথায় গিয়েছিলেন এবং কেন গিয়েছিলেন সে বিষয়ে কারুর কোন ঔৎসুক্য থাকার কথা নয়—কেউ তা প্রকাশও করলেন না। কে-ই বা করবে, যোগেশবাবু কাল সন্ধ্যা থেকে সেই যে স্তম্ভিত অবস্থায় ব'সে আছেন—এখনও পর্যন্ত একটা কথাও কন নি কারুর সঙ্গে। হাবুলি ছিল তাঁর বুকের জিনিস—যতক্ষণ তিনি বাড়ী থাকতেন ততক্ষণই সে হয় তাঁর কোলে নয় কাঁধে থাকত। রাত্রে বাড়ী না আসা পর্যন্ত ঘুমোত না, ঐটুকু ছেলে এতই ন্যাওটো হয়ে গিয়েছিল। সেই ছেলে কোথায় আছে, কার কাছে আছে—আছে কিনা কোথাও, অবিরাম এই প্রশ্নই তিনি ক'রে যাচ্ছেন মনে মনে—নিজের মনকেই। মাঝে মাঝে নিজেরই মনে হচ্ছে, এমন ক'রে থাকলে পাগল হয়ে যাবেন তিনি—অথচ তাঁকে জোর ক'রে কোন কাজে লাগাবে তেমন লোকই বা কই?

মিনতি তো মূর্ছাতুরের মত প'ড়ে আছে। মিনতির মাও তথৈবচ। অবিরাম কান্নার ফলে তাঁর চোখ ঝাপ্সা হয়ে এসেছে। এক রমেশ—সে বেচারা সারাদিন ধ'রে থানা, রেডিও, খবরের কাগজ ক'রে বেড়িয়েছে, এখন সেও ক্লান্ত, মৃতবৎ।

অবশ্য রামকমল কাবুর সোৎসুক প্রশ্নের ধারও ধারলেন না। তিনি এসে একটুখানি ব'সে থেকে নিজেই কথাটা পাড়লেন, 'ওসব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার কাজ নয় দাদা। আমি ভেবে দেখলাম, খুব পাকা ছেলেধরা ছাড়া এমন ভাবে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।'

সকলেই চমকে উঠল যেন। রামকমলও ছেলের কথা ভাবছেন তাহ'লে।

ছেলেধরার কথাটা কাল থেকে আলোচিত হয়েছে বহুবারই—কিন্তু সে বিষয়ে রামকমল কি চিন্তা করেছেন জানবার জন্য সকলেই উৎসুক হয়ে উঠল এবার।

রামকমল ঈষৎ একটু হেসে বললেন, 'আপৎ-কালে শুধু ছুটোছুটি করলে বা শুধু হা-হুতাশ করলে কোন কাজ হয় না দাদা, সেটার প্রমাণ হাতে হাতে তো পেলেন। আপনারা মনে করেছিলেন আমি পাষাণ, আমার কোন দুশ্চিন্তাই হয় নি। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা কাজ করে মাথায়—হাতে নয়। কাল সারাদিন ধ'রে ব'সে ব'সে কর্মপন্থা ঠিক করেছিলাম, আজ কাজ ক'রে এলাম। কলকাতা আর আশে-পাশে যত গুণ্ডার কলোনী আছে সব জায়গা ঘুরে এসেছি। ব'লে এসেছি, অক্ষত অবস্থায় ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারলে বা ছেলের খোঁজ পেলে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত দিতে রাজী আছি আমরা।'

'হাজার। হাজার। তুমি হাজার টাকা বললে না কেন রামকমল!'

যোগেশবাবু আকুলকণ্ঠে বলে ওঠেন।

'একেবারে অত টাকার কথা কি বলা ঠিক? তাহ'লে পয়সাওলা লোক ভেবে আরও বেশী টাকার জন্যে চাপ দিত।…এমনিতেই তো অত টাকা বলতেই সঙ্কোচ

হচ্ছিল আমার—নিজের হাতে যখন সেই—একপয়সা দেব বলতেও কুণ্ঠা হয় বৈকি! নেহাৎ জানি যে আপনি ওকে নিজের ছেলের মতই স্নেহ করেন তাই—'

এ কি সেই রামকমল ? অবিশ্বাসের চোখে তাকায় সবাই।

তবে বুঝি—বিপদে না পড়লে মানুষকে পুরোপুরি চেনা যায় না—এ-কথাটা ঠিকই।...

যোগেশবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে চাকরকে হাঁক দেন, 'ওরে, জামাইবাবুকে চা দে কেউ!' তারপর বলেন, 'তা খবরটা কখন পাওয়া যাবে ?'

'যেতে হবে আবার এখনই।...আর তো কিছু নয়—এর মধ্যেই হাত-পা কেটে কিংবা চোখটোখ কানা ক'রে না দেয় এই চিন্তা। সেইজন্যেই তো মোটা টাকার লোভ দেখিয়েছি ব্যাটাদের। আসলে ওরা ভিখিরী করবার জন্যেই ধ'রে নিয়ে যায় তো—এমন ভাবে চেহারাটা বদলে দেয় যাতে একসঙ্গে দু'কাজ হয়, লোকের দেখলে দয়া হবে বেশী, বেশী পয়সা পাবে—আর এদিকে যাদের ছেলে তারাও দেখলে চিনতে পারবে না।'

কথাটা শেষ ক'রে বেশ স্মিত প্রসন্নমুখে তাকান উনি এদের দিকে।

যোগেশবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে বলেন, 'তুমি ভাই তাহ'লে এখনই একবার যাও, লক্ষ্মী ভাইটি! টাকাটা নিয়েই যাও বরং। চা খেয়েই বেরিয়ে যাও, একদিন একটু কষ্ট হবে কী আর করবে বলো।...এই নাও, ছশো টাকাই রাখো বরং, ট্রামে-বাসে আর ঘুরো না, একখানা ট্যাক্সী নাও এইখান থেকেই। কত আর উঠবে!'

একতাড়া নোট ভগ্নিপতির অনিচ্ছুক হাতে গুঁজে দেন যোগেশবাবু।

রামকমল বলতে যান, 'এখন কেন দাদা, বরং সন্ধান পেলে না হয়—। তাদেরও তো নিয়ে আসতে পারি।'

'পাগল নাকি! তারা কখনও বিশ্বাস ক'রে আসে! আর নগদ টাকা না দেখলে ওরা কোন কথাই বলবে না। তুমি নিয়েই যাও, খবর নিয়ে এখানে আসবে টাকা নিয়ে যাবে—ততক্ষণে ব্যাটাদের আবার মতলব হয়ত পাল্‌টে যাবে! তুমি অত সঙ্কোচ করছ কিসের জন্যে ? টাকা কার জন্যে—সবই তো তার ভাই!'

রামকমল কোনমতে চা আর দুটো সন্দেশ খেয়ে তখনই আবার বেরিয়ে গেলেন। সারাদিন খাওয়া হয় নি ব'লে চাকরটাই বুদ্ধি ক'রে সন্দেশ দুটো এনেছিল চায়ের সঙ্গে। যোগেশবাবু তার বিবেচনায় খুশী হয়ে উঠলেন।...

তারপর শুরু হ'ল সোৎসুক, সাগ্রহ প্রতীক্ষা।

সন্ধ্যা হ'ল ক্রমশ। এখনই অবশ্য ফেরবার কথা নয়, তবু যোগেশবাবু দূরের বড় রাস্তায় ট্যাক্সীর শব্দ পেলেই ছুটে বাইরে এসে দাঁড়াতে লাগলেন। কিন্তু সে শুধু হতাশ হবার জন্যেই।

সন্ধ্যা থেকে রাত। রাত দশটা, বারোটা, তিনটে।

শেষরাত্রে শুধু শারীরিক ক্লান্তিতেই ঘুমিয়ে পড়লেন ওঁরা।

কিন্তু রাত্রিশেষেও ফিরলেন না রামকমল। সারাদিনেও না। পরের দিন, তার

পরের দিন,—আর কোনদিনই না।

ছেলের সঙ্গে সঙ্গে রামকমলও যেন উবে গেলেন একেবারে।

এমন হবে রামকমলও জানতেন না। এ আশঙ্কা একবারও করেন নি।

এ পরিণতির জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।

সেদিনের অপমানে প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল তাঁর। দিগ্‌দাহকারী ক্রোধ এবং বিদ্বেষ।

স্বভাব-অলস অকর্মণ্য লোক যখন আলস্য ত্যাগ ক'রে প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তা করে, স্বভাবতই তার মন ধরে পাপের পথ, অপরাধের পথ।

রামকমলও সেই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের কথা ভাবতে পারেন নি।

সারাদিন পাগলের মত ঘুরতে ঘুরতে শিয়ালদা স্টেশনের ধারে একটা বিকলাঙ্গ শিশু ভিখারীকে দেখেই কথাটা মনে জাগে ওঁর। তাকে চার আনা পয়সা দিয়ে জেরা ক'রে ক'রে সালেকের খবর পান তিনি। সালেক আর বটা বা বটকৃষ্ট দু'জনে মিলে এই কারবার করে। বেলেঘাটার এক প্রান্তে কোন্ বস্তীতে থাকে তারা। ওদের আড্ডা হচ্ছে খালের ধারে এক চায়ের দোকানে।

খুঁজে খুঁজে সেইখানেই গিয়েছিলেন রামকমল।

প্রথমটা এ অবিশ্বাস্য কথা তারা বিশ্বাস করতে চায় নি, বিশ্বাস করে নি রামকমলকেও। গোয়েন্দা ভেবে সোজাসুজি সব কথাই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু রামকমল পৈতা ছুঁয়ে শপথ করতে শেষ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস হয়েছিল।

আর কাজটাও এমন কোন গর্হিত কিছু নয়। বাপই ছেলেটাকে গোপনে এনে গচ্ছিত ক'রে দেবে ওদের কাছে। ওরা শুধু দুটোদিন লুকিয়ে রাখবে। তারপর তিনি এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন—এই সামান্য কাজের জন্যে ওদের বকশিশ দেবেন কুড়িটি টাকা।

এই সামান্য টাকায় ওরা রাজী হয় নি অবশ্য। এ কাজের ঝুঁকি আছে বৈকি। হৈ চৈ তো একটা হবেই, পুলিশেও খবর দেওয়া হবে নিশ্চয়—এর মধ্যেই যদি ওরা ধরা পড়ে যায়? তখন কি কেউ বিশ্বাস করবে যে বাপ দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেকে চুরি করিয়েছে?

অনেক দর-কষাকষির পর পঞ্চাশ টাকাতে রফা হয়েছিল।

কথা ছিল যে পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ঐ চায়ের দোকানের কাছেই সালেক বা বটা কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে ছেলে নিয়ে—টাকা দিয়ে তাকে নিয়ে আসবেন রামকমল।

তার পরের সব ব্যাপারটাই নির্বিবাদে ঘটেছিল।

নির্দিষ্ট ট্রেনের একটা কামরায় উঠে ব'সেছিল সালেক, রামকমল নিজে নিয়ে গিয়ে ছেলেকে উঠিয়ে দিয়েছেন এক ফাঁকে। হিসেব-করা সামান্য সময়ে কাজটা হয়ে গেছে, কেউই টের পায় নি তাই। বাপ ছেলেকে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা, এত সাধারণ যে কেউ লক্ষ্যই করে নি, পরেও সে কথাটা কারুর তাই মনে পড়ে নি। চতুর রামকমল মনস্তত্ত্বের এই কথাটার ওপরই নির্ভর করেছিলেন এবং ঠকেন নি।

সবচেয়ে প্রিয় জিনিসে ঘা দিলেই মানুষকে সবচেয়ে জব্দ করা হয়—এটা তিনি জানতেন। তাই এ আয়োজন। বেশ হবে, জব্দ হবে সবাই! ওদের সেই কান্না এবং ব্যাকুলতা দেখলেই এ অপমানের শোধ উঠবে। তাছাড়াও কিছু জরিমানা আদায় হবে। পাঁচশ টাকা তো তুচ্ছ, যোগেশবাবু রামকমলের সন্তানের জন্যে আরও বহু টাকা খরচ করতে কুণ্ঠিত হবেন না, তা রামকমল জানতেন। তিনি তো দয়াই করলেন বলতে গেলে।

এ পর্যন্ত ঠিক ঠিক মিলে গিয়েছিল পরিকল্পনার সঙ্গে।

ঘড়ির কাঁটার মতই নির্ভুল হিসেবে চলেছিল সবটা।

কিন্তু প্রথম ব্যতিক্রম হ'ল টাকাটা নিয়ে যখন খালের ধারে এসে দাঁড়ালেন রামকমল—তখনই।

সালেকও নেই, বটাও নেই। তাঁর ছেলে তো নেই-ই।

হয়ত সময়ের হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে। ওদের কাছে এত সময়-জ্ঞান আশা করাই উচিত নয়। কিম্বা কোন কাজে আটকে গেছে, কোন লাভজনক কাজ। এ টাকাটা সম্বন্ধে তো কোন উদ্বেগ নেই—তাই এটা ফেলে কোন নগদ বিদায়ের কাজে যাওয়া বিচিত্র নয়।

প্রথমটা কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হন নি রামকমল। বোকার মতো বহু লোকের স-প্রশ্ন দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হওয়ায় একটু বিরক্ত হয়ে উঠে-ছিলেন, এই মাত্র। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের যখন একঘণ্টা পার হয়ে গেল তখন একটু উদ্বিগ্ন বোধ করলেন—চায়ের দোকানে গিয়ে খোঁজ করলেন। তারা আকাশ থেকে পড়ল। সালেক বা বটকৃষ্ট নামে কাউকে তারা চেনে না। না, ওরকম বর্ণনার কোন লোককে তারা দেখেও নি। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রামকমল। রাগ করলেন, চেঁচামেচি করলেন, কিন্তু কোন ফলই হ'ল না। যাদের জানে না, দেখে নি—কেমন ক'রে তারা বলবে তাদের খবর! এ ওঁর অন্যায় জুলুম নয়? এইবার রামকমলের মুখ শুকিয়ে উঠল।

ছুটে শিয়ালদায় এলেন। সে ভিখারী ছেলেটা যদি থাকে। না, সে-ও নেই।

আরও দু-পাঁচ জনকে ধরলেন, কিন্তু কেউই অমন কোন লোককে চেনে না। সকলেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল ওঁর দিকে। রামকমল বুঝলেন যে গোয়েন্দা ভেবেই ওরা আরও সাফ জবাব দিচ্ছে। তখন আবার ফিরে গেলেন সেই চায়ের দোকানে। মালিকের হাতে-পায়ে ধ'রে মাপ চেয়ে একশ' টাকার একখানি নোট তার হাতে গুঁজে দিতে তার দয়া হ'ল। সে ব'লে দিলে বেলেঘাটার প্রত্যন্ত ভাগের সেই বস্তীর খোঁজ। তখনই ট্যাক্সী ক'রে ছুটলেন সেখানে। অনেক খোঁজ-খবরের পর ঘরটা যদি বা পাওয়া গেল—দেখা গেল ঘরে তালাবন্ধ। ঘরের মালিক বললে, আজ সকালেই তারা ভাড়া মিটিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। দরকার থাকলে ঘর ভাড়া নিতে পারেন রামকমল। ভাড়া সামান্যই। কোথায় গেছে? তা কেমন

ক'রে জানবে।

ট্যাক্সী ছেড়ে দিয়ে শ্লথ মন্থর গতিতে হেঁটেই ফিরে এলেন আবার শিয়ালদায়। কোথায় যাবেন, কোথায় খোঁজ করবেন এবার, তা জানেন না। পুলিশে যাবার অন্তত মুখ নেই। বাপ হয়ে নিজের ছেলেকে চুরি করিয়েছেন একথা কেমন ক'রে বলবেন সেখানে গিয়ে? তখন রাত অনেক হয়ে গেছে। কোনমতে স্টেশনেই ব'সে কাটালেন বাকী রাতটা। তারপর উঠে ঘুরতে শুরু করলেন আবার। কলকাতার উপকণ্ঠে যেখানে যত বস্তী আছে সব ঘুরে দেখলেন ক'দিন ধ'রে। প্রায় সব বিকলাঙ্গ ভিখারীকেই পয়সার লোভ দেখিয়ে জেরা করলেন। কেউ কেউ তাদের আড্ডার বা সর্দারের খবর দিল না যে তা নয়—কিন্তু সে সব জায়গাতেও সালেক বা বটা অথবা তাঁর আড়াই বছরের সুন্দর ছেলের খবর কেউই বলতে পারলে না তারা। দু-একজন চেনে বটে, কিন্তু কখন্ কোথায় তারা থাকে তা কেমন ক'রে বলবে? সারা ভারতেই তাদের গতিবিধি, গোটা দেশটাই কর্মক্ষেত্র।

কেন গেল তারা? কেন নিয়ে গেল তাঁর ছেলেটাকে?

কত পয়সা পাবে তারা আরও!

তিনিই না হয় কিছু বেশী দিতেন! তাঁর কাছে চাইল না কেন!...এমনি সহস্র নিষ্ফল প্রশ্নে জর্জরিত ক'রে তোলেন নিজেকেই। আর কোন লাভ হয় না।

হাতের টাকা নিঃশেষ হয়ে এল—শুধু চা খেয়ে এবং ভিখারীদের ঘুষ দিয়ে দিয়ে। খোঁচা খোঁচা দাড়ী-গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন হয়ে গেল, পরিধেয় জামাকাপড় হয়ে উঠল মলিন ও শতছিন্ন। পরিচিত কোন আত্মীয়স্বজনের আর চেনবার উপায় রইল না। চেহারাও অনাহারে অনাহারে শীর্ণ হয়ে উঠল। তবু কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

এবার তিনিও ভিক্ষাবৃত্তি ধরলেন। ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষা ক'রে ঘুরে বেড়ান, নজর রাখেন অন্য ভিখারীদের ওপর, কান পেতে শোনেন তাদের কথাবার্তা। কোন বিকলাঙ্গ বালক বা শিশুভিখারী দেখতে পেলে তাদের ধ'রে সঞ্চিত সব পয়সা উজাড় ক'রে দেন—শুধু তাদের আড্ডা এবং আড্ডার মালিকের সন্ধান চান তিনি। কেউ দেয়, কেউ দেয় না। তেমন কোন খবর পেলেই ছুটে যান সেখানে, যেমন ক'রে হোক্।

কিন্তু আজও তিনি ছেলের কোন খবর পান নি। তাঁর সোনার ছেলে হাবলির। হয়ত আর কোনদিনই পাবেন না। হয়ত পা-বাঁকা কিংবা হাত-নুলো কোন ভিখারীতে পরিণত হয়ে তামিল ভাষায় ভিক্ষা চাইছে মাদ্রাজের কোন রাস্তার ধারে। কিম্বা পশ্চিম পাকিস্তানের কোন শহরে চোস্ত উর্দু ভাষায় কোন অনাথাশ্রমের জন্য গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছে—কে জানে।

কিম্বা হয়ত এর মধ্যে সে তাঁর পাশ দিয়েই চলে গেছে এক আধবার। চেনার আর কোন উপায় নেই ব'লেই চিনতে পারেন নি—কে জানে।

আজও তিনি ভিক্ষা ক'রেই বেড়াচ্ছেন এমনি। ট্রেনে ট্রেনে। কোথাও কোথাও

গাড়ী থেকে নামিয়ে দেয়, মারধোরও খান, তবু আবারও আর একটা ট্রেনে চাপেন গিয়ে।

এমনি ক'রেই তাঁর দিনও একদিন শেষ হয়ে যাবে। এমনি ভিক্ষা করতে করতে। তা যাক্। তার জন্য ভাবেন না তিনি। কিন্তু যদি ছেলেটার কোন খবর পেতেন মরবার আগে। কিম্বা সেই লোক দুটোর।

কেন তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে দিল না তারা? কেন? কেন?

যাকে রাখো

লোকে যে কথায় বলে 'যাকে রাখো সে-ই রাখে'—সে কথাটার সত্যতা বিধুর মেয়ের বিয়েতে নতুন ক'রে একবার প্রমাণিত হয়ে গেল।

বিধু গয়লানী পৈতৃক বিষয়ের কণা মাত্র পায় নি—বিবাহ সূত্রে পাওয়া শাশুড়ীর চল্‌তি দুধের ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আরও বড় করেছে। কিন্তু তাই বলে ওর বাপের বাড়ীর অবস্থা খারাপ ছিল না। বিষয় সম্পত্তি বেশ ভালই ছিল। সেই সব জমি জায়গা ঘর বাড়ী, একশটার ওপর গোরু-মোষ—যাতে অর্শে-ছিল, ওর সেই একমাত্র ভাই এবং দাদা পঞ্চানন যথাসর্বস্ব শেষ ক'রে যখন বোনের দোরে এসে দাঁড়াল—তখন অনেকেই বিধুকে পরামর্শ দিয়েছিল—'খবরদার ও নেশাখোরটার মুখ দেখিস নি বিধু, বাপুতি সম্পত্তির এক কানাকড়িও তো তোকে কখনও দেয় নি—যতদিন পয়সার জোর ছিল এদিক পর্যন্ত মাড়ায় নি। তোর মেয়ের অন্নপ্রাশন গেল—তাও আসে নি কিছু দেবার ভয়ে। সবচেয়ে তোর এমন অবস্থা হ'ল—যার চেয়ে বিপদ আর মেয়েমানুষের নেই—তা এতবড় সব্বনাশের সময়ও একবার দাঁড়ানো উচিত বিবেচনা করলে না। এখন নেশা ক'রে জুয়ো খেলে সব উড়িয়ে দিয়ে এসে তোর ঘাড়ে চাপছে। তুই কিসের জন্যে দয়া করবি ওকে? যাক্ যেখানে খুশি। না জোটে ভিক্ষে করবে। তোর এত কষ্টের পয়সা যদি ওর পেছনে খরচ করিস তো মা লক্ষ্মী তোর ওপর নারাজ হবেন।' ইত্যাদি—

কিন্তু বিধু সে পরামর্শ শুনতে পারে নি। হাজার হোক মার পেটের ভাই। তাছাড়া ওর ছেলেমেয়েরা, ওর বৌ—বাপের কুল বলতে তো ঐ কটাই। ওরা যদি না খেতে পেয়ে মরে তো বিধুরই পিতৃকুল জলগণ্ডূষ পাবে না।

তবে সে বাড়ীতেও ঠাঁই দেয় নি। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটু জমি কিনে একখানা মাটির ঘর তুলে দিয়েছিল। জমিটা নিয়েছিল ছোট ভাইপোর নামে, যাতে দাদা বেচতে না পারে। সেইখানেই থাকত ওরা। আর ওদের খোরাকীর মত ধান কলাই তেল নুন পাঠিয়ে দিত। তাও, আগে একেবারে একমাসের মত পাঠাত—দেখা গেল তাও বেচে নেশা করে পাঁচু—তিনদিন চারদিন ধ'রে উপোস ক'রে থেকে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে আবার ছেলেকে পাঠায় ওর বৌদি একমুঠো চালের জন্যে।

সেই থেকে রোজকার চাল-ডাল রোজ দেবার ব্যবস্থা করেছে বিধু—বড় ভাইপো ভোর বেলা এসে নিয়ে যায়। ঝড়জলের দিন হ'লে নিজের কোন দোহাল কি কিষেনকে দিয়ে পাঠায়—তবু ভরসা ক'রে ভাইপোর বাপের হাতে দেয় না।

অথচ এতটার বদলে সামান্য উপকারেও যদি আসত পাঁচু তো লোকের কাছে বলবার মুখ থাকত। কিন্তু কোন দিন একটা কুটি ভেঙ্গেও দুখানা করত না সে। নিতান্ত নেশার পয়সা দরকার হ'লে তবেই এদিকে আসত। তাও বিধুর শাসনে ও অর্থাভাবে বড় নেশা অর্থাৎ মদের নেশাটা ছাড়তে হয়েছে বলে অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিল। সব গিয়ে সবচেয়ে সস্তার নেশা গাঁজা ধরেছিল—তবু তাতেও দৈনিক চার গণ্ডা পয়সা তো লাগে।

অনেকেই এ নিয়ে বিধুকে ঠাট্টা করত। বলত, 'এ কী হচ্ছে বিধু—বৈঠকখানায় শিবস্থাপনা। অত বড় মিন্‌সে ছোট বোনের কাছ থেকে নেশার পয়সাটা পর্যন্ত হাত পেতে নিচ্ছে—অথচ একটা কাজ ক'রে দেয় না। সকালে এসে দুধের যোগানগুলোও তো দিতে পারে।'

বিধু হাঁ হাঁ ক'রে ওঠে, 'রক্ষে করো মা। তাহলে আর খদ্দেরদের সাদা বুগ্‌টুকুও পেতে হবে না।...না না, এই বেশ আছি। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।'

'তবে ও পাপ পুষছিস কেন? ওর দ্বারা যদি এক কড়ার উপকারও না হয়।'

'হবে হবে—দেখে নিও। যাকে রাখো, সেই রাখে।' বলে হাসতে হাসতে চলে যেত বিধু—অপ্রিয় প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে।

এতকাল পরে বিধুর সেই কথাটা কিন্তু আশ্চর্য রকম ভাবে ফলে গেল।

দাদার দ্বারা একটা মহৎ উপকারই হ'ল।

ওরে মেয়ে মালতীর বিয়ের এক সম্বন্ধ আনলে পাঁচু।

গোড়াতে ভয় ছিল বৈকি। ওর আনা সম্বন্ধে আদৌ আস্থা রাখে নি বিধু—খোঁজখবর করতে হয় তাই করা, কিন্তু খবর নিয়ে—বেশ অনেক দিন ধরে ভাল ক'রে খবর নিয়েই—জানা গেল যে পাত্রটি সত্যিই ভাল। পাঁচু যতটা বলেছে বরং তার চেয়েও ভাল।

সে সম্বন্ধ পেকেও গেল এক সময়।

বিধু বেশ ঘটা ক'রেই মেয়ের বিয়ের আয়োজন করতে লাগল।

আর তার ফলে এতদিন পরে একটা বহুদিনের আলোচিত ও অমীমাংসিত সংশয়েরও মীমাংসা হ'ল—সেটা হচ্ছে বিধু ঠিক কত পয়সা করেছে।

বিধু জলের সঙ্গে দুধ মেশায় কি দুধে জল মেশায়—এ চিরন্তন তর্কেরও শেষ হ'ল একেবারে এই ওর মেয়ের বিয়েতে এসে। ওর যারা নিতান্ত অন্ধ সমর্থক—তাদেরও স্বীকার করতে হ'ল যে দুধে জল না দিলে আজকালকার এই বাজারে গ্রামের ইতরভদ্র ষোলআনা সবাইকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়ানো যায় না। তাও যদি উৎসবটা ছেলের বিয়ে উপলক্ষে হ'ত তো কথা ছিল—কারণ তাতে দু পয়সা ঘরে

আসে ; মেয়ের বিয়ে—এ তো পুরোপুরি লোকসান। আর গ্রামও আমাদের খুব ছোট নয়। সুতরাং সবাইকেই মানতে হ'ল যে বিধু গয়লানী এতকাল জলের সঙ্গে সামান্য দুধ মিশিয়েই আমাদের যোগান দিয়ে এসেছে।

কিন্তু সে যাই হোক, বিধুর মেয়ের বিয়েতে গেল প্রায় সকলেই। তার কারণ দুধই দিক আর জলই দিক—বিধুকে ছাড়া আমাদের চলবার উপায় নেই। ধার দেয় সে দেদার। এক এক বাড়ীতে যে কতটাকা বাকী পড়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত তামাদি হয়ে গেছে সে হিসাব বিধুরও নেই। তবু সে কখনও খদ্দেরের দুধ বন্ধ করে নি। তা ছাড়া ভারী মিষ্টি মুখ ছিল তার—তাগাদা করলেও হাসি মুখে করত। এমন কি নিতান্ত ছ্যাঁচড়া যে সব খদ্দের—যাদের দু কথা না শোনালে নয়—তাদেরও হাসি-হাসি মুখে খুব মিষ্টি ক'রেই শোনাত। একবার ক্ষীরোদ ভটচার্যিকে কিছু কটু কথা বলবার দরকার হয়েছিল—আগে ওঁর খোলা চটিটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে তবে বলেছিল মর্মান্তিক কথাগুলো। সুতরাং নিত্য ঠকালেও তাকে কেউ ছাড়াতে পারত না। স্নেহও করত অনেকেই।

এবারও—বিয়ের এই সহস্র ঝামেলার মধ্যেও—সে নিজে প্রত্যেক বাড়ী গিয়ে হাত জোড় ক'রে বলে এল সবাইকে। পাঁচটা নয়, সাতটা নয়—মরা-হাজা ঐ একটা মেয়ে। তাছাড়া তার অর্থাৎ বিধুর এই প্রথম এবং শেষ কাজ বলতে গেলে, সুতরাং পায়ের ধুলো একবার ক'রে দিতেই হবে সবাইকে। কোন অজুহাত কি কৈফিয়ৎ সে শুনবে না। কেউ না গেলে—পরের দিন বিধু তার বাড়ীতে এসে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা করবে একেবারে। ...কলকাতা থেকে হালুইকর বামুন আনানো হচ্ছে—বামুনবাড়ীর ছেলেরা সব পরিবেশন করবে—কারুরই খেতে আপত্তি থাকার কথা নয়। তাছাড়া মাছের পাট সে রাখছে না। লুচি মিষ্টি ভাজা—তার সঙ্গে আলুর দম ছানার ডালনা—এই মোটা-মুটি। এ তো ইত্তিক্ জাতের বাড়ীতেও খাওয়া যায়।

বিয়ে কেমন হচ্ছে—এ প্রশ্ন উঠল সর্বত্রই। তা বিয়ে ভালই দিচ্ছে সে। মেয়েও অবিশ্যি তার ফেলনা নয় খুব, মায়ের মতো রং পায় নি—বাপের মতো 'ময়লা' হয়েছে (কালো বলবার জো নেই, বিধুর শাশুড়ী ছিল এ অঞ্চলের ডাকসাইটে কালো গয়লানী)—তবু এমন মুখচোখ, এমন গড়ন-পেটন কটা মেয়ের আছে? একেবারে মুখ্খুও নয়—দ্বিজেন মাস্টারের ইস্কুলে চারের কেলাস অবধি পড়েছে। ...তা জামাইও করছে বিধু বিদ্বান পণ্ডিত দেখে। ওদের জাতের ছেলে, দেশে থেকে জাত ব্যবসা দেখে অথচ দুটো পাস করেছে—এমন ছেলে কি সহজে মেলে? মস্তবড় কারবার ওদের—জমি-জমা অঢেল—বাপের হাতেও নাকি দু-পয়সা আছে। এখন সবাই আশীর্বাদ করুন মেয়ে-জামাই যেন বেঁচে থেকে এসব ভোগ করতে পারে।

এমন সম্বন্ধ এল কোথা থেকে? ঈর্ষাতুর অনেক বাপ-মাই এই প্রশ্ন করলেন। তার উত্তরে বিধু সকলকে এক জবাবই দিলে, 'সে একটা বলবার মতোই কথা

বটে। সম্বন্ধ এনেছে মেয়ের মামা। জীবনে এই একবার উপকারে এল। তাও কি আর এমনি—বোন-ভাগ্নির টানে? খরচা বলে কত দফায় যে কত টাকা নিয়েছে তার হিসেব আছে? অন্তত ধরো দেড়শ দুশো টাকা তো হবেই। আবারও দুশো টাকা চেয়েছিল, ঘটকালী—শুনেছ এমন কথা? নিহাৎ মায়ের পেটের ভাই তাই—নইলে মুখে মুড়ো খ্যাংরা মারতুম। ইস্তক নাগাদ ওর সংসার দেখতে হ'ল আমাকে—মায় গাঁজার পয়সা পর্যন্ত জুগিয়ে এলুম চিরকাল—এখন আবার আমার মেয়ের বে-তে ঘটকালী চায়।'

'তা কত খরচা হবে বিধু!'

'কতয় যে পেঁছিবে তা তো বলতে পারব না বাপু, তবে হ্যাঁ ওদের কত দিতে হবে সেটা বলতে পারি। আটশ একটাকা নগদ, বারো ভরি সোনা, ছেলের একটা ছাইকেল গাড়ী। এছাড়া দান সামিগ্‌গির, বরের বোতাম আংটি এসব তো আছেই। তবু তো দাদা বলেছিল দেড় হাজার দিতে হবে—তার কম হবে না। চিনি তো দাদাকে, লজ্জাসরম না ক'রে—সোজা চলে গেলুম কুটুম-বাড়ী। শুনলুম ওরা চেয়েছেই মোটে এক হাজার। ধরে-পাকড়ে সেটাকে আটশ ক'রে ফিরলুম। দাদার মতলব ছিল একটা গোলমাল ক'রে ঐ পাঁচশ নিজে মারবে আর কি!'

বিধু হা-হা ক'রে হেসে ওঠে ভাইয়ের কীর্তির কথা বলতে বলতে।

নিজের কৃতিত্বের আনন্দেও হাসে হয়ত।

বিয়ের লগ্ন নাকি রাত সাড়ে এগারোটায়। বরপক্ষ বারবেলা কাটিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ রওনা দিয়ে নটা দশটায় এসে পেঁছিবে—এই রকম কথা আছে। তিন ক্রোশ পথ—গোরুর গাড়ীতে এলেও তিন ঘণ্টার বেশী লাগার কথা নয়। তাতে বিধু নাকি আবার এখান থেকে বলে-কয়ে কখানা মোষের গাড়ীই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে—যাতে তাড়াতাড়ি পেঁছিায়।

কিন্তু গ্রামের লোক পায়ের ধুলো দিতে আরম্ভ করেছে সন্ধ্যে থেকেই। বিধুও অপ্রস্তুত নয়—সে হাত জোড় ক'রে সবাইকে বললে, 'আপনারা সব দয়া ক'রে বসে পড়ুন। এধারের ঝঞ্ঝাট মিটে গেলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারব। বরযাত্রীদের আবার হ্যাঙ্গামা আছে তো—সব একসময়ে এসে পড়লে পারব কেন?'

অনেকেই এ প্রস্তাবে খুশী হ'ল। খালি দু' একজন অল্পবয়সী ছোকরা খুঁত-খুঁত করতে লাগল—'বর এল না, বরযাত্রী এল না, আমরা খেয়ে দেয়ে বাড়ী চলে যাব?' অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে গেলে অগাধ জলে পড়তে হবে—হয়ত রাত একটা-দুটো বেজে যাবে। তা ছাড়া সত্যিই, তখন অত রাত্রে বিধু বিয়ের ব্যবস্থা করবে, বরযাত্রী সামলাবে—না লোক খাওয়াবে? ওর দিকটাও দেখ!

অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ওর দিক দেখবার লোকই বেশী। অনেকেই বসে গেল এবং পরিতৃপ্তি সহকারে আহার ক'রে উঠল। বিধুর আয়োজন প্রচুর, জিনিসও

হয়েছে সব উৎকৃষ্ট—এবং তা সদ্ব্যবহারেরও ত্রুটি হ'ল না। দু' একজন প্রবীণ ব্যক্তি বিধুকে কয়েকবারই সতর্ক করতে গেলেন—'দেখো গো বিধু, এদিকে তো দেদার উঠিয়ে দিচ্ছ, বরযাত্রী বসবে যখন—আতান্তরে পড়বে না তো!' প্রত্যেক বারই বিধু এতখানি জিভ্ কেটে বললে, 'কী বলছেন ঠাকুর মশাই, (কিংবা চৌধুরী কাকা, কিংবা ভট্চাজ জ্যাঠা—যে যেমন)—সে হিসেব আমার নেই? আগভাগ সরিয়ে তুলে রেখে দিয়েছি না! ওরা আসবে বলেছে চল্লিশ জন—আমি অন্তত একশ জনের মিষ্টি তরকারী সরিয়ে রেখেছি!'

উৎসাহ বিধুরও যত—ওর ভাই পাঁচুরও তত। সে একটা ওপ্‌ন্‌ব্রেস্ট কোটের ওপর কোমরে কোঁচার খুঁট বেঁধে প্রাণপণে ছুটোছুটি করছে। কারণে অকারণে লোকের কাছে হাত জোড় করছে, হালুইকরদের অযথা ধমক্ দিচ্ছে এবং খাওয়ার সময় সকলকার কাছে গিয়ে আর দুটো রসগোল্লা কিম্বা আর দুটো মণ্ডা নেবার জন্যে—পীড়াপীড়ি করছে।

'দাও হে দাও। একবার না বলবে আর চলে যাবে—ওতে কি আর পরিবেশনের সুখ্যেত হয়! একেবারে উপুড় হয়ে না পড়া পর্যন্ত দিয়ে যেতে হয়। দাও, দাও—আমি বলছি দাও!'

দেখে শুনে ক্ষীরোদ ভট্চাজ আমার কাকার কাছে এসে হি-হি ক'রে হেসে বললেন, 'বেশ হয়েছে, বুঝেছ নবীন, মাগী আমাদের ঠকিয়ে যত পয়সা করেছিল—তার কিছুটা আজ প্রায়শ্চিত্তে যাচ্ছে। যেমন কুকুর ও—তেমনি মুগুর ওর ঐ গাঁজাখোর ভাইটা। ইচ্ছে ক'রে নষ্ট করাচ্ছে পেঁচো—বুঝতে পারছ না! যত যায় বোনের অপচ হয়ে! যদি শেষে টান্ পড়ে—অপ্রস্তুত হ'তে হয়—তাহলে পেঁচো বোধ হয় সওয়া পাঁচ আনার হরির নুট দেবে!'

কথাটা যে বিধুও না বুঝেছিল তা নয়! বার-দুই ভাইকে ডেকে সাবধানও করতে গেল, 'ও কী হচ্ছে দাদা! থাক্ লোকে পেট পুরে, তাতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু এ বাজারে এত নষ্ট করা কি উচিত! দ্যাখো দিকি লোক উঠে গেছে—আর পাতে মুণ্ডমালার মত মোণ্ডা রসগোল্লা গড়াচ্ছে। লুচি তরকারীও তো গাদা গাদা পড়ে!'

কিন্তু ভাই যেন থাবড়া মেরে বসিয়ে দিলে বোনকে।

'ওসব কথা আজ মুখে আনিস্ নি খুকী! (পাঁচুর কাছে বিধু এখনও খুকী!) ছি ছি, বাপ-ঠাকুদ্দার কত পুণ্যি যে এতগুলো ভদ্দর লোকের পায়ের ধুলো পড়েছে!…তোর আজ কত আনন্দের দিন বল্ তো! এমন দিনে না হয় কিছু অপচ হ'লই। বামুন কায়েত বাবু-ভাইরা চাই কিনা জিজ্ঞেস করলে হ্যাঁ বলতে পারে কখনও? জোর ক'রে পাতে ঢেলে দিতে হয়। জম্মের মধ্যে কম্ম, একদিন তো পাত পাড়তে ডেকেছিস, তাও কি আধপেটা খাইয়ে সারতে চাস? পাতে পড়ে থাকলে তবে বুঝবি পেটপুরে খেয়েছে সবাই!'

অভ্যাগতদের কাছে গিয়েও পাঁচু হাত জোড় ক'রে বলতে লাগল বার বার—'কী

আনন্দ হচ্ছে বাবু কী বলব। কত জন্মের পুণ্যি আমাদের তাই আপনারা পায়ের ধুলো দিয়েছেন। এখন আশীর্বাদ ক'রে যান যেন মেয়ে জামাই আমার বেঁচে থাকে, মনের সুখে ঘরকন্না করতে পারে!'

একজন কে নবাগত 'আমায় মেয়ে'র রহস্য বুঝতে না পেরে পাশের লোককে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে—'ওর মেয়ে মানে? তবে যে শুনলুম—মানে বিধু বলে এল—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পাঁচু বললে, 'কী বলছেন বাবু, মার পেটের বোন —তার মেয়ে। বোনের মেয়ে আমার মেয়ে কী আলাদা? তার ওপর ও হ'ল বিধবা-বেওয়া। ওর মেয়েটা যে পার হয়ে গেল—ভালয় ভালয়—এইতেই আমার সন্তোষ। আমার নিজের মেয়ের বে হ'লে যা আনন্দ হ'ত—তার চেয়ে এ ঢের বেশী হয়েছে জেনে রাখুন!'

পাঁচুর এই আন্তরিকতা, তার এই ছুটোছুটি—অনেকেরই হৃদয় স্পর্শ করল। ছেলেছোক্‌রারা তো স্পষ্টই বলতে লাগল—'যাই বল, গাঁজাখোরই হোক আর যাই হোক্—লোকটার হার্ট আছে!' এমন কি আমার কাকাও মাধব দত্তকে চুপিচুপি বললেন, 'হ্যাঁ, একটু দেখিয়ে দেখিয়ে করছে তাতে সন্দেহ নাই, হয়ত মিস্‌চীফ্‌ও কিছু আছে, তবু লোকটার আনন্দও হয়েছে জেনুইন্। আজকালকার দিনে ভাই বোনের এতটা টান—দেখলেও আনন্দ হয়।'

বিধুর ব্যবস্থায় এবং পাঁচুর তম্বিরে এখানকার অভ্যাগতদের খাওয়ার পাট মোটামুটি রাত দশটার মধ্যেই চুকে গেল।

কিন্তু বর কৈ?

এতক্ষণ এত লোকের খাওয়া দাওয়ার মধ্যে, হৈ-চৈ গণ্ডগোলে বিধুও সময়টা ঠিক ঠাওর করতে পারে নি। কে যেন মেয়েদের মধ্যে থেকেই বললে, 'রাত তো দুপুর গড়িয়ে গেল, বর কই গো—ও বিধু? আর কখন আসবে তারা?'

বিধু যেন চমকে উঠল।

'সত্যিই তো। কটা বাজল চৌধুরী কাকা? দশটা? সে কি?'

সে ছুটে এল ভিয়েনের জায়গায়। তখন পাঁচু সবে—বোধ করি সন্ধ্যের পর এই প্রথম হাঁফ্ ছাড়বার সময় পেয়ে—ছোট কল্‌কেটি বার ক'রে আঙ্‌রার সন্ধান করছে।

বিধু এসে প্রায় আর্তস্বরে ডাকল, 'দাদা! বর কই!'.

শুধু হাতেই আশ্চর্য-কৌশলে জ্বলন্ত আঙরা কল্‌কেতে তুলতে তুলতে নিশ্চিন্ত মনে জবাব দিল পাঁচু, 'সে এরই মধ্যে কি!...নটা বাজুক, নটার মধ্যেই তারা এসে পড়বে—দেখ্ না!'

'মুখে আগুন তোমার! এত ক'রে বারণ করলুম যে আজকের দিনটা অন্তত ঐ ছাই-পাঁশ নেশা ক'রো না—তা হ'ল না! ঐ নেশা যদি চিরকালের মত না ঘোচাই

তো আমার নাম নেই !'

নেশা করা আর হ'ল না। কল্‌কে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল পাঁচু, 'কেন কেন, বলি হ'ল কি ? কোন্ কাজটি তোর হচ্ছে না শুনি। বর আসবার কি সময় হয়েছে যে বর বর করছিস !'

'না, তা কি আর হয়েছে ! হাত্তোর নেশাখোরের মরণ রে ! কটা বেজেছে সে খেয়াল আছে ? দশটা বেজে গেছে যে !'

নেশা অবশ্য করেই নি তখনও পর্যন্ত—তবু কল্‌কেটা হাতে এলেই বোধ করি একটু ঘোর লাগে—সে ঘোরও ছুটে গেল।

'য়্যাঁ ! দশটা বেজে গেছে ? বলিস কি ! ও ঠাকুর মশাই—ঘড়িটা একটু দেখে দিন তো। সত্যি-সত্যিই দশটা ? তাই তো !'

তারপর একটু অসহায়ভাবে বিধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আপনিই আবার আশ্বস্ত হয়ে উঠল, 'তোর লগন তো সেই রাত বারোটার উদিকে। তবে অত উতলা হচ্ছিস কেন খামোকা ? ওরা হয় তো একটু গড়িমসি ক'রে বেরিয়েছে, তাছাড়া মেঠোপথ—মোষের গাড়ীতে আসা। দ্যাখ্ না—এসে পড়ল বলে !'

কিন্তু বিধু আশ্বস্ত হ'তে পারল না। সে পাড়ার একটি ছেলেকে অনেক খোশামোদ ক'রে নতুন কেনা টর্চের আলো দিয়ে পাঠাল—সে সাইকেল ক'রে একবার গ্রামে ঢোকবার মুখটা পর্যন্ত এগিয়ে দেখে আসবে।

ছেলেটি ফিরল মিনিট-কতক পরেই।

গ্রামের সীমানা কেন—তার ধারে-কাছেও পেঁছয় নি কেউ। সে মাঠ ভেঙ্গে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল—সেই বাসের রাস্তা পর্যন্ত—কিন্তু কোথাও কোন গাড়ীর চিহ্ন দেখতে পায় নি।

সবাই যেন কোন্ মন্ত্রবলে নির্বাক হয়ে গেল। বিধু তো সেই উঠোনের মাঝখানে মাটিব ওপরই বসে পড়ল। তার তখন কোন কথা কইবার কি বিলাপ করার মতও মনের অবস্থা নয়।

পাঁচুরও প্রথমটা একটু ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গিয়েছিল—সে বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একবার সেই ছেলেটির দিকে, বোনের দিকে—আর একবার আমাদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তারপরই হঠাৎ যেন ইলেক্‌ট্রিকের শক্ খাওয়ার মত লাফিয়ে উঠল, 'কী রকম—আসবে না কী রকম ? এ কি চালাকি নাকি ! চালাকি পেয়েছে ! ভদ্দর লোকের জাত-মান খাওয়ার ব্যাপার, আসবে না বললেই হ'ল ! আসতেই হবে তাদের। তাঁদের ঘাড় আসবে। তারা তো ছেলেমানুষ !'

সে অকারণেই একবার ছুটে বাইরে গেল, আবার তেমনিই ছুটে ভেতরে এল তখনই।

'তুই ভাবিস নি খুকী। নিশ্চয়ই পথে কোথাও কোন দেরি হচ্ছে। আজ সকালে গায়ে হলুদ এল—সব ঠিকঠাক, পরামানিক বলে গেল যে ছটা পর্যন্ত বারবেলা আছে, তার পরই রওনা দেবে ওরা। যুধিষ্ঠিরকে মোষের গাড়ীর বায়না

দিয়ে গেল যাবার সময়, বলে গেল যে বেলা চারটের এগোনে যেন ঠিক পেঁছায়—এ কি আরম্ভনা আসবার ধারা ? তুই ব্যস্ত হোস নি—এসে পড়ল বলে ।'

কথাগুলোয় যুক্তি ছিল, বিধুও একটু আশ্বস্ত হ'ল ।

যে কজন মাতব্বর তখনও বাড়ি যেতে পারেন নি—বিধুর বিশেষ অনুরোধে বরযাত্রীদের সাম্‌লাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তার মধ্যে হারাধনবাবু প্রধান । বিধুর খাটালের খানিকটা জমি তাঁর কাছেই খাজনা-করা—সেদিক দিয়ে তিনি জমিদারও বটে । সদরের এক নামকরা উকীলের মুহুরী—বুদ্ধিসুদ্ধিও অনেকটা পালিশ করা । সেজন্যে পাড়ার লোকে ওঁকে বেশ একটু সমীহ ক'রে চলে ।

হারাধনবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'কিন্তু তাহ'লেও পঞ্চানন, নিশ্চিন্ত হয়ে আর আমাদের থাকা উচিত নয় । কাউকে পাঠালে কী হয় ?'

পাঁচু বিনা কারণেই হাত জোড় ক'রে বললে, 'আজ্ঞে বাবু সে তো মেঠো পথ —সাইকেল যাবে না । কেউ হেঁটে গেলে—গিয়ে খবর নিয়ে আসতে আসতে ধরুন রাতই পুইয়ে যাবে । তখন তো আর খবর নেবার কোন দরকার থাকবে না !'

অকাট্য যুক্তি ! হারাধনবাবুকেও চুপ ক'রে যেতে হ'ল ।

কাকা মাধববাবুকে বললেন, 'বেটা গাঁজাই খাক্ আর যাই করুক—বেটার মাথা দেখেছ কি সাফ ?'

অগত্যা আবার সেই অস্বস্তিকর প্রতীক্ষা আর ঘর-বার করা । হালুইকররা মাথা-ময়দায় ভিজে গামছা চাপিয়ে, উনুনে মোটা গুঁড়ি ঠেলে দিয়ে বসে বসে ঝিমোতে লাগল ।

বাড়ীর লোকজন দোহাল-কিষেণ আত্মীয়-কুটুম কেউ কেউ তখনও খেতে বাকী আছে বটে—কিন্তু এখন এই অবস্থায় তাদের খাওয়ার কথা এমন কি তারাও ভাবতে পারলে না ।

রাত এগারোটাও বেজে গেল একসময় ।

ক্ষীরোদ ভট্‌চাজকে থাকতে কেউ অনুরোধ করে নি—কিন্তু তিনি ছিলেন । একবার মাধব দত্তের হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে গলাখ্যাঁকারি দিয়ে বললেন, 'বলি তোর পুরুত কোথায় রে বিধু—জিগ্যেস কর কটা পজ্জন্ত টাইম ! নইলে মেয়ে তো দোপড়া হয়ে যাবে !'

এবার হাউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠল বিধু ।

'ওমা এ আমার কী সব্বনাশ হ'ল গো ! ওমা এ যে দাঁড়িয়ে আতান্তর গো ! আমার যে একটা মেয়ে—তার কপালে এ কী হ'লো গো । ওগো আমি যে যথাসব্বস্ব ক্ষুইয়ে এই বে দিতে বসেছি গো ! ওগো মেয়েটা যে আমার জ্যান্তে মরা হয়ে থাকবে গো !'

হারাধনবাবু এগিয়ে এসে ভট্‌চাজকে ধমক দিলেন, 'ওসব কী কথা ভট্‌চাজ । দেখছ এরা সবাই উতলা হয়ে রয়েছে—এখন কি ঐ সব দোপড়া-টোপড়া কথা কেউ

তোলে।...আর বিধু তুইও কি পাগল হয়ে গেলি ? চুপ কর। আজকাল ওসব মানে নাকি কেউ ? চুপ কর দিকি—মাথা ঠাণ্ডা কর।...লগ্নটা কটা পর্যন্ত জানা আছে নাকি কারুর ?'

হারাধনবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চান আমাদের দিকে। তারপর পুনশ্চ প্রশ্ন করেন, 'পুরুত ঠাকুর কৈ ? তোদের পুরুতই বা গেল কোথায় ?'

দেখা গেল ওদের পুরুত ঠাকুর খানকতক কুশাসন পেতে আল্পনা দেওয়া উঠোনেই পড়ে ঘুমোচ্ছেন। এখন বহু কণ্ঠের মিলিত ডাকে চমকে উঠে বসে বিহ্বল ভাবে চেয়ে রইলেন। প্রশ্নটা বোধ করি তাঁর মাথাতেও ঢুকল না।

তবে তাঁর দরকারও হ'ল না। হরিমোহন চৌধুরী তখনও উপস্থিত ছিলেন, পাঁজিপুঁথি তাঁর নখদর্পণে। তিনি বললেন, 'লগ্নের জন্যে ভয় নেই—লগ্ন সেই রাত তিনটে পর্যন্ত আছে। কিন্তু এদের হ'লই বা কি—সেটাও তো জানা দরকার।'

'হওয়াচ্ছি আমি' হুঙ্কার দিয়ে উঠল পঞ্চানন, 'ওদের মজা আমি দেখাচ্ছি। হবে আবার কি ? বজ্জাতি। বজ্জাতি আমি বার ক'রে দেব তবে আমার নাম পঞ্চানন ঘোষ। একটা একটা ক'রে ধরে ধড় থেকে ওদের মুণ্ডু ক'টা সব যদি না ছিঁড়ে নিই—তবে আমার নাম নেই।'

যাত্রা-দলের রাবণের মত ধেই ধেই ক'রে নাচতে লাগল পাঁচু।

'কিন্তু বদমাইসী করবেই বা কেন পাঁচু'—হারাধনবাবু এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চান পঞ্চাননের মুখের দিকে, 'ব্যাপারটা কি বল দিকি। দেনা-পাওনা সব ঠিক-ঠাক—শুনেছি আগাম তিনশ টাকা নিয়ে বসে আছে—একগাদা টাকা খরচ ক'রে গায়ে হলুদ পাঠিয়েছে—এখন বদমাইসী করার উদ্দেশ্যটা কি ? এসব তো বদ মতলবের মতো নয় কিছু। তবে ? —বলি ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছিল কিছু ? কথা-কাটাকাটি ?'

'কিছু না কিছু না। অতিশয় সজ্জন লোক তারা। ঝগড়া হবেই বা কেন ? আর আমরাই কি ঝগড়া করার মত মানুষ ? বলি দেখছেন তো এতকাল। আমাদের বংশে কেউ কখনও ঝগড়া করে না।'

'এ যে উল্টোপাল্টা কথা হয়ে গেল পাঁচু। এই বলছ বজ্জাতি, আবার বলছ ঝগড়া হবেই বা কেন। অতিশয় সজ্জন। বলি ঘোরপ্যাঁচ ছেড়ে সোজা-সুজি বল দিকি।'

'ব্যাপার ? ব্যাপার জিজ্ঞেস করুন আমার বোনটিকে। ঐ যে ছিহরি ঘোষের বেটি ওখানে মাথা গুঁজে বসে আছেন—আমার ঐ ভগ্নীকে জিজ্ঞেসা করুন আগে। তখনই বলেছিলুম, দেখ—দেনাপাওয়া ঠিক করা পুরুষের কাজ, তুই ওর মধ্যে নাক গলাতে যাস নি। তা কি শুনলে ? পছন্দ হ'ল না কথাটা। আমাকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে নিজে মদ্দানী ক'রে গেল বাহাদুরী নিতে। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে যাওয়া। মনে করলে এত টাকা কমিয়ে খুব সস্তায় কিস্তিমাৎ করলুম।'

আমি বেশ বলতে পারি সেই টাকার জন্যেই বেগ দিচ্ছে এখন।'—

'কখ্খনও না।' কাঁদতে কাঁদতেই ফোঁস্ করে ওঠে বিধ্, 'তুমি মিছে ক'রে বলেছিলে পাঁচশ টাকা মারবে বলে। তারা বেশী টাকার কথা তোলেই নি। হাজার চেয়েছিল আটশ'তে রাজী করিয়েছি—এ এমন একটা কী কথা। তার জন্যে—'

হারাধনবাব্ বললেন, 'পাগল নাকি। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে পাঁচু। সামান্য কটা টাকার জন্যে তারা এমন কাজ করবেই বা কেন। কোর্ট্ ধরে বসে থাকতে পারত আগেই। এখন খানিক টাকা আগাম নেওয়া হয়ে গেছে, বিধ্ বোতাম দিয়ে আশীর্বাদ করেছে, তারা বালা দিয়ে গেছে অন্তত আড়াই ভরির—আজ সকালে তত্ত্বও যা করেছে তিন-চারশ'র কম নয়—এখন সামান্য কটা টাকার জন্যে বেগ দিতে এমন হাত পা গ্নটিয়ে বসে থাকবে—এ বিশ্বাস হয় না।'

'তাহলে আমি একবার যাই তাদের ওখানে—গিয়ে দেখি কী ব্যাপার।' আর একবার হ্ঙ্কার ছাড়ে পাঁচু, 'কান ধরে টেনে আনি গিয়ে—চালাকি নাকি এ—য়্যাঁ। ভদ্দরলোকদের মানসম্মানের কথা—সে হ্ঁশ নেই তাদের।'

হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে হারাধনবাব্ বললেন, 'রাত বারোটা বাজে, তুমি এখন এই তিন ক্রোশ পথ গিয়ে কখন ফিরবে?'

'সে আমি যাব আর আসব। একবার ছোট কল্কেটায় টান দিতে দেন—ইষ্টিমটা ভরে নিই, তারপর এ পথ এক দৌড়ে পার হ'তে পারব।'

হারাধনবাব্ ম্হ্র্তকাল কি ভেবে নিয়ে বললেন, 'তুমি এখানে থাক পাঁচু, হঠাৎ যদি ওরা এসে টেসে পড়ে—সামলাতে পারবে। আমিই বরং যাই। বিধ্, তখন যে সাইকেল ক'রে গেল ছোকরাটি—সে গাড়ীটা আছে?'

হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল পাঁচু, 'সে চেষ্টাও করবেন না বাব্, সে একেবারে অসম্ভব। সড়ক আর কতট্কু? বেশীর ভাগ পথই বলতে গেলে আলের ওপর ধরে যাওয়া—সাইকেল ক'রে কখনও যাওয়া যায়?'

'দেখি না—যতটা যাওয়া যায়। নিতান্ত যখন পারব না নেমে হাঁটব। খরার দিন—কাদা তো নেই। তুই গাড়ীটা আনতে বল বিধ্, আমি দেখছি।'

বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল পাঁচু।

'এ কী বলছেন বাব্—আপনার বড্ড কষ্ট হবে। তার চেয়ে আমি একছ্টে যাব আর আসব। এ গাঁজার জোরে চলে যাব—কোন কষ্টই হবে না। আপনি এই খেয়ে দেয়ে এতটা পথ—সে আপনি কিছ্তে পারবেন না।'

ততক্ষণে সাইকেল নিয়ে সেই ছোকরাটি এসে দাঁড়িয়েছে। হারাধনবাব্ একবার টর্চ ফেলে গাড়ীর অবস্থাটা দেখে নিয়ে প্রশান্ত ম্খে গাড়ীতে চেপে বসলেন। পাঁচুর কথার জবাবও দিলেন না।

জবাব দিলেন হরিমোহনবাব্, 'কেন উতলা হ'চ্ছ পাঁচু—ওর নাম হারাধন হাজরা, ফৌজদারী আদালতে যত রাজ্যের ঠ্যাঙ্গাড়ে বদমাইস চরিয়ে খায়। ও না পারে এমন কাজ নেই। তুমি এতক্ষণ যা করছিলে তাই করো গে—ইষ্টিম ভরে

নাও গে !'

আবার সেই অন্তহীন প্রতীক্ষা।

রাত ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। লোকজন সবাই বসে ঢুলছে—তাদেরও খুব দোষ দেওয়া যায় না ; উৎকণ্ঠা আছে ঠিকই কিন্তু সারাদিনের এই হাড়-ভাঙ্গা খাটুনীর পর চুপ ক'রে বসলে ঘুম পাবেই—তা যত দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠাই থাক। পাড়ার মাতব্বর যাঁরা আগে যান নি, তাঁরা আর যেতে পারলেন না। বিধুকে এই বিপদ আর অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে চলে যেতে চক্ষুলজ্জায় বাধল। তাঁরাও—উঠোনে অনেকগুলো তক্তপোশ জড়ো ক'রে যে ঢালা ফরাস পাতা হয়েছিল তার উপরেই—তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে ঝিমুতে লাগলেন। হালুইকররা প্রথমটা কিছু গজ-গজ করেছিল কিন্তু মাধব দত্তর কাছে ধমক খেয়ে চুপ ক'রে গেছে। তাছাড়া তাদের সেই পরের দিন দুপুরের আগে গাড়ী নেই—কাজেই খুব অসুবিধাও ছিল না। তারা কিছু কিছু দই-মিষ্টি খেয়ে নিয়ে পড়ে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

শুধু ঘুম নেই বিধুর চোখে। আর বোধহয় ঘরের মধ্যে মেয়েটার চোখেও। বিধু বসে বসে নিঃশব্দে কাঁদছে। বাড়ীর দিকে পিছন ফিরে বসে আছে তবু—ওদিকে চাইলে বুকের মধ্যে মুচড়ে কান্না আসছে।

রাত একটা বাজল।

ক্রমে দুটোও বেজে গেল।

বেশ একটা ঝোঁক তন্দ্রার পর মাধব দত্ত উঠে বসে ঘড়িটা দেখে বললেন, 'বিধু শুধু কেঁদে তো কিছু হবে না। আর তো মোটে এক ঘণ্টা লগ্ন আছে।…জানা-শোনার ভেতর—পাড়াঘরে কোন পাত্তর্-টাত্তর নেই! একটা কিছু করা যায় না—?'

আবারও ডুকরে কেঁদে উঠল বিধু, 'দত্ত কাকা, যাকে তাকে ধরে দেব বলেই কি এত কাণ্ড করলুম—জলের মতো এত টাকা খরচ করলুম! আমার যে ঐ একটা মেয়ে কাকা!'

সে কান্নায় সকলেরই তন্দ্রা ছুটে গেল।

আবারও উঠল গুঞ্জন। আত্মীয়-স্বজনরাও—যার যেখানে জানাশুনো যত পাত্র আছে—সকলের নাম মনে করতে লাগল। হালুইকররাও হাই তুলে উঠে বসল একে একে। একজন একটা হাঁড়ি ক'রে চায়ের জল বসিয়ে দিলে।

বিধু ততক্ষণে ঢিব্ ঢিব্ ক'রে মাথা ঠুকছে। চৌধুরী মশাই গিয়ে জোর ক'রে মাথাটা চেপে ধরলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, 'এক বাড়ী মেয়ে-ছেলে বসে আছে, একে একটু ধরে মাথায় জল দিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারে এমন লোক নেই ?'

তখন দু' তিনজন ছুটে এসে বিধুকে ধরল।

বিধু তাদের হাত ছাড়াবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে—'ওরে, তোরা আমাকে মেরে ফেল, নইলে মরতে দে। ওরে এ মুখ আর আমি কাল সকালে মেয়েটাকে দেখাতে পারব না রে—'

আড়াইটেও বেজে গেল একসময়।

সকলের মুখ শুকিয়ে উঠেছে এবার।

হরিমোহন বললেন, 'ওহে ভটচাজ—আর তো দেরি করা যায় না। এদের এখন মাথার ঠিক নেই—তুমি পাঁচুকে ডাক দিকি, ওদের জাত-কুটুমের মধ্যে চলনসই পাত্র কে আছে বলুক।···বিধুর অভাব কি, এত সম্পত্তি ঐ মেয়েই তো পাবে—জামাই বড়লোক না হ'লেও চলবে। পাঁচু কোথায় গেল?'

'পাঁচু কোথায় গেল!' আরও দু চার জন অসহায় ভাবে সেই প্রশ্নটাই শুধু করলেন।

কিন্তু কাছাকাছি ধারে-কাছে অন্তত পাঁচুর টিকিও দেখা গেল না।

আমার কাকা উঠে ভিয়েনের জায়গাটা দেখে এলেন। একটা মেয়েকে বাড়ীর মধ্যেটাও দেখতে বললেন। একজনকে পাঠালেন 'মাঠ' অর্থাৎ অপকর্ম করার জায়গাটা দেখে আসতে। কিন্তু কোথাও কোন খবর পাওয়া গেল না।

'তাই তো!' হরিমোহন বললেন, 'এখন উপায়?'

'আর খোঁজ ক'রেই বা এখন লাভ কি বল?' মাধববাবু বললেন, 'এখন আর কি খবর ক'রে কথা বলে লগ্নের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব?'

কাকা হাতঘড়িটা দেখলেন, 'পুরুত তখন তিনটে তের বললেন না? আর ঠিক সতেরো মিনিট সময় আছে! ইম্পসিব্‌ল!'

'লগ্ন চুলোয় যাক! আজ রাত পোয়াবার আগেও বসাতে পারলে জাত মানটা বাঁচে!' হরিমোহনবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, 'এদের খুব ভুল হয়েছিল, একটা লোক এখান থেকে পাঠানো উচিত ছিল বিকেলেই—'

'সে রেওয়াজ তো আমাদের ইদিকে নেই। এমন হবে তাই বা কে জানে বল!'

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড চিৎকার ক'রে উঠলেন ক্ষীরোদ ভট্‌চাজ—'ঐ!!'

ঐ কি? সকলে অবাক!

'ঐ শোন না কান পেতে।···এসে গেছে!'

মুহূর্তে যেন জাদু-মন্ত্রবলে সবাই চুপ ক'রে গেল। আর তখনই স্পষ্ট শোনা গেল—নৈশ অন্ধকারের মধ্যে মাঠের দিক থেকে ভেসে আসছে তখনকার মতো পরম অভীপ্সিত শব্দ—এক সাইকেলের ঘণ্টা!

সাইকেলের ঘণ্টা বলে নিঃসংশয়ে বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা কোলাহল উঠল। কিন্তু আনন্দধ্বনি যাকে বলে ঠিক তা নয়—কারণ সকলেই তখন আশা ও আশঙ্কার মাঝখানে কাঁটা হয়ে আছে।

কী সংবাদ আসছে কে জানে!

আশার চেয়ে আশঙ্কাই বেশী—হারাধনবাবু না হয় সাইকেলে ফিরলেন—কিন্তু বর? বর এত তাড়াতাড়ি আসবে কেমন ক'রে? লগ্ন যাক্‌গে—যদি ভোরের মধ্যেও এসে যায়—।

হারাধনবাবু এসে পড়লেন—সাইকেল সুদ্ধ একেবারে উঠোনের মধ্যে। ঘর্মাক্ত কলেবর—হা হা শব্দে হাপরের মত নিঃশ্বাস নিচ্ছেন।

তারই মধ্যে প্রথম প্রশ্ন করলেন, 'সময় আছে তো এখনও একটু? পুরুত কৈ? পুরুত? বসে যাও বসে যাও—বাবাজী, সংকল্পটা সেরে নাও কোন মতে—'

তবু যেন কারুর হাত-পা চলতে চায় না। বিস্ময়ে সকলে অনড় বিমূঢ়।

কিন্তু সে মুহূর্ত কয়েক মাত্র। তারপরই একটা আনন্দের কোলাহল নয়—গর্জনই উঠল!

হারাধনবাবু অসম্ভব সম্ভব করেছেন—তাঁর সাইকেলের পিছনে বসিয়ে এনেছেন—একটি চব্বিশ পঁচিশ বছরের শ্যামবর্ণ যুবক—বরবেশে সজ্জিত।

বিধু একবার 'ঐ তো, ঐ তো আমার হারানো মানিক!' বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

সকলে সেদিকে ছুটে যাচ্ছিল, হরিমোহনবাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'উঁহু উঁহু। ও এখন থাক। এর পর ঢের সময় পাওয়া যাবে। আগে পিঁড়িতে বসাও বরকে! বাবাজী এস এস—আর কাপড় ছাড়তে হবে না। এসো—আমি মন্তর পড়াচ্ছি—বলি ও পুরুত ঠাকুর—অমন হাঁ ক'রে চেয়ে বসে থাকলে চলবে না। চটপট মন্তর পড়ান। আর মনে না পড়ে তো সরে আসুন—আমি পড়াচ্ছি!'

শাঁখ বাজল, হুলুধ্বনি উঠল। অনেকক্ষণ পরে বিয়ে-বাড়ীর চেহারা নিয়ে যেন পুনর্জন্মে জেগে উঠল সেই মৃত্যুপুরী!

আমার কাকা হারাধনবাবুকে চৌকীতে বসিয়ে পাখার অভাবে একটা কুশাসন পাট ক'রে বাতাস করছিলেন। চারিদিকে সহস্র প্রশ্ন মুখর ও উন্মুখ—কিন্তু কাকাই সবাইকে থামিয়ে রেখেছেন, 'দেখছেন না লোকটার অবস্থা—এই মাঠ আর আল ভেঙ্গে একটা লোককে পেছনে বসিয়ে এতটা পথ এসেছে—আর বেশ জোরেই আসতে হয়েছে। ওর বুকে কি আছে!'

সামান্য একটু সুস্থ হয়ে উঠেই হারাধনবাবু প্রথম প্রশ্ন করলেন, 'সে হারামজাদা পালিয়েছে তো?'

'কে? কার কথা বলছেন?' সহস্র কণ্ঠে প্রশ্ন হয়।

'আবার কে! ঐ গাঁজাখোর পেঁচো হারামজাদা!...দেখা হ'লে জ্যান্ত ওর ছালটা ছাড়িয়ে নেব আমি আগে, তা বুঝেই পালিয়েছে!'

এবার আর কারুরই কৌতূহল চাপা থাকে না। কাকাও প্রশ্ন করেন—'কিন্তু ব্যাপারটা কি হারাধনবাবু?'

'ব্যাপার খুব সোজা। বিকেলে কে এক ছোকরাকে ধরে ঐ স্কাউন্ড্রেলটা খবর পাঠিয়েছে যে—এ বাড়ীতে ভীষণ রকমের কলেরা দেখা দিয়েছে। রোগ ধরছে আর মরছে। কনে তো দুপুর বেলাতেই মারা গেছে—কনের মাও যায় যায় অবস্থা, কাজেই বর আসবার আর দরকার হবে না—যা রোগের চেহারা, খবর নিতে যাওয়াও নিরাপদ নয়। ...কাজেই ওরা বিয়ের আশা ত্যাগ ক'রে ঘুমোচ্ছিল। কোনরকমে

ওদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে বরকে বলতে গেলে একরকম টেনে নিয়ে চলে এসেছি, ওর বাবা আর জ্যাঠার মাথাতে কথাটা ঢোকে নি—বোধ হয় একটু ভয়ও পেয়েছে, পেছন ফিরে একবার দেখেছি তারা হেঁটেই রওনা দিয়েছে, খানিক পরেই এসে পড়বে হয়ত। বাকী সব গাড়ী ঠেলে মোষ জুতে রওনা হ'তে যাকে বলে ভোর—সকালের আগে আসছে না কেউ।...মহাপুরুষ লোক পাঁচু! টাকাটা মারতে পারে নি—ঘটকালি চেয়েছিল তাও দেয় নি বিধু—সেই রাগে এত বড় সব্বনাশটি বাধিয়ে বসেছিল। রাত ভোর হ'লে এক ফাঁকে আস্তে আস্তে সরে পড়বে—বোধ হয় এই ছিল মতলব। আমার জন্যেই কিছু আগে পালাতে হ'ল। কে জানে, হয়ত মনে মনে একটা অখাদ্য পাত্তরও ঠিক ক'রে রেখেছিল শেষ মুহূর্তের জন্যে—এপক্ষ ওপক্ষ দুজনের কাছ থেকেই টাকা খেয়ে তাকে হাজির করত। বিধুর জামাই হবার জন্যে এখানকার অনেক ছোকরাই ওকে ঘুষ দিত!'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে আবারও হাঁপাতে লাগলেন হারাধনবাবু।

মোহমুদ্গর

পয়সা খরচ ক'রে বাড়ী কিনে, আর তা দেখা-শোনা করবার জন্য মাইনে দিয়ে লোক রেখে মানুষ যে এমন বিপদে পড়ে তা কে জানত!

সবচেয়ে বিপদ হচ্ছে, সম্পত্তি যাঁর নামে, যাঁর মনস্তুষ্টির জন্যে প্রধানত এসব করা—তাঁরই বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই এ ব্যাপারে। পরামর্শ দেওয়া তো দূরের কথা, প্রসঙ্গটাই তোলবার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে ওঠেন, 'তখনই পঞ্চাশবার বারণ করেছিলুম যে, ওকাজ কোর না—কোর না! তখন আমার কথা বড় বিষ লেগেছিল।...তখন আমার কথা শোন নি—নিজের গোঁয়ে কাজ করেছিলে—এখন নিজেই বোঝ, আমাকে শোনাতে এসেছ কী করতে! কী সমাচার —না বড় ভাল জায়গা! বলি ভাল জায়গার কি অভাব আছে পৃথিবীতে? একই জায়গায় বছর-বছর চোদ্দবার ক'রে যাব কেন? আর যদিই যাই—তোমার ছুটি তো সেই বছরে একমাস—এর বেশী নয়? একটা বাড়ী ভাড়া করলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কত খরচ পড়ত তাতে তাই শুনি! তা নয়—আমাকে বোকা বোঝালে—অমনি একটা সম্পত্তি হয়ে রইল তোমার! সম্পত্তি! কলকাতায় একটা খোলার বাড়ী তুললেও মাসে পঞ্চাশটা টাকা আয় হয়—আর এ উল্‌টে মাস মাস তিরিশ টাকা গুণগার! তাছাড়া খাজনা টেক্স মেরামত, বাগানের খরচা, বারো মাসে তের পার্বণ তো লেগেই আছে! এসব হ'ল গে হাতী-পোষা—কোমরের বল বুঝে এসব শখ করা উচিত!'

এটা সামান্য নমুনা। আরও যে সব কথা তিনি বলেন এই বাড়ী প্রসঙ্গে, তা সব না হোক অর্ধেক বলতে গেলেও মহাভারতের মতো পুঁথি হয়ে যায় একটা।

সেইজন্যে ও কথা তোলাই ছেড়ে দিয়েছি। কুন্তীকে টাকা পাঠাই অফিসের ঠিকানা দিয়ে—যাতে রসিদ বাড়ীতে না আসে। ওটা দেখলেই মনে পড়বে খরচের কথাটা—আর তা হ'লেই ব্যস্, ঘণ্টা-দুয়ের জন্যে নিশ্চিন্ত। বাড়ীতে কাক-চীল বসবে না গিন্নীর চিৎকারে।

কিন্তু বিধাতা যাকে শান্তি দেবেন না বলে মনে করেন তার সেটা আশা করাই বিড়ম্বনা। কোথা থেকে, কোন্ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে অশান্তির সূচনা হয় তা কেউ বলতে পারে না।

আমারও হ'ল তাই। হঠাৎ দেবু বড় বড় চিঠি লিখতে শুরু করলে আমার কাছে—এবং আমার কাছ থেকে সহানুভূতি না পেয়ে আমার স্ত্রীর কাছে। পোস্ট-কার্ড, ইন্ল্যান্ড, খাম—শেষে রেজেস্ট্রি চিঠি পর্যন্ত।

এক একটি চিঠি আসে আর আমার গৃহিণী তুড়িলাফ্ খেতে থাকেন। দেবুর নালিশ তো বটেই—সেই প্রসঙ্গে বাড়ী করার নির্বুদ্ধিতা এবং তজ্জনিত মাসে মাসে কতগুলি ক'রে টাকা লোকসান হচ্ছে সে কথাও তাঁর মনে পড়ে যায়—আর তার ফলে তিক্ততার শেষ থাকে না। এবং তাঁর সব বক্তব্যের উপসংহার একই—"আমাকে একটা গয়না কি একখানা ভাল কাপড় দিতে হ'লে তোমার বুক ফেটে চড়চড় করে—অথচ এর বেলা তো টাকা ঠিক বেরোয়! একটা বেশ্যে মাগীর জন্যে মাস মাস এক কাঁড়ি টাকা খরচ করা! লোকে বাড়ী ঘর ক'রে ঠাকুর দেবতা বসায়—তুমি আট হাজার টাকা খরচ ক'রে এক বেশ্যে বসিয়েছ—তার খরচা সুদ্ধ যুগিয়ে যাচ্ছ মাস মাস! বলিহারী তোমার বুদ্ধি!...এখনও ভাল চাও তো ঐ বাড়ী বেচে টাকা ঘরে তোল। পোস্টাপিসে পড়ে থাকলেও শুনেছি দেড় টাকা সুদ মাস পাওয়া যায়। আধা দামে বেচতে হয় সেও ভাল—তবু মাস মাস এই খরচাটা তো বাঁচে!" ইত্যাদি—

কিন্তু তার আগে দেবু-কুন্তী সংবাদের গোড়ার কথাটা বলতে হয়।

তারও আগে ঐ বাড়ীটা। স্বাস্থ্যকর জায়গা, পাহাড়ে পর্বতে নদীতে অরণ্যে মেশা মনোরম দৃশ্য—অথচ কলকাতা থেকে সাড়ে ছ ঘণ্টার পথ, গাড়ীভাড়াও চার টাকার মধ্যে। পেটের রোগ তো সকলকারই, ওখানে গেলে অথচ একদিনও ওষুধ খেতে হয় না। এই সব ভেবেই বাড়ীর খোঁজ ক'রেছিলুম এবং সাড়ে ছ হাজারে অতখানি জমি সুদ্ধ বাড়ীটা পেতে আর দ্বিধা করি নি। পরে অবশ্য পাঁচিল দেওয়া এবং মেরামত করা নিয়ে হাজার-দেড়েক পড়ে গেল; কিন্তু তবু—তিনখানা বড় বড় ঘর, দালান, রান্না-ভাঁড়ার (এ দুটো অবশ্য খাপরার) সব নিয়ে অত বড় বাড়িটা সস্তাতেই মিলেছে বলে মনে করি।

বাড়ি করার আনন্দে বাড়ি ক'রে গেছি, তখন অতটা বুঝি নি; বাড়ি শেষ হ'তেই সমস্যাটা উঠল—বাড়ি দেখবে কে? এতখানি জমি, যদি গাছপালাই দু'-চারটে আন্জাতে হয় তো তাই বা কে করে।

তার আগেই গৃহপ্রবেশ করতে গিয়ে কুন্তীকে পেয়েছিলুম। ঝি খুঁজছি—পাড়ার মাতব্বর ভোলাদা কুন্তীকে এনে দিলেন। বললেন, 'কাজ-কর্মে চৌকস, বাগানের কাজ, জল দেওয়া—যেটা এখানে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার—সব করতে পারবে। এমন কি—চুপিচুপি বলি, রান্নাবান্নাতেও ওস্তাদ, বাঙ্গালী-পছন্দ রান্না সব জানে, আর মুরগী যা রাঁধে খেলে ভুলতে পারবেন না। দোষের মধ্যে একটু ইয়ে—মানে চরিত্রটা তেমন ভাল নয়।'

তখন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম, 'নিন মশাই। ঘরের মাগকেই পাহারা দেওয়া যায় না—তা বাইরের ঝি। ঝিয়ের চরিত্র নিয়ে আমি করবই বা কি!'

'তা নয়!' ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলেছিলেন ভোলাদা, 'ওর ক্যান্ডিডেট অনেক। বড় জ্বালাতন করে। এখন দেখছেন বেশ মানুষ—রাত নটার পর আর এক রকম। আর রুচিও সব লোকের তেমনি! এর আগে ও যেখানে ছিল, ঘোষ-বাংলোতে—সেখানকার পাঁচিল টপ্‌কে ওর কাছে অভিসারে যেতে গিয়ে পা ভেঙেছে ছোটুমল মারোয়াড়ী—যার পয়সার দিশাবিশ নেই। এই তো সেদিনকার কথা!'

ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখেছিলাম বৈকি কুন্তীর দিকে। যেমন এদেশের আদিবাসী মেয়েরা হয় তেমনিই—নিকষ কালো রং আর অটুট স্বাস্থ্য। তবে বয়স হয়েছে, নিতান্ত কাঁচা মেয়ে নয়। আর এক-টা যা নজরে পড়ল তা হচ্ছে ওর অপরিসীম গাম্ভীর্য। পরেও দেখলাম—বাক্য সম্বন্ধে বড় কৃপণ, কথা কেউ কইলে জবাব দেয়—তাও অতি সংক্ষেপে, একটি দুটি শব্দর বেশি খরচ করে না—কিন্তু নিজে থেকে কোন কথাই বলে না, কিছু জানবার প্রয়োজন ছাড়া। এমন কি হাসতেও দেখি নি কোনোদিন।

তা হোক—কুন্তীকে আমাদের সকলেরই পছন্দ হয়েছিল। কাজের লোক তাতে সন্দেহ নেই, একটা লোক যে এত কাজ করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করাই শক্ত। এতগুলো লোকের জল যোগানো, বাড়ীঘর ঝাড়া-মোছা করা, রান্না, মুহুর্মুহুঃ চা দেওয়া—তার ওপর বাগানের কাজ। বিশ্রাম বলে কিছু যেন জানে না মেয়েটা। সারা দুপুর ভূতের মত ঘুরে ঘুরে কাজ করে—কিছু না থাকলে শুক্‌নো পাতা কঞ্চি কুড়িয়ে এনে রান্নাঘরে জমা করে পোড়াবার জন্য। আমার স্ত্রী সুদ্ধ তখন ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। তার কারণ এখানে এলে তাঁর অখণ্ড ছুটি মিলত—মধ্যে মধ্যে কুট্‌নো কোটা ছাড়া কোন কাজ করতে হ'ত না। রান্নাবান্নাও আমাদের পছন্দমতো ছিল—আর চায়ের তো তুলনা নেই। অমন চা—চুপিচুপি বলি—বাড়ীর ওঁয়ারাও কোনদিন করতে পারেন নি।

তবে ঐ, ভোর পাঁচটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত। রাত্রে আমাদের খাওয়ার পরই যে শ্রীমতী কোথায় উধাও হতেন, সারারাত আর পাত্তা মিলত না।

প্রথমটা অত বুঝতে পারি নি। ওকে শুতে দেওয়া হয়েছিল ভাঁড়ার ঘরটাতে—কথা হয়েছিল—আমরা যখন থাকব না—ও মূল বাড়ীর যে কোন একখানা ঘরে শুতে পারবে; সবাই এলে ঘরের অকুলান হয়, তখন—আমাদের থাকার কদিন—

ঐ ভাঁড়ার ঘরটাতেই থাকবে। সে ঘরও ভাল, জানলা আছে, তাছাড়া খাটিয়া তো ওকে একখানা প্রথম দিনই কিনে দিয়েছিলাম।

সেই প্রথমবারই—হঠাৎ একদিন রাত্রে আবিষ্কার করলুম যে, ওর ঘরে কেউ নেই—ঘরে তালা দেওয়া।

কুন্তী। কুন্তী। কুন্তী কোথায় গেল? বাথরুমে? পায়খানায়? বাগানে?

কোথাও পাত্তা নেই। গৃহিণী ব্যস্ত হয়ে ছেলেদের ডাকতে যাচ্ছিলেন, আমি ইঙ্গিতে নিষেধ করলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভোলাদার কথাটা। চোখ টিপে বললাম, 'দেখ, তোমার বেটি বোধ হয় অভিসারে গিয়েছেন। অত চেঁচামেচি কোর না, শেষে হয়ত লজ্জা পাবে।'

'অভি—ও!' কথাটা মনে পড়ে গেল তাঁরও, 'কিন্তু ফটকে তো তালা বন্ধ, সে চাবিও তো আমার বালিশের নিচে। গেল কোথা দিয়ে?'

'কেন, পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে।'

'এই এত উঁচু পাঁচিল। আচ্ছা গেছো মেয়ে তো।'

পরের দিন কখন আবার ফিরে এসেছে, কোন্ পথে, তা কেউ জানি না। গৃহিণী ইচ্ছে ক'রেই পাঁচটায় উঠলেন, কিন্তু দেখলেন তার আগেই সে কুয়া থেকে জল তুলে বাথরুমের চৌবাচ্চা ভরে ফেলেছে।

তিনি ছাড়বার পাত্রী নন। আমি এ প্রসঙ্গ তুলতে বারণ করলুম কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। ডেকে প্রশ্ন করলেন, 'রাত্রে কোথায় গিছলি রে কুন্তী? ঘরে চাবি দিয়ে?'

কুন্তী জল তুলতে তুলতেই সংক্ষেপে উত্তর দিলে—'এই একটু—'

'এই একটু কি? গেলিই বা কি ক'রে—খাড়া পাঁচিল বেয়ে?'

এ অনাবশ্যক প্রশ্নের আর উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করল না সে।

গৃহিণী তবু কথা চালাবেন। পুনশ্চ প্রশ্ন করলেন, 'ঐ ঘরে ছিষ্টির বাসন-কোসন তুই যে তালা লাগিয়ে চলে গেলি—যদি চোর আসত?'

এবার উত্তর দিলে কুন্তী। তার হিসেবে অনেক কথাই বলে ফেললে, 'আমি যতদিন এ বাড়ীতে কাজ করব—কোনদিন কোন চোর আসবে না।'

ঐ পর্যন্তই ও প্রসঙ্গে ইস্তফা পড়ল।

এ এমন কিছু নয় যা নিয়ে বেশী কচ্লাকচ্লি করতে হবে। তাছাড়া এত গুণের মানুষ কিছু পথে ঘাটে ছড়ানো থাকে না। সামান্য একটা দোষের জন্য একে তাড়ানোও যায় না।

আমরা চেপেই গেলুম ব্যাপারটা।

এরপর, বাড়ী কেনার পর নতুন নতুন অনেকবারই এসেছি, যখনই এসেছি এই ব্যাপার। ইদানীং স্ত্রী নীতিগতভাবে ওর মাইনেটা নিয়ে চেঁচামেচি করতেন বটে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ওর ওপর খুব প্রসন্নই ছিলেন। এমন কি পাড়ার লোক এ বিষয়ে ইঙ্গিত করলে বলতেন,—'আমার কাজে যখন সে এতটুকু ফাঁকি দেয় না—

আমার সময়েও গরহাজির থাকে না, তখন আর আমার কী বলবার আছে? মনে করব ঠিকে ঝি—রাত্রে বাড়ী গেছে। তাহ'লেই তো চুকে গেল।'

একবার এসে শুনলাম,—পাড়ার বৃদ্ধ দত্তবাবু ডেকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন,—'বাবাজী, আমাদের চোখে বড় খারাপ লাগে বলেই বলা। একে তো নিত্যি হরেক নাগর এনে কেলি করে তোমার শোবার ঘরে—তোমার খাটিয়ার ওপর, তারপর এদান্তে মদের যা রেলা চলছে! আমাদেরই অসহ্য বোধ হয়। বললে বিশ্বাস করবে না, আমার ঘর থেকে রাত্তিরে মদের গন্ধ পাওয়া যায়। তার ওপর হুড়হুড় ক'রে বমি করার শব্দ! এতটা বাড়াবাড়ি করতে দেওয়া ঠিক নয়।'

মনে পড়ে গেল কথাটা, গতবারই ঋষিবাবু বলেছিলেন, 'ঐ বুড়ো নারান দত্তটা—ঐ বুড়োটাই কি কম! এই তো সেদিনও—আপনার গেটের সামনে কুন্তীর হাত ধরে টানতে গিয়ে চড় খেয়েছিল ওর হাতে।' সুতরাং আমার সম্বন্ধে এই অহেতুক হিতৈষণার কারণটা বুঝতে দেরি হ'ল না। তবু সেইদিনই কুন্তীকে ডেকে বললুম, 'হ্যাঁরে তোরা নাকি আমাদের শোবার ঘরে বসে মদ খাস? আর যা করিস করিস—মদটা খাস নি বাবা। ওতে আমার বড্ড ঘেন্না। খেতে হ'লে বারান্দায় বসে খাবি।'

কুন্তী ঘাড় হেঁট ক'রে শুনেছিল সব—শেষে শুধু একটা কথা বলেছিল, 'ঘরে আর মদ ঢুকবে না।'

এবং ঢোকেও নি আর। সে কথাটা এমন কি দত্তবাবুকেও স্বীকার করতে হয়েছে, 'না, ঘরে আর খায় না। এখন মদ খেলে এই বাগানে বসে খায় দেখেছি। নেহাৎ বিষ্টিটিষ্টি পড়লে বারান্দায় গিয়ে বসে—কিন্তু ঘরে ঢোকে না। আর সেরকম হল্লাও শুনি নি কোনদিন।'

সত্যিই শান্তিতে ছিলুম। এদিকটা নিয়ে মোটে মাথা ঘামাতে হ'ত না। মাসে মাসে টাকাটা পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত। যত গোল বাধল ঐ দেবুটা আসার পর থেকেই। দেবু এই দেশেরই ছেলে, আদিবাসী ঠিক নয়, বাঙ্গালীই, তবে দীর্ঘদিন এদেশে থাকার ফলে এদের মতই চালচলন কথাবার্তা এসে গেছে; পদবীও বিচিত্র, কোন্ জাত বোঝবার উপায় নেই। উনিশ কুড়ি বছরের ছিপছিপে শ্যামবর্ণ লাজুক ধরণের ছেলে—ওল্টানো টেরি সর্বদা তেল চকচক করে—এছাড়া কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। ওদিকে বহড়াগোড়া না কোথায় দেশ, এখানে এসেছে বড় কারখানায় চাকরি করতে। ওরও একটি আশ্রয় দরকার—সামনে মুখুয্যেবাবুদেরও দরকার দেখাশোনা করার একটা লোক। মুখুয্যেবাবুরা এখানে থাকেন না, কদাচিৎ কালে-ভদ্রে আসেন। বাগান টাগান করার শখ নেই, নিতান্তই জানলা-কপাটগুলো না চুরি ক'রে নিয়ে যায়—এই কারণে একটা লোক রাখা। তার জন্যে মোটা মাইনে দিয়ে লোক রাখতে রাজী নন তিনি। দেবুকে জুটিয়ে দিলেন দত্তবাবুরই জামাই রবি। রবিও ঐ কারখানায় কাজ করেন, বড় চাকরি। দেবুর ঐ লাজুক প্রকৃতির জন্যেই হোক আর যে জন্যেই হোক,—হয়ত অনুগত একটা লোক

শ্বশুরবাড়ীর পাশে থাকলে স্ত্রীর ফায়ফরমাশ খাটার সুবিধা হবে বলেই—তিনি মুখুয্যেবাবুকে বলে দিলেন। স্থির হ'ল দেবু ও'র ছোট বাইরের ঘরখানাতে থাকবে এবং রান্নাঘরেই রেঁধেবেড়ে খাবে। ও'রা যখন আসবেন তখন অবশ্য রান্না-ঘর ছেড়ে দিতে হবে, তবে ও'দের ওখানেও খেতে পাবে—অথবা হোটেলে—যেমন অভিরুচি। মাইনে-পত্র বলে কিছু দেবেন না—তেমনি ভাড়াও নেবেন না। শুধু পুজোয় কাপড়-জামা এবং নগদ কুড়িটা টাকা দেবেন ও'রা—এককালীন থোক্ বকশিশ।

এ ঘটনা আষাঢ় মাসের। আমরা পুজোর সময় এসে শুনে গেলাম সব। দেবুকে দেখলামও। ওদের বাড়ীতে কুয়া ছিল না, আমাদের কুয়া থেকেই জল নিত। এক-দিন সামনে পড়ে যেতে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করলে। ডেকে দু' একটা কথা আলাপ করলুম। ওর দেশেঘরে কে-কে আছে, বাবা কি করে, ইত্যাদি। স্ত্রীর সঙ্গেই বেশী কথা হ'ল। তাঁর কৌতূহল অন্য দিকে। আগেই জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন, বিয়ে করেছে কিনা। একে দেবু বেচারা লাজুক, তায় এই প্রশ্ন, সে তো মাথাই তোলে না —অতি কষ্টে অনেকক্ষণ পরে যা বললে তাতে বুঝলুম—ওর মা-বাবার খুব ইচ্ছা এখন বিয়ে দেবার কিন্তু আর কিছু টাকা না জমিয়ে সে ও কাজ করবে না।

স্ত্রী খুশী হয়ে বললেন, 'সেই ভাল। তোমার সুমতিই বলতে হবে। এই তো বয়স, এর মধ্যেই ন্যাঞ্জারী হয়ে পড়া ভাল নয়।'

এটা পুজোর সময়কার কথা। মধ্যে তিন-চার মাস গেছে—মাঘ মাসে কী একটা কাজে আবার এসেছি—আমি একা, তিন-চার দিনের জন্যে। পেঁছিবামাত্র খবর পেয়ে দত্তবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেন এবং একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জরুরী খবরটা দিলেন—'শুনেছেন ব্যাপারটা ?...এখনও শোনেন নি ?...ওঃ, আচ্ছা কাঁচাখেকো ডাইনীটিকে বাড়ীতে পুষে রেখেছেন বটে।...ঐ ছোঁড়াটা, ঐ যে দেবু—আমার জামাইয়ের অফিসে কাজ করে—শেষে ওর মাথাটাও চিবিয়ে খেয়ে বসে রইল।'

'সে কি।' এ শ্রেণীর আলাপ আমার পক্ষে রুচিকর নয়, সাধারণত প্রশ্রয়ও দিই না এই ধরণের আলোচনায়—কিন্তু আজ এমনই অবাক হয়ে গেলাম যে সবিস্ময় কৌতূহল প্রকাশ না ক'রে পারলাম না। এ যে একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বললাম, 'কী বলছেন, দত্তবাবু—ও যে কুন্তীর ছোট ভায়ের বয়িসী।'

'ওটা তো আপনি ক্যামাঘেন্না ক'রে বললেন সমীরবাবু, ছেলের বয়সী বলুন। কিন্তু তাতে কি।...কী যে ওর আছে মশাই তা জানি না, ঐ তো কাঠ-কাঠ ভাব, গম্ভীর মেজাজ—যেন মানোয়ারী গোরা। তবু ঐতেই সকলে পাগল। জানেন কি করেছে ছোঁড়া ? যত কিছু উপার্জন গোদাপদে সমর্পণ, এর মধ্যে তিন-চারখানা দামী শাড়ী কিনে দিয়েছে কুন্তীকে,—পনেরো-ষোল আঠার-উনিশ টাকা দামের। আপনার আমার বাড়ীর মেয়েছেলেরা সে শাড়ী কিনতে গেলে দুবার অগ্রপশ্চাৎ ভাবে। এছাড়া রুপোর বালা একজোড়া গড়িয়ে দিয়েছে। তিনমাস একটি পয়সা

পাঠায় নি বাড়ীতে—ওর বাবা এসে রবির কাছে কান্নাকাটি ক'রে গিয়েছে। ওকেও লিখেছিল, তাতে নাকি জবাব দিয়েছে যে—আমি রোজগার করি আমার জন্যে, তোমাদের দেব কেন ?'

কী আর বলব—হাসলুম একটু। দত্তবাবু কিন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন, 'আপনি হাসছেন কিন্তু এ একটা ফ্যামিলির সর্বনাশের কথা—তা জানেন !'

'তা আমি আর কি করতে পারি বলুন !'

'আপনিই তো প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আপনার বাড়ীতে এই ইমমরাল ব্যাপার চলেছে —আপনি একটু শাসন করবেন না !'

'দেখুন—আমার বাড়ীতে যখন ছিল না, তখনও শুনেছি পুরুষ ও দুপায়ে জড়ো করত—আমি যদি তাড়িয়ে দিই তাহলেও ওর অভাব হবে না। জায়গারও না —পুরুষেরও না। মাঝখান থেকে আমি একটা ভাল সারভেণ্ট্ হারাই কেন বলুন। ...তা আপনার জামাই তো ওর মনিব-স্থানীয়, তাঁকে দিয়ে একটু শাসন করান না !'

দত্তবাবুর ললাটে ভীষণ ভ্রূকুটি ঘনিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করি শেষের কথাটা।

'আরে—সে কি আর সে-চেষ্টা করে নি—কতদিন ওকে ধরে যাচ্ছেতাই করেছে। কিন্তু ওর যে মস্ত সুবিধে, মুখচোরা ভাব, সাত চড়ে রা কাড়ে না। সামনে মুখটি অবধি তোলে না, ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে—যেন কত ভাল মানুষ। এধারে এখানে যা করবার ঠিক ক'রে যাচ্ছে। আবার বেশী কিছু তো বলবার উপায় নেই,—আজকালকার লেবার বোঝেন তো।'

'আমারও তো সেই সমস্যা। আজকালকার দিনের লেবার—গেলে যে আর পাওয়া যায় না। কী করি বলুন...তবে বলব আমি একবার !'

'হ্যাঁ বলবেন। ঐ মাগীকে, আচ্ছা ক'রে শাসন ক'রে দেবেন।...আর বলিহারী যাই ঐ ছোঁড়াকেও। আচ্ছা নিঘিন্নে প্রিবিত্তি বটে !'

প্রবৃত্তির প্রসঙ্গে অবশ্য অনেক কথাই বলা যেতে পারত—ঋষিবাবুর কথাটা ভুলি নি এখনও—কিন্তু কী দরকার। কিছুই বললাম না, একটু মুচকি হাসলাম।

*

কে জানে কেন, কুন্তীকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই শাসন করতে পারলুম না। ওর ঐ অটল গাম্ভীর্যের দিকে তাকিয়ে শেষ অবধি বোধ হয় ভয়ই করল কথাটা পাড়তে। কী জানি কি বলবে—শেষে এতটুকু হয়ে যাব ওর সামনে।

বললাম দেবুকে। বিকেলে জল নিতে এসেছিল, আমাকে বাইরে বসে থাকতে দেখে ঘাড় হেঁট ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে—ডেকে দাঁড় করালাম। তেমনি মাথা হেঁট ক'রেই এসে সামনে দাঁড়াল।

দেখলাম পরিবর্তন হয়েছে ঢের। চোখ দুটো যেন কোটরে ঢুকে গেছে, রগ

গেছে চেপে—চোয়ালের আর কণ্ঠার হাড় পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে। তেমনি দুর্দশা কাপড়-জামারও। খাকী হাফ প্যাণ্টে গোটা চারেক তালি, শার্টটার দিকে তো চাওয়াই যায় না, শতছিন্ন একেবারে। অথচ এই কমাস আগেও দেখে গেছি—ফিট-ফাট থাকত দেবু। সম্ভবত প্রণয়িনীর কাপড় গয়না যোগাতে গিয়েই নিজের জামা কাপড় আর কেনা হয়ে ওঠে না।

বললাম অনেক ক'রে—অনেক যুক্তি দিলাম। বললাম, 'তুমি এ বাসা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাও—নইলে বাঁচবে না। এখানে শুনছি নানা বদখেয়ালে পয়সা উড়িয়ে দিচ্ছ, নিজে বোধ হয় পেটপুরে খাচ্ছও না—না হ'লে এমন চেহারা হবে কেন ? এর চেয়ে বরং দেশে গিয়ে বিয়ে ক'রে এস গে—সেও ঢের ভাল।'

শুনল সব, মাথাও তুলল না, প্রতিবাদও করল না। ঠায় ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দেখে এক সময় আমাকেই বলতে হ'ল, 'যাও তাহ'লে। আমার কথাগুলো ভেবে দেখো। যা বললাম—তোমার ভালোর জন্যেই বললাম। আমার বয়স হয়েছে—অনেক দেখলাম তো। কথাগুলো ভাবোগে।'

কোনমতে 'যে আজ্ঞে' বলে চলে গেল। পালিয়েই গেল বলা চলে।...

বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে কথাগুলো বলতে প্রথমটা তিনি বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। তারপর যখন করলেন—তখন হেসে খুন একেবারে।

তারপর বললেন, 'কী আছে বলতো ছুঁড়ির ? ওকে দেখলে তো ভয় করে। চেহারাও এমন কিছু ভাল নয়—ওর চেয়ে ভাল দেখতে কমবয়সী মেয়ে ও পাড়াতেই তো কত রয়েছে। বয়সেরও গাছপাথর নেই—মুখে মেচেতা পড়ে গেছে—ওর জন্যে ওরা পাগল হয় কেন বলতে পার ?...ছেলেটা বেশ ছিল গো, নরম-সরম লাজুক, বেশ ভদ্দরলোকের জল ছিল গায়ে—একেবারে কুলিমিস্তিরি বলতে যেমন মনে হয় তেমন নয়।...আহা, কত আশা ওর বাবা-মায়ের বল তো। না বাপু, তুমি, একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বোলো কুন্তীকে—'

আমি বললুম, 'নরমসরম ভদ্দর বলেই কাঁচামাথাটি চিবিয়ে খাবার সুবিধে হয়েছে। তবে তাও বলি—মার বয়সী একটা মেয়েছেলের জন্যে যে বেটাছেলে পাগল হয়ে ওঠে সে-ও খুব সহজ নয়। ও অধঃপাতে যেতই—যে কোন একটা অবলম্বনের ওয়াস্তা।'

গৃহিণী বললেন, 'তা হোক্ তবু—'

'না, ও কুন্তীকে কিছু বলতে টলতে আমি পারব না। তাছাড়া সে আমাকে বাবা বলে, তাকে এমনি বকতে পারি শাসন করতে পারি, কিন্তু এ নোংরা কথা পাড়তে পারব না।'

'দেখি—আমিই বলব অবিশ্যি যদি ততদিনেও ছোঁড়ার চৈতন্য না হয়ে থাকে।'

দেখা গেল যে, অচৈতন্য হয়ে থাকতে যে চায় সাধ ক'রে—তার চৈতন্য হওয়া অত সহজ নয়।

মাস কতক পরে গৃহিণীকে অনেক সাধ্য-সাধনায় রাজী ক'রে তাঁকে সঙ্গে নিয়েই যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। গিয়ে শুনি যে দেবু এখনও কুন্তীর জন্যে তেমনি উন্মত্ত। পয়সাকড়ি যা রোজগার করে সব কুন্তীকে এনে ধরে দেয়—ভাল ভাল শাড়ী পরে আজকাল কুন্তী—আর নিজে শতছিন্ন তালি দেওয়া জামা পরে ঘুরে বেড়ায়। অর্ধেক দিন খাওয়াই হয় না নাকি, পয়সার অভাবে।

দেখলামও—কঙ্কালসার চেহারা হয়েছে ছেলেটার—টি-বি রোগীর মত।

দত্তবাবু বললেন, 'এর আগে অমন হাজারখানেক নাগর করেছে ছুঁড়ি—কিন্তু তার বেশির ভাগই শখের নাগর, পয়সা কড়ি বিশেষ কেউ দিত না। বড় জোর পালে-পার্বনে গয়নাটা কাপড়টা। এ বড় মজার নাগর জুটেছে ওর, বেশ ক'রে দুয়ে নিচ্ছে একেবারে।'

কথাটা শুনে এবং দেবুর হালটা নিজে চোখে দেখে গৃহিণী খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি কুন্তীকে ডেকে প্রায় আমার সামনেই—সামান্য একটা দরজার ব্যবধানে—যথেষ্ট তিরস্কার করলেন।

নিজের অটল গাম্ভীর্য অটুট বজায় রেখে অবিচলিত মুখে সব শুনে গেল কুন্তী, তারপর সংক্ষেপে শুধু বললে, 'ওকে আমি ডাকি না, ও-ই আসে। ওকে ঠেকান না কেন।'

'কিন্তু টাকা। তুই অমন ক'রে ওর যথাসর্বস্ব দুয়ে নিস কেন—দেখছিস না কি হাল হয়েছে ওর। মরে যাবে না খেয়ে?' গৃহিণী উত্তেজিত হয়ে বলেন।

শাণিত ছুরির মতই উত্তর আসে ও পক্ষ থেকে, 'ও চায় টাকা দিয়ে আমাকে কিনে রাখতে। জিনিস কিনতে গেলে দাম দিতে হবে বৈকি।'

তারপর আর কিছুক্ষণ—বোধহয় কয়েক-মুহূর্ত—স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু 'যাই' বলে চলে গেল সে।

'হ'ল তো, গাল বাড়িয়ে চড় খেলে তো।' বললাম গৃহিণীকে।

'মরণদশা। দুই-ই সমান। যেমন দেবা তেমনি দেবী।'

কিন্তু গৃহিণীর কথাতে যে কিছু কাজ হয়েছে তা বুঝলাম কলকাতায় ফেরবার সামান্য কদিন পরেই।

শ্রীমান দেবুর সেই প্রথম পত্র। সামান্য একটু ভণিতার পরই সে নিবেদন করেছে—কুন্তীর আচার-আচরণ নাকি বড় খারাপ হয়ে গেছে, তার চরিত্রের দোষের জন্যে নাকি ও পাড়ার কোন ভদ্রলোক টিকতে পারছেন না—আর তাঁরা সেজন্য প্রকাশ্যেই আমাদের দায়ী করছেন। প্রতিদিন পাঁচ সাত জন পুরুষ আসে ওর কাছে, মদ খেয়ে বেলেল্লাপনা করে, তার ফলে বাড়ীঘরেরও ক্ষতি হচ্ছে; ইত্যাদি।

অর্থাৎ যাকে বলে ভূতের মুখে রাম নাম। চিঠি পড়ে হাসলুম একটু।

কিন্তু গৃহিণী খুব খানিকটা চেঁচামেচি করলেন, 'কী দরকার আমাদের পয়সা

খরচ ক'রে এই কেলেঙ্কারি জীইয়ে রাখার! সত্যিই তো—আমাদের খেয়ে আমাদের বাড়ীতে বসে বেশ্যাগিরি করবে—তাতে লোকে আমাদের কী বলে! আমরা জেনে-শুনে রেখেছি যখন তখন হয়ত আমরাও ঐ চরিত্রের লোক!'

তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, 'তুমি কি ক্ষেপেছ! এ নিশ্চয় তোমার সেই বকাবকির ফল। নিশ্চয় কুন্তী ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে—সেই আক্রোশেই ও কুন্তীর নামে কুচ্ছো করছে।'

এর ভেতর যে প্রচ্ছন্ন তোষামোদ ছিল—আপাতত তাতেই কিছু কাজ হ'ল। গৃহিণী শান্ত হ'লেন খানিকটা। যদিচ তারপরও প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আমাকে ও বাড়ী বেচে ফেলে এ পাপ চুকিয়ে দেবার উপদেশ দান চলতে লাগল।

যাই হোক—এরপর কয়েকটা দিন শান্তিতেই কাটল। ক্রমশ ও প্রসঙ্গ ভুলেই গেলাম। দেবুর চিঠির যে জবাব দিই নি তা বলাই বাহুল্য। কীই বা দেব! আশা করলাম যে হয়ত এতদিনে ওদের সোহাগের ঝগড়া মিটে গিয়েছে—নয়ত শ্রীমান দেবুর প্রণয়রোগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়েছে।

কিন্তু তারপর হপ্তা-তিনেক না যেতে যেতে আবার এক চিঠি। এবার ইন্‌ল্যাণ্ডে—বেশ বিস্তৃত ও বিস্তারিত। কুন্তীর ব্যভিচার ও বেলেল্লাপনার লম্বা একটা ফর্দ। সেই সঙ্গে আমাদের মহৎ নাম যে এই ব্যাপারে কী পরিমাণ কলঙ্কিত হচ্ছে তার একটা ইঙ্গিত।

আবারও গৃহিণীর সেই তা-তা থৈ-থৈ নৃত্য আর অগ্ন্যুদ্‌গার। এবার শান্ত করতেও বেশ খানিকটা বিলম্ব হ'ল।...

আশা করেছিলাম যে এই দুখানা চিঠির জবাব না পেয়েই দেবু নিরস্ত হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে আর যারই থাক—ধৈর্য বস্তুটির অভাব নেই দেবুর।

এরপর খামের চিঠি এবং তারপর রেজেস্ট্রী। ফল সহজেই অনুমেয়।

এত কাণ্ডের পর আর চুপ ক'রে থাকা যায় না। এ ক্ষেত্রে চিঠি লেখাও শোভন নয়। একটা অর্ধপরিচিত ছোক্‌রার সঙ্গে ঝিয়ের চরিত্র নিয়ে কী চিঠি লেখালেখি করব?

অগত্যা দিন দুইয়ের ছুটি নিয়ে চলেই গেলাম। উদ্দেশ্য ওকে তিরস্কার ক'রে আসব। ভোর বেলা বাড়ীর সামনে রিক্সা থেকে নামতেই প্রথম যাঁর সঙ্গে দেখা—তিনি হলেন দত্তবাবু। মর্ণিং ওয়াক ক'রে ফিরছেন। প্রত্যহ রাত চারটেয় বেরিয়ে পড়েন দত্তবাবু, সেই ওপাশে পঞ্চপাণ্ডবতলা পর্যন্ত ওঁর গতি নির্দিষ্ট। ওখানে থাকে খাঁদি, এককালে নাকি ওঁর সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক ছিল—এখন তার রেশ-টুকু মাত্র আছে। খানিকটা বসে এক ছিলিম তামাক খেয়ে গল্প ক'রে চলে আসেন, এই পর্যন্ত। কিন্তু তবু ওটুকু না হ'লে দত্তবাবুর চলে না।

দত্তবাবু আমাকে নামতে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার, এমন হঠাৎ? একা

একা ? আমার মেয়ে আসেন নি ?'

রিক্সাওলাকে স্যুটকেসটা বাড়ীর রোয়াকে নামিয়ে রেখে আসতে বলে দত্তবাবুর সঙ্গে দু'পা এগিয়ে গেলাম। আমার আসার কারণটা শুনে তিনি বললেন, 'মরেছে! ছোঁড়া বুঝি এই কান্ড করেছে! ওর পেটে পেটে এত! না, মিছে বলব কেন, বেলেল্লাগিরিটিরি কিছুই করে নি, বরং আজকাল মদের আড্ডা বসতেও বিশেষ দেখি না। ও কাজটা বোধহয় বাইরে সারে।...আসল কথা কি জানেন, ও ছোঁড়া চায় ও একাই থাকবে—আর কেউ না আসে, কিন্তু সে কি সম্ভব! ওর এত পেয়ারের লোক, এত নাগর। কুন্তী ছাড়বে কেন ? তাই নিয়েই বোধহয় অশান্তি। প্রথমটা দেবু ভেবেছিল টাকা দিয়ে টাকার জোরে ওকে খাস ক'রে রাখবে। যথা-সর্বস্ব ঢেলেও ছিল। কিন্তু তোর টাকার জোর কতটুকু বাপু! এর মধ্যেই—এই এক বছরে বোধহয় হাজার খানেক টাকা দেনা ক'রে ফেলেছে। তাছাড়া টাকায় বশ হবার মেয়ে ও নয়!'

বাড়ী ফিরে সবে চায়ের কাপ নিয়ে বসেছি, কুন্তী আমাকে চা ক'রে দিয়ে দোকানে গেছে, বোধ করি কিছু সওদা করতেই—কোথা থেকে দেবু ছুটে এসে পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। কী কান্না ছোকরার! না পারি তাকে শান্ত করতে আর না পারি আমার পা-টা ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে। কাপের চা কাপেই ঠাণ্ডা হ'ল—সেটুকুও শেষ করতে পারলুম না।

অনেক কষ্টে ওর বক্তব্য যা উদ্ধার করলুম তার সারমর্ম হ'ল এই ঃ আমরা সেবার চলে যাবার পরই যে কুন্তীর কি হ'ল—সে আর ওকে আদৌ আমল দেয় না। বলে এসব কাজ ভাল নয়, এসব ছাড়া উচিত। অথচ—দিনের পর দিন ও নিজের ঘর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখে—সারারাত ওর ঘুম হয় না—প্রত্যহ রাত্রে নতুন নতুন মানুষ আসে কুন্তীর ঘরে।

কষ্ট খুবই—তবু চেয়ে দেখলাম—এর মধ্যে দেবুর চেহারাটায় একটু চেক্‌নাই এসেছে। গায়েও অনেকদিন পরে উঠেছে একটা আস্ত নতুন জামা।

দুঃখও হ'ল—রাগও হ'ল। বললাম অনেক কথা, উপদেশও দিলাম প্রচুর। মেয়ের কি অভাব আছে পৃথিবীতে ? এ পাগলামিই বা ওর কেন ? ঘরে যাক্‌, বিয়ে-থা করুক। নয়ত এপাড়া থেকে সরে যাক। ও যদি স্বেচ্ছায় না যায় আমি মুখুয্যেবাবুকে বলে ওকে তাড়াব—এমন ভয়ও দেখালুম।

অবশ্য এসব উপদেশে যে ওর বিশেষ চৈতন্য সম্পাদিত হ'ল তা নয়। বিন্দু-মাত্র সান্ত্বনা লাভ করল বলেও মনে হ'ল না। সম্ভবত শারীরিক ক্লান্তিতেই কিছুক্ষণ পরে চুপ করল এবং আর কিছুক্ষণ গুম খেয়ে বসে থেকে বোধহয় দূরে কুন্তীকে আসতে দেখেই উঠে চলে গেল।

বলা বাহুল্য কুন্তী ওকে দেখলেও কোন প্রশ্ন করল না। কোনদিনই কোন-প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করা স্বভাব নয় ওর। কিন্তু আমিই আহারাদির পর ওকে ডেকে কথাটা তুললাম। যথোচিত সমীহ সহকারেই তুললাম অবশ্য,—স্বীকার

করতে লজ্জা নেই, ইদানীং বেশ বুঝতে পেরেছি—আমি ওকে ভয়ই করি দস্তুর মতো, সব বিবরণ খুলে বলে বললাম, 'তোর জন্যে কি আমায় গলায় দাড়ি দিতে হবে কুন্তী ? হয় ও ছোঁড়াকে থামা—নয়ত বল এখান থেকে বাড়ী বেচে চলে যাই আমি !'

পাষাণ-মূর্তির মতোই ভাবলেশহীন মুখে কুন্তী শুনে গেল সব। তারপর এক বিচিত্র প্রশ্ন করল, 'আর কিছু বলবেন—না এই কথা শুধু ?'

আমি যেন থতমত খেয়ে গেলাম। বয়স্ক অভিভাবকের কাছে চাপল্য প্রকাশ ক'রে ধমক খেলে যেমন হয়—আমার তখন কতকটা সেই অবস্থা। ঢোঁক গিলে বললাম, 'না আর কিছু না। কিন্তু এই কথা বলতেই পয়সা খরচ ক'রে আসতে হ'ল আমাকে।'

একটু কঠিন হবার চেষ্টা করতে হবে বৈকি। কঠোর কণ্ঠেই বলবার চেষ্টা করি শেষের কথাগুলো।

কিন্তু তাতেও কোন ভাবান্তর ঘটল না কুন্তীর। সে এক মিনিট চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে তেমনি নিরুত্তাপ শান্ত কণ্ঠে শুধু বলল, 'আপনি বাড়ী যান—ও আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।'

বক্তব্য শেষ ক'রে সে তার অভ্যস্ত শান্ত মহিমময় ভঙ্গীতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কেন সে অতটা জোর দিয়ে কথাটা বলে গেল—কী আশ্বাসে, কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে অব্যর্থ ফল পাবে ভাবছে সে—এতটা নিশ্চিত সে হচ্ছে কী ভরসায় —এমন শতেক প্রশ্ন করা যেতে পারত। কিন্তু একটাও করতে পারলুম না, সাহসে কুলোল না। শব্দগুলো যেন মুখের কাছ পর্যন্ত এসেও আটকে গেল।

তবু কে জানে কেন—মনে মনে আশ্বস্তই হলাম। ওর ঐ সহজ কণ্ঠের মধ্যে কী একটা অপূর্ব আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ আছে—যাতে মনে হয় ওর পক্ষে সবই সম্ভব। সেই দিনই রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী রওনা হলাম।

সত্যিই তারপর আর দেবুর কোন চিঠি আসে নি। মনে করলাম হয়ত কুন্তীই মিটিয়ে নিয়েছে ব্যাপারটা, নয়ত দেবু বুঝেছে আমাকে চিঠি দিয়ে কোন লাভ নেই। আমার ধমকেও কিছু কাজ হয়েছে হয়ত।

আসল কারণটা জানা গেল আরও মাসকতক পরে, পুজোর ছুটিতে ওখানে গিয়ে।

দেখলাম মুখুয্যেবাবুর বাড়ীতে তালা বন্ধ। প্রথম ভেবেছিলাম দেবু বুঝি কাজে গেছে। কিন্তু সারাদিন এমন কি সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন কাউকে দেখলাম না তখন কুন্তীকেই প্রশ্ন করলাম, 'হ্যাঁরে দেবুকে দেখছি না যে ?'

'সে আর থাকে না ও বাড়ী।'

'তবে ও বাড়ী এখন দেখছে কে ?'

'আমি ?'

এর বেশী উত্তর কুন্তীর কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কৌতূহল বেড়েই যায়। শেষে আর কিছুতেই যখন থাকতে পারলাম না, গেলাম দত্তবাবুর বাড়ী—ফলও পেলাম। দত্তবাবু বোধকরি সংবাদটা দেবার জন্যেই ব্যগ্র হয়ে ছিলেন, অভ্যস্ত অন্তরঙ্গতার সুরে গলাটা নামিয়ে বিস্তারিতভাবে জানালেন দেবুর স্থান-ত্যাগের বৃত্তান্তটা ঃ

'ও—সে শোনেন নি বুঝি? সে এক কাণ্ড হয়ে গেল যে। আপনারা চলে যাবার পর—সেইদিনই ঘটল ব্যাপারটা। আপনি তো গেলেন চলে—আমরাও সব খেয়ে দেয়ে শুয়েছি—অকস্মাৎ রাতদুপুরে এক বিকট চিৎকার। তাড়াতাড়ি সবাই উঠে বাইরে আসি। কী ব্যাপার—কান পেতে শুনতেই বুঝলুম দেবু চেঁচাচ্ছে। চেয়ে দেখি আলোও জ্বলছে ওর ঘরে। ওর চিৎকার আর কী সব দুদ্দাড় আওয়াজ। সবাই ছুটে গেলুম,—আমরা, ভোলাবাবুরা, ওদিক থেকে পাগলারা—ও মশাই, কী দেখলুম জানেন, দেখি কুন্তী একেবারে রণ-রঙ্গিণী মূর্তি ধরেছে। হাতে একগাছা লাঠি—কিন্তু লাঠিই শুধু চলছে না—তার সঙ্গে আর একহাতে ঘুষি চড়—আর তার ওপর লাথি। লাথির পর লাথি। ও ছোঁড়া পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে আর বলছে, "ও কুন্তী, তোর পায়ে পড়ি, আর মারিস নি—মরে যাব একেবারে। দোহাই তোর।" কিন্তু কে কার কথা শোনে মশাই, আমরা এতগুলো লোক তাই থামাতে পারি না। যা মূর্তি তখন, কাছে যেতেই ভরসা হয় না—কে জানে—হয়ত আমাদের ওপরই দুচার ঘা এসে পড়বে। শেষে ঐ পাগলার মা, ওর মামী হয় তো সম্পর্কে—সে-ই কোনমতে লাঠিটা কেড়ে নিলে। ...তখন মার থামিয়ে আমাদের গেরাহ্যি মাত্র না ক'রে বলে গেল, "কাল ভোরেই এ বাড়ী ছেড়ে এ পাড়া ছেড়ে চলে যাবি। আর কোন দিন না তোকে এখানে দেখি। চাবি আমার কাছে দিয়ে যাবি। আমি দেখব এ বাড়ী।"...ও মশাই, ঐ এক ওষুধেই রোগ ভাল হয়ে গেল!...সেই যে ভোরে পালাল ছোঁড়া—আর এদিক-মুখো হয় নি। শুনেছি মধ্যে দেশেও গিছল, বাপ-মাকে টাকাও পাঠায় নাকি আজকাল!'

অগ্নিশুদ্ধ

মাল ওজন ক'রে 'ট্যাগ' লাগিয়ে দিল পোর্টাররা, তারপর দুটো ট্যাগেরই আধখানা, বোর্ডিং কার্ড এবং মূল টিকেট বুঝিয়ে দিলেন কাউন্টারের ভদ্রলোক। চেয়ে দেখলেনও না ওর মুখের দিকে। সে সময়ও ছিল না, 'নেক্‌স্‌ট্‌' বলে ওর পিছনের ভদ্রমহিলার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালেন।

তখনও এনক্লোজারে ঢোকার দেরি আছে। ওরা য়্যানাউন্স করবে, ফ্লাইট নাম্বার আলোর অক্ষরে জ্বলে উঠবে, তখন গিয়ে লাইন দিতে হবে। এখন কোন কাজ নেই, মালপত্র চলে গেছে, খালি হাত, শুধু একটা য়্যাটাচি আছে। হাল্‌কা, কারণ

তাতে দু-একটা বই, রুমাল সিগারেট ছাড়া কিছু নেই। আর আছে একটা পুরনো খামের মধ্যে দশ হাজার টাকা।

কেশব সিং চায়ের স্টলে এসে দাঁড়াল।

চা খেল, সিগারেট ধরাল। তারপর বেড়াতে বেড়াতে গেটের কাছে এল—এবং নিরাপদে নির্বিঘ্নে ; অতি সাধারণ ভাবেই বেরিয়ে এল য়্যারপোর্ট থেকে—যেমন আত্মীয় বা বন্ধু কোন যাত্রীকে তুলে দিয়ে বেরিয়ে আসে লোকে।

বাইরে এসে বিজয়গর্বে একবার চাইল চারিদিকে।

কত সহজে কাজটা হয়ে গেল। এর জন্যে এত দুশ্চিন্তা ওদের। এত ভয়, এত হুঁশিয়ারি। ছোঃ। মাছের রক্ত ওদের শরীরে।

হ্যাঁ, ধরা পড়লে কড়া সাজা হ'ত—এটা ঠিক। এর পরেও যদি ধরা পড়ে—মানে যোগসূত্রটা টের পায়—তাদের টানাটানি করতে পারুক না পারুক প্রত্যক্ষ অপরাধীর রেহাই নেই। চোদ্দ বছর জেল অবধারিত।

যে লোকটি কেশবকে এ ভার দিয়েছে তাকে কেশব চেনে না কিন্তু সে ওর হাড়হদ্দ জানে। কেশব পথে পথে ঘোরে, জুটলে কোন কাজ করে, না জুটলে উপোস। গাড়ি চালাতে জানে, কিছু কিছু যন্ত্রপাতির কাজও জানে—নিহাৎ মুটে-গিরি বা রাজমিস্ত্রীর যোগাড়ে এমন কাজ করার মতো অবস্থা ওর নয়। অর্থাৎ অত নিচে সে নামতে রাজী নয়। কিছু লেখাপড়া করেছিল, ওখানে এক ধনী ব্যক্তির গাড়ি চালাত। তিনি আবার এক মন্ত্রীর ভাই—ওর পোজিশ্যন ছিল। নিহাৎ সব ছেড়ে এল বলেই না—!

লোকটি নাম বলেছিল নরিন্দর সিং—তবে নিশ্চয়ই সে নাম ওর নয়। ডেকে নিয়ে গিয়েছিল একটা খালি বাড়িতে—হাতে কুড়িটা টাকা আগাম জমা দিয়ে। বলেছিল জরুরী কাজ আছে একটা, ইচ্ছে করলে নিতে পারে, না ইচ্ছে করলে সাফ যেন বলে দেয়। তবে চুকলি খাবার চেষ্টা করলে কোন কাজ হবে না, এ বাড়ি বা তার পরিচয় কিছুই জানতে পারবে না সে। কিন্তু তারা ওকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাবাড় করবে, যেখানেই থাক।

গিয়েছিল কেশব। ভয় ? না ভয় করে নি। কেনই বা করবে। যার কিছুই নেই, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, কোন এক খাপরার ঘরের 'ঔরৎ' তাকে শেষ রাত্রে আশ্রয় দেয়, রুটিও দেয়—তাই বেঁচে আছে, তার কাছে আর কি নেবে ? জান ? জান কেউ নিলে তো সে বাঁচে।

সে বাড়িতে আর একজন মাত্র লোক ছিল। খালি বাড়ি—আসবাব আছে, সামান্য। নরিন্দরই কাজের কথা পাড়ল সোজাসুজি। কাল একটা প্লেনে নিজের মাল বলে দুটো স্যুটকেস ওজন ক'রে তুলিয়ে দিতে হবে—তারপর ধীরেসুস্থে বেরিয়ে আসবে—কেউ না টের পায়।

'ইসকা মতলব ?' প্রশ্ন করেছিল কেশব।

'রুক যাইয়ে, ম্যয় বাতা রহা হুঁ।' একটু ধমকই দিয়েছিল নরিন্দর। বলেছিল,

হ্যাঁ, ঐ স্যুটকেসের একটির মধ্যে দাহ্য পদার্থ থাকবে। প্লেন ছাড়ার দু'ঘণ্টা পরে ফাটবে তা। তাতেই প্লেন জ্বলে যাবে বা নিচে পড়বে। ওরা আজকাল অনেক রকম যন্ত্রপাতি বসিয়েছে এসব জিনিস কারও মালে আছে কিনা তা পরীক্ষা করার। তবে সে ব্যবস্থাও করবে এরা, এমন একরকমের আচ্ছাদন দিয়ে মুড়ে দেবে যাতে যন্ত্রের অনুভূতি সে বস্তুতে পৌঁছবে না। সে দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত যেন থাকে কেশব, 'বে-ফিকির রহো।'

কেশবের চেহারা ভাল, ভাল ক'রে স্নান প্রসাধন করলে অনায়াসে 'রইস্ আদ্মি' মনে হবে। ইংরিজী তো কেশব কিছু জানেই। ওরা কেশবের মাপ দিয়ে ভাল পোশাক করিয়ে দেবে। স্যুটকেসের মধ্যে ভাল কাপড়-জামা থাকবে, দুএকটা প্রেজেণ্টেশ্যনের মতো জিনিস, যাতে বাক্স খুললেও কিছু টের পাওয়া না যায়। আসল মাল থাকবে একপাটি জুতোর মধ্যে। দু'তিন জোড়া ভিন্নভিন্ন মাপের জুতো—আজকাল ওদিকে সকলেই হিন্দোস্তান থেকে চামড়ার জুতো নিয়ে যায় দু'চার জোড়া—কেউ 'সোবে' করবে না। কাজ সেরে বেরিয়ে এলেই দশ হাজার টাকা পাবে। লোক বাইরেই থাকবে, সে কোন ছুতোয় ওর হাতে ধরিয়ে দেবে।'

এইখানে কেশব শক্ত হয়ে দাঁড়াল। বললে, 'না, টাকা আমার আগাম চাই। আমি য়্যারপোর্টে ঢুকলেই তো দেখতে পাবে, তোমরা কেউ সঙ্গে যাবে, পোর্টারের কাছে মাল জিম্মা ক'রে দেবে যখন, তখনই দিতে হবে। পুরনো কোন লেফাফায় পুরে দেবে—আমি বাথরুমে ঢুকে এক ফাঁকে দেখে নেব—রাজী থাক তো বল, নইলে এখানেই নমস্তে!'

'তারপর ? তুমি যদি বেইমানী করো ?' নরিন্দর প্রশ্ন করল।

'সে ঝুঁকি নিতে হবে। কাজ হাসিল করলে পর আমি তোমাদের কোথায় ধরব ? তা ছাড়া তুমিই তো বললে, বেইমানী করলে তোমাদের হাত থেকে রেহাই নেই। তবে আর ভাবছ কেন!'

একটু বিদ্রূপের হাসিই হাসে সে। যার কিছু নেই, মরীয়া—তার কাকে ভয় ?

তাতেই রাজী হ'তে হ'ল।

সেই কাজই এইমাত্র হাসিল ক'রে এল কেশব সিং।

নিরাপদে নির্বিঘ্নে। কেউ সন্দেহ মাত্রও করল না। করবেও না কেউ। কোন্ লোক কোন্ স্যুটকেস রেখেছে, তা সর্বনাশের পর আর কে ধরবে।

এর জন্যেই ওদের এত ভয়। দশ তো ওকেই দিয়েছে, টিকিট বাক্স পোশাক পাসপোর্ট সব জড়িয়ে কোন্ না আরও পনেরো হাজার।

পাসপোর্ট নিয়েই ভয় ছিল বরং। অপরের পাসপোর্ট, তার ছবি পাল্টে ওর ছবি বসানো, খুবই নিখুঁত মেরামতি, তবু সেই সময়টায় বুক ঢিপঢিপ করছিল বৈকি।

কেশব একটা ট্যাক্সি নিয়ে উঠে বসল।

পাহাড়গঞ্জ এলাকায় যে বস্তিতে সে এসে থামল, এ পোশাক, এ সিগারেট, ট্যাক্সি—সবগুলোই এর সঙ্গে বেমানান।

বস্তী। গরীব লোকেরই বাস, তবে এ অংশটুকু তার চেয়েও বেশী। রেন্ডী মহল্লা—নিম্নস্তরের বেশ্যাপটি।

তবে সুবিধে এই, তখনও এ মহল্লার ঘুম ভাঙে নি। ট্যাক্সির শব্দ নতুন, তবে কোন কালে যে কেউ আসে না এমনও নয়।

কেশব ওরই একটা ঘরে গিয়ে ডাক দিল, 'সুরতিয়া, এ সুরতিয়া!'

মিনিট দুই লাগল দরজা খুলতে। তা হোক, কেশব জানে ঘরে অন্য কোন মরদ নেই। ওর জন্যেই সুরতিয়া সারারাতের কড়ারে কোন খদ্দের বসায় না। তা ছাড়া কদিন কিছু টাকা এনে দিয়েছে কেশব—নরিন্দরের কাছ থেকে নেওয়া, জামা কাপড়ের আয়োজন বাবদ—সুরতিয়া এ কদিন মরদ বসায় নি কাউকে।

ঘরে ঢুকে আগে ভালো পোশাকগুলো ছেড়ে ফেলল কেশব, এখানে হঠাৎ ওকে এ পোশাকে দেখলে নানা রকম সোবে করবে এরা। নিজের সেই জরাজীর্ণ পুরাতন পোশাক পরে সুরতিয়াকে হুকুম করল, 'এক গ্লাস জল দে দিকি, তার পর একটু চা বানা। রাত তো শেষই হয়েছে, চা খাবার এমনিও টাইম হয়েছে। আর এই পোশাকগুলো পাট ক'রে রেখে দে। কে তোর বাবু বলেছিল না পুরনো পোশাকের কারবার করে, তার কাছে বেচে দে। যা দেয় দিক, তাই লাভ।'

সুরতিয়া বলে, 'সে যদি জিজ্ঞেস করে কোথা থেকে পেলি—কী বলব?'

'বলবি এক মাতাল মদের ঝোঁকে এক বাবুর কাছে কুড়ি টাকায় বেচে গেছে।'

জল আর চা খাওয়া শেষ হতে নতুন য়্যাটাচি থেকে মোটা খামখানা বের করল—তোয়ালে মোজা গেঞ্জির নিচে চাপা ছিল। সুরতিয়ার হাতে দিয়ে বললে, 'নে তুলে রেখে দে ভাল ক'রে, এক আধ রুপিয়া নয়, দশ দশ হাজার—যত্ন ক'রে লুকিয়ে রাখ।'

'ইসকা মতলব।' সুরতিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে—'কদিন এই কাজেই ঘুরছিলে বুঝি। এত টাকা কেউ তোমাকে এমনি দেয় নি—খুন ক'রে এলে নাকি কোথাও, না ডাকাতি। ঠিক ক'রে বল দিকি—এত টাকা তোমার হাতে কোথা থেকে আসছে!'

'তুই থাম তো।' ঝেঁঝে ওঠে কেশব সিং, 'অত জমা-খরচে তোর দরকার কি, তবে এটা বলতে পারি খুনও করি নি, ডাকাতিও নয়। এ যে কোন কসম বলবি তাই খেয়ে বলতে পারি।'

সুরতিয়ার মুখ কিন্তু অন্ধকার হয়েই রইল।

অনেক বেলা অবধি ঘুমোল কেশব। বলতে গেলে সারারাত জেগেছে। ঘুমও দিয়েছে টানা, বেলা একটা অবধি। তারপর চান ক'রে দাড়ি কামিয়ে রুটি খেতে বসেছে সবে—পাশের ঝোপড়ির এক লড়কি এসে ঘরে ঢুকল, 'সুরতিয়া' কিছু খবর

শুনেছিস ? তোরা ট্রাঞ্জিস্টার খুলিস না বুঝি খবরের সময় ? আমার তো ও পাট নেই, পাশের ঘরের বিমল বলছিল যে দুপুরের খবরে বলেছে কাল আমাদের এক বিমান মস্কাউ না কোন্ জায়গা হয়ে বিলায়েত যাচ্ছিল, হঠাৎ আগুন লেগে পাহাড়ের ওপর পড়ে গেছে আজ ভোরের দিকে। লোকজন সব ছুটে গেছে, আমাদের লোকজন—ওদিকের আরও কোন্ কোন্ মুলুকের, তবে নাকি পাহাড়ের ওপর পড়েছে, সহজে পৌঁছনো যাবে না। অবিশ্যি এরা আন্দাজ করছে সে আগুনে সকলেই পুড়ে গেছে, একজনও বোধ হয় বেঁচে নেই। আহা রে, কী কষ্ট, অতগুলো লোক পুড়ে মরল। পাহাড়ের ওপর কোথায় পড়েছে কে জানে, ছুটে কেউ যাবে তারও তো জো নেই। কেন যে লোকে হাওয়াই জাহাজে চড়ে তাও জানি না।'

'চলি—এখনও রুটি পাকানো হয় নি—ঘরদোর সাফ হয় নি। যে লোকটা ঘরে ছিল সে বেলা ইগারো পর্যন্ত পড়ে ঘুমোল। অবিশ্যি হ্যাঁ, রুপিয়াও বেশী দিয়েছে।'

বলতে বলতেই যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল, তেমনি ঝড়ের বেগে চলে গেল।…

রুটি খাওয়া হ'ল না। আড়ষ্ট হযে বসে রইল কেশব সিং।

সুবতিয়ার চোখে তীব্র ভর্ৎসনা, তা আড়ে একবার দেখে নিয়েছে সে।

একটু পরেই সে-চোখের কোল পূর্ণ ক'রে জল ঝরে পড়ল।

তবে তাতে আগুন নেভে নি, 'এ তুমি।' চাপা গলায় বলে উঠল সে, 'তোমাবই কাজ! এই জন্যে টাকা। এই কটা টাকাব জন্যে এতগুলো লোককে পুড়িয়ে মারলে! এর চেয়ে ডাকাতি করা যে ঢের ভাল ছিল!'

জোর ক'রেই গলায় জোর আনল কেশব, 'তুই কিছু জানিস না শুনিস না, লেকচার ঝাড়তে শুরু করলি। আমি কি করেছি তাও জানিস না। কোন্ পিলেন কিসে জ্বলে গেল—কার জন্যে জ্বলল—খবর নিয়েছিস! আগেই আমাকে সোবে করে বসলি!'

সে না খেয়েই উঠে হাত ধুয়ে বেরিয়ে গেল।

খাওয়া হ'ল না সুরতিয়ারও। গুম খেয়ে বসে রইল।

সন্দেহ নয় শুধু—ওর মন কেমন যেন বলছে, এ দুর্ঘটনার মূলে ঐ টাকাগুলো।

চুরি-ডাকাতিও এর চেয়ে ভাল ছিল—তাতে দু'চার জনের ক্ষতি হয়, দু'একটা প্রাণ যায়। এতগুলো নিরীহ মানুষের প্রাণ বেচে এল সে মোটে দশ হাজার টাকার জন্যে!

অনেক রাত্রে ঘরে এল কেশব।

চারদিকে চেয়ে বুঝল আজ কাউকে বসায় নি সুরতিয়া। এখন কদিন বসাচ্ছে না অবশ্য। তবে রান্নাও করে নি, খায়ও নি বোধ হয়। সেই দুপুরের চাপাটি আর

আলুর ভর্তা পড়ে আছে ছোট বাক্সটার ওপর, একটা জালের ঢাকা চাপা। এক গ্লাস জলও আছে।

কিন্তু ও রুটি তো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

একটু রাগও হ'ল সুরতিয়ার অবিবেচনায়। সে গিয়ে ওদিকের খাটিয়াটায় শুয়ে পড়ল কিছু না খেয়েই। এদিকের খাটিয়ায় সুরতিয়া শুয়ে—নিশ্চয় জেগে আছে, সেও বলল না খেতে।

সারাদিনই কিছু খায় নি কেশব। খেতে পারত, জেব-এ পয়সা ছিল কিন্তু কেমন যেন লোকালয়ে যেতে সাহস হচ্ছে না। কিসের ভয়, তাকে কে ধরবে। তবুও—

ভোরে ঘুম ভাঙল কেশবের। সুরতিয়া অবশ্য তার আগেই উঠেছে। আড়ে চেয়ে দেখল চোখমুখে গভীর কালি তার। কেঁদে আর না খেয়ে একদিনেই শুকিয়ে গেছে।

কেশব আর কথা বলার চেষ্টা করল না। উঠে রাস্তায় গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে ফিরল যখন—দেখল একটা টুলের ওপর চা রেখে সুরতিয়া চলে গেছে। যাবে আর কোথায়, ভেতরের দাওয়ায় গিয়ে বসে আছে নিশ্চয়।

আবারও কেশবের প্রচণ্ড রাগ হ'ল সুরতিয়ার ওপর।

'উঁঃ' চেঁচিয়ে বলার সাহস নেই, তবে তার দরকারও নেই, জানে কাছেই আছে, 'যদিই আমি অধর্ম ক'রে টাকা এনে থাকি, তোর অধর্মের পয়সা নয় ? সেই টাকায়ই তো খাচ্ছি—আমার আর ধর্ম আছে কোথায়।'

ভেতর থেকে কান্না-ভাঙা গলায় জবাব এল, 'না, আমার অধর্মের পয়সা নয়। এই আমার পেশা, শরীরটা বিক্রী করি পয়সা নিই—এ তো চিরকাল আছে। যে আসে ঘরে সে ষোল আনার ওপর আঠারো আনা উশুল করে।'

কেশব আর কথা বাড়াল না। তারও শরীর ভাল নেই, মুখে যাই বলুক একটা কি যেন ভার বুকে চেপে বসে আছে—ভারী বোঝার মতো। তাতেই আরও ভেঙে আসছে শরীর—

চাও খেল না সে। পোশাক পরে বাচ্চা ট্রাঞ্জিস্টারটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বড় রাস্তায় পড়েই যে বাস সামনে পেল উঠে পড়ল। টিকিট কিনতে গিয়ে শুনল, বাসটা সুরযকুণ্ডে যাবে।

ভালই হ'ল। মনে মনে বলল সে। নির্জনে জলের ধারে গিয়ে বসতে পারবে।

ওখানে অনেক বড় বড় চাট্ আর চায়ের দোকান। সরকারী টুরিস্ট লজ আছে। কিন্তু এসব জায়গায় অনেক মানুষের মধ্যে যেতে ইচ্ছে করল না। পেতলের ঘড়া ক'রে যারা চা নিয়ে ঘোরে—ঘড়ার নিচে আগুন—তাদেরই একজনকে ধরে একসঙ্গে দু ভাঁড় চা খেল, তারপর একখানা খবরের কাগজ আর কিছু দেশী বিস্কুট কিনে নিয়ে গিয়ে জলের কাছাকাছি একটা গাছতলায় বসল।

বিস্কুট তখনই খেতে ইচ্ছে হ'ল না—যদিও খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে কাগজখানা খুলল।

বড় বড় ক'রে ঐ খবরই ছাপা হয়েছে। একশো ছিয়াত্তর জন যাত্রী ছিল, দুজন ফিল্ম অভিনেত্রী। কটা বাচ্চাও ছিল। ইস্কুলের ছেলে।

জনহীন পার্বত্য জায়গায় পড়েছে, সেখানে পেঁছিতেই উদ্ধারকারীদের কাল প্রায় সারা দিন কেটে গেছে।…সে বীভৎস মর্মন্তুদ দৃশ্য। বেশীর ভাগ লোকই সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে, কেউ কেউ বোধহয় পালাবার চেষ্টা করেছিল পড়বার পর—অথবা এমনিই দেহগুলো ছড়িয়ে পড়েছে জ্বলতে জ্বলতে। পেট্রলের আগুন বহুদূর ব্যাপ্ত হয়েছে—তা মাটির চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। প্রচন্ড তাপে হাড়গুলো সুদ্ধ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা গাড়ীর মধ্যে কোন শক্তিশালী বিস্ফোরক ছিল, যার শক্তি অনায়াসে পেট্রল ট্যাঙ্কারদের ধাতব শরীর বিদীর্ণ ক'রে সেই বিপুল তেলে আগুন ধরিয়েছে। জ্বলতে জ্বলতে পড়েছে প্লেন, পড়েও জ্বলেছে—যতক্ষণ না সব অঙ্গারে পরিণত হয়।…

কাগজগুলোর কি কোন কাজ নেই। ইনিয়ে বিনিয়ে তিন চাব পাতা ধরে ঐ একই কথা।

বিরক্ত হয়ে কাগজ মুড়ে রেখে ট্রান্জিস্টার খুলল।

না, এখানেও অব্যাহতি নেই। বিশেষ সংবাদে ঐ সব বর্ণনাই দেওয়া হয়েছে—

কে একমাত্র মেয়ে রুশ দেশে স্কলারশিপ নিয়ে যাচ্ছিল ফিরে এলে বিয়ে হবার কথা। তার মা, মাথা কুটছে। বাক্‌দত্ত স্বামী হাহাকার করছে। কোন ইস্কুলের ছেলে মায়ের সঙ্গে তার মামার কাছে যাচ্ছিল বার্মিংহামে—তার বাবা পাগলের মতো হয়ে গেছে, বলছে 'য়্যারপোর্ট সব জ্বালিয়ে দোব।' এত ভগ্নস্তূপের মধ্যে এক শিশুর আধপোড়া একটা হাত পাওয়া গেছে, তার হাতের মধ্যে একটা খেলার রেলগাড়ি তখনও ধরা—

জোর ক'রে ট্রান্জিস্টারটায় আছাড় মেড়ে জলে ফেলে দিল। তারপর অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগল।

বিবেক বলে কোন জিনিস আছে তা জানত না কেশব সিং। শুনেছে হয়ত, অত মাথা ঘামায় নি। এই যে অসহ্য জ্বালা, বুকের মধ্যে যে একটা যন্ত্রণা—এই কি বিবেক?

তা সে আর এমন কি করেছে। সে না করলে আর কেউ করত। ওদের কথায় বুঝেছে বিদেশী কোন সরকার এই টাকা যোগাচ্ছে, ভারতকে জব্দ করবে বলে। তারা কি আর লোক পেত না!

আর, এতটা তো সেও জানত না। এমন যে হ'তে পারে তাও ভাবে নি। প্লেনটা হয়ত পড়বে, ভাঙ্গবে—সকলে কি আর মরবে।

আত্ম-কথোপকথনে যেন খানিকটা স্বস্তি বোধ করল সে।

ক্ষিদে পেয়েছে খুব। ফিরে এসে গাছতলায় বসে পকেট থেকে বিস্কুটগুলো বের ক'রে খেতে শুরু করল। এই সঙ্গে আর এক ভাঁড় চা পেলে খুব ভাল হ'ত।...

হঠাৎই আজ এতদিন পরে ওর মনে পড়ল নিজের বাচ্চাটার কথা। এতটুকু মেয়ে, তিন বছরের। দেবশিশুর মতো সুন্দর ছিল। কী যে রোগে ধরল। কত ডাক্তার দেখাল কেশব—তারপর নিয়ে এল জেলার সদর হাসপাতালে। ওখানে ধরা পড়ল জন্মগত জখমী কিড্‌নি। চেষ্টা অনেক করলেন তাঁরা কিন্তু মেয়েটা বাঁচল না। ভুগে কঙ্কালসার হয়ে মরে গেল।

তাতেই তো ঘর ছেড়ে চলে এল। সেই হাসপাতাল থেকেই।

বৌটার কি হ'ল, মা বেঁচে ছিল—তাদের কে খেতে দিচ্ছে, কিছুই ভাবে নি। পাগলের মতো চলে এসেছে। আর ফেরে নি, কোন খবরও নেয় নি। আজও না।

ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছে এই শহরে, রাজধানী শহরে। মরতে পারে নি, বরং বাঁচবারই চেষ্টা করেছে। যখন যা কাজ পেয়েছে—যে কোন মজদুরী। মিস্ত্রীর যোগাড়ে, মুটেগিরি—কি না করেছে। তবে সব সময় কাজ জুটত না। তখন উপোস দিতে হ'ত।

এমনি উপবাসের মধ্যেই একদিন জ্বর এল। বেঁহুশ জ্বর। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, এই রেণ্ডী পট্টিরই এক গাছতলায়। তখন জানত না জায়গাটা কি। হাঁটবার চেষ্টা করেছে—যখন পারে নি শুয়ে পড়েছে। কোন্‌ জায়গা অত দেখার অবস্থা ছিল না।

ভোরবেলা সুরতিয়াই ওকে প্রথম দেখে। কোনমতে কাঁধের নিচে দিয়ে বগলে হাত দিয়ে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে আসে। মুখে জল দিয়ে, দুধ খাইয়ে চাঙ্গা করে।

সেই থেকেই এখানে। অল্প দামের 'রেণ্ডী' এরা। মুখে সস্তাদামের পাউডার মেখে দাঁড়িয়ে থাকে—দু টাকা তিন টাকা যার কাছে যা পায় তাকেই ঘরে আনে। শোয়। কোন কোন দিন দু'তিনজনও আসে। তবে সে কদাচিত। এ মহল্লায় এমন খদ্দের বেশী নেই। কেশব অবশ্য মাঝে মাঝে রোজগার করেছে। সুরতিয়াই টাকা দিয়ে ওকে মোটর-মিস্ত্রীর কাজ শিখিয়েছে। দেশে জমিজায়গা ছিল, চাষবাস করত। কিছু লেখাপড়াও করেছে। গ্রামের স্কুলে নিচের ক্লাসে মাস্টারীও করত।

কাজ শিখলেও নিত্য কিছু রোজগার হয় না। বলতে গেলে সুরতিয়াই চালায়। সেইজন্যেই তাকেও লোক বসাতে হয়, কেশবকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয় সে-সব দিনে, রাত এগারো-বারোটা পর্যন্ত।...

হঠাৎ তিন-চারটি কলেজের ছেলে উত্তেজিত ভাবে কথা কইতে কইতে কেশবেরই কাছাকাছি একটা গাছতলায় এসে বসল। হাতে পপকর্ণের প্যাকেট, একজন কিছু পকোড়াও এনেছে বোধ হ'ল একটা কাগজে ক'রে। একজন পকেট থেকে একটা চ্যাপটা শিশি বার করল। এ শিশি কেশব চেনে—জিন-এর।

কিন্তু শিশি বেরোলেও তখনই কেউ সেদিকে হাত বাড়াল না। উত্তেজনা বোধ

হয় চরমে উঠেছে।

অবশ্যই এই প্লেন ক্র্যাশ প্রসঙ্গ।

এখনই নাকি কি স্পেশ্যাল খবর দিয়েছে রেডিওতে। কে একজন যাত্রী দুটো স্যুটকেস এয়ার ইণ্ডিয়ার কাউণ্টারে জমা ক'রে রেখে ব্যাগ, বোর্ডিং কার্ড, পাসপোর্ট নিয়ে কোথায় চলে গিছল। তার জন্য পুরো কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করা হয়েছে—সারা লাউঞ্জ ঘুরে দেখা হয়েছে কোথাও পাওয়া যায় নি। যে নামে পাসপোর্টে বা টিকিটের বুকিং তাও বলা হয়েছে রেডিওতে যদি কেউ কোন খবর দিতে পারে। তবে যে এ কাজ করেছে সে কি আর নিজের নাম দিয়েছে। যারা পাসপোর্ট ফটো করে সাধারণতঃ তাদের কাছে খবর নিচ্ছে পুলিশ—তবে চেহারাটা কেউ মনে করতে পারছে না। লাউঞ্জে ঢোকার দোরে যে চেকার থাকে—সে বাইরে যাবার যাত্রীদের দিকে নজর রাখবেই বা কেন?

সকলেই ক্রুদ্ধ। সকলেরই চোখেমুখে যেন জিঘাংসা।

একজন বললে, 'ধরা পড়লে তাকে দস্তুরমতো লীঞ্চ করা উচিত।'

আর একজন বললে, 'উঁহু, সেকালে বাদশাদের আমলে যেমন কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হ'ত, অর্ধেকটা মাটিতে পুঁতে—সেইরকম করা উচিত।'

'শালা পুলিশরা যে করতে দেবে না।'

'পুলিশের কথা শুনব না আমরা। যেমন যন্ত্রণায় মৃত্যু হয়েছে অতগুলো নিরীহ প্রাণীর তেমনি যন্ত্রণা দিয়ে মারব আমরা। একটু একটু ক'রে পোড়াব ভুট্টা পোড়াবার মত ক'রে—'

আর শুনল না কেশব, শুনতে পারল না। হঠাৎ যেন মেয়েটার মুখ ভেসে উঠল মনে।

আচমকা বোলতা কি ভীমরুল কামড়ালে যেমন মানুষ লাফিয়ে ওঠে তেমনিই উঠল। তারপর হন হন করে এসে বড় রাস্তার পড়ে সামনের বাসটাতে উঠে পড়ল ছুটতে ছুটতে গিয়ে। এটা ওদের পাড়ায় নয়। আশ্রমের কাছে বদলাতে হবে। তা হোক। এখন অনেক বাস পাবে।

এখুনি গিয়ে আগে ঐ টাকাগুলো নিয়ে সেই লোকটার বাড়ি যাবে। তার মুখের ওপর ফেলে দেবে টাকাগুলো, তারপর তাকে খুন করবে, আচমকা—গলা টিপে ধরবে।

উত্তেজনার মাথায় একথা তার মনে হ'ল না, যে এ কাজ করেছে সে নিশ্চয়ই বসে নেই ওখানে। হয়ত খালি বাড়ি অপরের—সে নামও নয় যা বলেছিল—সেই দিন সকালেই সরে পড়েছে সে—

সুরাতিয়াদের বস্তির কাছে নেমেই চোখে পড়ল একটা জায়গা থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আগুনের শিখা। বাঁশ কাঠ পোড়ার কটকট শব্দও কানে এল সেখান থেকেই। 'জল আন, সবুজ গাছের ডাল, পাতা সুদ্ধ। এই যে এদিকে—'

সুরাতিয়ার ঘর না?

পাগলের মতো ছুটল কেশব।

সত্যিই সুরতিয়ার ঘর। আগুন এখনও প্রচণ্ড। ওর ঘর থেকে পাশের ঘরেও ছড়িয়ে পড়েছে। ওটা সেই বিমল মেয়েটার ঘর। যাতে না আরও ছড়ায় সেই চেষ্টাই করছে সবাই মিলে।

ওকে দেখেই হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল বিমল।

'সর্বনাশী। সর্বনাশী এই কাজ করবে কি জানতুম। পাশের ঘর থেকে লখিয়া ট্রাঞ্জিস্টার নিয়ে আমার ঘরে এসেছে, তিন-চারজন আছি শুনছি সব খবর—সুরতিয়াও এসে বসেছিল। ওর মুখ দেখেই বোঝা উচিত ছিল পাগল হয়ে গেছে—খায় নি দায় নি, চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। আরে, তোর এত কিরে, দুঃখ সকলেরই হয়—তোর তো কেউ মরে নি—করলে কি, মিট্টিতেলের গাড়ি এসেছিল, আওয়াজ পেয়েই ছুটে বেরিয়ে এসে দু লিটার তেল কিনল।' তারপর অত জানি না, আমরা ভাবলুম ঘরে তেল নেই, ইস্টোভ জ্বালতে হবে, তাই এত তাড়া। গল্প করছি। ট্রাঞ্জিস্টার শুনছি—হঠাৎ দেখি ধোঁয়া। সবাই চেঁচাচ্ছে—আগ। আগ। আগ লাগ গিয়া।...

কি বলল কেশব তা কেশবও বোধ হয় জানে না। বিমল বললে, 'হ্যাঁ, আগে তো ওকে বাঁচাবারই চেষ্টা করছিল সবাই—কিন্তু হারামজাদী বোধহয় পুরো তেলটাই ঝুপ্পির চারদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে ঢেলেছে, একেবারে বেড়া আগুনে পুড়ল মেয়েটা—'

আর অপেক্ষা করল না কেশব, আর কিছু শোনবার নেই।

কী যেন বলছিল ছোকরাটা—ভুট্টার মতো অল্প অল্প ক'রে পুড়িয়ে মারবে?

এখনও যথেষ্ট আগুন, এখানে কোন চেষ্টা করা অনর্থক বলেই বিমলের ঘর বাঁচাবার চেষ্টা করছে সবাই—কেশব, সে কি করছে কেউ বোঝবার আগেই, শার্ট প্যাণ্ট সুদ্ধ সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঢুকে গেল। দলিলের ভাষায় স্বেচ্ছায়, অন্যের বিনানুরোধে।

কলমজীবী

প্রকাশক পাণ্ডুলিপিটা আদ্যোপান্ত পড়িয়া ডেস্কে বন্ধ করিয়া রাখিলেন, তারপর দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিয়া কহিলেন, 'আজ এই দুটো টাকাই নিয়ে যান, আসছে হপ্তায় আর কিছু দেব এখন।'

নির্মল হাত দুটি জোড় করিয়া কহিল, দেখুন মারা যাবো, 'অন্তত আর দুটো টাকা দিতেই হবে।'

প্রকাশক তাঁহার অতি স্থূল দেহ চেয়ারে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করিয়া দিয়া কহিলেন,—'কোথায় টাকা পাব? বেচাকেনা নেই, একটি পয়সা আয় নেই, এখন ঐ

দুটো টাকা দিতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। আজ আর কিছু হবে না। আসবেন তখন, দিন-পাঁচ-সাত পরে—

নির্মল আরও কি বলিতে যাইতেছিল, প্রকাশক বাধা দিয়া কহিলেন, এ বাজারে বই ছাপা মানেই তো টাকা জলে দেওয়া, ছাপতে যা খরচ হয় তার অর্ধেকও ওঠে না। তার ওপর অত জুলুম করলে পেরে উঠব কেন?

নির্মল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

প্রায় দেড়শ' পৃষ্ঠার বই লিখিয়া দিয়া দশটি টাকা পাওয়া যাইবে—তাহাও এমনি করিয়া আদায় করিতে হয়।

মনে পড়িল আজ ম্যানেজারকে নিশ্চয়ই কিছু টাকা দিবে, কথা দিয়াছে। মেসে ঢুকিয়াই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে, অথচ দুটি টাকাই বা দেওয়া যায় কি করিয়া? যৌনবিজ্ঞানের উপর এই বইটি লিখিতে তাহাকে পনেরো রাত্রি জাগিতে হইয়াছে—তাহার ফল এই।

ভাদ্রের খর-রৌদ্র মাথায় করিয়া মেসে ফিরিল। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মধ্যে একটা ভাঙ্গা বাড়ী—তাহারই মধ্যে সস্তা দরের একটা মেস, নীচের ঘরগুলা যেমন অন্ধকার তেমনই দুর্গন্ধ, অব্যবহার্য্য। সুতরাং দোতলার ঘরগুলিতে চার-পাঁচটি করিয়া সিট ফেলিয়া খরচের সঙ্কুলান করিতে হয়।

বিছানার চাদরটা ময়লা এবং ছেঁড়া বালিশের সমস্ত তুলাই বাহির হইয়া যাওয়ায় তাহাতে মাথা দেওয়া বিড়ম্বনা। তক্তপোশ আর ছেঁড়া চাদরের মধ্যে একটা সস্তা দরের বিলাতী কম্বল ছাড়া আর কিছুই নাই। তক্তপোশটাও নড়িলে চড়িলেই ক্যাঁচ-কোঁচ করিয়া নিজের অক্ষমতা ঘোষণা করে।

সাহিত্যিক বলিয়া এই কেরানীদের মেসে তাহার একটু প্রতিপত্তি ছিল; তাই ঘরের একটি মাত্র জানালার যতটা সম্ভব কাছের সিটটাই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়া নিজের বিছানাতে বসিতেই ম্যানেজার আসিয়া দেখা দিলেন—এত দেরি হ'ল মশাই?

নির্মল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, প্রকাশকের কাছে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।

ম্যানেজার আর বৃথা ভূমিকা না করিয়া একেবারে কাজের কথা পাড়িলেন, টাকাপয়সা কিছু দেবেন নাকি?

নির্মল দুটি টাকা পকেট হইতে বাহির করিয়া ম্যানেজারের হাতে দিয়া বলিল, এই নিয়েই সন্তুষ্ট হ'তে হবে আজকে—এর বেশী পাওয়া গেল না।

ম্যানেজার লোক খুব খারাপ ন'ন, বিশেষ সাহিত্যিকের উপর শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে। তিনি কহিলেন, এতক্ষণ বসিয়ে রেখে মোটে দু'টি টাকা দিলে, তারা মানুষ না চামার মশাই?—যাক উঠে নেয়ে-খেয়ে নিন। ঠাকুর এখনও ভাত নিয়ে বসে আছে।

নির্মল উঠিয়া একমাত্র জামাটি খুলিয়া ছেঁড়া গামছাটি লইয়া কলতলার দিকে

চলিয়া গেল। জামা সে রঙিন দেখিয়াই কিনিত—একটা জামা একেবারে না ছিঁড়িয়া গেলে তো আর একটা কেনা সম্ভব হইত না। সুতরাং কাচাইবার প্রয়োজন না হয়, এমন জামা কেনাই ভালো। কাপড় খান-দুই করিয়া থাকিত—কোনও রকমে তাহা সাবান দিয়া মাঝে মাঝে ফরসা করার চেষ্টা হইত!

সাহিত্য তাহার বাল্যের স্বপ্ন, যৌবনের সাধনা। তাই সে জীবিকার অন্য কোনও পথ কখনও খোঁজে নাই। ইহার জন্য পিতামাতা ঢের গঞ্জনা দিয়াছেন কিন্তু সে বরাবর তাঁহাদের এই জবাব দিয়াছে, বই লিখিয়া, সে অন্ততঃ তাঁহাদের স্বচ্ছলভাবে চলিবার ব্যবস্থা নিশ্চয় করিতে পারিবে।

হায় রে! স্বচ্ছলভাবে চলা তো দূরে থাক্, আজ সে মেসের খরচ চালাইয়া বাড়ীতে দশটা টাকাও সব মাসে পাঠাইতে পারে না। অথচ বাড়ীতে মা, ছোট ভাই ও বিধবা বোন—তিন-তিনটি পোষ্য।

প্রথমে সে এক দৈনিকের অফিসে পঁচিশ টাকা মাহিনার চাকুরি একটা পাইয়াছিল। বেলা দুইটা হইতে রাত্রি চারিটা পর্যন্ত চৌদ্দ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু সে চাকুরিও টিঁকিল না, পরিচালক সমিতির অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাঁহারা জবাব দিলেন।

তারপর কত জায়গায় কত চেষ্টা করিয়াছে, কোথাও কোনও কাজ পায় নাই। ...বছর খানেক ঘোরাঘুরির পরে কোন সাপ্তাহিক কাগজের অফিসে একটা কাজ পাইয়াছিল, গত তিন বৎসর তাহাই চলিতেছে। পনেরো টাকা মাহিনা,—যাবতীয় লেখা, প্রুফ দেখা প্রভৃতি সব কাজ তাহাকেই করিতে হয়। তাহার উপর মাঝে মাঝে বিল-তাগাদা ফাউ আছে।

ঐ কাজটি আছে তবু রক্ষা। এদিকে তো বিশেষ কোনও সুবিধা হয় নাই। সে গল্প লিখিত কিন্তু—বড় কাগজওয়ালারা ছোট লেখকের গল্প ছাপে না। ছোট কাগজওয়ালারা গল্প ছাপে বটে, টাকা দেয় না।

সুতরাং উপরির মধ্যে প্রকাশকদের ফরমাস্ খাটা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কেহ হয়ত একখানি উপন্যাস লিখিয়া দিতে বলিলেন, দশ টাকা কি পনেরো টাকা, বড় জোর কুড়ি টাকা দিবেন। অবশ্য প্রকাশকের নিজের নামে কিম্বা অপর কোনও বেনামে প্রকাশিত হইবে। যশটাও তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে পাইতে দেন না।

কাহারও হয়ত গালাগালি দিয়া বই লিখাইতে হইবে—কাহারও বা কেচ্ছা ছাপা দরকার, দশ-পনেরো টাকায় লিখাইতে চান, সুতরাং বড় দরের সাহিত্যিকদের কাছে ঘেঁষিতে পারেন না, নির্মলের মত অভাবগ্রস্ত ছাড়া তাঁহাদের গতি কি?

তাই কি টাকাটা সব একসঙ্গে পাওয়া যায়? যিনি খুব ভদ্রলোক তিনি পাঁচ-ছয় মাসে দশ টাকা শোধ করেন। অধিকাংশ লোকের কাছেই দশ টাকা আদায় করিতে বছর কাটে—কিম্বা অন্য কোনও রকমে আদায় করিতে হয়।

আহারের পর্ব সহজেই চুকিয়া গেল। ঠাণ্ডা ভাতের সহিত কলাইয়ের দাল, কচুর তরকারী ও এক টুক্রো মাছ যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি খাইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। বিছানার উপর একখানা চিঠি পড়িয়া আছে, এতক্ষণ চোখে পড়ে নাই। তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া দেখিল, মা লিখিয়াছেন, ছোট ভায়ের অসুখ, ক'টা টাকা না পাঠাইলেই নয়।

বিছানায় পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। গত মাসে বাড়ীতে এক পয়সাও পাঠাইতে পারে নাই বলিয়া এ মাসে মাহিনার পনেরো টাকা সবটাই বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিল। ফলে মেসের টাকা দিতে পারে নাই। আজ প্রথম দু'টি টাকা দেওয়া হইল। এখন আবার বাড়ীতে টাকা সে পাঠায় কি করিয়া ?...

বিশ্রাম করা হইল না। আবার ঘর্মসিক্ত জামাটা গায়ে চড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাহিরের রৌদ্রে আত্মসমর্পণ করাই তাহার ভাগ্য ; ভাবিয়া কি হইবে।

একজন প্রকাশকের কাছে কিছু পাওনা ছিল। তিনি নির্মলকে দেখিয়াই কাঁদুনি গাহিতে শুরু করিলেন, সারাদিন এক পয়সা বিক্রি নেই মশাই, দোকান তুলে দিতে হবে দেখছি !

তবুও ভরসা করিয়া নির্মল টাকার কথা তুলিল।

প্রকাশক চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন, টাকার কথা তুলছেন কি ক'রে মশাই, অবস্থা দেখছেন ?

নির্মল মিনতি করিয়া বলিল, অন্ততঃ দুটো টাকা দিন, বাড়ীতে বড় অসুখ।

দুটো পয়সা বিক্রি হয় নি। মাইরি বলছি !

অগত্যা নির্মলকে উঠিতে হইল।

প্রকাশক পিছন হইতে কহিলেন, চললেন নাকি ? একটু বসুন না ! একটা প্রুফ ছিল। দেখে দেবার সময় হবে কি ?

নির্মল জবাব না দিয়াই বাহির হইয়া আসিল।

আর এক জায়গায়—

প্রকাশক অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, আসুন আসুন নির্মলবাবু !

নির্মল নমস্কার করিয়া কহিল, আমার সেই ছেলেদের নাটকটার দরুন তিনটে টাকা পাওনা ছিল, আজ অনুগ্রহ ক'রে দিতে হবে।

প্রকাশক কহিলেন, এখন টাকা কি ! সেই পুজোর আগে নেবেন।

নির্মল বলিল, বড্ড দরকার। বাড়ীতে অসুখ, ক'টা টাকা না পাঠালেই নয়, আজকে আমায় দিতেই হবে।

অসুখের কথা আর বলবেন না, আমার বাড়ীসুদ্ধ সব পড়েছে, যেন হাসপাতাল !

নির্মল কহিল, ও তিনটে টাকা আমায় দিয়ে দিন। বড্ড উপকার করা হবে।

প্রকাশক কহিলেন, আজ তো অসম্ভব, বরং আসছে সপ্তাহে চেষ্টা ক'রে দেখতে

পারি।

নির্মল কহিল, দেখুন না, অন্তত দুটো টাকা যদি হয়—

ক্ষেপেছেন? ক্যাশে আট গণ্ডা পয়সা পড়ে আছে।···

পাশেই আর একজনের কাছে ছয় মাস আগের পাওনা।

তিনি নির্মলকে দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, আসুন, কি খবর?

আজ্ঞে আমার সেই টাকা ক'টা। দেখুন অনেকদিন হ'ল।

তিনি কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ পাবেন বৈকি। আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। রাত্রে ফেরবার সময় আসবেন।

যে সাপ্তাহিকের অফিসে সে কাজ করিত সেখানে আজ কাজ আছে। আর দেরি করা যায় না দেখিয়া তাড়াতাড়ি সে সেইখানে চলিয়া গেল।

আগের দিন যতটা কপি দিয়া আসিয়াছে তাহার প্রুফ দেখা, বাকীটা লিখিয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজ সারিয়া উঠিতে রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী একই ব্যক্তি। তিনি সম্মুখেই বসিয়াছিলেন।

ধীরে ধীরে তাঁহার চোখের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

তিনি মাথা তুলিয়া কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, কি খবর নির্মলবাবু?

নির্মল মাথা চুলকাইয়া কহিল, বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, ছোট ভায়ের বড় অসুখ। গোটা কতক টাকা যদি য়্যাডভান্স করেন তো বড়ই উপকার করা হয়।

সম্পাদক কহিলেন, আপনার বারো মাসই অভাব মশাই। আপনার তাগাদার জ্বালায় দেখছি এবার অন্য লোক দেখতে হবে।

কথা নির্মলের গলায় ভয়ে আটকাইয়া গেল! সে মুখ শুকাইয়া উপর হইতে নামিয়া আসিল।

যে প্রকাশকটি রাত্রে আসিতে বলিয়াছিলেন তাঁহার দোকানে গেল।

কর্মচারী কহিলেন, ওঃ, তাঁকে খুঁজছেন? তিনি তো আজকের মাদ্রাজ মেলে ওয়াল্‌টেয়ার চলে গেলেন।

নির্মল জিজ্ঞাসা করিল, কবে ফিরবেন?

তা মাসখানেক হবে।

বাহিরে আসিয়া ফুটপাথে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বাসার দিকেই চলিতে শুরু করিল। ছোট ভায়ের রোগক্লিষ্ট মুখ মনে পড়িয়া বার বার তাহার দুই চোখে জল আসিতেছিল।

সহসা চমক ভাঙ্গিল পিঠে প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া, ফিরিয়া দেখিল হরিমোহনবাবু। ভদ্রলোকের দোকান নাই। তবে বাড়ীতে বসিয়া বই প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বেও ইঁহাকে খান-দুই বই সে লিখিয়া দিয়াছে।

তিনি কহিলেন, আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম।

নির্মল কহিল, কেন বলুন দেখি?

পুজোর আগে ছেলেদের জন্য একটা শিকারের বই বার করতে চাই। লিখে

দিতে পারবেন খুব তাড়াতাড়ি ?

নির্মল প্রশ্ন করিল, কার নামে বেরোবে ? আর আমি কি দেখেই বা লিখব ? কখনও তো শিকারে যাই নি।

হরিমোহনবাবু কহিলেন, বেরোবে কমলপুরের কুমার বাহাদুরের নামে, তিনি প্রায়ই শিকারে যান। কেউ সন্দেহ করবে না। আর লেখা ? সে আমি একটা ইংরাজী বই দিয়ে দেব এখন। বেমালুম বাংলা ক'রে দেবেন।

নির্মল কহিল, কত দেবেন ?

তিনি মধুর হাসিয়া কহিলেন, এতদিন বাদে কি আপনার সঙ্গে দর করতে হবে ? যা পান, পনেরো টাকা ?

নির্মল কহিল, দিতে পারি লিখে, টাকাটা কিন্তু আজই দিতে হবে।

টাকা ? টাকা সেই পুজোর পরে।

নির্মল দৃঢ় স্বরে কহিল, তা হ'লে পারব না। ভাই আমার ওষুধ-পথ্যির অভাবে মরতে বসেছে, আমার এখন ব্যাগার দেবার সময় নেই।

আহা-হা, ভায়ের অসুখ করেছে নাকি ? কি অসুখ,—কতদিন হ'ল ? না বল্‌লে জানব কি ক'রে বলুন দেখি।

নির্মল কহিল, এখন তো জানলেন। দেবেন টাকা কটা।

হরিমোহনবাবু কণ্ঠস্বর নামাইয়া যতদূর সম্ভব মিষ্টভাবে বলিলেন, অবস্থা তো জানেন, টাকা একটিও হাতে নেই। বই দিতে পারি খানকতক, বেচে যদি কোথাও থেকে টাকা পান্।

নির্মল একটু ভাবিয়া বলিল, চলুন তাই দেবেন।

লিখিত দাম টাকা-বারোর মত বই তাহার হাতে দিয়া হরিমোহন কহিলেন, বারো টাকা দামের বই দিলুম, কমিশন বাদ দিয়ে দশ টাকাই পাবেন।

তখন ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। হরিমোহনবাবুর বাড়ী হইতে কর্ণওআলিস্ স্ট্রীট অনেক দূরে। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল।

একটি মাত্র দোকান তখন খোলা ছিল। সেখানে গিয়া প্রশ্ন করিল, মশাই এই বই ক'খানা রেখে কিছু টাকা দেবেন ?

তাহারা নির্মলকে চিনিত। কহিল, কত কমিশন বাদ দেবেন ?

শতকরা পঁচিশ টাকা—

পঁচিশ টাকা তো ওরাই দেয় মশাই। আধা-আধি হ'লে নিতে পারি।

আরও খানিকটা টানাটানি করিয়া সাতটি টাকা পকেটে ফেলিয়া নির্মল বাহিরে আসিল। ক্লান্ত দেহ আর চলিতে চায় না, তবু হাঁটিতে হইবে।

বাসায় তখন সকলে খাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। ঠাকুর মৃদু অনুযোগ করিল, তবু ভালমানুষ বলিয়া নির্মলকে তাহারা ঢের দয়া করিত।

আবারও সেই ঠাণ্ডা ভাত। কোনও রকমে দুইটি মুখে দিয়া উপরে আসিয়া একা উঠিয়া গেল অন্ধকার ছাদে। একটু ঠাণ্ডায় বিশ্রাম করা দরকার।

বহু রাত্রি পর্যন্ত সেখানে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। মায়ের কথা, বোনের কথা, ভায়ের কথা, আরও কত কি।

সহসা মনে হইল দূরে কে যেন গান গাহিতেছে—কান পাতিয়া শুনিল, রবীন্দ্রনাথের যে গানখানা সে খুব ভালবাসিত এটি সেই গান—

'...আজি এ কোন গান নিখিল প্লাবিয়া,
তোমার বীণা হ'তে এসেছে নামিয়া,
ভুবন ভেসে যায় সুরের রণনে,
গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে।'

সত্যই, এমন রাতে ছেলেবেলায় সে কত কবিতা লিখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতাগুলি এক সময় তাহার বোধহয় মুখস্থ ছিল।

হয়ত আজও সে চেষ্টা করিলে কবিতা লিখিতে পারে। আজও গান শিখিবার ইচ্ছা মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। আজও ভাল-ভাল কথা মাথায় আসে, লিখিতে ইচ্ছা করে।...

গানের সুরটা ফিরিয়া ফিরিয়া মনে কত ব্যথার সঞ্চার করে।...

'এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে,
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে
গভীর কী আশায়, বিপুল পুলকে
তোমার পানে যাই দু'বাহু বাড়ায়ে—'

সে জোর করিয়া মন হইতে এ মোহ দূর করিয়া ফেলিল। শিকারের বইটা দুই দিনের মধ্যে শেষ করিয়া দিতে হইবে। রাত জাগিয়া লেখা প্রয়োজন, স্বপ্ন দেখিবার সময় কৈ ?

ফুলশয্যার ইতিহাস

একে একে সকলে বাহির হইয়া গেলে রমেন দোরে খিল দিয়া আলোটা কমাইয়া বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দীপ্তি তখন মাথার বালিশের কাছে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু সে যে ঘুম নয়, তা তাহার দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দেই বোঝা যায়।

শুভ্র শয্যার সর্বত্র গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো, তাহারই মধ্যে ফুটন্ত গোলাপের মত দীপ্তির দেহখানি পড়িয়া আছে। 'পড়িয়া আছে' বলিলে ঠিক বোঝানো যায় না, অত্যন্ত নরম সিল্কের কাপড়ের মত তাহা এলাইয়া আছে।

দীপ্তির দেহখানি ক্ষীণ, কিন্তু সুগোল, সুডৌল এবং সুকুমার। সেদিকে চাহিবামাত্র মনে হয়, এ দেহ এতই নরম যে বোধহয় কাহারও হাতের ভরও সহিবে না।...এত সুকুমার দেহ ইতিপূর্বে কাহারও দেখিয়াছে বলিয়া রমেনের মনে

পড়িল না। ট্রেনে আসিবার পথে আগের দিন দুই একবার চুরি করিয়া রমেন তাহার মুখটা দেখিয়া লইয়াছিল, উপবাসক্লিষ্ট মলিন মুখের মধ্যে আয়ত দু'টি চক্ষুর লজ্জা-বিজড়িত চাহনির কথা মনে করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা যেন মোচড়াইয়া উঠিল ; আজ সারাদিন সে কাজের ভিতর একবারও ভাল করিয়া দীপ্তিকে দেখিতে পায় নাই সত্য কথা, কিন্তু গতকল্যকার কটাক্ষের স্মৃতিতেই সে মশগুল হইয়া আছে—সমস্ত কাজের মধ্যে সেই দু'টি চোখের কথা বার বার তাহাকে উন্মনা করিয়া দিয়াছে।

রমেন পকেট হইতে টর্চটা বাহির করিয়া একবার দীপ্তির মুখখানি তুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। দীপ্তি মুখ তুলিল বটে কিন্তু সে মুহূর্ত-কয়েকের জন্য, তা-ও চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল না।

রমেন একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিছানার তলার দিকে আসিয়া বসিল। তাহার বয়স একটু বেশী হইয়াছে এ কথা আজ আর কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না ; সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে যে বয়সে বিবাহ হয়, সে বয়সকেও সে বহুদিন পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। আজ এই যৌবনের প্রায় প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়া ঐ ষোলো বছরের মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া কি সে ভুল করিল না ? দীপ্তির বয়স যে ষোলোর বেশী নয় তাহার প্রমাণ সে আগেই পাইয়াছিল, আজ আরও নিঃসংশয় হইল সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, একেবারে ছেলেমানুষের মুখ!

রমেনের মনে পড়িল বন্ধুবান্ধবরা এই অসমান বিবাহে বাধা দিয়াছিল কিন্তু এই মেয়েটিকে সে নিজে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছিল বলিয়া কাহারও কথা শোনে নাই। আজ তাহার মনে মনে কেমন একটা ভয় হইতে লাগিল, সে কি পারিবে, দীপ্তির মনের মত হইতে ? কিশোরীর প্রণয়লীলার মধ্যে তাহাকে কি নিতান্ত বেমানান দেখাইবে না ?

সে একবার চকিতের মধ্যে তাহার এই চৌত্রিশ বৎসরের জীবনযাত্রার দিকে চাহিয়া লইল। অতি শৈশবে তাহার মাথায় এক বিপুল সংসারের ভার পড়িয়াছিল ; অর্থ উপার্জন এবং ভাই-বোনদের মানুষ করার চিন্তার মধ্যে সে আর কোনও দিকে নজর দিতে পারে নাই ; মা এবং বোন ছাড়া অন্য কোনও রমণীর সঙ্গ বা সাহচর্যও তাহার অদৃষ্টে মিলে নাই। কোনও অভিজ্ঞতা, কোনও জ্ঞানই নাই তাহার এ বিষয়ে!...যদি দীপ্তি তাহাকে ভালবাসিতে না পারে ? যদি সে তাহাকে ভয় করে ? তাহার সঙ্গ যদি পীড়াদায়ক বলিয়া মনে করে ?"

রমেনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সে জোর করিয়া মনকে দৃঢ় করিবার চেষ্টায় দীপ্তির তনুলতার দিকে চাহিল। সুশ্রী, সুগঠিত তাহার চরণ দুটির কাছেই বসিয়াছিল—একবার তাহার পায়ে হাত বুলাইবার লোভ সে সামলাইতে পারিল না। মাখনের মত নরম একখানি পা সে দুই মুঠার মধ্যে ধরিয়া ধীরে ধীরে চাপ দিল। মুহূর্তখানেক স্থির হইয়া থাকিয়াই দীপ্তি পা সরাইয়া

লইল। বোধ হইল যেন চাপা হাসিতে তাহার পিঠটা বার দুই বেশী করিয়া ফুলিয়াও উঠিল, কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ দিল না।...

রমেন জামাটা খুলিয়া বিছানাতে ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল, তারপর দীপ্তির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি ডাকিল, দীপু, দীপ্তি!

দীপ্তি তেমনিই চুপ করিয়া রহিল, সাড়া দিল না।...

হাওড়া জেলার এক দুর্গম পল্লীর অতি গরীবের ঘরে তাহার জন্ম। তাহার জন্মের পরেই তাহার মা মারা যান এবং তাহার বাবার চাকরি যায়। সে চাকরি তিনি আর পান নাই। কোনও রকমে ছোট ভাইদের মন যোগাইয়া এবং ভাদ্রবৌ-দের সংসারে খাটিয়া তিনি আজও বাঁচিয়া আছেন বটে কিন্তু সে থাকা যে মরার অধিক, এ কথা সে এই বয়সেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। সুতরাং সে ছেলেবেলা হইতেই সর্বত্র শুনিয়াছে যে তাহার মত দুর্ভাগা আর নাই, নিজেও সে-কথা বিশ্বাস করিয়াছে। তাহার চেয়ে যে-সব মেয়েদের ভাল অবস্থা, যাহাদের সমস্ত শৈশব ও কৈশোর অবিরত লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া কাটে নাই, তাহারাও উপযুক্ত অর্থের অভাবে কেহ মদ্যপের হাতে, কেহ বৃদ্ধের হাতে, কেহ বা অত্যাচারী লম্পটের হাতে পড়িয়াছে ; তাহাদের দুর্দশা সে নিজের চোখেই দেখিয়াছে এবং শিহরিয়া উঠিয়া ভাবিয়াছে নিজের অদৃষ্টের কথা। কখনও ভাবিয়াছে যে তাড়াতাড়ি যাহা-হোক্ একটা হইয়া যাওয়া ভাল, বিবাহিত জীবনে তবু একটা স্বাধীনতা আছে ; আবার ভাবিয়াছে যে বাপের বাড়ীতে লাঞ্ছনার মধ্যে দুঃখ আছে বটে, অপমান নাই, কিন্তু স্বামীর কাছে গিয়াও অদৃষ্টে যদি নির্যাতনই জোটে তো তাহার অপমান সে সহিবে কেমন করিয়া? তা-ছাড়া বাপের বাড়ীর দুঃখ একদিন শেষ হইবেই, এই আশায় সে প্রাণ ধরিয়া আছে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্ক যে আজীবন!

এমন সময় একদিন কার্তিকের মত রূপ এবং অগাধ ঐশ্বর্য লইয়া রমেন নিজে আসিল তাহাকে দেখিতে। সেদিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। আগেই তাহার রূপ ও ঐশ্বর্যের খ্যাতি সে শুনিয়াছিল ; মনে পড়িল, যে লোকটি মধ্যস্থ হইয়া এ সম্বন্ধ করে, জ্যাঠাইমা তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন, কেন ও চেষ্টা করছ মিছিমিছি? ও বাঁদ্‌রীর কি আছে যে পছন্দ করবে? শুধু শুধু এ ধাষ্টামো কেন?

তাহার উপর সেদিন তাহাকে সাজাইয়া দিবারও কেহ ছিল না, এমন কি কেহ তাহাকে একটা ভাল কাপড়ও পরাইয়া দেয় নাই। কী দুর্নিবার লজ্জার সহিত লড়াই করিতে করিতে যে সেই পুরাতন দেশী কাপড়টিতে দেহ ঢাকিয়া রমেনের সামনে তাহাকে যাইতে হইয়াছে, তাহা একমাত্র তাহার অন্তর্যামীই জানেন। তাহার পর সে কেমন করিয়া দূরে, জামরুল গাছের আড়াল হইতে রমেনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল এবং কী গভীর বেদনায় সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় মাথা খুঁড়িয়াছিল, তাহা সে আজও ভোলে নাই। চোখের জলে তুলসী-মঞ্চের মাটি ভিজাইয়া বার বার

জানাইয়াছিল, হে ঠাকুর, যেন আমায় পছন্দ করে।

কিন্তু তবুও যে সত্যই ভগবান তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবেন, তাহা সে কোনও দিনই আশা করে নাই। তাই যে দিন খবর আসিল যে রমেন তাহাকে পছন্দ করিয়াছে এবং এক কপর্দকও না লইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে, তখন বাড়ীর অন্যান্য লোকের মত সে-ও সেকথা বিশ্বাস করে নাই। জ্যাঠাইমা এই সেদিন পর্যন্ত যখন বলিয়াছেন, 'ও তোকে ঠাট্টা করেছে' তখন সে না মুখে, না মনে, কোনও প্রতিবাদই করিতে পারে নাই, শুধু গভীর রাত্রি পর্যন্ত অন্যের অজ্ঞাতসারে মুখে কাপড় গুঁজিয়া কাঁদিয়াছে।

তাহার পর শেষ পর্যন্ত সেই দিনটিও আসিয়া পড়িল, যেদিন আর কাহারও কোনও সংশয় রহিল না। কাকী ও জ্যাঠাইয়ের দলের হইল ঈর্ষা, কারণ তাহাদেরও বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল; সুতরাং লাঞ্ছনার মাত্রা সেদিক দিয়া বাড়িয়াই গেল। কিন্তু তা বাড়ুক, সে লাঞ্ছনা তখন আর তাহাকে বেদনা দিতে পারে নাই; বরং সে মনে মনে গৌরব অনুভব করিয়াছে। উপকথার রাজপুত্রের মত পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়া তাহারও স্বামী আসিতেছেন, নিমেষে এই সব বেদনা সোনা হইয়া যাইবে। আজ যত দুঃখই আসুক, তাহাকে সে গ্রাহ্য করে না।

কিন্তু কোথাও কোথাও তাহার আদরও বাড়িল। তাহার কাকার দুই মেয়ের আগেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, তাহারা এতদিন ভাল করিয়া দীপ্তির সহিত কথা পর্যন্ত কহিত না, এইবার তাহারা দীপ্তিকে ঘিরিয়া ধরিল। নিজেদের বিবাহিত জীবনের নানা গল্প তাহার কাছে করিয়া নানা উপদেশ দিয়া তাহাকে তৈরি করিতে লাগিল। মনে আছে, বিবাহের ঠিক আগের দিনই অনিলা তাহাকে বলিয়াছিল, দেখিস্ ছুঁড়ি, চট্ ক'রে যেন ভাতারের হাতে ধরা দিস্-নি। তাহ'লে দাম কমে যাবে। অন্তত তিন চারদিন খেলিয়ে তবে তার সঙ্গে কথা কইবি।

তাহার জবাবে অনুপমা বলিয়াছিল, 'হ্যাঁ, ধরা না দিয়ে পার পাবে কিনা! আজকালকার ছেলেরা পায়ে ধরে, কেঁদে, যেমন ক'রে হোক্ কথা কওয়াবেই। বাব্বা, আমাদের মানুষটি যা কাণ্ড করলে—সব প্রতিজ্ঞাই ভেসে গেল।

অনিলাও হাসিয়া বলিয়াছিল, তা—যা বলেছিস, যা বেহায়াগিরি করে—! মকর বলছিল যে ফুলশয্যার রাত্রিতে সে তার বরের সঙ্গে কথা কয় নি ব'লে শেষ পর্যন্ত বেচারা মাথা খুঁড়তে শুরু করেছিল, একেবারে রক্তগঙ্গা।

কথাটা শুনিয়া তাহার সারাদেহ আবেশে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল, সারারাত ঘুমাইতে পারে নাই। তাহার কথা, শুধু দু'টি মুখের কথা শুনিবার জন্য একটা পুরুষ-মানুষ পায়ে ধরিতে পারে? এ-ও কি সম্ভব? ঐ সুন্দর পুরুষটি, যাহার জন্য সবাই তাহাকে ইতিমধ্যেই ঈর্ষা করিতে শুরু করিয়াছে, যাহার বংশ এবং ঐশ্বর্যের খ্যাতি আজ এ গ্রামের সকলের মুখে মুখে—সে-ও তাহার পায়ে ধরিবে, তাহার কাছে মিনতি জানাইবে, শুধু তাহার মুখের কথা শুনিবার জন্য? তাহার সহিত কথা কহিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইবে?…

সে কিছুতেই এ সম্ভাবনাটা মনের মধ্যে ধারণা করিতে পারিল না, অথচ অবিশ্বাস করিতে গেলেও মনের ভিতরটা বেদনায় টন্ টন্ করিয়া ওঠে। এমনি করিয়া আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল, ভোররাত্রে তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিল যে, সে অভিমান করিয়া একটা ঘরে বসিয়া আছে আর তাহার স্বামী রুদ্ধদ্বারে মাথা কুটিতেছে।

বিবাহের দিনই বা কী লাঞ্ছনা তাহার! 'গায়ে হলুদে'র তত্ত্বের বেনারসী কাপড়খানার মূল্য যখন তাহার বিশ্বনিন্দুক ন'কাকীমা পর্যন্ত অন্ততঃ একশ' টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন, তখন আর কাহারও ঈর্ষা বাধা মানিল না। যত কিছু বাহ্য মুখোশ খুলিয়া সকলে একেবারে নিজমূর্তি ধারণ করিল। কিন্তু সে সব কোনও দিকে তাহার তখন মন ছিল না, তাহার অন্তরে সে কী এক অপরূপ সুর বাজিয়া চলিয়াছে, তাহাতেই সে আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। ঐ অসংখ্য দামী শাড়ী, ঐ রকমারি জামা এবং বহুমূল্য সোনার হার আসিয়াছে শুধু তাহারই জন্য, একান্ত-ভাবে ঐগুলি তাহারই!

শুভদৃষ্টির সময় সে তাই সকল লজ্জা ভুলিয়া চোখ মেলিয়া তাহার স্বামী, তাহার দয়িতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। রমেনের সৌম্য-সুন্দর মুখের দিকে, তাহার সঙ্কোচ-ভরা কুণ্ঠিত দৃষ্টির দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল; তাহার যত কিছু গ্লানি যেন নিমেষে ফুলের মালার মত রমণীয় হইয়া উঠিল। ছেলেবেলায় সে শুনিয়াছিল, গৌরী মহাদেবকে পাইবার জন্য সহস্র বৎসর অনাহারে তপস্যা করিয়াছিলেন; তাহার মনে হইল যে সে এইমাত্র ষোলো বছরের কৃচ্ছ্র-সাধনেই মহাদেবকে পাইয়াছে। সে মনে মনে বার বার ভগবানকে বলিতে লাগিল, হে ঠাকুর, যেন ভোগে হয়!

তারপর তাহার শ্বশুরবাড়ীতে আসা! শ্বশুর শাশুড়ী দেবর ননদ সকলের যত্নে ও স্নেহে গত চব্বিশ ঘণ্টা সময় যেন তাহার এক মধুর স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। মনে হইল যেন সে সত্য-সত্যই উপকথার রাজপুত্রের সঙ্গে কোন্ এক কল্প-রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আজ আর সে সংসারের সকলের অনাদৃতা, লাঞ্ছিতা, অনাবশ্যক ভার মাত্র নয়—আজ সে রাজেন্দ্রাণী! বহুলোকের সুখ-সৌভাগ্যের নিয়ন্ত্রী সে!

সব কথাগুলি মনে পড়িয়া একবার দীপ্তির সারা দেহ আনন্দে আশায় আবেশে, শিহরিয়া উঠিল। কোন্ এক পুলকানুভূতি তাহার বুকের মধ্য হইতে বাহির হইয়া দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে ছড়াইয়া ক্রমে দেহের অতীত যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়িল। সে সুখ বেদনার মতই টন্‌টন্ করিতে থাকে, সারা বিশ্বের বীণায় বেহাগ সুরে আঘাত করে!

রমেন অনেকক্ষণ পিছনে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া তাহার গায়ে আস্তে আস্তে একবার হাতখানা রাখিল। দেখিল সে কাঁপিতেছে; তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া

মুখের কাছে মুখ আনিয়া আবার ডাকিল, দীপু, তোমার শীত করছে? শালখানা গায়ে দিয়ে দেব?

দীপ্তি মুখ টিপিয়া হাসিল, সাড়া দিল না।

সে হাসি রমেন দেখিতে পাইল না। সে বিব্রত হইয়া উঠিল। আর একবার পিঠে হাত দিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দেখিল ভীরু পাখীর মত তাহার বুক ধুক্ ধুক্ করিতেছে। তাহার মন মমতায় ভরিয়া উঠিল। ভাবিল, ছেলেমানুষ। ভয় পাইয়াছে!

সে শালখানা খুলিয়া দীপ্তির গায়ে ঢাকা দিয়া দিল।

কিন্তু এত ভয়ই বা কেন? সে আজ পর্যন্ত যত বন্ধুবান্ধবদের ফুলশয্যার কথা শুনিয়াছে কোথাও তো এরূপ ভয়ের কথা শোনে নাই। অধিকাংশ স্থলেই বরং শুনিয়াছে বধূরাই স্বামীর ভয় ভাঙায়। এই তো কালই ইন্দু বলিতেছিল যে তাহার বউ ঘরে খিল দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে নাই, নিজেই আলাপ করিতে শুরু করিয়াছিল। তিন ঘণ্টায় সে এত কথা বলিয়াছিল যে বর্ধমানের রাজার মহাভারতের মত একখানা সহস্র পৃষ্ঠার বই হয়!

তবে কি দীপ্তি তাহাকে পছন্দ করে নাই? না, তাহার বয়সের কথাটা কাহারও মুখে শুনিয়াছে? তাহার নামে কেহ নিন্দা করে নাই তো? রমেন রীতিমত নার্ভাস হইয়া উঠিল, আর একবার হেঁট হইয়া জোর করিয়া দীপ্তির মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, দীপু, একবার চোখ চেয়ে দেখ, আমাকে কি তোমার পছন্দ হয় নি?

দীপ্তি চোখ খুলিল না। কিন্তু মুখও ফিরাইল না। তখন রমেন মনে অনেকখানি বল আনিয়া তাহাকে একটি চুম্বন করিল—বিবাহিত জীবনের প্রথম চুম্বন।

দীপ্তি এইবার মুখটা ফিরাইয়া লইয়া পুনরায় বালিশের তলায় মুখ গুঁজিল। বিবাহের পূর্বেকার যত কিছু আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে; মাত্র দুইদিন পূর্বে যে আশা সে কল্পনাতেও মনে স্থান দিতে পারে নাই, আজ সে ধরিয়া লইয়াছে যে তা তাহার শুধু ন্যায্য প্রাপ্য মাত্র। সে অসহিষ্ণু ভাবে মনে মনে বলিল, এ আবার কি ঢং। এত ভয় কিসের?

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। পাশের ঘরের বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। আর মাত্র ঘণ্টা দুই-তিন এ ঘরে থাকা চলিবে। রমেনও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। কিন্তু এই চুপ করিয়া শুইয়া থাকার রহস্য সে কিছুতেই ভেদ করিতে পারিল না। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নিজের কোন অভিজ্ঞতাই তাহার নাই, বন্ধু-বান্ধবরা যতটুকু বলিয়া দিয়াছে সেই পর্যন্তই তাহার দৌড়; কিন্তু এরকম সম্ভাবনা তো কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই?...সে কি সত্যই এই ছোট মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া ভুল করিল?

আরও কিছুক্ষণ—

তারপর সে ভয়ে ভয়ে দীপ্তির পায়ে আর একবার হাত দিল, মিনিট-দুই নিঃশব্দে তাহার পা টিপিতে লাগিল। দীপ্তি বাধা দিল না, মনে মনে শুধু হাসিতে

লাগিল, ভাবিল যে এইবার লক্ষণ মিলিতেছে—

রমেন তাহাকে এইবার জোর করিয়া নিজের দিকে ফিরাইল। দীপ্তির মুখখানিকে নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল ; কিন্তু সে চুম্বন মরা-মানুষকে চুমা খাওয়ার মতই নিরর্থক বলিয়া মনে হইল। আর একটা মানুষ যদি নিতান্ত পাষাণের মতই পড়িয়া থাকে তো কেমন করিয়া তাহার কাছে প্রেম নিবেদন করা যায়।

সে ডাকিল, দীপু!

সাড়া নাই। পুনশ্চ কহিল, দীপু, আমার সঙ্গে কথা কইবে না? আমাকে কি তোমার ভয় করে?

দীপ্তি তাহার জবাবে আবারও পিছন ফিরিয়া শুইল। আসল কথা, তাহার হাসি পাইতেছিল। এই বুদ্ধি লইয়া লোকটা বিবাহ করিয়াছে? সে ধরা কিছুতেই দিবে না তাহা স্থির, কিন্তু এ লোকটা কি কোনও দিন জোর করিয়া তাহাকে কথা কহাইতে পারিবে?

রমেন একটু থামিয়া কহিল, আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে, সত্যি ক'রে বলো।

তবু ও-পক্ষ হইতে সাড়া আসে না। রমেনের দেহে ঘাম দেখা দিল। কি বিপদ! এ কি বোবা নাকি?

সে রাগ করিয়া শুইয়া পড়িল। অর্ধস্ফুট স্বরে স্বগতোক্তি করিল, আমি ঘুমুই বাবা, কথা না কইলে তো বয়েই গেল!

কিন্তু সেটা কথার কথা। শুইয়া শুইয়া যেন শয্যাকণ্টকী বোধ হইতে লাগিল। তাহার ষোল-সতেরটি বন্ধুর আজ পর্যন্ত বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু কৈ, কাহারও অদৃষ্টে যে এরকমটি ঘটিয়াছে বলিয়া তো শোনা যায় নাই! তাহারই দুর্ভাগ্যক্রমে কি এই মেয়েটির যত কিছু বিপরীত আচরণ?

ওধারে দীপ্তিরও চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল। পাশের ঘরের ঘড়িটা ক্রমাগত টিক্ টিক্ শব্দে মিনিটের পর মিনিট যেন দুই হাতে করিয়া সরাইয়া দিতেছে। তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিনটি কি এমনি করিয়া নীরবে কাটিয়া যাইবে? রাত্রি প্রভাত হইতে আর দেরিই বা কি?···কিন্তু অনিলা অনুপমা, তাহাদের স্বামীরা পর্যন্ত পায়ে ধরিয়া সাধিয়া কথা কওয়াইয়াছে, আর সে-ই বিনা আয়াসে ধরা দিবে! অথচ তাহার মত স্বামী-সৌভাগ্য আর কাহারও কি হইয়াছে?

রমেন ভাবিল বড় মেয়ে হইলেও না হয় রাগারাগি করা চলিত, কিন্তু এ যে একেবারে বালিকা, ইহাকে লইয়া কি করা যায়। সে নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিল কিন্তু দীপ্তির এই কঠিন নীরবতার কোনও কারণই সে খুঁজিয়া পাইল না। কারণ না জানিলে উপায় হয় কি করিয়া?

অনেকক্ষণ পরে সে শুইয়া শুইয়াই দীপ্তিকে নিজের কাছে জোর করিয়া টানিয়া আনিল, অকস্মাৎ তাহার মুখ, বুক, কণ্ঠ অজস্র চুম্বনে ভরাইয়া তুলিল। দীপ্তি

বাধা দিল না, সরিয়াও গেল না। অভিমানে তাহার চোখ দুইটি জ্বালা করিতে-ছিল, মনে মনে সে বলিল, আমার দেহটার ওপরেই শুধু যদি তোমার লোভ হয়, তাই তুমি নাও, আমি চাই না কথা বলতে, চাই না তোমায় ভালবাসতে।

রমেনের সারা দেহ একাগ্র উত্তেজনায় তখন কাঁপিতেছে। দেহের প্রতিটি অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে অকারণে তাহার হাতটা কঠিন মুঠার মধ্যে ধরিয়া নিপীড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু একটু পরেই নিজের আচরণে লজ্জিত হইয়া দীপ্তিকে ছাড়িয়া দিল। এ কী করিতেছে সে, কাণ্ডজ্ঞান কি তাহার লোপ পাইল?

তাহার লজ্জাটা ক্রমে ক্রোধের আকার ধারণ করিল, ঐটুকু মেয়েরই বা এত কিসের জেদ? এত অহঙ্কার কেন? সে কি ভাবে রমেনকে বিবাহ করিয়া সে মাথা কিনিয়াছে? রমেন পাশ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইল। থাক্ দীপ্তি তাহার অহঙ্কার লইয়া—সে আর সাধিবে না।

দীপ্তিও বুঝিতে পারিল না, কোথা দিয়া কি করিয়া এমনটা হইল। সে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। ধারায় ধারায় তাহার চোখের জল ঝরিয়া পড়িয়া ফুলশয্যার নূতন বালিশ ভিজিতে লাগিল। এমনি করিয়া দু'টি নববিবাহিত নরনারী অন্তরের অগাধ আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বুকে করিয়া নীরবে পাশাপাশি শুইয়া রহিল। এবং তাহাদের সেই বেদনাকে উপহাস করিয়াই যেন ঘড়িটা অন্ধকারের মধ্যে টিক্ টিক্ শব্দ করিতে লাগিল।

ভোরের আলো শার্সির গায়ে লাগিতেই রমেন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সেই ম্লান আলোতে প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল—দীপ্তি কাঁদিতেছে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রাগ মন হইতে চলিয়া গিয়া সে জায়গায় পূর্বেকার উদ্বেগ আসিয়া জুড়িয়া বসিল। সে ব্যাকুলভাবে তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া কহিল, দীপু, কি হয়েছে আমায় বলো, লক্ষ্মীটি! বাপের বাড়ীর জন্যে মন-কেমন করছে? না আমারই কোন কাজে ব্যথা পেয়েছ। বলো লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি।

দীপ্তির চোখের জল দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। এই কথাগুলি এতক্ষণ কোথায় ছিল? এমন করিয়া আগে বলিলে তো তাহার ফুলশয্যার রাত্রি ব্যর্থ হইয়া যাইত না।

রমেন তাহাকে খানিকটা তুলিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, আমাকে এমন ক'রে কষ্ট দিয়ে তোমার লাভ কি হচ্ছে, দীপু?

এই তো! দীপ্তির বুক জ্বলিয়া উঠিল। অনিলা-অনুপমার দল যাহা বলিয়া দিয়াছে, এতক্ষণ পরে বুঝি তাহা মিলিতে চলিল। সে অধীর আগ্রহে অধিকতর মিনতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু রমেন আবারও ভুল বুঝিল। সে রাগ করিয়া তাহাকে নামাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দীপ্তি কিছুক্ষণ কাঠ হইয়া শুইয়া রহিল। কিছুতেই সে তাহার দুর্ভাগ্যের

কারণ বুঝিতে পারিল না। এমনি করিয়াই কি সারাজীবন অমৃতের পাত্র তাহার মুখের কাছে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে? এ কি তাহারই সূচনা?...

সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া শুষ্ক মুখে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে পাণ্ডুর আকাশের নীচে চাহিয়া মনে মনে কহিল, ঠাকুর, একটিবার সে ফিরে আসুক, এবার নিজেই পায়ে ধরে তার কাছে মাপ চাইব।...

নীচের ঘরে বসিয়া তখন রমেনও ভাবিতেছে, অত রাগ না করিলেও চলিত। ছেলেমানুষ, আমারই উচিত ছিল, তাহার হাতে পায়ে ধরিয়া ভয় ভাঙ্গানো।

বিশ্বদেবতা পূর্বাকাশে বসিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মায়ার ফাঁদ

বহুদিন পরে গরমের সময় ওয়ালটেয়ার গিয়েছিলুম। এবার আর সমুদ্রের ধারের কোন হোটেলে ওঠার চেষ্টা করি নি—যদিচ এখন অনেক বড় বড় হোটেল হয়ে গেছে, এই ক'বছরের মধ্যে—তবু দৈনিক প্রণামী যে কত দিতে হবে তা আন্দাজ করেই আর সে বৃথা চেষ্টা করিনি। সেবারই নবনির্মিত এক হোটেলে শুনেছিলুম দৈনিক পঁয়ষট্টি টাকা শুধু ঘরের ভাড়া, সেটা এখন কোন্ না দুশো টাকা হয়েছে। অনেক খুঁজে শহরের মধ্যে বড় রাস্তার ওপর নতুন ঝকঝকে হোটেলে ভাল ঘর পেয়েছিলাম মাত্র পনেরো টাকায়। সেটাই এযাত্রা দিতে হ'ল ষাট টাকা হিসেবে।

শহরে উঠলেও কোন অসুবিধা নেই, বাসে ক'রে আমার সেই চিহ্নিত ও লোভনীয় 'স্পটটি' যাওয়া মাত্র দশ মিনিটের ওয়াস্তা। রামকৃষ্ণ আশ্রমের কাছে, মনে হয় একটা কোণ বেরিয়ে গেছে দু'তিনটে পথের সংযোগ বিন্দুতে—তার ওপর একটি চা কফি ও আইসক্রীম বিক্রীর মনোরম 'শেড', একটা কিছু নিয়ে ঘণ্টা-খানেক বসে বসে তরঙ্গভঙ্গ দেখলেও কেউ কিছু বলে না।

তবে আমি যে দিনের কথা বলছি, সেদিন বেশীক্ষণ বসা হ'ল না। কফি খেতে খেতে (এদের কফি অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু হায়! আমার খাওয়া নিষেধ) লক্ষ্য করলুম একটি ছোকরা নিচে সমুদ্রধারে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে, একেবারে পাথরের মূর্তির মতো—এতক্ষণে একবারও নড়াচড়া করতে দেখলুম না। সে ভঙ্গীতে মনে হয় ওদিকে চেয়ে থাকলেও 'ঢেউ গোনা' যাকে বলে তা দেখছে না, মন কোন্ এক সুদূর চিন্তায় ডুবে আছে। চোখে দৃষ্টি আছে, তবে সে দৃষ্টি অন্তঃপ্রবিষ্ট।

তাতেও অত বিচলিত হতুম না, বেশটা যেন চেনা-চেনা লাগল, ন্যাভাল অফিসারের পোশাক।

এই ওয়ালটেয়ারের সঙ্গেই এ পোশাকের স্মৃতি জড়িয়ে আছে যেন।

একটু পরেই মনে পড়ল। সেবার স্টেশনে মালপত্র রেখে একটা ট্যাক্সি ক'রে বেরিয়ে পড়েছিলুম হোটেলের খোঁজে। সমুদ্রের ধারে হোটেল চাই—তবে আকাশ-ছোঁয়া ভাড়া হলে চলবে না। রিকশাওলাদের এ ব্যাপারে প্রাপ্য থাকে কোথাও কোথাও, সেই ভেবেই ট্যাক্সি নেওয়া, কিন্তু লোভের ঊর্ধ্বে আজকাল কোন মানুষ আছে বলুন!

তবে সে যে হোটেলে নিয়ে গেল আপাতদর্শনে তা 'লা-জবাব'।

সমুদ্রের ধারে তো বটেই, প্রায় ওপরে বলা চলে। সেদিক দিয়ে ওদিকের দামী হোটেলের চেয়ে অনেক ভাল। বাঁধানো স্ট্র্যাণ্ডের মতো করা, তাতেই এসে ঢেউ আছড়ে পড়ছে—সে জল ও হোটেলের মধ্যে মাত্র একটি, বোধহয় বারো ফুট পথ, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই সুরম্য লন, তারপর বাড়ি। যে ঘর দেখালো তাও একেবারে সেই লনের ওপর। বড় ঘর, দুদিক খোলা, জোড়াখাট—মাত্র পঁচিশ টাকা দৈনিক ভাড়া।

আর এক মুহূর্তও ইতস্তত করি নি, একশ টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে মাল-পত্র এনে উঠেছিলুম। তখন বেলা চারটে।

তবে ঘরে ঢুকে মনটা একটু খারাপ হ'ল বৈকি।

বিছানায় চাদর পেতে দিয়ে গেছে তা ছেঁড়া এবং তাতে সন্দেহজনক সব দাগ। বালিশটার ওয়াড় আসে নি এবং তা এলও না শেষ পর্যন্ত, তিনচার বার বলা সত্ত্বেও। নিজের সঙ্গে বিছানা ছিল—তারই চাদর বিছিয়ে নিলুম, বালিশটাও।

তবে এই শুরু মাত্র, শেষ নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই লনে টেবিল ও চেয়ার পড়ল, স্কুলের ছাত্র যাদের বলা চলে এমন বয়সী ছেলেরা মদের বোতল নিয়ে বসে গেল। পরেই শুরু হ'ল দেহ-জীবিনীদের আবির্ভাব। চোদ্দ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত বয়সের—য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান বা তদ্বেশিনী। তারপর হুল্লোড়, বাইরের হল ঘরে—প্রকাশ্যেই। ষোল বছরের ছেলেরা চল্লিশ বছরের রঙ্গিনীদের কোমর ধরে নাচছে। অধিক দূর যাবে অতঃপর—তা তো বোঝাই যায়।

সামনে অপূর্ব দৃশ্য। 'ডলফিনস্ নোজ' পাহাড় মনে হয় হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। বিশাখাপত্তনের পোতাশ্রয় সামান্য কিছু দূরে। কিন্তু নরকের মধ্যে বসে কি দূরে দিনান্তের দৃশ্যে মনের গ্লানি দূর হয়। এর পরে যা ঘটেছিল তা আমি অন্যত্র বিশদ লিখেছি, এখন তার পুনরুক্তি করার প্রয়োজন নেই।

সেইদিন সন্ধ্যাতেই হঠাৎ দোর ঠেলে এই ছেলেটি ঘরে ঢুকেছিল, তখন বয়স কত হবে, মনে হয় বড় জোর একুশ-বাইশ। এ-ই ধরনের পোশাক, তখন এত চিহ্ন যোগ হয় নি তাতে। তর্জন ক'রে বলেছিল, 'আপনি তো বাঙালী, খাতায় যে নাম লেখা তাও আমার শোনা—আপনি এ নরকে এসেছেন কেন?'

সে কেন এসেছে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, 'জাহাজে কাজ করি, দুটো দিন মাত্র আছি, কাছাকাছি কোথাও কোন হোটেল নেই, তাই থাকি। আর আমার কথা আলাদা—কেউ কোথাও নেই, জলে থাকি, বন্দরে বন্দরে ঘোরা এসব আমার গা-

সওয়া। আপনি সহ্য করতে পারবেন। কাল ভোরেই চলে যান।'

আর দাঁড়ায় নি, তখনই বেরিয়ে গিছল। কোথায় তা জানি না, হয়ত ঐ নরক-কুণ্ডেই। আমিও পরের দিন সত্যিই ভোরবেলা পালিয়েছিলুম, শহরের মাঝখানে 'হোটেল আনন্দ' বলে আবাসে।

আরও কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলুম।

হ্যাঁ, সেই ছোকরাই, তাতে সন্দেহ নেই। মুখটা ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছে না, তবে চেহারার 'আড়া' একটা থাকে তো—তাতেই বোঝা যায়।

কফির দাম দিয়ে নিচে নেমে এলুম। একেবারে পাশে এসে দাঁড়াতে তার যেন সম্বিৎ ফিরল, চমকে মুখের দিকে চাইল, ভুরু কুঁচকে।

'কী, চিনতে পারছেন?' প্রশ্ন করি।

'কে, না তো—' একটু বিপন্ন ভাবেই চায়।

'সেই যে মেরিনা হোটেলে—আপনি আমাকে তিরস্কার করেছিলেন। মনে পড়ছে না?'

'মাই গড্। ঠিকই তো, চেহারা বিশেষ বদলায় নি আপনার, আর একটু বুড়ো হয়েছেন এইমাত্র। আপনাকে আমার মনে আছে বৈকি, তবে চেহারাটা কি আর মনে থাকে! হাতের কাছে বাংলা বইটই পেলে পড়ি—আপনার বইও দু'তিনখানা পড়েছি। চলুন চলুন, ওপরে গিয়ে বসা যাক। এখানে যা অবস্থা—এমন স্যান্ড-বীচ—নোংরা কাজ সেরে সেরে নরক ক'রে রাখে বেটারা।'

এসে বসলাম আবার। ওর জন্যে একরকম জোর ক'রেই একটা কুলফি হুকুম করলাম—নিজের জন্যে এবারে চা আর স্যান্ডউইচ।

'তারপর! অমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অত আকাশ-পাতাল কি ভাবছিলেন? চোখ দুটো সমুদ্রের দিকে মেলা ছিল কিন্তু দৃষ্টি ছিল না সেদিকে। এই বয়সে এত চিন্তা কিসের। কাঁচা বয়স হলে ভাবতুম প্রথম কারও প্রেমে পড়েছেন।'

সে হেসে ফেলল। বলল, 'এত লক্ষ্য করেছেন! আশ্চর্য! অবিশ্যি তা না হলে আর নভেল-লেখক হবেন কি ক'রে। সত্যিই সে বয়স আর আমার নেই—বত্রিশ চলছে, তবু যা ধরেছেন তা ঠিকই, প্রেমে পড়ারই ব্যাপার—আর সেই জন্যেই অসংখ্য সমস্যা, অজস্র দুশ্চিন্তা।'

'অল্প বয়স, ভাল রোজগার করেন, কেউ কোথাও নেই বলেছেন তবে আর সমস্যা কি? অন্য কোন রাইভাল দেখা দিয়েছে রঙ্গমঞ্চে?'

'ওহ্ নো নো! তাহলে তো বাঁচতুম। তা নয়, তবে—'

এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল খানিকটা, আবার তেমনিই দূরের দিকে চেয়ে রইল, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'নাঃ, বলেই ফেলি। আপনাকেই বলি। আমি একা আর এ দুশ্চিন্তার বোঝা বইতে পারছি না। আপনি নভেল লেখেন, এসব বোঝেন ভাল—একটা সৎ পরামর্শ দিতে পারবেন।'

এই বলে আবারও একটু চুপ ক'রে গেল। দ্বিধা? সঙ্কোচ? না অন্য কোন বাধা?

যাই হোক—যেন জোর ক'রেই সরিয়ে দিল সেটা—তারপর খুলে বলল ওর সমস্যার কথা, ওর জীবনের কথাও—আনুপূর্বিক।

ওর নাম প্রবাল, ধনীর ঘরেই জন্ম। বাবা ছিলেন বিলেত ফেরৎ য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, একেবারে বিলেত থেকেই চাকরি নিয়ে এসেছিলেন, সেই সঙ্গে এনেছিলেন কিছু বদভ্যাস, তার মধ্যে সুরাপান অন্যতম, তবে প্রধান নয়। প্রধান যেটা তা হ'ল মেমসাহেবের সঙ্গে ঘর করার প্রবল ইচ্ছা। বিলেতে যাবার আগে যাঁকে বিয়ে করে-ছিলেন—প্রবালের মা, যদিও তিনি কনভেণ্টে পড়া ও রীতিমতো রূপসী—তবুও ওর বাবা বীরেশ্বরবাবুর মনে হ'ত এটা তাঁর পক্ষে খুব আন-ইকোয়াল ম্যাচ, তাঁর সঙ্গে ও'র মতো লোকের ঘর করা পোষাবে না। তবু, অগত্যাই বছর তিনেক ঘর করতে হয়েছিল। প্রবালের মা-ই ও'কে মুক্তি দিয়ে গেলেন। প্রতিদিন অপমানিত হওয়ার জ্বালা অসহ্য হওয়াতেই এই কাজ করতে হয়েছিল তাঁকে, একবার শিশুর কথাও চিন্তা করেন নি, অথবা ভেবেছিলেন বাঁদরের ছেলে বাঁদরই হবে—। তিনি স্বামীকে যেন উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যেই ও'র আপিসের একটি তরুণ ইংরেজ কর্মচারীর সঙ্গে বিলেত চলে গেলেন।

ছেলেকে কে মানুষ করে? এ সমস্যার সমাধান করলেন বীরেশবাবু এক য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্সকে প্রচুর টাকা মাসিক বেতন দিয়ে গৃহে প্রতিষ্ঠিত ক'রে। বোধহয় এক ঢিলে দুই পাখী মরবে ভেবেছিলেন—অর্থাৎ ও'র দৈহিক প্রয়োজনও মিটবে, ছেলেও মানুষ হবে। কিন্তু সে মেয়েটি অত বোকা নয়, সে বীরেশবাবুকে বিবাহ করতে বাধ্য করল। আগের হিন্দু বিয়ে তার ওপর সে গৃহত্যাগিনী—সুতরাং রেজেস্ট্রী বিয়ে আটকাল না। বিয়ের পরও বছর তিনেক এখানে ছিলেন বীরেশবাবু, পিঙ্গলকেশী স্ত্রী তাঁকে নিয়ত উত্তেজিত করতে লাগল—তার উচ্চাশা সে সাদা চামড়ার দেশে থাকবে। অনেক তদ্বির ক'রে বীরেশবাবু আমেরিকায় একটা চাকরি যোগাড় করলেন। অতঃপর ছেলেকে একটি তথাকথিত বিশেষ শিক্ষালয়ে —যারা নাকি অভয় দিয়েছিল যে ছোট ছেলেদের ভার নেওয়া মানুষ করা সেই সঙ্গে শিক্ষিত করাই তাদের স্পেশালিটি—রেখে ও'রা দুজনে দীর্ঘকালের জন্যেই ফ্লোরিডায় চলে গেলেন।

তারপর থেকে আর কোনদিনই প্রবালের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় নি, হয়ত তাঁরা বেঁচে নেই, অথবা খোঁজ করার তেমন কোন চেষ্টাও করেন নি। গর্ভধারিণী মায়ের খবর প্রবালই পরবর্তীকালে সংগ্রহ করেছিল কিন্তু দেখা করার ইচ্ছা তেমন বোধ করে নি বলেই যোগাযোগ হয় নি।

এই বিশেষ বোর্ডিংস্কুলে বছর দুয়েক ছিল প্রবাল বাধ্য হয়েই। পরে ঐ বয়সেই একটা আবছা আবছা ভাবে বুঝেছিল ব্যাপারটা—যাদের বাবা মা বা

অভিভাবক শিশু কি বালকের ভার বইতে চান না, বা যেসব ছেলের পড়াশুনো হবে না, ছোট বয়সেই বাড়ি থেকে পালাবার চেষ্টা করেছে—তাদেরই ভার নেবার আশ্বাস দিয়ে মোটা টাকা আগেই খানিকটা আদায় ক'রে নেন এ'রা, তার পরের ব্যাপারটা মানুষ হওয়া, লেখাপড়া শেখাটা দায়ঠেলা ভাবে সারেন। খেতে দেওয়া হয় জীবনধারণের মতো, ইস্কুলের মাস্টার রাখা হয় অপদার্থ দেখে—অর্থাৎ যারা নাম-মাত্র মাইনেতে কাজ করবে।

ঐ বছর দুয়েকের মধ্যেই অসহ্য হয়ে উঠল প্রবালের—কিন্তু কী করবে কোথায় যাবে—কিছুই তো জানে না। বাবাকে চিঠি দেবার চেষ্টা করেছিল, সম্ভবত স্কুলের কর্তারা সে চিঠি গায়েব করেছিলেন। শেষে এক বুড়ো দারোয়ানের কেমন মায়া পড়ল ওর ওপর। এমনি ভদ্র শান্ত স্বভাব বলেও বটে, ওর ইতিহাসটা জানতে পেরেও বটে। অবস্থাপন্ন লোকের একমাত্র সন্তান এই দুর্দশায় বাড়ছে (মানুষ হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না এখানে) আপন বাবা মা থাকতেও—ঐ দরিদ্র ভোজ-পুরী দারোয়ানের কাছে এটা অত্যন্ত অবিচার বা অত্যাচার বলে বোধ হয়েছিল।

সে বার বার প্রশ্ন করে প্রবালকে, 'আচ্ছা, এখানে তোমার কোন আত্মীয় নেই ? কারও নাম-ঠিকানা মনে পড়ে না ? ভাল ক'রে ভেবে দ্যাখো। আমি এদের চিনে নিয়েছি, এরা তোমার বাবাকে লেখা চিঠি ডালতে দেবে না ডাকবাক্সে। তাহলে এতগুলো টাকা চলে যাবে, বদনাম ভি হবে।'

কারও নামই মনে পড়ে না।

হঠাৎ একদিন মনে পড়ল একজনের কথা। আত্মীয় কেউ নয়, তবে ভালবাসবার মতো একজন।

খোদাবক্স, ওর বাবার ড্রাইভার ছিল। খুব ভালবাসত প্রবালকে, ফাঁক পেলেই কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াত, কখনও কখনও টফি কিনে দিত। খেলনাও।

তার কারণও ছিল, এর কিছুদিন আগেই খোদাবক্সের স্ত্রী আর আট বছরের ছেলে একদিনের আগে-পিছে 'হেজা কি বিমারী' বা কলেরায় মারা গিছল। মুজঃ-ফরপুরের উত্তরে কোথায় দেশ, সেখানে কোন ডাক্তার কি হাসপাতাল নেই, বেঘোরেই মরেছে। তারপর থেকে আর খোদাবক্স দেশে যায় নি, আর বিয়ে কি নিকা কিছুই করে নি। তার কথাই বলল প্রবাল।

দারোয়ান দয়ারাম পিচ ক'রে একটা ঠোঁটের আওয়াজ ক'রে বললে 'দূর পাগল, সে ডিরাইভার তোমার পিতাজীর খবর রাখবে ? আর সে-ই কি সেখানে আছে ? তাকে খুঁজে পাবে কি করে ?'

প্রবাল এবার জেদ করে। বলে, 'না, বেনেপুকুরে তার নিজের একটা টিনের বাড়ি আছে, একখানা ঘর কাকে ভাড়া দিয়েছে, আর একখানায় থাকে। সে কোথায় যাবে ? তা ছাড়া—আমার বাবা তাকে এক বড় সাহেবের কাছে চাকরি ক'রে দিয়ে গেছে—খোদাবক্স নিশ্চয়ই বাবার ঠিকানা জানে। নয় তো সে সাহেব জানবে না ?'

ওর পীড়াপীড়িতে দয়ারামকে যেতে হয়। খুঁজে বারও করে শেষ পর্যন্ত।

ড্রাইভার খোদাবক্স বাড়িওলা—এই পরিচয়ে অনেকেই চেনে।

খোদাবক্স প্রবালের নাম শুনেই লাফিয়ে উঠল।

'সে লেড়কা বেঁচে আছে? কোথায় আছে সে? কি করছে? তুমি কি ক'রে জানলে?'

প্রবালের দুর্দশা সব শুনে তার দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে লাগল। বললে, 'কত খুঁজেছি ছেলেটাকে। সাহেব তো আমাকে ঠিকনা দিয়ে যান নি, তবু আমি খুঁজে বার করেছিলুম সে ইস্কুল বোর্ডিং, কিন্তু আমাকে দেখা করতে দেয় নি, বলেছিল আমাদের কানুন নেই, এমন ভাবে দেখা করতে দেবার। তারপর আমার মালিকের পুর্জা নিয়েও একবার গিছলুম—বলেছিল, সে এখান থেকে চলে গেছে, ওর বাবা নিয়ে গেছেন।···সব ঝুট বাত। য়্যাঁ। এমন বেইমান ওরা—আবার ইস্কুল করে। ছোঃ।'

দয়ারাম বলল, 'এই তো ওদের রোজগার ভাইয়া। যা খরচ করে তার তিনগুণ নেয় বাবা-মায়েদের কাছ থেকে। তাছাড়া ওখানকার ছেলে বাইরের কারও সঙ্গে কথা বললেই তো ভেতরের খবর দেবে। মানুষ তো হয়ই না, জানোয়ার হয়ে বেরোয়। এই বাচ্ছা ছেলে—তাকে ধাড়িগুলো বকাবার কি কম চেষ্টা করে। এখন এই বয়েসেই রাত্রে ওকে ধরে নানারকম অত্যাচার করে।'

খোদাবক্স একেবারে ওর হাত দুটো চেপে ধরে, 'তুমি ভাই কোনমতে একবার বার ক'রে দাও—রাতে হোক দুপুরে হোক, আমি ওকে মানুষ করব এনে। ওর মা এখন বাঙ্গালোরে আছে জানি, শুনেছি আমার সাহেবের কাছ থেকে—তবে তার কাছেও দেব না, সে আওরৎ একেবারে বরবাদে গেছে।'

'কিন্তু দেব যে—ওরা পুলিশে দেবে না? ওদের লুকসান তো আছেই, বাবা-মা যখন চেপে ধরবে?'

'আমি তোমাকে জবান দিচ্ছি, কিচ্ছু হবে না। আমি এখন যাঁর গাড়ি চালাই তিনি নানারকম কি কারবার করেন, পুলিশের বড় আপিসাররা হাতের মুঠোয়, হামেশা খানা খেতে আসে। আমাকে খুব পেয়ার করেন—ড্রাইভার ভাবেন না, বন্ধুর মতো দেখেন। তাঁকে দিয়ে পুলিশকে ধরে আমি ওদের এমন ধাতানি দেব যে ওরা কথা কইতে ভরসা পাবে না। তা ছাড়া ওর বাবা অনেক টাকা থোক জমা ক'রে দিয়ে গেছেন—ওদের নুকসানও হবে না। বরং ফেরৎ দিতে হবে—এই ভেবে বেশী খোঁজ-খবরও করবে না। আমি ওদের চিনে নিয়েছি।'

তাই দিয়েছিল দয়ারাম। একদিন রবিবারের দুপুরে বার ক'রে দিয়েছিল। প্রথম কটা দিন বেনেপুকুরের বস্তিতেই অন্য লোকের ঘরে রেখে দিয়েছিল খোদাবক্স, যদি কোন খোঁজ-খবর হয় তেমন এই জন্যে—তারপর এক কাণ্ডই ক'রে বসল। নিজের থাকার ঘরখানাও ভাড়া দিয়ে ওর এখনকার যে মনিব—তাঁকে বলে নিচের একটা খালি পড়ে থাকা ঘরে উঠল। নিজের বাড়ির ভাড়া আর মাইনের যথাসর্বস্ব খরচ ক'রে প্রবালকে ডন্‌বসকো ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিল। সে অবশ্য

সাহেবের দৌলতেই হয়েছিল, কারণ সব কাহিনী শুনে তাঁরও মায়া পড়ে গিয়েছিল ছেলেটার ওপর। তিনিও কিছু কিছু টাকা দিতেন খোদাবক্সকে প্রবালের পোশাক, বইখাতা ইত্যাদির খরচ বাবদ। তারপরও, তাঁরই চেষ্টায়, নেভিতে ক্যাডেট হয়ে ঢোকে। সে সম্পর্কিত খরচ, শিক্ষা বা তদ্বির তিনিই ক'রে দিয়েছিলেন।

তারপর থেকে এই জীবন চলছে। খোদাবক্স খুব বুড়ো হয়ে না পড়লেও চোখে কম দেখছে, তার আর গাড়ি চালানোর অবস্থা নয়। পুরনো সাহেব নতুন ড্রাইভার রেখেছেন কিন্তু ঘরটা ওকে দিয়ে রেখেছেন, বাকী খরচ প্রবালই পাঠায়। তাও যা পাঠায় প্রাণ ধরে খরচ করতে পারে না খোদাবক্স, বলে, 'খোকা, তোর জন্যে কিছু রাখ, টাকা জমা। বিয়ে-থা করবি, সংসার করবি, এখন দুহাতে খরচ করলে চলবে কেন।'

না, প্রবালের বিয়ে-থা করার ইচ্ছে নেই আদৌ, অন্তত এতকাল ছিল না। মা বাবাকে দেখেই ও ব্যাপারে ঘেন্না হয়ে গেছে। তাই বলে, শরৎবাবুর জীবানন্দর ভাষায় শুকদেবও নয় সে। বন্দরে বন্দরে কিছু স্ত্রীলোক ভোগ করে। বেছে বেছে অল্পবয়সী নেয়—যত অল্পবয়সী পাওয়া যায়। কারণ তাদের দেহ তখনও খুব একটা কুৎসিত রোগে একেবারে ঝাঁঝরা হবার মতো সময় হয় নি। তাই বলে বিশ্বাসও করে না, যথেষ্ট প্রিকশ্যন নেয়।

হঠাৎ গোল বাধল এইখানেই—আমার দেখা সেই হোটেলে।

কিছুদিন আগে জাহাজে একটা গোলমাল দেখা দিতে দিন কুড়ি ওকে থাকতে হয়েছিল। ছিল ঐ হোটেলেই। ওদের থাকারও কনশেশ্যন, স্ত্রীলোকদের ভাড়াও কম লাগে। এবার বেছে নিয়েছিল চোদ্দ পনেরো বছরের একটি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে, ডেইজী নাম—ফুলের মতো কচি মুখ আর সুন্দর দেখতে বলে একেবারেই ওর যে কদিনের স্থিতি—সেই কদিনের জন্যে আটকে ছিল, মানে সেই রকম ব্যবস্থা করেছিল ম্যানেজারের সঙ্গে (এ ব্যবসার বিশেষ পৃথক ম্যানেজার, গোয়ানিজ একজন)।

সেইটেই কাল হ'ল। রোজই একত্র কাটানো—কতকটা স্বামীস্ত্রীর মতোই হয়ে গিছল ব্যাপারটা। ওর জাহাজ ছাড়ার সময় হতেই মেয়েটা কান্নাকাটি শুরু ক'রে দিল। একটু আধটু মায়াকান্না নয়—সে কেমন তা প্রবাল জানে বৈকি, এক বছরে বিস্তর দেখেছে—আছাড়ি-পিছাড়ি কান্না। পা-টা বুকে জাপটে ধরে রাখে, হাউ হাউ ক'রে কাঁদে, কেঁদে চোখ লাল ক'রে ফেলে।

অনেক বলে-কয়ে—শিগগিরই আসবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রবাল কোনমতে অব্যাহতি পেয়েছিল কিন্তু কদিন পরে জাহাজেই এক কেব্‌ল্ গেল, ডেইজি আর ও ব্যবসা করতে রাজী নয়, কারও সঙ্গে যাচ্ছে না, যত পয়সাই দিতে চাক। তাকে শাসন ক'রে মেরে-ধরেও কোন ফল হয় নি। ম্যানেজার চাবুক পেটা করে পিঠের চামড়া কেটে দিয়েছে, তাতেও তাকে শায়েস্তা করা যায় নি, এখন নাকি

খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে।

তাতেই, স্পেশ্যাল লীভ নিয়ে প্লেনে ফিরেছে এবার। অনেক বুঝিয়েছে, অনেক আদর করেছে—ভাঁব ভোলবার নয়। সে বলে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে বলছি না, আমাকে আর পছন্দ না হয় অন্য মেয়ে নিয়ে থেকো—আমাকে শুধু কাছে থাকতে দাও। আমি তোমার ঝি হয়ে থাকব।

প্রবাল একটু দুর্বল হয়েছে বৈকি। সে ওর গলার আওয়াজেই বুঝলাম।

তবে সে কথা বললুম না, স্বীকার করবে না—পরাজিত হয়েছে একফোঁটা একটা মেয়ের কাছে। তাও সে বেশ্যা ছাড়া আর কিছু নয়—এ-কথাটা স্পষ্ট ক'রে দেখিয়ে দিলে তার জেদই বাড়বে।

বললুম, 'তার পর? কি ঠিক করলে তাহলে?'

'কিছুই ঠিক করতে পারি নি, সেই জন্যেই তো এত চিন্তা। আমার কি মতলব ছিল জানেন? কলকাতার সম্বন্ধে আমার কোন মোহ নেই—বরং আজন্ম বহু তিক্ত স্মৃতিই ঐ শহরের সঙ্গে জড়িত কিন্তু বুড়ো খোদাবক্সের বড় মায়া। দেশভুঁই কবে ত্যাগ করেছে, ওর বাড়িঘর সব জ্ঞাতিরা ভোগ করছে। ও জানে কলকাতাতেই দেশ ওর, আবার বলে, এইখানে তোকে পেয়েছি—এ জায়গা ছেড়ে কোথায় যাবো? তাই আমি ঠিক করেছি, কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট কিনে সেইখানে খোদাবক্সকে রাখব, আর—হাসবেন না শুনে—খোঁজখবর ক'রে একটা আধাবুড়িকে ধরে এনে ওর সঙ্গে নিকে দিয়ে দোব। পয়সা পাবে, আস্তানা পাবে, খেতে পরতে পাবে এমন নিকেতে সবাই রাজী হবে। মানে বুড়ো বয়সে একা থাকবে—একটা দেখাশুনার লোক চাই তো!'

'সে তো খুব ভাল কথা—তার সঙ্গে তোমার বিয়ে—বা নিকেও বলতে পারো, যদি রেজেস্ট্রী না করতে চাও—তার সম্পর্ক কি?'

প্রবাল বললে, 'অনেক দূর এগিয়েছে, অফিসের জোরে একটা সরকারী ফ্ল্যাট যোগাড়ও করেছি, অনেকটা টাকা জমা হয়ে গেছে—কেবল শুধু দলিলটা পাওয়ার ওয়াস্তা। আমার জানা এক অ্যাটর্নীকে সে ভার দিয়েও দিয়েছি। এখন যদি আমি বিয়ে করি, বিয়েই করতে হবে, ওসব ঝি হয়ে থাকব, তুমি অন্য মেয়ে নিও—ও কোন কাজের কথা নয়—মানে তাহলে দুটো এস্টাব্লিশমেণ্ট হয়ে যায়। ওখানে একটা সংসার চালানো—আজকালকার দিনে তো সোজা কথা নয়; তার ওপর আর একটা—এত টাকা পাবো কোথায়? কোনদিন সংসারী হবো তা তো ভাবি নি—দুহাতে টাকা উড়িয়েছি। তা সত্ত্বেও কিছু জমেছিল, তা সবই এই ফ্ল্যাটে চলে যাবে। এখন এত খরচ টানব কি ক'রে?' কেমন যেন বিপন্ন ভাবে প্রশ্ন করে প্রবাল।

'তা এক কাজ করো না, বিয়ে ক'রে খোদাবক্সকে তোমার সংসারে এনে রাখো না। একটা অজানা ধুমসী মেয়েছেলেকে ওর ঘাড়ে চাপালে ও কি সুখী হবে ভাবো? সেই বা বুড়োর সেবা করার জন্যে আসবে কেন, বিয়ে নিকে করে মানুষ

সংসার করার জন্যে। এ বরং—তুমি জাহাজে জাহাজে ঘোর—একটা বাঁধা আস্তানা থাকবে, সেই তো ভাল। একটা কোথাও কোয়ার্টার তো পাবেই বিয়ে করলে, সেখানে ডেইজীকে একা রাখাও তো বিপদ, বরং খোদাবক্স থাকলে সে-ই দেখতে পারবে, ভাত জলও পাবে সে। ওখানের ফ্ল্যাট ভাড়া দাও, খোদাবক্সকে তোমার কাছে এনে রাখো। তাতেই তার বেশী সুখ।'

'বলছেন ? আপনিও বলছেন। মাই গড্। ডেইজীকে সব খুলে বলেছি। আমার মতলব আমার দায়িত্ব—সে ঐ এক কথা বলে, বলে, সে তোমার বাপের কাজ করেছে, আমিই তার সেবা করব—অন্য মেয়েছেলে আনবে কেন ?'

'সে কি ওকে দেখবে ?...আমি বলেছিলুম 'কোন হোম-এ রাখার ব্যবস্থা করি তাহলে—তাতেও তার আপত্তি, বলে, কখনও না। আমি তার সেবা করব—সে আমার বাবার মতো। নিজের বাবাকে তা আমি জানিও না, মা বলে সে নাকি এক খাঁটি সাহেব ছিল—একেই বাবা বলে ভাবব।'

'তা বেশ তো। তাহলে আর ইতস্তত করছ কেন ?'

'কি জানেন, বাঁধা পড়তেই ভয় করছে। ও অবশ্য বলছে এত বাঁধনে ভয় তো বিয়ে করো না। আমি তোমার দাসী হয়েই থাকব, বাড়ির ঝি ভেবো।...তবে তা তো হয় না, ও মুখে যাই বলুক। আজকের দাসী কাল মাথায় চড়ে বসবে।... আর, যদি বিয়েই করি—এক-আধবার অন্তত প্রথম প্রথম সঙ্গে নিয়ে যাবো না ? ...তখন খোদাবক্স কার কাছে থাকবে ?'

'সে কোন সার্ভেণ্ট রেখে যেও। কোয়ার্টার যদি পাও, আপিসের কাউকে রেখে যেতে পারবে।'

'দেখি।'

এর মাসখানেক পরে একখানা চিঠি পেয়েছিলুম (ঠিকানা নিয়ে গিছল সেই-দিনই)। 'ডেইজীকে বিয়েই করেছি, খোদাবক্সকেও আনিয়ে নিয়েছি। কলকাতার ফ্ল্যাট কোল ইণ্ডিয়াকে ভাড়া দিয়েছি, সে টাকা ওর ব্যাঙ্কে জমা হবে। খোদাবক্স খুশী—সে বলে, তুই আমাকে একটা নাতি কি নাতনি দে, তারপর তোরা যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াস, আমি বাচ্ছাকে মানুষ করব।'

এরপর বহুদিন কোন খবর পাই নি। একেবারে গত মাসে একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল প্রবালের সঙ্গে, কলকাতারই রাজপথে।

কিন্তু এ কোন প্রবাল। উসকোখুসকো চুল, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। আগের সে স্বাস্থ্যদীপ্ত বলিষ্ঠতার চিহ্নমাত্র নেই।

উদ্‌ভ্রান্ত সব দিকেই।

'প্রবাল', বলে ডাকতে ফিরে তাকাল কিন্তু বহুক্ষণ তার চোখে পরিচয়ের কোন চিহ্ন ফুটল না। যে আমাকে বহুদিন পরেও সহজে চিনেছিল।

তবে বিস্মৃতি পেরিয়ে যখন পরিচয়ের সূত্রটা মনে পড়ল—তখন হঠাৎ আমার

হাওদ্‌টো স্বরে প্রায় হাউ হাউ ক'রে কেঁদেউঠল।

কী বিপদ। চারিদিকে লোক, সবাই অবাক হয়ে তাকাচ্ছে, তার মধ্যে সেই অকারণ অবাঞ্ছিত প্রশ্ন, 'কি হয়েছে মশাই? কেউ মারা গেছে? য়্যাকসিডেন্ট?' 'নেশা করেছে বুঝি খুব জোর?' একজন শুধু বেশ যেন পরিতৃপ্তির সঙ্গেই বললে, 'পকেটমারা গেছে বুঝি? অনেক টাকা ছিল নিশ্চয়ই? আমার এমনি হয়েছিল যে। মেয়ের বে, বাজারের টাকা নিয়ে ট্রামে চড়েছি—এই কাণ্ড। আমিও এমনি কেঁদে-ছিলুম।'

আমি আর ঐখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা বা সান্ত্বনা দেওয়া, কোন চেষ্টাই করলুম না—কোনমতে তাকে টেনে নিয়ে পাশের একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লুম।

ভেতরে ঢুকে কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে সামলে নিল নিজেকে। চোখ মুছে স্থির হয়ে বসলও, চাও খেল—প্রায় এক নিঃশ্বাসেই সেই অপেয় চায়ের কাপ শেষ করল। কাপ নামিয়ে রেখে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'এই অবস্থায় হুইস্কি কি ব্র্যান্ডি পেলে উপকার হ'ত—কিন্তু সেও উপায় নেই, আমাকে দিয়ে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছে সে-ই।'

সে-টা কে তাও প্রশ্ন করলুম না। আস্তে আস্তে অন্য খুচরো আলাপের মধ্যে দিয়ে আসল প্রশ্নে পেঁছিলুম, 'ব্যাপারটা কি?'

খুলে বলল সবই। বোধহয় বলবার মতো একটা লোকই খুঁজছিল। পরামর্শ নেবার মতো। সাগ্রহেই বলল তার এই উদ্‌ভ্রান্ত অর্ধোন্মত্ত অবস্থার কারণ।

দাম্পত্য কলহ। কিন্তু লঘু-ক্রিয়া হয় নি।

যে দাসী হয়ে থাকতে চেয়েছিল, সে যে এমনভাবে প্রবালকে পদানত করবে তা কখনও কল্পনাও করে নি ও। স্ত্রীজাতিতেই তার ঘৃণা হয়ে গিয়েছিল—মা ও বাবার কাণ্ডর পর। বিশেষ ক'রে পদানত করল কিনা এক বার-কাম-ক্যাবারের-বারাঙ্গনা।

বিয়ের পর খোদাবক্সকে এনে রেখেছিল কাছে। ঠিক নিজের বাবার মতই তাকে সম্মান আর যত্ন করত ডেইজী। মানে সাধারণত মেয়েরা তার বাবাকে যেমন যত্ন করে। এ অভিজ্ঞতা অবশ্য ডেইজীর নেই—এ ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্ত। ওর এক কথা—'এই লোকটি তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, মানুষ করেছিল বলে তো তোমাকে পেলাম।'

সেই সঙ্গে প্রবালেরও যে সেবা-যত্ন করত তা প্রবালের কাছে কল্পনাতীত। ও অবাক হয়ে ভাবত মনে মনে—এসব কোথা থেকে শিখল ও। এত নিপুণ সেবা। গৃহস্থ-জীবনের অভিজ্ঞতা তো ওরও নেই।...এই সব নানা কারণে ডেইজীর প্রতি আসক্তিটা তার প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছিল। যে জন্ম-বাউণ্ডুলে, তার এখন সারাদিনের ভাবনা দাঁড়িয়েছিল কতক্ষণে বাড়ি ফিরবে।

এর মধ্যে দু'একটা ছোটখাটো ট্রিপ দিতে হয়েছিল ওকে, সঙ্গে ডেইজীকে নিয়ে গিয়েছিল। ভাল একটি দক্ষিণী-মুসলমান বাবুর্চি পেয়েছিল—সে দেখত খোদাবক্সকে, বাড়িও পাহারা দিত।

কিন্তু এই মাসকতক আগে হঠাৎ খোদাবক্সের একটা ছোটখাটো সেরিব্রাল স্ট্রোক হ'ল—ডাক্তারী ভাষায় 'লীকেজ'। একদিকের হাত পা পড়ে গেল। অসাড় ঠিক না হলেও অনড় হ'ল।

চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি। প্রথম হাসপাতালে, তারপর তাঁরা যখন ছেড়ে দিলেন তখন বাড়িতে। ওষুধপত্রের চেয়েও সেবাটা বেশী দরকার, এটাও জানিয়ে দিলেন ডাক্তাররা। একটি য়্যাটেণ্ডেন্টের ব্যবস্থা করেছিল প্রবাল। একটি ফিজিওথেরাপিস্ট। কিন্তু আসল চিকিৎসার ভার বলতে গেলে ডেইজীই হাতে তুলে নিল। এমন যত্ন, এমন অক্লান্ত সেবা বোধহয় কেউ কখনও দেখে নি। খোদাবক্স বলত, 'আল্লা আমার ওপর মেহেরবাণী ক'রে তাঁর এক ফেরিস্তা পাঠিয়েছেন মা। তোকে পেয়ে আমার জন্ম সার্থক হ'ল।'

এই সময় একটা লম্বা পাড়িতে যাবার হুকুম এল প্রবালের ওপর। এখান থেকে অস্ট্রেলিয়া, সেখান থেকে জাপান, আবার ফেরা। মাস দুইয়ের ফের।

প্রবাল বলল, 'এবার তুমি সঙ্গে চলো, এতদিন তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। মুবারক রইল, য়্যাটেণ্ডেণ্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত করছি সে দিনরাতই থাকবে, ডাক্তারকে বলছি রোজ দেখে যাবে, সে ফী তাকে আগাম দিয়েছি—তোমার বা'জানের কোন অসুবিধে হবে না।'

ডেইজী মুবারকের কাছে শব্দটা শিখেছিল, বাপজান—তা থেকে বা'জান।

সে বেঁকে দাঁড়াল, 'তা কখনও হয়। বা'জান ছেলেমানুষের মতো হয়ে গেছে —আমি না খাইয়ে দিলে খেতে চায় না। আর কটা দিনই বা বাঁচবে। এবারটা তুমি একাই যাও।'

প্রবাল বলল, 'না, এতদিন আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। বাবাকে আমি বুঝিয়ে বলে যাবো, ও তোমাকে ভালবাসে, তোমার সুখ দুঃখ ও বেশী বোঝে।'

ডেইজী কিছুতেই রাজী হ'ল না। প্রবালেরও রোখ চড়ে গেল। সে রাগ ক'রে —কতকটা ডেইজীকে জব্দ করার জন্যেই ঐ হোটেল থেকেই আর একটা কুড়ি একুশ বছরের মেয়েকে নিয়ে গেল সঙ্গে—খাতায় স্ত্রী লিখিয়ে। আর যাবার আগে সেটাও ডেইজীকে জানিয়ে গেল।

মজা হচ্ছে এই—রাগের মাথায় যা-ই করুক, প্রবাল একদিনও ঐ মেয়েটাকে স্পর্শ করে নি, করতে পারে নি। তবে সে কথাটা ডেইজীর জানার কথা নয়। সে প্রচণ্ড আঘাত পেল।

খোদাবক্সকে কেউ এ কথা জানায় নি। ডেইজীর মুখের অপরিসীম শুষ্কতা আর কালিমা দেখে আগে সে মনে করেছিল এটা বিরহ। সস্নেহ মৃদু তিরস্কার করত, 'কী করলি পাগলি। কেন আমার জন্যে এই কষ্টটা করতে গেলি। আমি বেশ থাকতুম।'

তবে সে অনেক দেখেছে জীবনে, অভিজ্ঞতা ঢের। ক্রমশ বুঝল এই যে প্রভাতের

প্রস্ফুট শতদলটি এমন ভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে, পূর্ণযৌবনা মেয়েটি এত শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—এ শুধু বিরহে হয় না। সে মুবারককে একদিন নিরিবিলি কাছে ডেকে জেরা ক'রে জানল ইতিহাসটা, এবং এও জানল যে এ কদিনে ডেইজী বলতে গেলে কিছুই খায় নি।

সব শুনে চুপ ক'রে রইল খোদাবক্স। নিজের বেঁচে থাকাটা আগে এত বিড়ম্বনা বোধ হয় নি, যেমন আজ হ'ল। দুচোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ডেইজী খাবার নিয়ে এসে চমকে উঠল, 'কী হয়েছে বা'জান? কষ্ট হচ্ছে? ডাক্তার ডাকব?'

সবল হাতটাতে ওর হাত চেপে ধরল খোদাবক্স। বলল, 'মা, তুই কি পাগল হলি। অনেক দেখেছি, ছোটবেলা থেকে দেখেছি। ছেলেটা আর যাই হোক বেইমান নয়। তোর যে ভালবাসা পেয়েছে তার অপমান করবে না। যাকেই নিয়ে যাক, তার মন তোর কাছেই পড়ে আছে জানবি।'

চোখে জল এসে গিছল বৈকি ডেইজীরও, তবু সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা হয়েছে, এখন খেয়ে নাও দিকি?'

'না। তুমি তোমার খাবার নিয়ে এসে আমার সামনে খাবে—তবে আমি দানা মুখে তুলব। নইলে এই আল্লার কিরে বলছি, এক ঢোক জল পর্যন্ত খাব না।'

অগত্যা খাওয়া শুরু করতে হয়েছিল।

তবে শোধ তুলল ডেইজী—ওর জাহাজ ডকে ফিরতে। ততদিনে খোদাবক্স অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। দায়িত্ব ছিল না। সে নিঃশব্দে এক বস্ত্রে কোথায় চলে গেল—কিছুতেই কোন খবর পাওয়া গেল না।

আর, তার ফলস্বরূপ—খোদাবক্স, প্রবাল বাড়ি ফেরার পর কোনমতে দেওয়াল ধরে ধরে গিয়ে দোতলার খোলা বারান্দা থেকে নিচে ঝাঁপ দিল। তারপরও দুদিন বেঁচে ছিল, মরার আগে একবার জ্ঞানও হয়েছিল, প্রবালের ঝুঁকে পড়া মুখের দিকে চেয়ে শুধু বলেছিল, 'কী করলি খোকা, কী করলি। খোদার দেওয়া এই অমূল্য জিনিস হেলায় হারালি।'

তারপরই আবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। মিনিট দশেক পরেই শেষ হয়ে গেল তার এ জন্মের যন্ত্রণা।

সেই থেকেই এমান উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরছে প্রবাল, এক লোকালয় থেকে আর এক লোকালয়ে। বিশেষ করে ক্যাথলিক গির্জেগুলোয়। চাকরি আছে কি না আছে তা জানে না, বাড়িতে কি হচ্ছে তাও না।

ওর যে খুঁজে বার করতেই হবে ডেইজীকে। তাকে যে জানানো দরকার ও তার সঙ্গে বেইমানী করে নি। স্পর্শও করে নি সে অন্য মেয়েটাকে।

'তার মানে ?' কেশববাবু কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছেন, এই দুটি শব্দই অনেক কষ্টে বেরোল মুখ দিয়ে।

কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি।

অনেকক্ষণ থেকেই বুঝতে পারছেন না। যখন দুটো লরি এসে দাঁড়াল তখন থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর বিহ্বলতা।

লরি কেন ? তাও দুটো। কি যাবে এত ? কে যাবে ?

মনে হতে পারত যে এ আশপাশের কোন বাড়ির ব্যাপার, কোন ভাড়াটে উঠে যাচ্ছে, ঘর-গেরস্তালি গুটিয়ে। কিন্তু এ দুটো তো ওঁদের বাড়ির সামনেই এসে দাঁড়িয়েছে।

তাছাড়া ওঁর বাড়িতে ভাড়াটে বলতে অদ্বিতীয় প্রয়াগবাবু, একা মানুষ, তিন-তলার চিলেকুঠরিতে একা থাকেন, কোনমতে নিজেই ভাত ফুটিয়ে খান। সামান্য চাকরি করেন, এখনকার দিনে আর একটা এই চিলেকুঠুরিও ভাড়া নিয়ে উঠে যাওয়ার সামর্থ্য তাঁর নেই।

আর—আর, ছেলে পাঁচুই যে নামল ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে। সঙ্গে দুটো মুটে।

কারিৎকর্মা লোক তারা মনে হ'ল। এসেই টপাটপ খাট খুলতে লেগে গেছে, সঙ্গে দড়ি—গদি আলাদা যাবে, কিন্তু বাকি বিছানা বেঁধে নেওয়া হবে বোধ হয়।

নতুন, ওদের বিয়েরই খাট গদি বিছানা।

ইতিমধ্যে ছেলে পাঁচুও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পাখাটা নামাবার উদ্যোগ করছে।

আসবাব অনেক। পুরনো যা ছিল তা তো যাবেই, এগুলোও যাবে—হয়ত সেইজন্যেই দুখানা লরি।

এও মূর্খতা—সেই বিহ্বলতার মধ্যেই মনে হয় ওঁর, দু-এক টাকা বেশি দিলে ওরা সব মালই সাপটে নিতে পারত। একটা লরিই।

'তার মানে ?' আবারও প্রশ্ন করেন কেশববাবু, 'এ-এসব হচ্ছে কি ? মাল যাচ্ছে কোথায় ?'

পাখা খোলার পরিশ্রমেই কেশববাবুর আদরের ছেলে ঘেমে উঠেছিল, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বেশ প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, 'যাচ্ছে আমার বাড়ি। আমি আজই শিফ্‌ট্‌ করছি যে।'

'তোর বাড়ি ? সে আবার কোথায় ?' বিহ্বলতা বেড়েই যায়।

'বাঃ, যে বাড়ি তুমি দাঁড়িয়ে থেকে করালে, মোজাইক বসালে, বাথরুমে মার্বেল। এই তো সেদিন গৃহপ্রবেশ করালে—এরি মধ্যে ভুলে গেলে!'

'হারামজাদা!' এবার বোমার মতো ফেটে পড়েন কেশববাবু, 'তোর বাড়ি! আমি বেঁচে থাকতে তোর বাড়ি কিসের! হ্যাঁ, ও বাড়ি তো আমি ভাড়া দোব—

সেদিনই বলেছি। ভাড়াটে ঠিক হয়ে গেছে, হাজার টাকা ভাড়া, আমি কথা দিয়েছি —কেবল সেলামীটা নিয়ে ওরা কচলাকচলি করছে। আমি কুড়ি চেয়েছি ওরা পনেরোয় নামাতে চাইছে! তুই সেখানে যাবি কি! য়্যাঁ! তোর আস্পদ্দা তো কম নয়!'

'পরের বাড়িতে ভাড়াটে বসাতে যাওয়াটা তো তোমারই আস্পদ্দার কথা। তুমি ভুলে যাচ্ছ জমি আমার নামে কেনা, বড় মামা টাকাটা দিয়েছেন, চেক দিয়েছিলেন, ভাঙ্গিয়ে টাকা দিয়েছ—এ সবাই জানে। তুমিই বলে বেড়িয়েছ। বাড়ি করার টাকাও কিছু মামা দিয়েছেন, কিছু আমার দিদিমার দেওয়া টাকা থেকে। তোমার বাড়ি কিসের?'

'আ মল যা! তোব মামা টাকা দেবে! বলে তারই টিকে ধরাতে জামিন লাগে সে দেবে এগারো হাজার টাকা! আমি নগদ টাকা তাকে দিয়ে চেক লিখিয়ে নিয়েছি —যাতে না ইনকামট্যাক্সের রাক্ষসগুলো গলায় জোল দেয়। দিদিমার টাকা আমিই বলে বেড়িয়েছি—সে কোথায় টাকা পাবে। বলে আমার কাছ থেকে কটা টাকা নিয়ে তবে কাশী গেছল জন্মের মধ্যে কম্ম!'

'বেশ তো—এসব কথা আদালতে গিয়ে বলো। তাদের কাছেই হিসেব দাখিল করো। আপাতত আমার বকবার সময় নেই, লরির লোকরা খ্যাচ্‌খ্যাচ্‌ করছে!'

মিনিট কতকের মধ্যেই বলতে গেলে, আধ ঘণ্টাও নয়—সব মাল নিয়ে পাঁচু চলে গেল। কোনমতে দূর থেকে একটা পেন্নাম সেরে। মা লরির শব্দ শুনেই ঘরে ঢুকে মাথা খুঁড়ছেন। তিনি জানতেন দোষটা স্বামীরও। তা জানেন কিন্তু বলবার উপায় নেই। তাঁর কান্না ছাড়া পথ কি! পাঁচু তাঁকে আর অযথা বিরক্ত করল না। স্ত্রীকে কালই শ্বশুরবাড়ি রেখে এসেছিল—এই কুৎসিত দৃশ্যের অবতারণা হবে বুঝেই।

কেশববাবু ছেলের শেষ কথাটার পরই ধপ ক'রে বসে পড়েছিলেন। তেমনি স্থাণুর মতোই বসে রইলেন। অসহায় দৃষ্টি মেলে বসে বসে দেখলেন তাঁর এক-মাত্র ছেলে—শিক্ষিত, বড় চাকুরে, উপযুক্ত ছেলে—তাঁকে চরম অপমান, মায় ব্ল্যাক-মেল ক'রে—কেমন প্রশান্ত মুখে বেরিয়ে গেল, পৃথক হয়ে বাপের সঙ্গে বাপেরই বুকের রক্ত জলকরা টাকায় তৈরি করা নতুন বাড়িতে।

এই আঘাতের মধ্যেই তাঁর যেন একবার মনে হ'ল তাঁরই উপযুক্ত ছেলে। একটু কেমন—এত জ্বালার মধ্যেও—একটু গর্বও বোধ হ'ল।

আর কিছু বলতে পারলেন না—চেঁচামেচি দাপাদাপি করতে পারলেন না— তার দুটো কারণ।

প্রথম হ'ল, চেঁচামেচি গালিগালাজ করলে দু'পাশের বাড়ি থেকে লোক ছুটে আসবে। জানাজানির কিছু বাকি থাকবে না। জানাজানি মানে, চলে যাওয়াটা

কিছু নতুন জিনিস নয়, এ তো হামেশাই ঘটছে—বিয়ের পর বাপ-মায়ের সঙ্গে ভেন্ন হওয়া—তা নয়, তাঁরা এলেই ছেলে আরও গলা বাড়াবে, বাড়ি কি সূত্রে তার —বাবার নয়—জোর প্রচার করবে। কেশববাবু প্রতিবাদে একটা কথাও বলতে পারবেন না। এসব কথা জানাজানি হলে শুধু যে প্রতিবেশীরা উৎফুল্ল এবং নিন্দায় মুখর হয়ে উঠবেন তাই নয়—শ্রাদ্ধ আরও অনেক দূর গড়াবে। সে কথা জেনেই ছেলে এত নিশ্চিন্ত। এ যদি ব্ল্যাকমেল না হয় তো ব্ল্যাকমেল কাকে বলে কেশববাবু তা জানেন না।

দ্বিতীয়ত—ইদানীং এই একটা উপসর্গ হয়েছে। রক্তের চাপ বৃদ্ধি। ডাক্তাররা বলে অতিরিক্ত পরিশ্রমেই এটা হয়। বিশ্রামের অভাব ও অনিয়মিত জীবনযাত্রা। সময়ে খাওয়া ও প্রয়োজনমতো বিশ্রাম চাই। ডাক্তারদের আর কি, অত আরাম করতে গেলে রোজগার হয় না! বড় বড় বিলিতি বা এদিশি ব্যবসাদাররা ক'ঘণ্টা ঘুমোয় তা শুনি? তারা কি মরে যাচ্ছে পটাপট!—(মনে মনে বলেন।)

সে সম্ভব নয়। তার ফল হয়েছে এই, একটু উত্তেজনাতেই চড়াক ক'রে রক্ত মাথায় উঠে যায় হয়ত—অসহ্য মাথার যন্ত্রণা হতে থাকে। আর সেই সঙ্গে বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা। পরিশ্রমে এটা হয় না। হয় একটু রেগে গেলে। উনি যে কাজ করেন বা ব্যবসা—তাতে এটাও অনিবার্য।

অদৃষ্টের পরিহাস! তাই বটে। কিন্তু কেবল তাঁকেই কেন বার বার এ পরিহাস সহ্য করতে হয়?

মার্চেণ্ট অফিসে কাজ করতেন বটে, তবে ভাল মার্কিন কোম্পানিতে থাকলে অনেক উন্নতি হ'ত। একটা পেনসনও পেতেন। কিন্তু হঠাৎ এমন শরীর খারাপ হ'ল—নানারকম উপসর্গ, ডাক্তার বললেন, 'আপনি বিশ্রাম নিন, নইলে ভোগান্তি, চিকিৎসা খরচ তো আছেই—বাঁচবেনও না বেশীদিন।'

নিলেন অবসর। অন্য সব পাওনা ছাড়া দয়া ক'রে আপিস আগে অবসর নেওয়ার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ত্রিশ হাজার টাকা দিলেন। ওঁরা পুরনো বা বেশী মাইনের লোক কমাতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই জন্যেই এই লোভ দেখানো।

কেশববাবু সব টাকাটাই এনে কিছু ভাল শেয়ারে, কিছু 'এফ-ডি'তে আমানত করলেন। তার যা আয় তাতে কোনমতে সংসারটা চলবে। তবে যে রকম হু হু করে নিত্য বাজার-দর বাড়ছে—তাতে এ আয়ে বেশীদিন চলবে কি না সন্দেহ। তবে এ থেকে কিছু ভেঙ্গে কোন ব্যবসায় নামতে সাহস হ'ল না। থাকার মধ্যে আছে তো এই এক পুরনো ভাঙ্গা বাড়ি, শেষ পর্যন্ত সেও কি বেচে খেতে হবে!

তবে, আশ্চর্য এই, চাকরি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন, শরীর ভাল হয়ে গেল। দেহে যথেষ্ট শক্তি, অখণ্ড অবসর। কিছু একটা করার জন্যে, যাতে অতিরিক্ত কিছু আয় হয়, মনটা ছটফট করতে লাগল। এমন কিছু ব্যবসা করা যায় না—যাতে ঘর থেকে কিছু বার না ক'রে ঘরে আনা যায় দু'পয়সা?

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল ওঁর এক চন্দ্র-খুড়োর কথা, তিনি প্রত্যহ আলিপুর আদালতে ঘুরে আইন উকিল মুহুরিতে ঘুণ হয়ে গিয়েছিলেন, মামলার তদ্বির-কারক হিসেবে 'পরোপকার' ক'রে শুধু সংসারটাই চালান নি, দু'খানা বাড়িও করেছিলেন।

কেশববাবুও তাই করবেন নাকি ?

ভাবছেন আদালতেই যাবেন নাকি রোজ, দশটায় ভাত খেয়ে আপিস যাবার মতো ?

এমন সময় এই সুযোগটা একেবারে নিজে থেকে এসে গেল।

ওঁর সম্পর্কে এক শালা চিঠি লিখলেন, 'আমার মেয়ের বিয়ে, আমি এই পাড়া-গাঁয়ে পড়ে থাকি, কলকাতার হালচাল কিছুই জানি না। পাত্র পক্ষ এখানে আসতে রাজী নন, তা ছাড়া সেও অনেক খরচা, হাঙ্গামাও ঢের। তুমি যদি একটু ব্যবস্থা না করো তো কন্যাদায় উদ্ধার হবে না। খরচপত্র যা হবে সব আমি দেব—ভয় নেই, দেব বলে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে সরে পড়ব না। আগাম সব টাকা তোমার হাতে ধরে দেব।'

কেশববাবুর মনে হ'ল এ ঈশ্বরেরই নির্দেশ, তাঁর আশীর্বাদ। তখনই তাদের আসবার জন্যে টেলিগ্রাম করলেন, সে বাড়ির আপন কজনকে নিজেদের প্রায় ভাঙ্গা ঘরেই তুললেন, দু'চারজন যারা অতিরিক্ত তাদের এ বাড়ি ও বাড়ি লড়াইয়ের সময় যাকে 'বিলেটিং' করা বলে সেই ভাবে রাখলেন। স্ত্রী রাগ করছিলেন, তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, 'এই কদিনের ঘরোয়া যজ্ঞির জন্যে একটা ঠাকুর আর একটা যোগাড়ে ঠিক করেছি, তোমাকে কুটি ভেঙ্গে দুটি করতে হবে না—মাঝখান থেকে আমাদের খাই-খরচটাও বেঁচে যাবে।'

'বে'র যৌতুক করতে হবে না ?' ব্যঙ্গের সুরে গৃহিণী বলেন।

'সে এমনিও করতে হ'ত। এ তো সুবিধে, সবই আমাদের হাতের কাছে—ওদেরই বাজারের টাকা থেকে কিম্বা যে সব শাড়ি আসবে প্রেজেণ্টেশন তাই থেকেই একখানা সরিয়ে—কনে যাবার সময় হাতে ক'রে দিয়ে দেবে।'

তারপর, যাকে বলে অসাধ্য সাধন করা—তাই করলেন কেশববাবু।

বিয়ের জন্যে একদিনের মতো একটা বাড়ি ভাড়া করতে হ'ল বটে কিন্তু কেটারার তিনি রাখতে দিলেন না। নিজে বাজার ক'রে, ঠাকুর ঠিক ক'রে, রান্না মিষ্টির ভিয়েন সব ওখানেই করালেন। এ দিককার বাজারহাট সব ক'রে দিলেন, মেয়ের বাবা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে সিনেমা দেখে বেড়াল। অবশ্য তিনি এসেই আট হাজার টাকা ক্যাশ ওঁর হাতে ধরে দিয়েছিলেন, বরপণের টাকা ও গহনা বরাভরণ ছাড়াই।

হিসেব দেবার কোন প্রশ্ন তোলেন নি কন্যাকর্তা, কিন্তু কেশববাবু যখন একটা মোটামুটি হিসেব খাড়া ক'রে উদ্বৃত্ত বলে তিনশো দশ টাকা কন্যাকর্তার হাতে ফেরৎ দিলেন তখন তিনি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হবেন এ স্বাভাবিক। তিনি যেন ধন্যবাদ

দেবার ভাষা খুঁজে পান না—এই অবস্থা।

সবাই চলে গেলে তিনি তাঁর আসল হিসেব ক'রে দেখলেন তাঁর হাতে অন্তত সাতশো পঞ্চাশ টাকা থাকার কথা। তার থেকেও টাকা পনেরো বেশি আছে।

এ-ই তাঁর ব্যবসার শুরু।

'গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটে গেল ক্রমে'—প্রথম আত্মীয়স্বজন, তারপর বন্ধু-বান্ধব, শেষ পর্যন্ত মক্কেলের সংখ্যার পরিধিটা বিস্মৃত হতে হতে পরিচিত, রবাহূত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। মক্কেল বলা ভুল, সাহায্যপ্রার্থী বলাই উচিত।

ব্যবসা—তবে তা কেউই বলবে না, পরোপকার বলেই গণ্য হবে এই তো স্বাভাবিক।

ওঁর এই সাফল্যের কারণ মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সহজাত জ্ঞান। যে যত টাকাই দিক, নিজের জন্যে কিছু রেখেও—উদ্বৃত্ত বলে ফেরৎ দেওয়া। সে অঙ্ক যত নগণ্যই হোক—এটা কি তাঁর সততা ও মহত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়। কে এমন ভূতের ব্যাগার খাটে ভূতের মতোই—পরের জন্যে।

এ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া নিরাপদ নয়, তাঁর সে মতলবও ছিল না। তাঁর আশা ছিল উচ্চ—ওঁর পক্ষে গগনস্পর্শী।

তিনি তাঁর একমাত্র ছেলে—পাঁচুঠাকুরের দোর ধরা পঞ্চাননের জন্যে একটি নূতন বাড়ি ক'রে দিয়ে যাবেন মৃত্যুর আগে—এ সংকল্প তাঁর বহুদিনের। শুধু একমাত্র ছেলে বলেই নয়—ছেলের মতো ছেলে। লেখাপড়ায় ভাল। সভ্য, ভদ্র, নেশাভাঙ করে না, এ যুগে এমন ছেলে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। তার উপযুক্ত বাড়িই ক'রে যাবেন তিনি—যাতে মৃত্যুর পরও ছেলে তাঁকে স্মরণ করে, কৃতজ্ঞ থাকে।

এ শখ বা ইচ্ছা, তাঁকে নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। জমি কেনা হয়ে যেতে নেশা আরও উগ্র হয়ে উঠল। অনেক টাকা চাই তাঁর। অনেক, অনেক টাকা।

সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। ওপরে নিচে চারখানা ঘর, ডাইনিং রুম, তার নিচে একটা বৈঠকখানার মতো, দু সেট বাথরুম পায়খানা, দুটো রান্নাঘর, তেতলায় ঠাকুরঘর। এক লাখ টাকাতেও কুলোবে না মনে হচ্ছে।

পরিশ্রম বাড়িয়ে দিলেন, যতটা পারেন টাকা বাঁচাতে। সেই তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল। ফলে খাদ্যবস্তুর মাল খারাপ হতে লাগল, পরিমাণ কম, খেতে বসে সবাই সব জিনিস যাতে না পায়—কিছু লোককে ফ্লাই দেওয়া হ'ল, তারা আর মাছটা পেল না, একেবারেই মাংস পড়ল পাতে। কোনটা ধরা পড়লে দোষ চাপাবার জন্যে পরিবেশকরা তো আছেই, যাকে বলে 'স্কেপ-গোট'। সেই কারণেই তিনি যাদের কাজ তাদের কাউকে পরিবেশন করতে দিতেন না—বলতেন, 'অ্যামেচারের কম্ম নয়। জিনিস নষ্ট করে, লোকে খেতে পায় না।'

খুঁজে সবচেয়ে সস্তা তেল কিনতেন, কম দামের বনস্পতি। অন্য সব জিনিসই অপকৃষ্ট। যারা কেটারার রাখার জন্যে জেদ করত তাদের জন্যেও একটা ব্যবস্থা রেখেছিলেন। সোজাসুজি পঁচিশ পার্সেন্ট হিসেবে। ফলে আহার্যের মান বজায়

দেওয়া তাদের পক্ষেও সম্ভব হ'ত না। কর্মকর্তা অনুযোগ করলে বলতেন, 'ঐ তো ভায়া, ঐ জন্যেই তো আমি কেটারার রাখতে চাই না। তোমরাই বললে—এখন তোমরাই বুঝে দ্যাখো।'

চরম ঘটনাটা ঘটল পাঁচুর বিয়েতে।

একমাত্র ছেলে, ঘটা ক'রেই বিয়ে দেবেন বৈকি।

সেই অজুহাত দেখিয়েই কন্যাপক্ষের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা নগদ নিলেন, ছেলে দিল সাত হাজার।

আলোর ব্যবস্থা হ'ল, সানাইও এল—কিন্তু আসল যেটা, গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এবং বৌভাতের খাওয়া—সেটা যে এই স্তরে নামিয়ে আনবেন ওর বাবা, পাঁচু স্বপ্নেও ভাবে নি।

নিজেদের আত্মীয় মহলেই, ফিশফাশ নয়, শ্রুতিগম্য ভাবেই ধিক্কারের ঝড় উঠল, এক্ষেত্রে কুটুমবাড়িতে যাবা দশ হাজার নগদ, উনিশ ভরি সোনা এবং যাবতীয় ফার্নিচার দিয়েছে—তাদের বাড়ি কি পরিমাণ নিন্দা এবং মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন-সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ হতে থাকবে, তা অনুমান ক'রে নিতে বুদ্ধিমান ছেলে পাঁচুর অসুবিধা হ'ল না।

সে বাবাকে বললে, 'এ কী করলে বাবা। আমার বিয়ে থেকেও এত টাকা না মারলে তোমার চলছিল না। ছিঃ, তুমি কি মানুষ। এমন চামার চশমখোর হয়ে গেছ তুমি!'

বাবা লজ্জিত হলেন না, দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'বটে। ওধারে যে এখনও মোজাইকের টালি, ওপরের বাথরুমের জন্যে মার্বেল পাথর কেনা হয় নি, সে হুঁশ আছে। অত চক্ষুলজ্জা করতে গেলে ইদিক হয় না। এ দুদিনের নিন্দে দুদিনে ভুলে যাবে। মেয়েটা যদি ভাল ব্যাভার পায়, তুই তাকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করলে—এসব কথা আর উঠবে না। যা না, তোদের আপিসে তো টাকা দেবে—বৌকে নিয়ে হনিমুন ক'রে আয় না। তোর যা আছে তা নে, আমি বরং বাড়তি, পাঁচশো টাকা দিচ্ছি, কাশী কি পুরী কি দার্জিলিং ঘুরে আয়।'

ছেলে অনেকক্ষণ শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এ লোককে আর কিছু বলতে যাওয়া কথার বাজে খরচ।'

সে কাশ্মীরে গেল হনিমুন করতে, বাবার কাছ থেকে টাকাটাও অম্লান বদনে হাত পেতে নিল। তার পর নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল ও বাড়ির কাজ শেষ হবার।

বাড়িও শেষ হ'ল, গৃহপ্রবেশ হ'ল। তারপর আর অপেক্ষা করে নি। ভাড়া দেবার কথা শুনেছে সে। ভাড়া এসে গেলে হাতের বাইরে চলে যাবে। স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে, এই সব ব্যবস্থা প্রায় নিঃশব্দে সেরেছে। বলতে গেলে চোখ না মেলতে মেলতে কেশববাবুর বাড়ি, ও বলতে গেলে তাঁর জীবন, খালি ক'রে দিয়ে চলে গেল।

বুকের সেই ব্যথার ভাবটা আজ যেন কমতে দেরি হচ্ছে। এই চিন্তাটার জন্যেই কি।

কিছুই যে বলতে পারলেন না ছেলেকে। এতই অবাক হয়ে গিছলেন যে তাঁর সদাজাগ্রত উপস্থিত বুদ্ধিও যেন বিকল হয়ে গেল।

অনায়াসে বুঝিয়ে বলা চলত, 'বাড়ি তোরই, তুইই থাকবি, খরচাটা বেশি হয়ে যেতে কিছু দেনা হয়েছে সেই জন্যেই এই ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা, তিন বছরের কনট্রাকট এগ্রিমেন্ট, দস্তুরমতো লেখাপড়া রেজিস্ট্রি হবে—সব ঠিকঠাক, ভাড়াটে ওঠাতে মামলা করতে হবে না।—কী টাকাই বা নিয়েছি এমন, পাঁচ ছ' হাজারের বেশি হবে না। তার পরেও টাকা তোলবার জন্যে এই চার মাস কি খাটুনিটা খাটতে হ'ল, চোখেই তো দেখলি। রোজ একটা ক'রে যজ্ঞি ঠেলেছি। কত আর ওঠে বল, বেশির ভাগই চারশো পাঁচশো—হাজার হ'ল তো ভাগ্যি। ওধারে বাড়ির হাঁ যে রাক্ষুসে হাঁ। সব বুঝে আমাকে মাপ কর, না হয় বল আমি বেয়াইয়ের কাছে গিয়ে মাপ চেয়ে আসি।'

এসব কিছুই বলা হ'ল না। ছেলে—তাঁরই ছেলে—আদালত দেখিয়ে চলে গেল বাড়ি খালি ক'রে।

অনেকক্ষণ পরে বুকের সে ব্যথাটা কমতে আস্তে আস্তে নিজেদের ঘরের দিকে গেলেন। ততক্ষণে স্ত্রীও দোর খুলে দিয়েছেন ঘরের—তবে বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি, উপুড় হয়ে পড়ে এখনও চোখের জল ফেলছেন।

এ দৃশ্যে মমতা নয় আগুন জ্বলে উঠল মাথায় আবারও।

খিঁচিয়ে উঠে বললেন, 'নাও, ঢের হয়েছে। উঠে পড়ো। মায়াকান্না দেখাচ্ছ কাকে। তুমি কি আর জানতে না। তোমাকে না জানিয়ে ঐ বেটার ছেলে পেঁচো কিছু এ বুদ্ধি করে নি। জেনেশুনে ন্যাকা সাজছ কেন। চলে গেলেই পারতে। আমি ওপরের পেরাগবাবুর সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে কুকারের ভাত দুটো খেয়ে থাকতুম।'

স্ত্রী ধড়মড় ক'রে উঠে বললেন, 'বেশ, তাই যাব। বৌমা আমার হাত ধরে বলেছে, "ও এই কান্ড করছে আমার একটুও ভাল লাগছে না মা। আমি কখনও কিছু করি নি—একা কেমন ক'রে থাকব!" তোমার মুখ চেয়েই যেতে পারি নি। তুমি অনুমতি দিলেই চলে যাবো। তুমি তোমার ঐ চোরের ব্যবসা নিয়ে সুখে থাকো।'

'যাও, যাও। এখুনি যাও। নিকাল যাও। গয়নাগাঁটি কাপড় জামা নিয়ে সোজা চলে যাও। এ বাড়ি আমি বেচে দোব। দিতেই হবে, নইলে এখনও বিশ-বাইশ হাজার দেনা শোধ হবে কিসে। ভাবছিলুম দেনা চুকিয়ে কাশীতে গিয়ে বুড়ো-বুড়ী থাকব। তা ভালই হ'ল নিজের মতো আমি যেদিকে প্রাণ চায় চলে যাব।'

বলতে বলতে কিন্তু অকস্মাৎ চোখে জল এসে গেল কেশববাবুর। ধপ ক'রে স্ত্রীর পাশে বসে পড়ে বললেন, 'না না, এ আমি কি বলছি—আর মাথা গরম করব না। বরং তুমি এক কাজ করো। আপাতক্ তোমার গহনা বন্ধক রেখে হাজার

পাঁচেক টাকা নিয়ে আসি। তুমি বৌমার বাবাকে দিয়ে আমার হয়ে মাপ চেয়ে এসো। তাতেও কি পাঁচু আমাকে মাপ করবে না?'

সে চোখের জলে গৃহিণীও নরম এবং অনুতপ্ত হলেন। স্বামীর হাত ধরে বললেন, 'কী পাগলের মতো বকছ যা তা, কিচ্ছু করতে হবে না। তোমার চোখে জল এসেছে জানলে পাঁচু নরম হবে। আমি বুঝিয়ে বলব এখন। ও বাড়ি ভাড়া দিতে হবে না, আমরা ঐ বাড়িতে চলে যাই। এত কষ্ট করলে—দুদিন নিজে ভোগ করো। বরং এ বাড়ি ভাড়া দাও, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে দেনা শোধ করো। ছেলে তোমাকে ভালবাসে—মুখে যাই বলুক। তোমাকে সুদের টাকার পরোয়া করতে হবে না।'

'বলছ? বলছ? ঐ বাড়িতে চলে যাবো? পাঁচু থাকতে দেবে?'

'নিশ্চয়ই দেবে। তুমি বসো আমি একটু চা ক'রে আনি তোমার জন্যে। একটু সুস্থ হও, মাথা ঠাণ্ডা করো।'

সেদিনটা শান্তিতেই কাটল। শান্ত হয়েছেন কেশববাবু, খাওয়া-দাওয়া ক'রে দিবানিদ্রা দিতেও রাজি হয়েছেন। কথা হয়েছে পরের দিন সকালে স্ত্রী একাই যাবেন প্রয়াগবাবুকে সঙ্গে নিয়ে নতুন বাড়িতে। প্রয়াগবাবুর কাজ নেই সেদিন, কোন অসুবিধে হবে না।

সেই মতো রাত্রেও খাওয়া-দাওয়া ক'রে শুয়েছেন।

স্ত্রী ভোরেই উঠেছেন পরের দিন, ঘরের কাজকর্ম সেরে সকাল সকাল বেরোতে হবে, কেশববাবুকে চা জলখাবার দিয়ে। প্রয়াগবাবুকেও দেওয়া উচিত, উনি অত সকালে বেরোবেন যখন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন, কেশববাবু তারও আগে উঠে স্নান ক'রে কাপড় জামা পরে ছাতা বগলে ক'রে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন।

'ওকি, আবার এখন চললে কোথায়?' স্ত্রী শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

'না পাঁচুর মা, সারারাত ভেবে ঠিক করলুম, এ ব্যবসা আমি ছাড়তে পারব না। এ আমার নেশার মতো দাঁড়িয়ে গেছে। এখন হাত পা গুটিয়ে বসে ছেলের ভাত খেলে দুদিনেই তোমাকে হাতের লোহা খুলতে হবে। আর ধরো—এতে তাদের যে কিছু উপকারও না হয় তা নয়। তাদের যদি অন্য লোক দিয়ে করাতে হ'ত, তাকে মেহনতানা দিতে হ'ত না? দেনা আমি শোধ ক'রে দেব, এ বাড়িও ঢেলে সাজাব আবার—তারপর বরং মাথা উঁচু ক'রে ছেলের বাড়িতে গিয়ে উঠব। আমি তাকে শাপশাপান্ত করছি না। ভাল থাক তারা—তবে একা সংসার করার ঠেলাটা একটু বুঝুক না। যাই এখন, আটটার মধ্যে ফিরে এসে জলখাবার খাবো, বরানগরের পার্টিকে হাঁ না কিছু বলা হয় নি, সেইটে জানিয়ে আসি। দুগ্গা দুগ্গা।'

তিনি ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন, কোন উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে।

আটটার মধ্যেই ফিরে এলেন তিনি, তবে জলখাবার মতো অবস্থায় নয়। ওখানে কাজ সেরে বেরোবার মুখেই পড়ে গেছেন তিনি, অজ্ঞান হয়ে। তারাই একটা ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে এসেছে।

ছেলেকে খবর দেওয়া হ'ল, প্রয়াগবাবু ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলেন।

ডাক্তার বললেন, 'স্ট্রোক। হার্টটা দুর্বল তো ছিলই, কারও তো কথা শুনতেন না, হাই প্রেসার। কতদিন বলেছি, বিশ্রাম নিন একটু—গো স্লো। আমি এখনি গিয়ে ফোন ক'রে দিচ্ছি, অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে। হাসপাতালেও বলে দেব—ভেরি ব্যাড কেস, এও বলে রাখছি।'

শুধু একেবারে শেষ নিঃশ্বাস পড়ার আগে একবার চোখ খুলেছিলেন, স্ত্রীই মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিলেন, তিনি শুনলেন, জড়িয়ে জড়িয়ে বলছেন, 'পেঁচোকে বলো ও-বাড়ি ভাড়া দিয়ে এ বাড়িতে এসে থাকতে—দুটো মানুষ অত বড় বাড়ি কি করবে—'

বলতে বলতে অর্ধনিমীলিত চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল।

"বাঘের বাচ্ছারে বাঘ না কহিনু যদি"

বেশ বছর কতক আগের কথা বলছি। দিল্লীতে এক পার্কের ধারে অপেক্ষা করছি, আর এক ভদ্রলোকের আসবার কথা, তিনি এলে বাস ধরবার চেষ্টা করব।

পার্কে কতকগুলি ছোট ছেলে খেলা করছিল, আট থেকে দশ, এই তাদের বয়সের সীমা—সবাই বেশ সম্ভ্রান্ত বাড়ির ছেলে, বেশ-ভূষায় যা মনে হয়। একটি ছেলে, ঐ বয়সীই হবে, কিছু তফাতে বসে উদাসভাবে দূরের দিকে তাকিয়েছিল। বেশভূষা খুবই দীন, দরিদ্র ঘরের ছেলে, তাই বোধহয় এদের খেলায় যোগ দিতে সাহস করে নি বা এরা নেয় নি।

এত লক্ষ্য করার কারণ বেশভূষা যেমনই হোক—কোথায় মুখে চোখে একটা ভাল বংশের ছাপ আছে, সেই সঙ্গে বুদ্ধির দীপ্তি। তার চেয়েও যেটা আছে, দৃষ্টি কোন বস্তুবিশেষে নেই, কতকটা শূন্যে দৃষ্টিই, কিন্তু ভুরু কোঁচকানো। অর্থাৎ খুব গভীরভাবে কি একটা ভাবছে। এই বয়সে ঠিক এভাবে ভাবাটা একটু অস্বাভাবিক বৈকি।

দাঁড়িয়েই আছি, হঠাৎ দেখি ধনীপুত্রগুলির কি খেয়াল হ'ল—বোধহয় ওর এমন স্বতন্ত্রভাবে চুপ ক'রে বসে থাকাটা ঔদ্ধত্য বলে মনে হ'ল—তারা ঐ ছেলেটিকে নানারকমে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করল। কেউ ঢিল ছোঁড়ে, কেউ যেতে যেতে ওর রুক্ষ চুলগুলো ধরে টান দিয়ে যায়—এই রকম। চরমে উঠল যখন একটা ছেলে একমুঠো ধুলো এনে ওর মাথায় দিল।

চোখের নিমেষে ছেলেটার মুখচোখের ভাব বদলে গেল। মাথার ধুলোটা ঝাড়তে যা সামান্য দেরি—তারপরই উঠে আস্তিন গুটোতে (ছেঁড়া জামার) গুটোতে রুখে উঠে একেবারে ওদের কাছে এল। প্রথমটা দু'একটা অশ্রাব্য গালা-গাল দিয়ে বলে উঠল, 'আও শালা, কোন্ লড়োগে হামারে সাথ, আও, আ যাও, খাড়া কেঁও হো!'

চার-পাঁচজন ওরা, কিন্তু এ ছেলেটার ঐ রুদ্র মূর্তি, দুই লাল চোখ দেখে—সত্যিই এক পা দু পা ক'রে পিছু হঠল। শেষে বোধহয় যে যার বাড়ি চলে গেল। এ ছেলেটাও, যেন কিছুই হয় নি এইভাবে আবার শান্ত হয়ে এসে বসল।

এ ঘটনাটা তুচ্ছ। কিন্তু আমার আর একটা এমনি ঘটনা মনে পড়ল। কলকাতার কানাই ধর লেনে আমার এক বন্ধুর চালের দোকান ছিল, মাঝে মাঝে সেখানে এসে বসতুম। ফলে পাড়ার অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল। একজন বিখ্যাত গায়কও থাকতেন ওখানে। কিন্তু আমি যাঁর কথা বলছি—অমরবাবু, কী করতেন জানি না, সুবর্ণ-বণিক, অবস্থাপন্ন ছিলেন। মেজাজটা ছিল, যাকে বলে "শৌখিয়া" ধরণের। হঠাৎ একদিন দেখি তিনি কোথা থেকে একটা বাঘের বাচ্ছা এনেছেন। চিতা নয়—রয়েল বেঙ্গলের বাচ্ছা, ডোরা কাটা বাঘ। তখন নিতান্তই শিশু, আমরা গিয়ে দেখে এলুম।

দিনকতক পরে যখন বেশ হুলো বেড়ালের মতো চেহারা হয়েছে, একদিন বিকেলে অমরবাবু তাকে চেনে বেঁধে প্রাকৃতিক কার্য-কাম-ব্যায়ামে বার করেছেন আর যায় কোথা। পাড়ায় লেড়িকুত্তার অভাব ছিল না। সবাই ঘেউ ঘেউ করতে করতে চারদিক থেকে ছুটে এসে প্রায় ঘিরে ধরল।

অমরবাবুর হাতে একটা বেতের ছড়ি ছিল কিন্তু তিনিও জানতেন যে যত? চেঁচাক এরা, বাঘের কাছে আসতে সাহস করবে না। ব্যাঘ্র-শাবকও, বেশ নিশ্চিন্ত-ভাবে যেন চারদিক তাকিয়ে দেখতে দেখতে চলেছে। কুকুরের ডাক গ্রাহ্যও করছে না। সম্ভবত কুকুরগুলো ভুল বুঝল। তারা আর একটু কাছে এল—বোধহয় কামড় দেবার অভিপ্রায়ে। অকস্মাৎ বাঘটা সোজা হয়ে দু পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁত-খিঁচোবার ভঙ্গি ক'রে রুখে দাঁড়াল এবং ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ একটা শব্দ করল বার দুই তিন—এইটেই পরে বোধহয় গর্জনে দাঁড়াবে—তার যে ফল হ'ল তা প্রায় অবর্ণনীয়। চোখের পলক ফেলতে যা দেরি, তারও আগে কুকুরগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। আর সেই প্রথম দেখলুম 'ল্যাজ মুখে ক'রে দৌড় দিল' কথাটা কোথা থেকে এসেছে। লেজটা এমনভাবে গুটিয়ে নিল পেটের নিচে যে তার প্রান্ত মুখে এসে পড়তে অসুবিধা নেই।…

সেই দৃশ্যের সঙ্গে এই দৃশ্য মিলিয়ে মনে হ'ল এ ছেলে যদি ভাল পথে না যায় তো গুন্ডা বদমাইশ হবে। এবং বেশ উঁচু দরেরই।

কি মনে হ'ল, ডাকলুম ছেলেটাকে, 'বেটা শুনো এক দফে ইধার!'

শান্ত ভাবেই কাছে এসে দাঁড়াল ছেলেটি।

নাম এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে একবার শুধু তেমনিভাবেই উত্তর দিল, 'ইসকা মতলব?'

সত্যি কথাই বললুম, যথাসাধ্য হিন্দীতেই যে, ওর এই রুখে দাঁড়ানোটা আমার খুব ভাল লেগেছে। সেই জন্যেই কৌতূহল। সাধারণ রাস্তার ছেলে তো নয়—নিশ্চয়ই বড় বংশের ছেলে হবে।

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছেলেটার। এক লাফে রেলিং ডিঙিয়ে পেভ্‌মেণ্টে আমার কাছে এল। পরিচয়ও দিল।

নাম রওশনলাল। দেশ সাহারাণপুর। বাবা অনেকদিন আগে এখানে এসে একটা মনোহারী দোকান দেন। ভাল চলছিল বলে দেশ থেকে ওর মাকে আনিয়ে নেন। বাড়ি ভাড়া করেন। হঠাৎই বাবার শরীর খারাপ হ'ল—ডাক্তার বললেন টি. বি. ক্ষয় রোগ। দোকান কে দেখে? মায়ের পরামর্শে তাঁর দাদাকে, অর্থাৎ রওশনের বড় মামাকে আনিয়ে নিলেন। সে-ই দেখাশুনো করতে লাগল। আর একটি ছোকরাও ছিল অবশ্য। বাবা দাওয়াই আর ইনজেকশ্যানে সেরেও উঠলেন। ডাক্তার বললেন, 'এখনই কাজে যেও না। মাসখানেক কোথাও বিশ্রাম নিয়ে এসো।' আলমোড়া যাবার পরামর্শ দিলেন। কিংবা রানীক্ষেত।

হাতের টাকা শেষ হয়ে এসেছিল। মা আশ্বাস দিলেন, 'ভয় কি, চালু কারবার, টাকা এসে যাবে। এখন দেনা ক'রেও যাওয়া ভাল।' তিনি জেবর বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে এলেন। ওরা রাণীক্ষেত চলে গেল। এক মাসের পরে যখন ফিরে এল তখন দেখা গেল সে দোকানের চিহ্নমাত্র নেই, সে ঘরে একটি লণ্ড্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দাড়িওলা এক শিখ ভদ্রলোক সেখানে বিরাজমান।

যা জানা গেল, রওশনের মামা ও সেই কর্মচারীটি সব মালপত্র জলের দামে বেচে দিয়ে—মায় ফার্ণিচার পর্যন্ত—অন্তর্হিত হয়েছে। বাড়িওলাকে বলে গেছে, 'উহ্‌ মর গয়া, হামারা বহিন মুলুক চলা গয়ী।' বাড়িওলা নিশ্চিত হয়ে নতুন লোককে ভাড়া দিয়েছিল।

মামলা মোকদ্দমা মানে প্রচুর টাকা খরচ, আর অন্তহীন প্রতীক্ষা।

জেবর যা বাঁধা ছিল বিক্রী হয়েও বেশী কিছু হাতে রইল না। দুমাসের বাড়ি ভাড়া শুধতে আর সংসার খরচ চালাতে তা যখন প্রায় যায়-যায়—ওর বাবা সামান্য পুঁজিতে যা হয়, রাস্তার ধারে একটা ফলের দোকান দিলেন, কিন্তু মাস দুয়েকের মধ্যেই এই অনভ্যস্ত পরিশ্রমেই হোক বা শালার বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতেই হোক —হার্টফেল ক'রে মারা গেলেন। ওরা একেবারেই পথে বসল, দেশে যাবারও পয়সা ছিল না। তা ছাড়া সেখানেও চাচারা ঢুকতে দিত কিনা কে জানে। এখন ওর মা দুটো বাড়িতে বাসন মাজা, ঘর মোছা, কাপড় কাচার কাজ করেন, ওরা থাকে একটা ছোট্ট ঘরে, এক ভদ্রলোকের বাগানের পিছনে টিন দিয়ে ঝি-চাকরের জন্যেই করা—সে বাড়ির কাজও করতে হয় বিনা মাইনেয়, নগদ আয় ঐ দু বাড়ির বাবদ একশ দশ টাকা।

লেখাপড়া? নগর নিগমের একটা ফ্রী প্রাইমারী স্কুলে পড়ত। সেখানের পড়া শেষ হয়ে গেছে। যে বাড়িতে থাকে ওরা সেই সাহেবের ছেলের ক্লাস সিক্‌স্‌ সেভেনের বই চেয়ে এনে নিজে নিজেই যতটুকু পারে, পড়ে। মা ঐ দুঃখের মধ্যেও কিছু কাগজ কিনে দেন—তাতেই অঙ্ক কষা বা লেখার কাজ চলে।

দীর্ঘ ইতিহাস—কিন্তু ছেলেটি বেশ গুছিয়ে অতি অল্প কথায় বলে গেল।

সব শুনে আমি পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার ক'রে ওর হাতে দিতে গেলুম, 'কোই ছোটাসা কিতাব ইয়া পেপার কা জরুরৎ হোগা তো মোল লেনা ইসসে।'

ছেলেটা দু পা পিছিয়ে গিয়ে একেবারে হাত জোড় করল, 'আপকো বহুৎ মেহেরবানী বাবুজী, লেকিন ভিখ নেহি লেঙ্গে, মাফ কিজিয়ে—'

*   *   *   *

দিল্লীতে আসা যাওয়া—বন্ধুত্ব অনেকের সঙ্গেই হয়েছে, ধনী বন্ধু বাহেল সাহেব একদা বললেন, 'চলো আমার বিবিজীর বার্থ ডে কাল, ওঁর খুব হীরের শখ, একটা ভাল দেখে কিনে দিই।'

একরকম জোর ক'রেই নিয়ে গেলেন বেশ বড় গোছের এক জুয়েলারী দোকানে। কাগজে খুব বিজ্ঞাপন দেন এঁরা, রেলের দুপাশে, বাড়ির গায়ে আলকাতরার লেখাও অনেক দেখেছি। "নামকরা মণিমাণিক্য-বিক্রেতা।"

বাহেল সাহেব সঙ্গে মেয়েকেও নিয়ে গিছলেন, আদুরী মেয়ে—বছর দশ-এগারো বয়স হবে, তাকেও কিছু কিনে দেবেন এই বোধ হয় অভিপ্রায় ছিল। ওরা দুজন ঐদিকে মগ্ন, আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি—আমার পকেট গড়ের মাঠ, এসব দেখে শুধু মন খারাপ—হঠাৎ চোখে পড়ল একটি ষোল আঠারো বয়সের কিশোর ছেলে শো-কেসের কাঁচ পরিষ্কার করছে। কেমন একটা মনে হ'ল, মুখটা ওর চেনা-চেনা। কাছে গিয়ে একটু ইতস্তত ক'রে প্রশ্ন করলুম, 'রওশনলাল ?'

ছেলেটি অনেকটা নত হয়ে নমস্কার ক'রে বলল, 'হান্‌জী সাহাব।'

কোন কৌতূহল প্রকাশ করল না দেখে বললুম, 'তুম পহ্‌চানা মুঝকো ?'

'জরুর। আপকা মেহেরবানী কভি নেহি ভুলেঙ্গে।'

তবে সে আর বিশেষ কিছু বলল না, দেখলুম তার হাতও থেমে গেছে—কানটা তার পাতা কাউণ্টারের দিকে, মনটা আসলে সেইখানেই।

যে হীরেটা পছন্দ হয়েছে তার দাম বলছে চোদ্দ হাজার টাকা। অবশ্যই ওঁরা সেট করিয়ে দিতে পারবেন ফরমাশ হলে আজকের মধ্যেই, তবে তার চার্জ আলগ্‌ পড়বে।

বাহেল বলছেন, 'ইট ইজ টু মাচ।...আমি পাথর এর আগেও কিনেছি, কিছু কিছু চিনি বৈকি। এ পাথরের এত দাম হয় না।'

যে সেলসম্যান ওঁকে দেখাচ্ছিল—দোকানের ভাষায় য়্যাটেণ্ড করছিল—তার বয়স কম, পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী হবে না, সম্ভবত মালিকের ছেলে বা ভাই হবে, সে এই বিশেষ হীরেটির ঠিকুজি কুলুজী পেডিগ্রী বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু বাহেল সাহেব তাতে ভুললেন না। বললেন, 'আমিও ব্যবসাদার, হার্ড-আর্নড্‌ মানি, স্কোয়াণ্ডার করতে পারব না।'

চলে যাচ্ছেন হঠাৎ দেখি রওশনলাল ঝাড়ন ফেলে ওঁর সামনে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াল। বললে, 'আমি সামান্য নৌকর এঁদের, আমি কথা কইতে সাহস

করছি এর গুস্তাফি যদি মাপ করেন—আমি একটা কথা বলব ?'

বাহেল বিস্মিত হলেন, ভ্রূকুটিও করলেন, তারপর কি জানি কেন, রওশনের চোখের আর কপালের দিকে চেয়ে কি মনে হ'ল, সহজভাবেই বললেন, 'বলো না, তাতে আর কি হয়েছে।' বোধহয় কিছু সাহায্য প্রার্থনা করবে ভেবেই মুখখানা কঠোর হয়ে উঠেছিল, ঝানু ব্যবসাদার চোখের দিকে চেয়ে বুঝলেন, এ সে পাত্র নয়।

[অনেকদিন পরে অবশ্য আমাকে বলেছিলেন, 'আমি ফ্রেনোলজি কিছু জানি —কপাল আর মাথা দেখে মানুষ কি রকম বুঝতে পারি।']

আমি উপযাচক হয়ে বললুম, 'রওশনলাল খুব ভাল ছেলে, বহুৎ আচ্ছা লেড়কা।'

'তুমি ওকে চেনো। কেমন করে চিনবে ?'

'পরে বলব। সে লম্বা কহানী।'

রওশনের মুখের দিকে চাইতে সে বলল—বোধহয় আমার কথায় একটু ভরসাও পেয়েছে—'সাহেব, পাথরটা আপনি নিয়ে যান, পাথরটা জিন্দা পাথর, ওর বড় মায়া—আপনাকে টেনে আনবে আবার—আপনাকে কিনতেই হবে।'

'উসকা মতলব ?' বাহেল সাহেব বলেন, 'পাথর আবার জিন্দা কি ? পাথর খনি থেকে উঠেছে, কেটেকুটে এই চেহারা দাঁড়িয়েছে। এর চেয়েও জেল্লা বেশী এমন হীরে আমি বিস্তর দেখেছি।'

'সাহেব' আমাকে বাওরা ভাববেন না, আমি এইসব শো-কেস ঝাড়া-মোছা করি। আমার তো শুধু বাইরে থেকে চেয়ে থাকা—চেয়ে চেয়ে দেখি সব পাথরই—এক একটা পাথরকে মনে হয় জীবন্ত, কী একটা টান আছে—চোখকে বার বার টানে, মায়া পড়ে যায়। সব নয়—দু'একটা এমনি পাথর আছে। এই পাথরটা আমাকে টানে, মাঝে মাঝেই এসে চেয়ে থাকি। আপনি পাথরের কদর বোঝেন আপনাকেও টানবে।'

এরপর অনেক টানাটানি দরাদরির পর সেই হীরেই কিনলেন বাহেলজি, শুধু ঠিক হলো ওঁরা সেট ক'রে দেবেন প্ল্যাটিনাম নয়—হোয়াইট গোল্ডে, তার মজুরী নেবেন না।

তখন এমনি আংটির মতো ক'রে সাজানো ছিল। খোলা হীরে।

এইসব কথাবার্তার মধ্যে এক ফাঁকে বাহেল সাহেব শুধু বলে দিলেন, 'ঐ ছেলেটার ঠিকানাটা একটু জেনে রাখো তো। আমার দরকার আছে।'

ঠিকানা নিলুম। মা মারা গেছেন, এখনও সেই ঘরটা তাঁরা দয়া ক'রে দিয়ে রেখেছেন—ভোরে উঠে ঝাড়পোঁছ সাবান-কাচাগুলো রওশন ক'রে দেয় ভাড়ার বদলে। রাত্রে ফিরে নিজের রুটি নিজেই পাকিয়ে নেয়। তাই থাকে সকালের জন্যে। এ নৌকরীও তাঁদের সুপারিশেই হয়েছে, বিশ্বাসী বলে নিয়েছেন এঁরা, দেড়শো টাকা মাইনে দেন।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

বাহেল সাহেব সুকৌশলে ছাড়িয়ে আনলেন রওশনকে সে জুয়েলারের দোকান থেকে, সেও সাগ্রহে এল। যদিও, এই পাথরটা বিক্রীর ইতিহাস শুনে মালিক ওকে একশো টাকা বকশিশ আর পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাহেল সাহেব বলতে গেলে ওর সব ভারই নেবেন এমনি আভাস দিতে ও স্বেচ্ছায় সানন্দে চলে এল।

বাহেল আমাকে বললেন, 'ওকে আমার সেলস্ অর্গানিজেশনে রাখব। ওসব "মায়া" "জিন্দা" সব ঝুট—আসলে মাল বেচতে জানে, কাকে কি বলতে হয় তাও।'

উনিই একটু ভদ্রভাবে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, নিজে সেলস্-এর কাজ বোঝাতে লাগলেন—শুধু তাই নয়, সন্ধ্যার পর এক মাস্টার এসে পড়াবেন সে ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন।...

এরপর বছর আষ্টেক আর দেখা হয় নি। একেবারে গতবছর ওঁর আপিসে গিয়ে দেখি, রওশনলাল এখন হেড সেলস্ অর্গানাইজার। চোস্ত ইংরেজী বলে। এবং এই বয়সেই একটা কর্তৃত্বের ভাব এসে গেছে—সহজ, স্বাভাবিক বলে মনে হয়, যেন মনে হয়, সে এই ব্যবসার মধ্যেই মানুষ হয়েছে, ছোট থেকেই।

শুধু তাই নয়। চেহারাও পালটে গেছে। ও যে এত সুন্দর দেখতে, তা আগে কখনও মনে হয় নি। মনে হয় একেবারে ঢেলে সেজেছেন বিধাতা।

আমাকে দেখামাত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে তেমনি হাতজোড় ক'রে দাঁড়াল, 'আইয়ে সাহাব। হাম আপহিকা বাত শোচতে থে আজ, বহুত রোজ ইধার নেহি আয়ে। ঈশ্বর হামারা ধেয়ানকো সাচ কর দিয়া।'

'আমার কথা মনে আছে এখনও?'

সেই এক উত্তর, 'আপকা মেহেরবানি নেহি ভুলেঙ্গে কভি। ই সবহি আপকে কৃপামে সম্ভব হুয়া।'

বাহেল সাহেবও দেখলাম খুব খুশী। বললেন, 'আমার বাছাইতে ভুল হয় নি। ছেলেটাই জুয়েল—দামী জহরৎ। আমার কাজ প্রায় সব ও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। য়্যাণ্ড ভেরি সাকসেসফুল। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ। তোমার জন্যেই বলতে গেলে একে পেলুম।'

শুনলুম এর মধ্যেই ও নাইট কলেজে পড়ছে। এবারেই বি. কম. দেবে। লেখা-পড়াতেও খুব মাথা। বাহেল দেড় হাজার টাকা মাইনে দেন, তাছাড়াও একটা কমিশন আছে। কতক টাকা যাতে জমাতে পারে সে ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছেন জোর ক'রেই। নিজের বাড়ির ওপরতলায় একটা ফ্ল্যাট দিয়ে রেখেছেন, খায় ওঁর কাছেই। এবার দেখেশুনে একটা ভাল শাদীর ব্যবস্থা করবেন।

বুঝলুম রওশনলাল ওঁর পুত্রতুল্য হয়ে উঠেছে।

কৃতজ্ঞতা মহৎগুণ আমার বাবা বলতেন, অকৃতজ্ঞতার তুল্য পাপ নেই।

ছেলেটা কৃতজ্ঞ বলেই এত উন্নতি হ'ল এত অল্প বয়সে।

এবার এসে দেখি বাহেলের অন্য মূর্তি। পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘ যাকে বলে তেমনি পায়চারি করছেন নিজের ঘরে।

কী ব্যাপার!

যা শুনলুম—খুব ক্রুদ্ধ লোক গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, দেরি হ'ল কার্যকারণটা উদ্ধার করতে—, অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নি। এ স্নেহের যা স্বাভাবিক পরিণতি তাই হয়েছে। ওঁর দুলালী মেয়েটি যাকে উনি এক বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে বাক্যদত্ত ছিলেন—এক বছর আগেই রওশনলালকে রেজেস্ট্রী বিয়ে ক'রে বসে আছে।

রাগটা দেখলাম মেয়েটার ওপরই বেশী। ওঁকে আগে না বলে এই ভাবে অপদস্থ করল তাতেই ওঁর আঘাত লেগেছে। উনি দূর ক'রে দিয়েছেন ওদের, ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তাঁর—বলে দিয়েছেন।

'তা রওশনলাল কি করছে এখন? ও তো চুপ ক'রে বসে থাকার পাত্র নয়।'

'বসে থাকে নি সে। টাকা তো কিছু হাতে ছিলই। হয়ত আগে থাকতেই ভেবেছিল—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নতুন একটা ব্যবসা শুরু ক'রে দিয়েছে, আর শুনছি এর মধ্যেই বেশ জমিয়ে নিয়েছে। তবে ছেলেটা সত্যিই ভদ্র। ভদ্রলোকেরই রক্ত আছে দেহে—আমার ব্যবসার সঙ্গে পাল্লা লাগাতে চেষ্টা করে নি—অন্য যে কেউ হলে যা করত—যে কাজ এতকাল ধরে শিখেছে—সেই কাজেই নামত।'

আমি একটু তিরস্কারের স্বরেই বললুম, 'তা তোমারও তো ছেলে নেই, একেই ছেলের মতো মানুষ করেছ। মেয়ের বিয়ে এর সঙ্গেই তোমার দেওয়া উচিত ছিল নিজে থেকেই উদ্যোগী হয়ে। ওকেও তুমি সত্যিসত্যিই ভালবাস—মিছিমিছি তাড়িয়ে দিতে গেলে কেন!'

এবার দেখলুম মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাসল খুব খানিকটা আপন মনে। বলল, 'তুমি কি ভাবছ আমি সত্যিসত্যিই ওকে ছেড়ে দেব? তাই কখনও সম্ভব—এই বয়সে এতকাল পরে এ বোঝা বইতে পারব? আসলে ছেলেটাকে পরখ ক'রেই দেখতে চেয়েছিলুম—এরকম বিপদে পড়লে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভদ্রতা বজায় রেখে দাঁড়াতে পারবে কিনা। রাগ আমার মেয়ের ওপরই—ঐ যা বললুম আগেই জানাতে পারত। শুনলুম রওশন নাকি লুকিয়ে বিয়েতে রাজী হয় নি, আমার মেয়েই জানাতে দেয় নি।...সে যাই হোক, ফিরিয়ে তো আনবই। আসলে এটা একটা আমার পরীক্ষা, ইম্‌তিহান, আর সেটা আমাকেই। বাচ্চা শেরকে শের ক'রেই তুলতে পেরেছি না বিল্লী তৈয়ার করেছি, সেটা একবার যাচাই ক'রে দেখব না! এত বড় ব্যবসার যে মালিক হবে সে তার যোগ্য কিনা বুঝতে হবে তো। আমি দুর্লভ পুরো মার্কেই পাস করেছি। বুদ্ধির সঙ্গে ভদ্রতাবোধ আর কৃতজ্ঞতা—এ বড় এ দুনিয়ায় মিল্লা সাহাব।'

তারপর একটু থেমে আমার জন্যে কফির ফরমাস দিয়ে বললেন, 'ফিরিয়ে তো আনবই। আনতেই হবে, বিবিজী অস্থির হয়ে উঠেছেন। শুনছি বাচ্ছা হবে শিগগিরই, সেই সময় 'নার্সিং-হোম' থেকে একেবারে বাড়িতে এনে তুলব এই ফিকিরেই আছি।' বলে খুব তৃপ্তির হাসি হেসে মাথা দোলাতে লাগলেন।

পাকা ঘুঁটি

সরকারী অফিসের মোটা মাহিনার প্রায়-সাহেবী পদে যাঁহারা ইতিপূর্বে অনুকূল-বাবুকে দেখিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে মোটা মালা ও টিকি, খাটো বহির্বাস এবং অসংখ্য-তিলক-শোভিত চৈতন্যদাস বাবাজীর মধ্যে তাঁহাকে চিনিয়া বাহির করা একটু কঠিন বৈ কি।

তবু সংস্কারে এমনিই হয়। বারবারই হয়। সেদিনকার সেই উগ্র সাহেবী মেজাজওয়ালা অখাদ্যলোলুপ ডেপুটি কণ্ট্রোলারের পক্ষেই বরং হয়ত চৈতন্যদাস বাবাজী হওয়াটা স্বাভাবিক। বা সেই জীবনেরই এটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

চৈতন্যদাস সংসার হইতে বহুদিন অবসর লইয়াছেন। ষাট বৎসর বয়সে অফিস হইতে রিটায়ার করেন তিনি, অবশ্য তাহার মধ্যেই তাঁহার গুরু কৃপা-লাভ হইয়া-ছিল, যদিচ ভেখ নেওয়ার অবস্থা তখনও হয় নাই। কলারের নিচে কণ্ঠি থাকিলেও অফিস যাওয়ার সময় নাসিকার তিলক মুছিয়া যাইতে হইত। অফিস ত্যাগ করার পর এসব আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়োজন না থাকিলেও সংসারে থাকিয়া সাধন-ভজনের সুবিধা হইল না। বাধা বিস্তর। অফিস হইতে রেহাই পাইবার তবু একটা বয়স আছে কিন্তু সংসার হইতে রেহাই পাইবার বয়স নাই। একেবারে অশক্ত হইলে ত্যাগ করে, উপেক্ষা করে, কিন্তু তাহার পূর্বে কোন অজুহাতই গ্রাহ্য করে না। বিষয় তো পুরুভুজের মতো আট দিক দিয়া বেষ্টন করিয়া আছেই, আত্মীয়তার বন্ধনও কম নয়। ছেলেমেয়েদের সংসার, নাতি-নাতনী, তাহাদের শিক্ষা-চাকরি-বিবাহ—এমনি সহস্র ঝঞ্ঝাট ও দায়। সকলেই আশা করে যে, তিনি তাহাদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। অসুখ-বিসুখে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা তো আছেই। এ-ছাড়া অনাত্মীয়দের হাত হইতেই কি অব্যাহতি আছে? তাহারা বিশ্বাসই করে না যে, তাঁহার একটা চাকরি করিয়া দিবারও সুবিধা নাই। আবার যাহাদের চাকরি আছে তাহাদের উন্নতির সুপারিশ চাই। এমন কি হাসপাতালে 'বেড্' পাইবার প্রয়োজন থাকিলেও তাঁহার চিঠির তাগিদ আসে। পাড়ার কমিটি আছে, তাহাদের চাঁদা আছে—দলাদলি, ভোট, পল্লীরাজনীতি কি নাই।

অথচ এসব আর কি ভাল লাগে?

এ বয়সে তো করিয়াছেনও ঢের, চিরজীবনই তো এই লইয়া কাটিল, আর কেন ? গুরুকৃপা যাঁহার লাভ হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞানের সন্ধানে যিনি পা বাড়াইয়াছেন, তাঁহার আর এইসব তুচ্ছ পার্থিব ব্যাপারে জড়িত থাকা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, কাহার জন্যই বা ? আত্মীয়তা কিম্বা বন্ধুত্ব কোনটাই তাঁহার মুখ চাহিয়া কেহ বজায় রাখিতে চায় না, সবাই চায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। সংসারের প্রত্যেকটি লোকই আত্মকেন্দ্রিক, সকলেই নিজের চারপাশে ঘুরিতেছে। তবে তিনিই বা কল্পবৃক্ষের মতো পরের প্রয়োজন সাধিতে এই শুষ্ক নীরস সংসার-মরুতে দাঁড়াইয়া থাকিবেন কেন ?

সুতরাং—একদিন তিনি 'দুত্তোর' বলিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন।

সেটা বোধ হয় রিটায়ার করার বছর দুই পরে। অবশ্য সে-ও প্রায় আট বছরের কথা, এখন তাঁহার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। আট বছর পূর্বে সেই যে সংসার ছাড়িয়া মাত্র একটি ট্রাঙ্ক, একটি সুটকেস, একটি হোল্ড-অল ও একটি চাকর লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, আর কোনমতেই গৃহে ফিরিয়া যান নাই। তারপর ত্যাগ করিয়াছেন বিস্তর ; ধুতি ছাড়িয়া বহির্বাস ধরিয়াছেন, জামা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছেন,—এমন কি স্বাদু আহার্যও। সকালবেলা চা আর খান না, তাহার পরিবর্তে ঘোল ; দুপুরে দুই মুঠা প্রসাদ এবং রাত্রে একটু দুধ, এই আজ তাঁহার সম্বল। শুধু শয্যাটাই এখনও ছাড়িতে পারেন নাই, ভাল নরম বিছানার উপর একটি কন্থা বিছাইয়া বৈরাগ্যের নিয়ম রক্ষা করেন।

ইতিমধ্যে বারবারই সংসার হইতে ডাক আসিয়াছে। বড় নাতনীটি মারা গেল, সেজ নাতনীর বিবাহ, তাছাড়া পৌত্রদের উপনয়ন, বিবাহ এবং প্রপৌত্রদের অন্নপ্রাশন—এসব তো ছোটখাটো ব্যাপার লাগিয়াই আছে। কিন্তু তবু তখনও তাঁহার চরম পরীক্ষা ভগবান লন নাই। সেটা শুরু হইয়াছে মাত্র দু'বছর আগে, যখন তাঁহার বড় ছেলেটি নিউমোনিয়ায় মারা যায়। তাহার পর দ্রুতবেগে আসিতে লাগিল আঘাতের পর আঘাত ; মেজ ছেলেটি বসন্তে এবং বড় মেয়েটি গ্রহণীতে মারা গেল।

আঘাত গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই, সংসারকে যতই বর্জন করুন এসব ব্যাপারে ব্যথা এখনও খুবই বাজে—এমন কি ঈশ্বরচিন্তাতেও যেন মধ্যে মধ্যে ব্যাঘাত জন্মায়। তবু এখান হইতে নড়াইতে পারে নাই কেহ তাঁহাকে। চিঠি, টেলিগ্রাম—অনুরোধ-উপরোধ, কান্নাকাটি, এমন কি সেখান হইতে লোকও আসিয়াছে, কিন্তু তিনি আর বাড়ি ফিরিতে রাজী হন নাই। যে যাইবার সে যাইবেই, পরমায়ু ফুরাইলে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। শুধু শুধু তিনি গিয়া কি করিবেন। চোখের দেখা ? এতকাল তো দেখিয়াছেন, এখন আর একবার সেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত রোগবিকৃত মুখ না দেখিলে নয় ? তিনি মরিয়া গেলে তাহারা কি করিত ? আর তিনি তো মরারই সামিল, সংসারের কাছে সম্পূর্ণ মৃত। তাঁহার আর পাওনাও নাই, দেনাও নাই। শুধু তাহারা এখন অব্যাহতি দিক

তাঁহাকে, এইটুকু শুধু চান। সেখানের সমস্ত আবহাওয়াতে আছে সাংসারিক চিন্তা, বিষয়ের চিন্তা, সেখানে গেলে সাধনভজন বহু দূরে সরিয়া যায়—সেখানে আর তিনি যাইতে রাজী নহেন্।

তাঁহার এই সংযমে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার খুব নিষ্ঠাবান গুরুভ্রাতারা পর্যন্ত। তিনি তাহাদের হাসিয়া জবাব দিয়াছেন, 'বাপু হে, ঘুঁটি কাঁচা থাকলেই দাবা খেলাতে মার খাবার সম্ভাবনা। আমরা যে পাকা ঘুঁটি, আমাদের মারে কে? মায়ার টান খুবই জোর সন্দেহ নেই—কিন্তু ঠিক ভগবানের খুঁটিতে বিশ্বাসের শেকল দিয়ে যদি মনের নৌকোখানা বাঁধতে পারো, তাহ'লে কোন টানই তাকে নিয়ে যেতে পারবে না। আসল কথা ঘুঁটিটা পাকা হওয়া চাই, নিজেদের ভাল ক'রে পাকাও আগে।'

একথা শুনিবার পর সম্ভ্রমের সহিত চাহিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় কি?

কিন্তু অকস্মাৎ আর একটি আঘাত আসিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক হইতে। ছোট ছেলে চিঠি লিখিয়াছে—

'দিদি মরবার পর থেকেই মার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিল—কোনমতে বেঁচে ছিলেন—এইমাত্র, কিন্তু এবারে আর বোধ হয় তাও থাকবেন না। মনে হচ্ছে এবার তাঁর পালা। অভিমানে এতদিন কিছুই বলেন নি, কিন্তু সম্প্রতি আপনার বধূমাতাদের কাছে জানিয়েছেন—শেষবারের মতো একবার স্বামীর দেখা পাবার জন্যেই প্রাণটা তাঁর বেরোচ্ছে না, এত কষ্টেও ধুক্ ধুক্ করছে। আপনার বৈরাগ্য এবং সাধনার কথা স্মরণ ক'রে একথাটা আপনাকে লেখার আর ইচ্ছা ছিল না, শুধু কর্তব্যবোধেই জানাচ্ছি। অর্থাৎ আমাদের কোন দায়িত্ব না থাকে। তাঁকে আর এখন বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, বিছানাতে তুলে বসাতেই ভয় করে—যে-কোন মুহূর্তে হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হ'তে পারে। সুতরাং তাঁর ইহজীবনের শেষ বাসনা মেটাবার একমাত্র উপায় আছে আপনার অন্তত একটি দিনের জন্য এখানে আসা। এতকালে সাধন-ভজন এবং বৈরাগ্য যদি একদিন সংসারের মধ্যে এসে দাঁড়ালে নষ্ট হয়ে যায় তো স্বতন্ত্র কথা—নইলে একবার আসতে দোষ কি? আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। ইতি—'

চিঠিখানা পাইয়া প্রথমটা তাঁহার অত্যন্ত রাগ হইল। ইহারা কি তাঁহার নির্জনবাসের বিঘ্ন ঘটাইবার জন্যই এমন পরামর্শ করিয়া মরিতে শুরু করিল? আর তাঁহাকে লইয়া এমন টানাটানি করিবার অর্থই বা কি? তিনি যাহাদের চিরকালের মত ছাড়িয়া আসিয়াছেন, কোন সম্পর্কই আর রাখেন না, তাহাদের এমন নির্লজ্জভাবে সেই ছিন্ন সম্পর্ককে আঁকড়াইয়া থাকারও কোন অর্থ তিনি বোঝেন না।

আর তেমনি অকালপক্ক হইয়াছে এই ছোট ছেলেটি তাঁহার। চিঠি লিখিবার ভাষা দেখ না। এই ছেলেটির দিকে তিনি কখনই মনোযোগ দিতে পারেন নাই,

কারণ ইহার পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের সময় হইতেই তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়াছেন—উহাকে মানুষ করিয়াছে উহার মা ও দাদারা। মানুষ তো হয় নাই, মা ও দাদাদের অত্যধিক আদরে একটি বানর তৈয়ারী হইয়াছে।

আবার লিখিয়াছে, 'আপনার এতদিনের সাধন-ভজন এবং বৈরাগ্য যদি একদিন সংসারে এলে নষ্ট হয়ে যায় তো স্বতন্ত্র কথা'—আরে মূর্খ, এ কি লোক-দেখানো বৈরাগ্য আর অন্তঃসারশূন্য সাধনা যে, একদিনে নষ্ট হইয়া যাইবে? অহঙ্কার করা অবশ্যই উচিত নয়, তবু একথাটা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এতকালের কৃচ্ছ্র-সাধনা ও ঐকান্তিকতায় আজ তিনি এমন স্তরেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যে, কোন প্রলোভনে এবং কোন ব্যাঘাতেই তাঁহার সে তপস্যায় বিঘ্ন ঘটা সম্ভব নয়। তাঁহার যা মনের কথা, তাহা ঐসব অর্বাচীন বালক আর ঘোর সংসারী জীবরা বুঝিবে কি করিয়া? আসলে আর-যে কোন টানই বোধ করেন না তিনি তাহাদের জন্য। মনকে যে তিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত এবং নিস্পৃহ করিয়া ফেলিয়াছেন—সে যে আর তাহাদের সম্বন্ধে এতটুকুও উৎসুক কিংবা কৌতূহলী নয়। তিনি যে কোন পার্থিব সম্পর্ককেই স্বীকার করেন না—বাহিরেও না, অন্তরেও না। কে তাহারা? পৃথিবীতে তো বহু লোক, লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যহ রোগে ভুগিতেছে এবং মারা যাইতেছে, তার জন্য তিনি করিবেন কি? দেহ ধারণ করিলেই রোগ-শোক-জরার অধীন হইতে হয়। আর পাঁচজনের মৃত্যুতে উহারা বিচলিত হয় কি? তবে তিনিই বা উহাদের মৃত্যুতে বিচলিত হইবেন কেন? তাঁহার কাছে পৃথিবীর আর-পাঁচজন মানুষের সঙ্গে উহাদের পার্থক্য কি? আজ যে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-আত্মীয় সবই শ্রীগোবিন্দ। ঐ এক আত্মীয়তাতেই তিনি মশগুল হইয়া আছেন, আর কোন আত্মীয়ের কথা আজ মনেও পড়ে না···

তাচ্ছিল্যভরে চিঠিখানা একপাশে গুঁজিয়া রাখিয়া চৈতন্যদাস আবার জপে মনোযোগ দিলেন। তিনি নিয়ম করিয়া প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করেন সুতরাং ভোর হইতে গভীর রাত পর্যন্ত তাঁহাকে জপ করিতে হয়। আজকাল বহুক্ষণ ধরিয়া জপ করিতে করিতে যখন এক এক সময় নামরসে বিভোর হইয়া পড়েন তখন মানস চোখে দেখিতে পান যেন অপূর্বসুন্দর একটি রাখাল বালক তাঁহার সামনে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তবে একটা অসুবিধা এই যে, বালকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে গেলেই তাহার মুখে জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রটির মুখের কেমন একটা সাদৃশ্য আসিয়া পড়ে—প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে ধারণাটাকে দূর করিতে পারেন না।

আজও জপে মনকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করেন।

সত্য-সত্যই—ঈশ্বরের করুণা আছে তাঁহার উপর, এটা মানিতে হইবে। নহিলে এই দীর্ঘ আট বৎসর তাহাদের ছাড়িয়া আসিয়াছেন—এই সময়ের মধ্যে একবারও আর দেখিবার ইচ্ছা হয় নাই কেন?

তাহারা তো তাঁহারই আত্মজ—আত্মার সহিতও জড়িত বটে। নিজেরই রক্ত-মাংসের সৃষ্টি তাহারা। আর রক্তমাংসের যে নয়, সে তো বরং আরও আপন।

বিবাহ করিয়াছেন তিনি যখন, তখন তাঁহার মাত্র একুশ বছর বয়স—স্ত্রী জাহ্নবীর বয়স তেরো—তারপর এই দীর্ঘকাল—চল্লিশ বছরেরও বেশী—তাঁহারা একসঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাটাইয়াছেন—দু-চার দিন বিদেশে যাওয়া ছাড়া আর কোন কারণেই তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটে নাই কখনও। সেই স্ত্রীকেও তো ছাড়িয়া আসিয়া অনায়াসে এতদিন আছেন, আশ্চর্য! বিশেষত, স্ত্রী সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ টান থাকিবার যখন যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান।

না, এটা স্বীকার করিতেই হইবে—স্ত্রীভাগ্য তাঁহার খুবই ভাল ছিল। জাহ্নবী স্বামীকে একটি দিনের জন্যও দুঃখ দেন নাই। সমস্ত সংসারটা তিনি চিরকাল হাল ধরিয়া থাকিয়া চালাইয়াছেন, কখনও স্বামীকে সেজন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিব্রত করেন নাই। সংসারের ছোট-খাটো তথ্য লইয়া উনি কখনও মাথা ঘামাইয়াছেন এমন কথা মনেই পড়ে না। তা ছাড়া, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী—এ ধরনের দুশ্চিন্তা হইতেও জাহ্নবী চিরকাল তাঁহাকে দূরে রাখিয়াছিলেন। সাংসারিক যন্ত্রটি নির্বিঘ্নে ও নিঃশব্দে ঘুরিয়া গিয়াছে বলিয়াই আজ ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি এতটা উদাসীন থাকিতে পারিয়াছেন। পেন্সনের অর্ধেক টাকা তিনি এখানে খরচ করেন—সে তো ঐ ভরসাতেই যে, সেখানে কোন অভাব-অভিযোগ নাই। তাঁহার চেয়ে অনেক বেশী মাহিনার অফিসারকেও তিনি পেন্সনের পর নিঃস্ব অবস্থায় মার্চেণ্ট অফিসে চাকরির চেষ্টায় ঘুরিতে দেখিয়াছেন—অথচ তিনি তো সংসার চালাইয়া, ইন্‌সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিয়াও একটি বসতবাড়ি এবং ভাড়াটে বাড়ি করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে হইয়াছে। আজ অবশ্য ছেলেরা সকলে রোজগার করে—কিন্তু সেদিন?

গোবিন্দ! গোবিন্দ!

এসব কী চিন্তা করিতেছেন তিনি? জপে বসিয়া এ কী কাণ্ড! একেই বলে মায়া—বিচিত্র মায়া বটে!

তিনি আবার জপে মন দিলেন। পাশে গোঁজা চিঠির কাগজের প্রান্তটা ঈষৎ কাঁপিতেছে। সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল জাহ্নবীও তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। এখানে আসিবার সময় তিনি স্ত্রীকেও সঙ্গে আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, স্বামী-স্ত্রী হিসাবে নয়—এমনি পরিচিত দুই স্ত্রী-পুরুষ তো কাছাকাছি থাকিয়া সাধন-ভজন করিতে পারে। তাহাতে বাধা কি? জাহ্নবীও চলুন না। জাহ্নবী উত্তর দিয়াছিলেন, 'এখান থেকে হাজার মাইল দূরে গেলেই কি আর মায়ার বন্ধন এড়াতে পারব? এ বড় কঠিন মায়া, বুঝলে। এ থেকে অব্যাহতি পাওয়া অত সোজা নয়। গিয়ে শুধু মুখে জপ করলেই তো আর হ'ল না। মন পড়ে থাকবে এখানেই। সে বড় অপরাধ। তার চেয়ে তুমিই যাও, পারো তো!'

জাহ্নবী চিরদিনই ঐ রকম। স্পষ্টবাদিনী ও সত্যদর্শিনী। কোন ভুয়া মোহ

তাঁহার নাই—যা সত্য তা স্পষ্ট দেখিতে পান চোখে এবং স্বীকার করিতে ভয় পান না।

এই তাঁহার স্বভাব—আশৈশব। যখন ত্রয়োদশী কিশোরী ছিলেন—ঈষৎ-উদ্ভিন্ন ফুলের কুঁড়ির মতো, যখন স্বামীর উত্তপ্ত চুম্বন এবং অর্থহীন প্রেমের প্রলাপে তিনি বিহ্বল হইয়া শুধু চাহিয়াই থাকিতেন—তখনও সতা-নিষ্ঠা ছিল তাঁহার অসাধারণ। নিজের মনকে তিনি ভাল করিয়াই চিনিতেন, কখনও আত্ম-প্রবঞ্চনার চেষ্টা করেন নাই।

ও, এখনও তাঁহার সে-সব দিনের কথা মনে আছে। আশ্চর্য!

সেই বহুযুগ আগেকার, আবেগ-থরোথরো প্রেমবিহ্বল দিনগুলি!

জাহ্নবী তখন সত্যই সুন্দরী ছিলেন। পুরুষের কামনার ধন হইবার মতোই ছিল তাহার রূপ। মসৃণ পেলব চর্ম, গৌর বর্ণ, চম্পককলির মতো আঙুল, এবং দীর্ঘ আয়ত নেত্র। সেকালের বৈষ্ণব কবিরা যে এত বয়স থাকিতে রাধারাণীর কিশোরী রূপই কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ আছে—

রাধে, রাধে!

এ কী পাপ! এ কী সব চিন্তা আজ মনে আসিতেছে। কোন বয়সে, কোন তপস্যাতেই কি এই চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশা নাই?

চৈতন্যদাস বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। এখন আর মনকে জপে নিবিষ্ট করা চলিবে না। মন আজ বড়ই বিক্ষিপ্ত। আবার একটু ঘুরিয়া আসিলে হয়ত—

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, সন্তানের মৃত্যুসংবাদেও তিনি এতটা বিচলিত হন নাই। সাময়িক আঘাত হয়ত পাইয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বর-চিন্তায় কিম্বা নামজপে বসার সঙ্গে সঙ্গে মন শান্ত হইয়া গিয়াছে।

স্ত্রী কি তাহা হইলে সন্তানের চেয়েও বেশী?

তা এক রকম বৈ কি! ছেলে মেয়ে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটু একটু করিয়া আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে, ফলে তাহাদের সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণা বা বিদ্বেষেরও সৃষ্টি হয় পুরুষের মনে—কিন্তু স্ত্রীর প্রতি সে রকম কোন মনো-ভাব গড়িয়া উঠিবার কারণই ঘটে না। বয়স ও সংসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠতা কমে সত্য, তবে আন্তরিক সম্পর্কটা তো এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় না! সমস্ত কাজ এবং সহস্র ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও তাঁহার প্রতিদিনের প্রয়োজন বা অভ্যাসের কথা জাহ্নবী কখনও বিস্মৃত হইতেন না। একটা চোখ এবং একটা কান যেন সর্বদা তাঁহার স্বামীর দিকে অতন্দ্র হইয়া থাকিত।

সেইজন্য স্ত্রী যে কখন ধীরে ধীরে নিজের আত্মার সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, জীবনের সমস্ত কিছুর সহিত সে বাঁধা পড়িয়াছে—তাহাও তিনি কখনও অনুভব করেন নাই। শুধু এটা এই শ্রীধামে আসিবার পর নিজের মনের কাছে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, প্রথম বৈরাগ্য ও সংসার-বিতৃষ্ণার উগ্রতার মধ্যেও যাহার অভাবটা তিনি বার বার অনুভব করিয়াছেন সে তাঁহার পুত্রকন্যাদের কেহ নয়—

তাহাদের জননী।

স্ত্রীর কাছে ঋণ তাঁহার আছে বৈ কি।

অনেক ঋণ আছে, এবং দেহ যখন ধারণ করিতে হইয়াছে, দেহীর সমস্ত দায় বহন করিতে হইতেছে, তখন সে ঋণই বা অস্বীকার করেন কি করিয়া? লোকে যে অকৃতজ্ঞ বলিবে।

সামান্য চোখের দেখার জন্য জাহ্নবীর প্রাণটা বাহির হইতেছে না—এটুকু হইতে বঞ্চিত করিবারই বা কী অধিকার আছে তাঁহার? এতই কি বৈরাগ্যের দম্ভ?

আচ্ছা, তিনি তো এখনও বেশ বাঁচিয়া আছেন—জাহ্নবীর এরই মধ্যে মরিবার কী বয়স হইল? হয়ত সন্তানদের শোকেই বেচারী শয্যা লইয়াছে—তিনি কাছে থাকিলে, সান্ত্বনা দিবার একটা লোক থাকিলে, এমন করিয়া কাতর হইয়া পড়িত না। বেচারী।

স্ত্রীর জন্য তাঁহার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও বাহির হইল।

কতদিন দেখেন নাই জাহ্নবীকে। বহু বৎসর। এতদিনে কেমন দেখিতে হইয়াছে কে জানে। হয়ত খুবই খারাপ হইয়া গিয়াছে চেহারাটা, অমন সোনার মতো রং—তাও হয়ত আর নাই। আর বয়সও তো কম হইল না। এখন তাঁহাকে দেখিলেও জাহ্নবী চিনিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। চৈতন্যদাস একবার মন্দিরের আয়নাটার সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। না, এমন কিছু পরিবর্তন হয় নাই। জাহ্নবীই বরং হয়ত অনেক বদ্‌লাইয়া গিয়াছেন। কেমন দেখিতে হইয়াছেন কে জানে।

আর একবার স্নান করিয়া আসিয়া চৈতন্যদাস জপে বসিলেন, কিন্তু তবু মন লাগে না। সে কিশোর বালক আজ একবারও মানস-চোখে ধরা দেয় না। তাহার বদলে বার বার মনে জাগে একটি নারীমূর্তি—কখনও কিশোরী, কখনও তরুণী, কখনও যুবতী। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় যে রমণী দীর্ঘকাল ছায়ার মতো পাশে থাকিয়া নিজের সমস্ত সত্তা বিসর্জন দিয়া স্বামীর আত্মার সহিত নিজেকে মিশাইয়া দিয়াছিল, সে আজ এতকাল পরে সমস্ত বৈরাগ্য-সমুদ্রে সাঁতার দিয়া বহুদূর হইতে নিজের প্রাপ্য আদায় করিতে আসিয়াছে। আজ তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া সহজ নয়।

সমস্ত দিন গেল—সমস্ত রাত্রি। অবশেষে ভোরের দিকে স্থির করিলেন তিনি ফিরিবেন—অন্তত একদিনের জন্য।

দুপুরে তুফান ছাড়ে হাতরাস হইতে, যাইতে হইলে এখনই যাত্রা করিতে হয়। তিনি তখনই নিজের চাকরকে ডাকিয়া তুলিলেন। হাঁক-ডাক, বিছানা-পত্র বাঁধা শুরু হইয়া গেল। ন'টার মধ্যে যাত্রা না করিলে ঠিক সময়ে পোঁছানো যাইবে না।

শুধু যেন স্থির করার অপেক্ষা ছিল এতক্ষণ। তাহার পর ভিড় করিয়া কত কথাই মনে আসিতে লাগিল।

জাহ্নবী পেঁড়া খাইতে ভালবাসিত। হয়ত খাইবার অবস্থা নাই—তবু লইতে

দোষ কি ? ভাল লিচু উঠিয়াছে এখন। কমলালেবু কিছু লওয়া দরকার। পথে যদি মোগলসরাইতে কাশীর ল্যাংড়া কিছু পাওয়া যায়। গোবিন্দের প্রসাদ একটু—চরণ-তুলসী ঐ সঙ্গে। তাঁহার নিজের জন্য এক গুরুভাই একটি গ্লুকোজ দিয়া গিয়াছিলেন—সেটাও সঙ্গে লইবেন, কে জানে কী পথ্য ব্যবস্থা করিয়াছে ডাক্তাররা, হয়ত ওসব আজকাল পাওয়াই যায় না।

সারা সকালটা চৈতন্যদাস ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন।

বাবা-ঠাকুর

কলকাতার উপকণ্ঠে জায়গাটা—ঠিক শহরও নয়, আবার পাড়াগাঁও বলা চলে না। সেইজন্যে শহর আর পাড়াগাঁর অসুবিধাগুলো সমস্তই আছে—সুবিধা নেই একটাও।

এরই একটা অংশে ছোট্ট একটা চালাঘরে বাবাঠাকুরের মন্দির। কেউ বলে পঞ্চানন্দ, কেউ বলে বাবা পঞ্চানন—সাধারণ লোকে জানত বাবাঠাকুর ! এককালে এঁর প্রতিপত্তি ছিল ঢের—শিবরাত্রি আর চড়কের সময় বিরাট হোগলার ম্যারাপ উঠত ওর পাশের মাঠটায়, খুব ধুমধাম খাওয়া-দাওয়া চলত, রীতিমত মেলা বসে যেত। তখন কেউ ভাবে নি যে এ মাঠের জমি একদিন বিক্রি হয়ে যাবে—কারণ বছরের বাকী সময়টা কালকাসুন্দে আর বনডুমুরের জঙ্গলে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত জমিটা, সে জঙ্গল বর্ষায় এমনই ঘন আর উন্নত হয়ে উঠত যে মন্দিরটা পর্যন্ত লোক-চক্ষুর আড়ালে চলে যেত।

আজও অবশ্য তা আড়ালেই চলে গেছে কিন্তু তা জঙ্গলের জন্যে নয়, বিরাট বিরাট চারতলা পাঁচতলা বাড়ীতে ভর্তি হয়ে গেছে চারদিকের সমস্ত জমি। যেখানে যতটুকু জমি পাওয়া গেছে মানুষের লোলুপ দৃষ্টি তা গ্রাস করেছে, হয়ত ঐ সামান্য মন্দিরটা উঠিয়ে ফেলতে পারলেও খুশি হ'ত—নেহাৎ প্রাচীন শিবমন্দির বলেই সাহসে কুলোয় নি, তা ছাড়া দেবোত্তর একটা দলিলও বোধহয় আছে কোথাও।

আগে ঐ চালাঘর প্রতি বৎসর নতুন ক'রে ছাইয়ে দেবার লোকের অভাব হ'ত না। চারদিক থেকে নতুন খড় এসে পড়ত—ঘরামীরাও বিনা পয়সায় খেটে দিয়ে ধন্য হ'ত। এখন আর নতুন ক'রে ছাওয়া তো হয়ই না—বছর বছর বর্ষার আগে গোঁজা দেওয়াও অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ফলে বর্ষায় বাইরের থেকে ভেতরেই বোধহয় জল বেশি পড়ে। দেওয়ালও নোনা ধরে চুনবালি সব খসে গিয়ে কঙ্কাল-দশা প্রাপ্ত হয়েছে। তারই মধ্যে এবড়ো-খেবড়ো একটি পাথরের শিবলিঙ্গ জল ও ফুলের অভাবে শুকনো পড়ে থাকে। অর্থাৎ পূর্ব গৌরবের আর কিছুই নেই—শুধু নামটি ছাড়া। চারদিকের সৌধ-শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে যে গলিটি এঁকেবেঁকে চলে

গিয়েছে আজও তার নাম আছে বাবাঠাকুরতলা লেন। কর্পোরেশনের মধ্যেই এটা—এই গলি থেকে বেরোলেই তিনটে রাস্তার বাস মেলে, পাঁচ মিনিট হেঁটে গেলেই ট্রাম।

এই বাবাঠাকুরের বর্তমান সেবাইত কে—কেউ তা জানে না। শোনা যায় এক-কালে বহু সম্পত্তিই ছিল মন্দিরের, সে লোকটি নানা কৌশলে তা বেচে খেয়েছে। তবে পুজোর ব্যবস্থাটা একেবারে লোপ পায় নি—একটি পুজারী আছে মাইনে-করা। পারিশ্রমিক এবং বেলপাতা ও অর্ঘ্যের চাল বাবদ মাসে সে পায় মবলগ্ পাঁচ টাকা। এ-ছাড়া শিবরাত্রি এবং চড়কে একটি অধিকতর অভিজাত পুজারী আসে। সে দুদিনের যা আয় তার দশ আনা সেবাইতের, পাঁচ আনা সেই নতুন পুজারী ঠাকুরের এবং এক আনা নগেনঠাকুরের পাওনা। তবে নগেনঠাকুর সেইসব অনুষ্ঠান বাবদ যে চাঁদা তোলে—বলা-বাহুল্য তার এক পয়সাও জমা পড়ে না, তার ষোল আনাই ওঠে ওঁর ট্যাঁকে।

হ্যাঁ, নগেনঠাকুরকেও আপনি দেখেছেন বৈকি।

কালো, ঈষৎ বাঁকা ধরণের একহারা চেহারা। বহুদিনের নেশার ফলে চক্ষু কোটরগত, দৃষ্টি স্তিমিত। গোঁফ-দাড়ি কামানোর অভ্যাস আছে কিন্তু সে কুড়ি পঁচিশদিন অন্তর অন্তর। একটি মলিন থান পরনে, গায়ে একটি নামাবলী, তা সেটা খুলে গায়ে দেওয়া হয়ে ওঠে না প্রায়ই, গলায় আলতো জড়ানো থাকে। তার ফাঁক দিয়ে ময়লা পৈতেটা দেখা যায়—তিনভাঁজ হয়ে মালার মত গলায় দুলছে। এস্টেটপত্র বলতে হাতে একটি পুরানো বার্লির কৌটো এবং ব্যাঙ্ক বলতে ট্যাঁক।

এছাড়া ওঁর কোথাও কিছু আছে বলে জানা নেই। বাসা কোথাও নেই, বাবা-ঠাকুরের মন্দিরের মধ্যেই রাত্রে শয়নের কাজটা চলে। গৌরীপট্টের পাশে যে অবশিষ্ট সঙ্কীর্ণ স্থানটি তাইতেই তিনি শুয়ে পড়েন। অবশ্য যেদিন শোবার ইচ্ছা হয়, নইলে অধিকাংশ দিনই নেশার ঘোরে চুপ ক'রে জেগে বসে থাকেন মন্দিরের সরু চাতালে আর খুব বেশী মশা কামড়ালে অনিচ্ছায় একবার হাত নেড়ে বিড়বিড় ক'রে বকেন। বর্ষায় যখন খুব জল পড়ে, তখন আশেপাশের যে কোন বাড়ীর রকে গিয়ে আশ্রয় নেন, পাড়ার ছাগল আর রাস্তার কুকুরদের মধ্যে। কনস্টেবলরা চিনে গেছে, তারাও আর বিরক্ত করে না। সাপ-খোপ বিছের ভয় নেই ওঁর, ময়লা তো চোখেই পড়ে না—পাড়ার একটি বুড়ী ঝি পাঁচ-সাত দিন অন্তর মন্দিরের মধ্যেটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে—নইলে নগেনঠাকুরের কিছুতেই আপত্তি নেই।

ঠাকুরমশাই প্রায়ই আসেন এ-পাড়ায়, কিছু 'সাহায্য' চাইতে। কেউ খুব ধীরে ধীরে খুট-খুট ক'রে কড়া নাড়ছে শুনলেই আপনি বুঝবেন নগেনঠাকুর। তারপর যদি দোর খোলেন কিংবা জানলা দিয়ে উঁকি মারেন তো দেখবেন সেই অপরূপ মূর্তিটি বিনীতভাবে ঘাড়টি বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাকে দেখা মাত্র সে মূর্তি অন্যদিকে চেয়ে খুব চুপি চুপি নৈর্ব্যক্তিক ভাবে কেমন একরকম গড়গড়

ক'রে কথা বলতে শ্বর্ করবেন, ভাল ক'রে না শ্বনলে বোঝাই যাবে না—'আজ্ঞে, বাবাঠাকুরের ওখান থেকে আমি আসছি। জানেনই তো বাবার মন্দিরের অবস্থা, একট্ব কিছ্ব যদি সাহায্য করেন বাবার প্বজার জন্যে!' আজকাল প্বরানো লোকরা প্রায়ই কিছ্ব দেয় না—একেবারে যারা নত্বন এসেছে এ-পাড়ায়, তারা হয়ত কিছ্ব দেয় দ্ব আনা, এক আনা—বড় জোর একটি সিকি।

সে যাই হোক, কোনমতে আনা-বারো হলেই আর নগেনঠাকুর এ-মেহনৎও করেন না। সোজা চলে যান ওখান থেকে আবগারীর দোকান। খানিকটা আফিং সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এবার যান নিভৃতে রেল লাইনের ধারে একটি ছোট খেজ্বর-গাছতলায়। যদি সেখানে কোনদিন গিয়ে পড়েন তো আজও দেখতে পাবেন খান-দ্বই পোড়া ইঁট পাতা আছে, তার মধ্যে আগ্বন জ্বালার চিহ্ন। কোথাও থেকে প্বরোনো মাখন বা জেলির কৌটো সংগ্রহ ক'রে ধ্বয়ে নিয়ে লতা-পাতা জেবলে চাপিয়ে দেন সেটা। তারপর কচি কচি খেজ্বর কিংবা পেয়ারা পাতা সংগ্রহ ক'রে আফিং গ্বলে কি একটা তৈরী করতে বসেন—কেউ কেউ বলে গ্বলির ছিটে।

ভোজনের ব্যবস্থা একটা আছে। অনেকটা পাকাপাকি রকমই। সকালবেলা ঘ্বম ভাঙ্গলে ম্বখে জল না দিয়েই নগেনঠাকুর বেরিয়ে যান বাজারে। যেদিন মনে থাকে সেদিন মন্দিরের ভেতরে পেরেকে টাঙানো ভাঙ্গা ধামাটা বার ক'রে নেন—নইলে নামাবলীটাতেই কাজ চলে। মন্দিরের দ্বদিকে দ্বটো বাজার আছে কাছাকাছির মধ্যেই। দ্বটি বাজারেই ওঁর অপক্ষপাত সমদ্ৃষ্টি নিয়ে আনাজওয়ালাদের কাছে ধামাটি পেতে দাঁড়ান। কোন নত্বন লোক হ'লে একবার, যেন খ্বব অনিচ্ছায় বিড়-বিড় ক'রে বলেন, 'বাবাঠাকুরের তোলা!' কেউ বিনা প্রতিবাদে দেয়, কেউ বা একট্ব গজগজ ক'রে—'বাবা, আর পারিনে তোলা দিয়ে দিয়ে! একবার জমিদারের তোলা, একবার তার সরকারের তোলা, আবার বাবাঠাকুরের তোলা। আমাদের কারবার ক'রে আর লাভ কি? সব বিলিয়ে দিয়ে চলে গেলেই হয়!' বলে কিন্তু দেয় ঠিক, কেউ একটা ঝিঙ্গে, কেউ একটা ঢ্যাড়স, কেউ বা দ্বটো উচ্ছে। একটা বাজার শেষ হ'লে মন্দিরের কাছে একটি ব্রাহ্মণ পরিবার আছে, তাদের গিয়ে দিয়ে আসেন। এদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হচ্ছে একবেলা খেতে দেবে ওঁকে, যখন হোক্। তারপর আর এক বাজারের তোলা তুলে এনে সটান গিয়ে ওঠেন কালীচরণের ময়রার দোকানে। তাদের দশ-বারোটি কর্মচারীর জন্যে রাঁধতেই হয়—সেই বাজার-খরচা অনেকটা বেঁচে যায় ওঁর তোলা-আ্নাজে। তার বদলে ওরা ওঁকে দেয় বাসি রাবড়ির ঝোল দেওয়া বড় এক গেলাস চা এবং খানিকটা মিষ্টি। সে মিষ্টিরও এক ইতিহাস আছে। সারাদিন ধরে রসগোল্লা, সন্দেশ, পান্তুয়া বেচতে বেচতে কিছ্ব কিছ্ব ভেঙে নষ্ট হয়। সেইগ্বলো একটি ভাঁড়ে জমানো থাকে। অবশ্য তার খদ্দেরও আছে দ্ব-চার-জন। দ্ব পয়সা চার পয়সায় যারা অনেকখানি চায় (বেশীর ভাগই আফিংখোর) তারা ঐ বস্তুটির সন্ধান রাখে। কিন্তু তব্ব বাঁচে ঢের, সেই সবটাই সকালবেলা নগেনঠাকুরের পাওনা হয়। এইটিই তাঁর দিনরাতের প্রধান খাদ্য—ভাত খাওয়াটা

হয় খেয়ালমত, মনে পড়লে—কোনদিন বেলা তিনটের, কোনদিন সন্ধ্যা ছটায়। সকালের ভাতই তারা বেড়ে তুলে রাখে, রাত নটায় খেতে এলেও সেই শুকনো ঠাণ্ডা ভাত এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া ডাল তরকারী খেতে হয়।

নগেনঠাকুরের বাড়ী কোথায় তা কেউ জানে না। কোন আত্মীয়স্বজন আছে কিনা তাও জানা নেই। কোথা থেকে কেমন ক'রে এসে জুটলেন—আজ সবাই তা ভুলে গেছে। এক কথায় ওঁর কোন পূর্ব ইতিহাসই জানা যায় না। শুধু একদিন দৈবাৎ যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল সেটা যেমন বিস্ময়কর—তেমনি বিচিত্র। ওঁর রহস্যময় ইতিহাসকে আরও জটিল ক'রে দিয়েছিল ব্যাপারটা। ঘটনাটা এই :—

বেলা দশটার সময় চা খেয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে রোদ পোয়াচ্ছেন নগেন-ঠাকুর—গুটিকতক পরীক্ষার্থী ছাত্র ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আগের দিনের সংস্কৃত পরীক্ষার একটি প্রশ্ন নিয়ে দারুণ তর্ক বাধিয়েছে। কেউ বলছে ওটা এই, কেউ বলছে তা হ'তে পারে না। আপন মনেই বসে ঝিমোচ্ছিলেন নগেনঠাকুর, হঠাৎ এক সময় ঘাড় তুলে অতিকষ্টে চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা ক'রে বললেন, 'য়্যাঁ, কী বললে বাবারা? কোনটাই ঠিক হ'ল না যে। ওটা সপ্তমী বিভক্তি হবে।'

সকলে তর্ক থামিয়ে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। তারপর দু-চারজন পাগলের প্রলাপ ভেবে একটু হেসেও উঠল। কেবল একটি ছেলে প্রশ্ন করল, 'সপ্তমী হবে কেন?'

মুহূর্ত-কয়েক চুপ ক'রে থেকে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে পাণিনির শ্লোক উদ্ধার ক'রে নগেনঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা।

নিজে বলে নিজেই যেন অবাক। খানিকটা ওদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থেকে খুশী হয়ে হেসে উঠলেন আপনমনেই, 'আছে আছে বাবারা—এখনও মনে আছে।'

ছেলেগুলি স্তম্ভিত। অতিকষ্টে একজন নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, 'তাই তো! ওটা তো মনেই পড়ে নি-রে। হেড-পণ্ডিত একদিন বলে দিয়েছিলেন ক্লাসে—মনে আছে?'

আর একটি ছেলে প্রশ্ন করলে, 'আ···তুমি লেখাপড়া জানো নাকি ঠাকুর?'

এবার ভাল ক'রে চাইলেন ঠাকুর, একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতেই বললেন, 'লেখা-পড়া? না—এখন আর কিছুই জানি না। তবে এক সময় কাব্য-ব্যাকরণ পাস করেছিলুম। বি-এতেও সংস্কৃত ছিল, অনার্স পেয়েছি।'

বলে ফেলে যেন নিজেই অপ্রস্তুত হলেন। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে কথাটা এমনই বেমানান শোনাল যে সেটা—এমন কি ওঁর কাছেও ধরা পড়ল।

ছেলেরা কিন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ততক্ষণে, সবাই মিলে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, 'তারপর ঠাকুর?'

'তারপর? দিনকতক মাস্টারীও করেছি। তারও পর বিয়ে করলুম।'

'তারপর ?'

'তারপর—এই। আর কি!' এক রকম ওদের ঠেলেই ঠাকুর চলে গেলেন প্ল্যাটফর্মের বাইরে। ইতিমধ্যে ট্রেন এসে পড়ায় ছেলেরাও আর তাড়া করবার সুবিধা পেলে না।

কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। কেউই পুরোটা বিশ্বাস করলে না। তবে কিছুটা যে সংস্কৃত জানেন ঠাকুর, এটা প্রমাণিত হয়ে যাওয়ায় অনেকেই তারপর থেকে একটু যেন বেশী অনুকম্পার চোখে দেখতে লাগল ওঁকে। পুরুতগিরিও করতে পারে না—আশ্চর্য! লেখাপড়া শিখে ভিক্ষে করে!

সেবার ভাদ্রের শেষের দিকে হঠাৎ নগেনঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কী অসুখ তা কেউ জানে না—কারণ খবরও কেউ পায় নি। নগেনঠাকুর নিজেও বোঝেন নি—শুধু এইটুকু বুঝেছিলেন যে, আর উঠতে পারছেন না কিছুতেই—বুকের মধ্যে কেমন করছে, তার সঙ্গে মাথায় যন্ত্রণা—মাথা তুলতে পারছেন না। শুয়েছিলেন মন্দিরের মধ্যেই, প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়লেও এটা হুঁশ ছিল যে মন্দিরে পড়ে থাকা ঠিক নয়—কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরের চাতালে পড়েছিলেন—। আর কোন কিছু খেয়াল ছিল না তাঁর।

খেয়াল যখন হ'ল তখন দেখলেন কে যেন তাঁর মাথা কোলে ক'রে বসে বাতাস করছে। আর একটু চেষ্টা ক'রে চোখ মেলে দেখলেন তুলসীর মা।

নগেনঠাকুর নিজে খুবই নীচে নেমেছেন—ঘৃণা, লজ্জা, ভয় প্রায় কোনটাই আর নেই—তবু তুলসীর মার কোলে মাথাটা আছে মনে করতে আজও যেন কেমন ক'রে উঠল মনটা। তাড়াতাড়ি মাথাটা তুলে নিতে গেলেন।

'থাক্‌ থাক্‌ ঠাকুরমশাই। বড্ড দুব্বল, উঠতে পারবে নি। আর একটু থাকো। ······কদ্দিন য়্যামন হয়েছে—য়্যাঁ, ঠাকুরমশাই ? আমি তো কাল আত্‌ থেকে এমনি তোমাকে নে বসে আছি। বিকেল থেকেই দেখতিছি, তা আমি বলি বুঝি ঠাকুর নেশাভাঙ ক'রে ঘুমোচ্ছে। আত্তিরবেলাও অমনি পড়ে আছ দেখে সন্দ হ'ল—গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা যেন পুড়তে নেগেছে—কী তাত্‌!'

ঠাকুর অবস্থাটা মনে মনে ভেবে নেবার চেষ্টা করেন।

তুলসীর মা!! তিনি যে তিনি—তিনিও এ জীবটিকে ঘৃণা ক'রে এসেছেন এতকাল।

এককালে এই মন্দিরের কাছেই বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া ক'রে থাকত তুলসীর মা। বৃত্তির মধ্যে ঝি-গিরিটা ওর গৌণ—বেশ্যাবৃত্তিটাই মুখ্য। সে বিষয়ে ওর উদারতারও শেষ নেই। পয়সা যে সবসময় পায় তাও নয়—ওটা নেশার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন বস্তি ভেঙ্গে গেছে—থাকবার একটা বাসাও খুঁজে নিতে পারে নি। সামান্য কিছু জিনিস-পত্র যা আছে অন্য ঝিয়ের কাছে রেখে দেয়, নিজে অধিকাংশ দিনই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটায়। খুব বর্ষা নামলে অম্লানবদনে

ফিমেল ওয়েটিংরুমে ঢুকে বেঞ্চিটায় শুয়ে পড়ে—অজস্র আবর্জনা এবং দুর্গন্ধের মধ্যে। ওরই জন্যে নিশীথ রাত্রে নিম্ন শ্রেণীর মদ্যপদের আনাগোনা চলে প্ল্যাটফর্মে এবং কখনও কখনও ওকে নিয়েই নোংরা কলহেরও সৃষ্টি হয়।

কিন্তু নগেনঠাকুরের ঘৃণা ঠিক এ-জন্যেও নয়। আর একটি বীভৎস দিক আছে ওর চরিত্রের। ওর ছেলে-পুলে হয় প্রায়ই। বৎসরখানেক ধরে তাদের মানুষও করে চেয়ে-চিন্তে, ভিক্ষা ক'রে। তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে বেচে আসে ভিখিরীদের কাছে। কলকাতায় মেছোবাজারের কাছে কোথায় ভিখিরীদের বড় আড্ডা আছে—সেখানে ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে গেলেই তারা কিনে নেয়—পাঁচ, ছয়—কখনও কখনও দরদস্তুর করলে কিছু বেশীও পাওয়া যায়। যেদিনই যায় একটু সন্ধ্যের ঝোঁকে, ঐ টাকায় আসবার সময় এক বোতল মদ আর কিছু ঝাল ফুলুরি কিনে এনে লাইনের ধারে কোন ঝোপের মধ্যে বসে সারারাত ধরে একা একা সেই মদ খায়—বোধ করি সন্তানের শোক ভোলবার জন্যেই। তার পরের দিন ভোরে উঠে একটা ডুব দিয়ে এসে আবার প্রকৃতিস্থ, যে-কে সে-ই। প্রতিবারই এই এক ইতিহাস। কথাটা খুব গোপনও নেই। এ অঞ্চলের প্রায় সকলেই জানে।

নগেনঠাকুর ওর এই নির্মমতাটা, কোন বিচিত্র কারণে, কখনও সহ্য করতে পারেন নি। একবার খুব বকেওছিলেন ওকে, তুলসীর মা হেসে জবাব দিয়েছিল, 'কী হবে গা ছেলেমেয়ে ঠাকুরমশাই ? মেয়ে বড় হয়ে তো এই কাজ করবে—আমি যা করছি ? আর ছেলে বড় হয়ে চোরছ্যাঁচড় হবে, নয়ত ভিখিরী—মানুষ করতে তো পারব না, তার কথাও নেই। লাভের মধ্যে বড় হয়ে নেশার পয়সা না পেলে মাকে ধরেই ঠ্যাঙ্গাবে। তার চেয়ে চোখের আড়ালে যা খুশী হোক্ গে।'

এই তুলসীর মা।

নগেনঠাকুর অচৈতন্যের মধ্যেই একবার শিউরে উঠলেন। সস্নেহে মুখ নিচু ক'রে তুলসীর মা বললে, 'বড্ড কষ্ট হচ্ছে—য়্যাঁ, ঠাকুরমশাই ? চলো বরঞ্চ না হয় একখানা ইক্কাগাড়ী ক'রে তোমাকে ডাক্তারখানায় নে যাই—হেঁটে তো যেতে পারবে নি।'

নগেনঠাকুর ঘাড় নাড়লেন।

'কেন গা ঠাকুর ? পয়সা নেই তাই ? আমার কাছে আজ একটা টাকা আছে। ইক্কাগাড়ীর ভাড়া আমি দোব, তুমি চলো—'

অতিকষ্টে নগেনঠাকুর বললেন, 'আমি এখন উঠতে পারছি না তুলসীর মা—তুই যা।'

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে তুলসীর মা বললে, 'ঠাকুর, একটু চা এনে দোব ? খাবে ?'

'না। তুই যা তুলসীর মা—দিক করিস্ নি।'

তুলসীর মার মুখ এক মুহূর্তের জন্যে ম্লান হয়ে গেল। তারপরই একটা বিচিত্র হাসি হেসে বললে, 'ঠাকুর—তুমি ভাবছ আমার হাতে খেলে জাত যাবে ?

তুমি আগ্ করো নি বাপু, আমি একটা কথা বলি—আমিও বামুনের মেয়ে।'

'য়্যাঁ!' প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠে কোনমতে চোখ মেলে তাকান নগেনঠাকুর। প্রাণপণ চেষ্টায় উঠেও বসেন একবার।

'কী বললি?'

'হ্যাঁ গো ঠাকুরমশাই। সত্যি। আমার বাবা সুন্দুরদের বাড়ী কখনও পা ধুতো নি।'

'আর তুই? তোর এমন দশা?' হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলেন নগেনঠাকুর, 'কেন রে?'

'আমি?' এবার সত্যিই ওর স্বভাব-প্রশান্ত মুখ ম্লান হয়ে গেল, 'সেকথা আর শুনতে চেয়ো নি ঠাকুরমশাই। কিন্তু তুমি একটুন শুয়ে থাকো চুপ ক'রে—আমি দৌড়ে গে একটু চা নে আসি। না না—আর কথা কয়ো নি—তোমার পায়ে পড়ি, হেই ঠাকুর!'

সে সত্যিই দৌড়ে চলে গেল। কিন্তু চা নিয়ে যখন এসে পেঁছিল তখন আর নগেনঠাকুরের কোন জ্ঞানই নেই। বহু চেষ্টাতেও সে ওকে এক ফোঁটা চা খাওয়াতে পারলে না। হয়তো বা চিরকালের মতই খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল ঠাকুরমশাইয়ের। কোনদিনই কিছু আর খেতে হবে না।......

তুলসীর মার কান্নাকাটিতেই পাড়ার লোকজন জড়ো হ'ল। কে যেন একটা টেলিফোনও ক'রে দিলে য়্যাম্বুলেন্সের জন্য।

খানিকটা পরে য়্যাম্বুলেন্স এসে নগেনঠাকুরকে নিয়ে চলে যেতে পুরোনো মন্দির আবার তেমনি নিঝ্‌ঝুম হয়ে গেল। পাড়ার লোক একে একে যে যার কাজে চলে গেল। নেশাখোর পাগলা বামুনের জন্যে বেশীক্ষণ নষ্ট করবে এমন অঢেল সময় কার আছে? কিন্তু গেল না তুলসীর মা। মাটির গেলাসে ক'রে চা এনেছিল ঠাকুরের জন্যে, সেটা পড়ে আছে তেমনই, ওর নিজেরও বাসিমুখে এখনও পর্যন্ত জল পড়ে নি—কিন্তু কোনদিকেই যেন ওর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সারাদিন তেমনি পাথরের মত বসে রইল সে মন্দিরের চাতালে—সেই য়্যাম্বুলেন্স চলে যাওয়ার রাস্তাটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে—ঠিক একভাবে।......

একেবারে যখন ওর হুঁশ হ'ল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। উঠে বাজারের দিকে যেতে ক্যাবলার চায়ের দোকান থেকে ওদের ছোকরা চাকর গৌর ডেকে বলল, 'এই তুলসের মা, চা খাবি না?'

থমকে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে যেন কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলে তুলসীর মা, তারপর বললে, 'না—আজ আর চা খাবো নি!'

পাছন্দসই

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেরই মন খারাপ হয়ে গেল এলার। একেই তো সে ফরসা নয় কোন কালে, এমন কি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণও বলা চলে না তাকে—তার

ওপর এই ক'দিন ঘ্রে ঘ্রে তার যা রং দাঁড়িয়েছে—তাকে অপরের বেলায় হলে এলাই বলত ভূতুড়ে-কালো। মুখখানা বিশেষ ক'রে ; তার সেই চিকচিকে শ্যামল বর্ণের অস্তিত্বও নেই কোথাও, তামাটে হয়ে প্ড়ে যেন মেচেতা পড়ার মতো হয়ে গেছে। মাগো, কী বলবে সুনীল। এই ছিরির বৌয়ের জন্যে সে তার ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গে বিরোধ করেছে—মনে হয়ে নিশ্চয়ই লজ্জা পাবে সে। তারাও কি টিটকিরি কম করবে!

অথচ এলাই বা কী করে। তারও যে এই রকম না ঘুরে উপায় ছিল না। যার অদৃষ্ট খারাপ হয় তার বুঝি সব দিকেই এমনিধারা হয়। কোন্ মেয়েকে নিজের বিয়ের বাজার নিজেকে করতে হয়? ছেলেরা—অনেকেই বাধ্য হয়ে করে, বিশেষতঃ বাড়ির বড় ছেলে হলে তো কথাই নেই, কিন্তু মেয়ে মানে পাত্রীকে ঘুরে ঘুরে ঊনকোটি চৌষট্টি সমস্ত রকম বাজার করতে হয়েছে—ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম। ছেলেরা করলেও এতটা তাদের করতে হয় না—অন্ততঃ কিছু না কিছু বাজার করার লোক জুটেই যায়, আত্মীয়-স্বজন না থাকলে বন্ধুবান্ধবরা এসে দাঁড়ায়, তারা খাটাখাটুনি করে। তার মতো নির্বান্ধব অবস্থায় কারও বিয়ে হচ্ছে এমন আর কখনও শোনে নি এলা, এতখানি বয়সেও।

অথচ তার নেই কে। মা আছেন, বাবা আছেন, ভাই আছে—ছোট ভাই ঠিকই কিন্তু পিঠোপিঠি ভাই, তার বয়স যদি ছাব্বিশ হয় তাহ'লে পলাশেরও চব্বিশের কম হবে না। এ ছাড়াও আছেন মামা, আছে ভগ্নীপতি—যাকে বলে হাটের ফিরিঙ্গী রয়েছে তার—তবু সেই পুজোর ফুল বেলপাতা থেকে শুরু ক'রে হোমের কাঠ ঘি পর্যন্ত তো তাকেই কিনতে হ'ল। বোধ হয় সেগুলো গোছ ক'রে সাজিয়েও দিতে হবে তাকেই।

অথচ তার কি অপরাধ তা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। এত অসহযোগ কেন ওদের। বরং তো সহানুভূতির চোখেই দেখা উচিত। দোষ তো তার কিছু নয় —দোষ তো বাবা-মা'রই ষোল আনা। তাঁরা দেখে-শুনেই ওর প্রথম বিয়ে দিয়েছিলেন। এলার বাবা বিনয়বাবু প্রথম বয়সে কিছুই করেন নি—গান শেখবার ও শেখাবার নাম ক'রেই যৌবনটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন—যতদিন এলার ঠাকুরমার হাতে দু'পয়সা ছিল আর কিছু করবার দরকারও হয় নি তেমন। গান শিখলে শেখাতে পারতেন—কিন্তু নিজেও শিখেছিলেন যেমন তেমন ক'রে—শেখাতেনও ঐ রকমই, ফলে পাঁচ সাত টাকার বেশী টিউশানি জুটত না কোনকালেই। তাতে শুধু বিড়ির খরচাটাই উঠত, নিজের জামা-কাপড়ও হ'ত না।

মায়ের হাতে টাকা থাকলেও খুব বেশী ছিল না, একসময় তা ফুরোল। এইবার চোখে অন্ধকার দেখলেন বিনয়বাবু। কোন ভাল চাকরি পাবার মতো যোগ্যতা তাঁর ছিল না, বয়স বেশী হয়ে গেছে, লেখাপড়া জানেন না, অফিসের চাকরি কে দেবে? কারখানায় গিয়ে লোহা-পেটাও আর সম্ভব নয়, আয়েসের দেহ। সুতরাং অনেক ঘোরাঘুরি এবং অনেক ধরাধরি ক'রে যা জুটল তা হচ্ছে এই—এক সিনেমা-

হলের গেট-কীপারি। পঞ্চাশে ঢুকেছিলেন, এখন বুঝি নব্বুই পান। তাতে সেদিনও সংসার চলত না, আজও চলে না। তবু আর কোথাও কিছু জুটিয়ে নিতে পারেন নি। হয়ত চেষ্টাও করেন নি তেমন। কোনরকম উদ্যমই ছিল না কোনদিন। আর ও বস্তু হঠাৎ আসেও না, যার থাকে তার বাল্যকাল থেকেই থাকে। কাজে-কাজেই চিরদিন পরের মুখ চেয়েই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তখন বড় বোনরা কিছু কিছু দিত, মামার কাছ থেকেও পাঁচ দশ টাকা চাইলে পাওয়া যেত। এখন পলাশ কোন্ সরকারী অফিসে 'ক্লাস-ফোর' কর্মচারী হয়েছে—অর্থাৎ বেয়ারার কাজ করে, সবসুদ্ধ নব্বুই পায় সেও। তবে তাতেও চলে না, চলার কথাও নয়—আসলে অনেকখানিই নির্ভর করে এলার ওপর। সংসার-তরণীর সর্ববৃহৎ ফুটোটাকে ভরাট ক'রে তাকে ভাসমান রাখার দায়িত্ব গত কয়েক বছর ধরে সে-ই বহন ক'রে আসছে।

আর সেই কারণেই আজ এ অসহযোগ। বাবা কথা বন্ধ করেছেন, গুম্ হয়ে বসে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন আর মেয়ের নাম না ক'রে অভিসম্পাত দিচ্ছেন। মা প্রকাশ্যেই গালিগালাজ করছেন। এর চেয়েও অসহ্য—পলাশের মনের যে নগ্ন চেহারাটা তার কথাবার্তায় প্রকাশ পাচ্ছে, তাও এলার কল্পনার বাইরে ছিল এতদিন। সে তার আক্রোশ ঢাকবার বা তাকে অন্য কোন আবরণ দেবারও চেষ্টা করছে না। সে কিছুদিন ধরে নিজের বিয়ের কথাটা ভাবছিল, পাত্রীও বুঝি পাড়াতে ঠিক হয়ে আছে—সে সবই ওলটপালট হয়ে গেল দিদির এই বিশ্রী অশোভন একটা কাণ্ডতে। এই বয়সে বিয়ে ক'রে সংসারী হবার এত লোভ, ছিঃ। বাপ-মা ভাই-বোনদের কথাটা একবারও তার মনে হচ্ছে না।

এলার বাবা বিনয়বাবু যে সিনেমাতে কাজ করেন, সেই হলেরই আর একটি ছোকরা গেট-কীপারের বন্ধু শান্তিপদ, ওখানে আসা যাওয়া করত, বিনাপয়সায় সিনেমা দেখে যেত ফাঁক পেলে। ক্রমে তার সঙ্গে আলাপ হ'ল বিনয়বাবুর। শুনলেন শান্তির বন্ধু মিহিরের মুখে যে, সে ইন্‌সিওরেন্সের দালালি ক'রে মোটা টাকা রোজগার করে। ছেলেটি দেখতে ভাল, কথাবার্তা মিষ্টি, ও'দের পাল্‌টি ঘর। এক-দিন কি খেয়াল গেল—তার কাছে কথাটা তুলে ফেললেন বিনয়বাবু—ও'র বড় মেয়েটিকে বিয়ে করবে শান্তি? খুব লক্ষ্মী আর কাজের মেয়ে। প্রথমটা বারকতক 'না' 'না' করেছিল, তারপর বিনয়বাবুর আমন্ত্রণে একদিন এলাদের বাড়ি চা খেতে এসে এলাকে দেখে গেল—এবং আরও দিনকতক পরে—রাজীও হয়ে গেল। মিহিরের বন্ধু বলে বিশেষ আর খোঁজখবরও করলেন না এ'রা—বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেল। শান্তিপদদের পাকিস্তানে বাড়ি, অভিভাবকরা সব সেখানেই থাকেন, সুতরাং কথাবার্তা সব শান্তিকেই বলতে হ'ল। সে মেসে থাকে, ঘর ঠিক করতে দেরি হবে। উৎসাহের আধিক্যে বিনয়বাবুই প্রস্তাব করলেন যে যতদিন না ঘর পাওয়া যায় ওরা এখানেই থাকবে, বিবাহের যা কিছু কৃত্য তাও এখানে থেকেই হবে।

তখন এলার বয়স ঠিক ষোল। তার কিছু জানবার বা ভাববার কথা নয়, ও

বয়সে মেয়েদের বিয়ের কথা শুনলে আনন্দই হয়, এলারও হয়েছিল। বিয়েটাও বিয়ের মতোই হয়েছিল। কারণ বিনয়বাবু যত গরীবই হোন, আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই অবস্থাপন্ন। পিসী এবং মাসীরা এক একটা গয়না দিয়ে গা সাজিয়ে দিলেন, মামা দিলেন দানের বাসন। এলার ঠাকুরমা তাঁর সর্বশেষ সম্বল পাঁচশ'টি টাকা বার ক'রে দিলেন নগদ পণ হিসেবে। বাকীটা ধারদেনা ক'রে বিনয়বাবুই করলেন।

বিয়ের পর সাত-আটটি দিন ছিল শান্তিপদ। তারপরই একদিন শেষরাত্রে এলার গয়না ও বরপণের টাকা নিয়ে সে অন্তর্হিত হ'ল। তখন এঁদের খেয়াল হ'ল যে তার দেশের ঠিকানাটা পর্যন্ত এঁরা ভাল রকম জানেন না। বাবার নাম একটা বলেছিল বটে, গ্রামের নামও—কিন্তু পুরো ঠিকানা কিছু বলে নি। আরও আবিষ্কৃত হ'ল যে মিহিরও কিছু জানে না—ইন্‌সিওরেন্সের দালাল হিসেবেই এসেছিল, তারপর আলাপ-পরিচয়টা বন্ধুত্বের মতো হয়ে দাঁড়ায়—এই পর্যন্ত। মিহির তাকে সিনেমা দেখাত বিনা-পয়সায়, তার বদলে শান্তি ওকে মধ্যে মধ্যে হোটেলে বা খাবারের দোকানে খাওয়াত—তাতেই মিহিরের ধারণা হয় যে তার অবস্থা ভাল। নইলে শান্তির মেসের ঠিকানাটাও কোনদিন খোঁজ করে নি। হাজরা রোডের দিকে কোন্ মেসে থাকত, এইটুকু জানে। দেশের ঠিকানা তো জানেই না। সে ওর বিশ্বাসবা ধারণানুসারেই এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে—বিনয়বাবুর উপকার হচ্ছে মনে ক'রে, এর মধ্যে এত কিছু গোলমাল থাকতে পারে তা একবারও ভাবে নি।...এদের ধমকে সে সেই কথাটাই বার বার বলতে লাগল।

'ঐ তো ছিরির পোড়াকাঠ দেহ আর ঐ পোড়ার মুখ। তাও একঘণ্টা ধরে আয়নাতে না দেখলে বুঝি আর আশ মেটে না!...মুখে আগুন, যার বিচ্ছিরি হয় তার কি সকল বিচ্ছিরি হয়!'

মায়ের কথাগুলো চাবুকের মতো এসে পড়ে এলার দিবাস্বপ্ন ভেঙে যায়। তাড়াতাড়ি সরে আসে সে আয়নার সামনে থেকে। আয়নাতে নিজের মুখের অবস্থা দেখেই চোখে জল এসে গিয়েছিল তার, এখন বুঝি আর কোনমতেই বাধা মানে না। মাও বলছে এই কথা। নিজের মা। তাহ'লে সে পরের ছেলে কি ভাববে!... সে প্রাণপণে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সেইটেই সামলাবার চেষ্টা করে, এদের সামনে চোখের জল ফেলবে না সে—কিছুতেই না। অন্ততঃ এরা না দেখতে পায় ওর চোখের জল। সে বড় অপমান। আরও টিটকিরি করবে ওরা, আরও জোর পেয়ে যাবে।

আর কতক্ষণই বা!

এক ঘণ্টা পরেই সুনীল আসবে—একসঙ্গে রেজেস্ট্রী অফিসে যাবে ওরা। সেখান থেকে কালীঘাট। কালীঘাট থেকে ফিরে ঘণ্টা চার পাঁচ থাকতে হবে যা—তারপর আবার সুনীল আসবে সন্ধ্যাবেলায়। তখন ভটচায্যি মশাই নারায়ণ এনে

হোম ক'রে বিবাহের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানটা সেরে দেবেন ; দু'চারজনকে আসতে বলেছে সে, বন্ধুবান্ধব হিতাকাঙ্ক্ষী যারা আছে এ পাড়ায়, একটু খাওয়া-দাওয়া—তারপরেই সে চলে যাবে স্বামীর সঙ্গে চিরকালের মতো এ বাড়ি ছেড়ে। আর নয়, আর কোনদিন স্বেচ্ছাসুখে এ বাড়ি সে আসবে না, মা কালী করুন যেন আসতে না হয়। এক যদি কোনদিন শোনে ওর মায়ের খুব বাড়াবাড়ি অসুখ করেছে কি বাবার—তাহ'লেই আসবে, ফল কি কোন 'ফুড' নিয়ে এসে দেখে চলে যাবে, থাকবে না একদিনও।

কানে গেল, ও ঘর থেকে বাবা বলছেন, 'হবে না কেন, যেমন তোমার শিক্ষা পেয়েছে তেমনি তো হবে। এ বংশের শিক্ষা পেলে অন্যরকম হ'ত।...অত ভাবন আর অত আত্মসুখের চিন্তা এ বাড়িতে নেই।...আমি বাজি রেখে বলতে পারি—ও আমার মেয়ে নয়। আমার জন্মিত্ হ'লে কিছুতেই অমন সাথপর হ'ত না—অমন খান্‌কীর মতো আচার-ব্যাভারও শিখত না।'

মা ফোঁস ক'রে উঠলেন, 'হ্যাঁ, তা আর নয়, কী আমার খড়দর মা গোসাঁইয়ের সন্তান সব এলেন রে।...আত্মসুখী হ'ত না। আত্মসুখ ছাড়া আর কিছু জানো তুমি? কখনও সংসারের কথাটা ভেবেছ, আমার কথা কি যাদের তুমি এ সংসারে আনছ সে ছেলেমেয়ের কথা? চিরকাল আয়েস ক'রে আড্ডা দিয়ে দিন কাটালে—কী ক'রে সামনে পিণ্ডির থালা ধরে দোব দু'বেলা, তাও কোনদিন ভাবলে না। ...আবার মুখ নাড়তে এসেছ বংশ বলে। বংশের কথা যেন আর কখনও না উঠতে দেখি।...মহৎ বংশের মেয়ে বলেই এত লাঞ্ছনা সহ্যি ক'রে এই সোয়ামীর ঘর করছি—অন্য বংশের মেয়ে হ'লে কবে অমন সোয়ামীর মুখে নুড়ো জেবলে দিয়ে চলে যেত।...তোমার মেয়ে বলেই কারও পানে না চেয়ে, কোন কথা না ভেবে নিজের সুখের জন্যে এই বুড়ো-বয়সে এমন কেলেঙ্কারি করছে।'...

ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে যাবারই কথা, এমন ঝগড়া তো কতবারই বাধতে দেখল সে এই ধরনের কথা উপলক্ষ ক'রে—কিন্তু আজ বাধবে না আর—তাও সে জানে। কথার ধারা তার দিকেই মোড় ঘুরেছে, এখনই দু'জনে একমত হয়ে যাবেন, সমবেত কটূক্তিটা তার ওপরই বর্ষিত হ'তে থাকবে। এমনিই হচ্ছে ক'দিন। বাবা আর মাতে অদ্ভুত মনের মিল হয়ে যাচ্ছে প্রচন্ড বিরোধের মুখেও।

আশ্চর্য! বাবা তাকেই আত্মসুখী বলছেন!

অথচ তার কথাটা যে ও'রা কেউই ভেবে দেখছেন না, দেখেন নি কোনদিনও, সেটা কি একবারও মনে পড়ছে না ও'দের?

তার জীবনটা কীভাবে কাটল এতকাল, কীভাবে কাটছে—সে কথাটা?

শান্তিপদর অন্তর্ধানের পর তো ও'রা বেশ নিশ্চিন্তই ছিলেন, ঘরের কাজ করবে, দু'বেলা দু'মুঠো খাবে—এইটুকুই ধরে নিয়েছিলেন। মেয়ের বরাত—নইলে তাঁরা তো আর চেষ্টার ত্রুটি করেন নি! এখনও সেই বরাতই ভরসা ক'রে

থাক—এই কথাই বলতেন বার বার আত্মীয়-মহলে।

ওর পক্ষে যে কোনদিন কিছু উপার্জন করা সম্ভব তাই তো মাথাতে যায় নি কারও।

সে তো তা-ই সম্ভব করেছে, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়।

দু'বেলা দু'মুঠো ভাত—তাও তো জুটত না সে সময়। দিনের পর দিন ওর মাতে আর ওতে উপবাসে কাটিয়েছে। মা আত্মীয়মহল থেকে দু টাকা এক টাকা 'ধার' বলে ভিক্ষা চেয়ে আনতেন, এ তো সে নিজের চোখেই দেখেছে কতদিন, আর তার জন্যে কত লাঞ্ছনা, কত ফৈজৎ সইতে হয়েছে তাঁকে।

সেলাইয়ের কাজ ক'রে মা কিছু উপার্জনের চেষ্টা করেছিলেন দিনকতক কিন্তু সে সুবিধে হয় নি। বাজারের থেকে কম মজুরি না নিলে তাঁকে কেউ কাজ দিত না, অথচ সেটুকু মজুরিরও বেশির ভাগ আদায় হ'ত না। পুজোর সময় কঙ্কাল-সার চেহারা হয়ে যেত মায়ের দিনরাত কল চালিয়ে—অথচ তাতে ঐ কটা দিনও সচ্ছলে কাটত না।

এইসব দেখেই সে একদিন মরীয়া হয়ে কাজের সন্ধানে বেরিয়েছিল।

ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়া মেয়ে, সেটুকু পড়ার ছাপও আর তখন মাথায় ছিল না তার। কী কাজ করতে পারে? কে কাজ দেবে ঐ একেবারে মূর্খ মেয়েকে? সেদিন তার সে চেষ্টায় এঁরাও হেসেছিলেন।

একে-ওকে-তাকে ধরতে ধরতে পাড়ার সুনিমাদির কাছে গিয়ে পড়েছিল একদিন। সুনিমাদি বড় একটা হাসপাতালের মেট্রন। তিনিও বালবিধবা—তিনি ওর দুঃখটা বুঝেছিলেন সেদিন। তিনিই ওকে ঠিকে ঝি হিসেবে সেই হাসপাতালে ঢুকিয়ে নিজের সঙ্গে সঙ্গে রেখে নার্সের কাজ শিখিয়েছিলেন। সুনিমাদির সে স্নেহ, সে উপকার জীবনে ভুলবে না এলা। তিনিই যথার্থ মায়ের কাজ করে-ছিলেন।

সেদিনই কি এঁরা কম লাঞ্ছনা করেছিলেন ওর।

সে নাকি এঁদের বংশের নাম ডুবিয়েছিল, এঁদের মুখে চুনকালি দিয়েছিল। এ বংশের মেয়ে হয়ে হাসপাতালে কাজ করতে যাওয়ার থেকে নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরাও ঢের শ্লাঘ্য। ...একথা শুধু বাপ-মাই বলেন নি, পিসী মাসী মামা সবাই বলেছিলেন। কিন্তু সেদিনও কারও কথা শোনে নি এলা। ভাগ্যে শোনে নি—শুনলে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হ'ত শুধু তাকে নয়—এঁদেরও। তবে সে অন্য কারণে, অনাহারের জ্বালাতেই।

সেই সময়ই এলা নাম নিয়েছিল সে। নইলে ওর বাড়ির নাম সন্ধ্যা। বংশের নাম ডোবানোর কথাটা সে গল্প করেছিল সুনিমাদির কাছে। সুনিমাদি হেসে বলেছিলেন, 'বেশ তো, নামটাই যদি ওঁদের কাছে এত বড় হয়—নিজেদের মেয়ের চাইতেও—সে নামটা ওঁদেরই থাক বরং। আর হাসপাতালের খাতায় অন্য নাম, পদবী দিয়ে দিই।'

এলা নামটাও তাঁরই দেওয়া। সে নামের মানেও জানে না সে। সুনিমাদি বলেছিলেন, 'খুব মডার্ন নাম দিয়ে দিলুম তোকে—রবীন্দ্রনাথের নায়িকার নাম। এই নামের জোরেই দেখিস তোর কাজে উন্নতি হবে!'

তা হয়েছিল কিনা এলা জানে না, তবে সুনিমাদির চেষ্টাতে অনেকটাই উন্নতি হয়েছিল এটা ঠিক। খুব দ্রুতই হয়েছিল।

প্রথম প্রথম তিনিই ওকে কাজ যুগিয়েছেন। সাত টাকা আট টাকা ক'রে রোজ পেয়েছে সে। গরীবের সংসারে অভাবনীয় উপার্জন। কিন্তু তাতেই থামেন নি সুনিমাদি। বড় বড় দুটো নার্সেস ইউনিয়নে ওকে ভিড়িয়ে দিয়েছেন। সেখানে মেম্বার ক'রে নিতে পারেন নি তাঁরা কিন্তু পাসকরা নার্সের সব সুবিধাটাই পেয়েছে বরাবর। সেই রেটই মিলেছে। শুধু শতকরা প'চিশ টাকা কেটে নিয়েছেন তাঁরা। একটা ইউনিয়নের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভদ্রমহিলা—অনিলাদি, তিনি ঐ টাকাটা ব্যক্তিগতভাবে পাবেন এই বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে গোপনে ওকে বহু কাজ যুগিয়েছেন। তাতেই ওর কখনও কাজের অভাব হয় নি। দৈনিক দশ-বারো টাকা উপার্জন করেছে সে মাসের মধ্যে অন্ততঃ কুড়ি প'চিশ দিন। ইউনিয়নের মেম্বার পাসকরা নার্সদেরও বহুদিন ক'রে বসে থাকতে হয় মধ্যে মধ্যে কাজের অভাবে—কিন্তু এলাকে একাদিক্রমে কখনও এক সপ্তাহের বেশী বসে থাকতে হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

তারপর এই কাজটা। সুনিমাদি মৃত্যুর আগে আরও এই একটি মহৎ উপকার ক'রে গেছেন। তাঁর সর্বশেষ স্নেহোপহার।

এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বাড়িতে ওকে পাঠিয়েছিলেন অনিলাদি, সেখানে বড় অপ্রস্তুতে পড়তে হয়েছিল। বড় অপমানিত হয়েছিল ও। তাঁরা ওর সার্টিফিকেট দেখতে চেয়েছিলেন—বলেছিলেন বাড়িতে গিয়ে কাগজপত্র নিয়ে আসতে। মুখ চুন ক'রে ফিরে আসতে হয়েছিল ওকে সেখান থেকে। অবশ্য অনিলাদি অনেক ঝগড়া করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে—বলেছিলেন যে তিনি যাকে পাঠিয়েছেন জেনেই পাঠিয়েছেন, সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে পাঠিয়েছেন। তাকে সন্দেহ করা মানে ইউ-নিয়নকেই সন্দেহ করা। কিন্তু তাঁরাও সোজা সোজা জবাব দিয়েছিলেন। বলে-ছিলেন, মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে তাঁরা কাউকেই খাতির করতে প্রস্তুত নন। আরও বলেছিলেন, ইউনিয়নেরই এগুলো লক্ষ্য করা উচিত, উচিত কাগজপত্র সঙ্গে দিয়ে পাঠানো—যাতে কোন প্রশ্ন না কোথাও উঠতে পারে। টাকা তো তাঁরা কিছু কম দিচ্ছেন না। পাসকরা নার্সের ফী যখন দিচ্ছেন তখন সে নার্স পাসকরা কি না তা যাচাই ক'রে নেবার অধিকার তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। অগত্যা অনিলাদিকে সে পার্টিই ছেড়ে দিতে হয়েছিল রাগের ভান ক'রে। কারণ তারপর অপরকে পাঠালে এই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেত, অনিলাদি যে ইউ-নিয়নকে ফাঁকি দিয়ে কমিশন খান তাও ধরা পড়ত।

এই কথাটাই একদিন সুনিমাদির কাছে গল্প করেছিল সে, ম্লান হেসে মুখ নীচু ক'রে তাঁকে জানিয়েছিল ঘটনাটার আনুপূর্বিক ইতিহাস।...

শুনতে শুনতে চোখ ছলছল ক'রে এসেছিল তাঁর। সুনিমাদি তাকে যথার্থই ভালবাসতেন। পৃথিবীতে একমাত্র তাঁর কাছেই বোধ হয় নিঃস্বার্থ ভালবাসা পেয়েছিল এলা। আজ যদি সুনিমাদি বেঁচে থাকতেন তাহ'লে কি আর ভাবনা ছিল! বোধ হয় নিজের বাড়িতে সব যোগাড়যন্ত্র ক'রে ঘটা ক'রেই বিয়ের ব্যবস্থা করতেন এলার। এলারই অদৃষ্ট, নইলে এই মোটে ছেচল্লিশ বছর বয়সেই বা তাঁর অমন স্ট্রোক হবে কেন! তাও তো কত বুড়ো বুড়ো লোক দুটো তিনটে স্ট্রোকও কাটিয়ে উঠছে—সুনিমাদিই বা প্রথম স্ট্রোকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবেন কেন?

যাই হোক—তবু ভাগ্যে যাবার আগে—মাত্র দিন দশ বারো আগে তাও—ওর এই চাকরিটি ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের এক উদ্বাস্তু রাজার বাড়িতে কাজ, রাজার নব্বুই বছরের বুড়ী মার সঙ্গে সঙ্গে থাকা, এই মাত্র। সে বুড়ী এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ, নিজেই তিনি বাথরুমে যান, স্নান করেন, পুজো করেন, এখনও বিনা চশমায় খবরের কাগজ পড়েন। শুধু কবে কোন্ মান্ধাতার আমলে একদিন তাঁর বুকের কাছটায় ব্যথা করেছিল, সেই থেকে এই ব্যবস্থা হয়েছে। সম্ভবতঃ বুড়ীর নিজেরই টাকা এটা—এ ব্যবস্থা তাঁরই—শুধু ছেলে একদিন এসে কথাবার্তা কয়ে কাজটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। দিনে ও রাত্রে পালা ক'রে একজন থাকবে কাছে কাছে, সেবার দরকার হ'লে করবে—নইলে করবে না। পনেরো দিন 'নাইট' ও পনেরো দিন 'ডে'—নিজেরা সুবিধেমতো পালা ঠিক ক'রে নেবে এরা। এখানেই খাওয়া (দিনে বা রাত্রে যে যখন থাকবে), চা জলখাবার সব—আড়াইশ' টাকা মাইনে।

হাত বাড়িয়ে স্বর্গই পেয়েছিল সেদিন এলা। কাজ কিছুই নয়। দিনে তবু বুড়ীর সঙ্গে গল্প করতে হয়—রাত্রে পাশের ক্যাম্পখাটে শুয়ে ঘুমোনো। বুড়ী রাত চারটেয় উঠে স্নান ক'রে পুজোয় বসেন—ওদের ডাকেনও না কোনদিন, অনেক সময় টেরও পায় না ওরা। বলতে গেলে বিনা পরিশ্রমে একটা বড় অফিসারের মাইনে পাচ্ছে!...

বোধ করি সেইটেই কাল হয়েছে। কারণ এই উপার্জনের বেশির ভাগই সংসারে ঢেলেছে সে বোকার মতো। বাবা এখন দেশী কাপড় আর আদ্দির পাঞ্জাবি ছাড়া পরেন না। মাকে সে-ই জোর ক'রে ধনেখালির শাড়ি পরানো অভ্যেস করিয়েছে। পলাশ অফিসে পরে যেতে পারে না লজ্জায়—কিন্তু পাড়াতে যখনই বেরোয় সে, কর্ডের প্যাণ্ট আর টেরিলিনের শার্ট পরে। মেজ বোন রেখার বিয়ের সমস্ত টাকা সে-ই দিয়েছে, মায় সারা বছরের তত্ত্ব পর্যন্ত। গত সাত আট বছর ধরে এতটাকা রোজগার করা সত্ত্বেও যে সে আজ প্রায় নিঃস্ব, এই বিয়ের বাজার করার পরে যে তার হাতে পুরো একশ'টা টাকাও নেই, সে কার জন্যে—কাদের জন্যে? এই বিপুল

অর্থের সবটাই তো সে খরচ করেছে বাপ-মা-ভাই-বোনদের সুখে রাখবার জন্যে।

আজ যদি সেই সুখেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে থাকেন তাঁরা, সেই সুখের আকস্মিক ব্যাঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠবারই তো কথা। হয়ত এ অবস্থায় এলাও এমনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে থাকত। তাঁরা যে আজ মেয়ের জীবনের দিকটা দেখতে পারছেন না, তারও জীবনে সুখী হবার, গৃহী হবার অধিকারটার কথা ভাবতে পারছেন না, সেজন্যে হয়ত এলাই বেশী দায়ী।

ঐ তো—একটু আগেই পলাশের আস্ফালন শুনতে পাচ্ছিল সে, 'কী বলব যে পাড়ায় আমাদের একটা পোজিশ্যন আছে, পাড়ার লোকেরাই আসবে, নইলে এ বাড়িতে বসে ঐ বিয়ের ঠাট্ করা বার ক'রে দিতুম একেবারে। ঐ পুরুত আর তার শালগ্রামকে যদি মেরে না তাড়াতুম তো আমার নামই নেই—আর সেই সঙ্গে যাঁরা আহ্লাদ ক'রে খেতে আর মজা দেখতে আসছেন তাঁদেরও। ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে ছেড়ে দিতুম সক্কলকার।...কিন্তু নেহাৎ মানের কান্না হয়ে পড়েছে যে—তাই মুখ বুজে আছি, দাঁতে দাঁত চেপে।'

ঐ পলাশই গত মাসে অদ্ভুত রূপ ধরেছিল। ওর অফিসের বন্ধুদের সবাইকে সে একদিন সিনেমা দেখাবে—ত্রিশটা টাকা দরকার। হাসিমুখেই দিয়েছিল টাকাটা এলা, যদিও পরে শুনেছিল যে, অফিসের বন্ধুদের নয়, এই পাড়ারই দুটি মেয়েকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিল পলাশ, সেখান থেকে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রীটের কোন রেস্তোরাঁয় খেয়ে ট্যাক্সি ক'রে লেক ঘুরে বাড়ি ফিরেছে। সে যাই হোক, সেদিন টাকাটা হাতে পেয়ে পলাশ যে কথাটা বলেছিল তা আজও মনে আছে তার, এই তো সেদিনের কথা, ভোলবার কোন কারণও নেই, বলেছিল, 'অনেক তপস্যা ক'রে তবে তোমার মতো দিদি পায় লোকে। মা কালীকে তো তাই জানাই—যেন জন্মে জন্মে তোমার ছোট ভাই হয়ে জন্মাতে পারি।'

ঐ পলাশই পরশু চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে মারতে এসেছিল। মারতও—যদি না ছোট বোন বেলা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ওকে এপাশের ঘরে এনে দোর বন্ধ ক'রে দিত। তবু দোরে দমাদম লাথি মেরেছিল কিছুক্ষণ—কিন্তু দরজাটা ভাঙলে এখন তাঁদেরই সারাতে হবে এই ভেবে মা-ই খুব বকাবকি ক'রে উঠেছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হ'তে হয়েছিল। বেলাও খুব খুশী নয় এলার এ বিয়েতে, কারণ তার নিজের বিয়ের প্রশ্নটা সুদূরপরাহত হয়ে পড়ল এতে ক'রে। সে বিষয়ে সে রীতিমতোই সচেতন—তবে সে নাকি কোনরকম মারধোর অশান্তি সহ্য করতে পারে না, তাই সেদিন বাধা দিয়েছিল পলাশকে। তাছাড়া সে এখনও আইবুড়ো বসে থাকতে পলাশের বিয়ের ইচ্ছাটাও তার ভাল লাগে না—সেজন্যে অত্যন্ত তির্যকভাবে সে একটু খুশীও তার এই আশাভঙ্গের সম্ভাবনায়। 'বেশ হয়েছে—এবার বিয়ে করো কী ক'রে করবে!' আড়ালে সে প্রায়ই বলে ওঠে আপন মনে।

কিন্তু এসবের আজই শেষ। আর নয়। আর তাকে এসব সহ্য করতে হবে না।

আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। বিধাতা এতদিন পরে মুখ তুলে চেয়েছেন।

সুনীলের সঙ্গে হঠাৎ একদিন আলাপ হয়ে গিয়েছিল ওর এক সহকর্মিণী নার্সের বাড়িতে—তার দাদার সঙ্গে বুঝি এক অফিসে কাজ করে। তারপর সুনীলই সে আলাপটা জিইয়ে রেখেছে। আর যাওয়া-আসার পথে বার বার দেখা হয়েছে, মধ্যে মধ্যে অবসরকালে লেক-এও গেছে তার সঙ্গে। ঠিক সঙ্গে হয়ত নয়—আগের কথামতো সেখানেই দেখা হয়েছে। তারপর সিনেমাতেও গেছে দু'জনে। জিনিসটা অশোভন না হয়ে পড়ে সেদিকে সুনীলেরই বেশী সতর্ক দৃষ্টি—গোড়ার দিকে কাউকে না কাউকে সঙ্গে নিত সে, অপর একজনকে। তারপর, আর একটু ঘনিষ্ঠতা হ'তে সে সঙ্কোচটুকুও গেছে—ইদানীং শুধু দু'জনেই ঘুরত। ওর ছুটির সময় এসে দাঁড়িয়ে থাকত সে পথের মোড়ে, ঘুরে বেড়িয়ে বাজার ক'রে বাড়ি ফিরত যখন—তখন ওদের গলির মুখটা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যেত। এমনিই ঘুরত এক-সঙ্গে, একসঙ্গে লেক-এ বেড়িয়ে বেড়াত বা পাশাপাশি বসে গল্প করত। প্রেমালাপ যাকে বলে তা হয় নি কোনদিনও। কোনদিন কোন অশোভন বা অসঙ্গত আচরণ করে নি সুনীল। বরাবরই একটা ভদ্র ব্যবধান বজায় রেখে গেছে। এমন কি সিনেমা-হলের অন্ধকার অন্তরঙ্গতাতেও অন্যায় কোন সুযোগ নেবার চেষ্টা করে নি। শুধু পরস্পরের সাহচর্যেই তারা খুশী ছিল, পরস্পরের সঙ্গ ভাল লাগত তাদের—এই মাত্র।

তারপর একদিন সুনীলই প্রস্তাব করল। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কোন কারণ খুঁজে পায় নি সেদিন এলা। কেনই বা করবে? যাকে সে এতদিন ধরে দেখছে, যার আচার-আচরণ কথাবার্তা সবই তার পছন্দ—তার সঙ্গে যদি চিরদিনের মতো জীবনের গ্রন্থি বাঁধতে পারে, তার সঙ্গে জড়াতে পারে নিজের জীবন তো, সে জীবন সার্থক ধন্য মনে করবারই তো কথা। মুখে কোনদিন কেউ কাউকে কথাটা না বললেও ওরা যে পরস্পরকে ভালই বেসেছে তাতে তো সন্দেহ নেই—নইলে দু'জনেরই অমন নেশার মতো পেয়ে বসত না দু'জনের সঙ্গ। কিছুই তো চায় নি কোনদিন সুনীল—লুটে নিয়ে সরে পড়বার মনোবৃত্তি কোনদিন প্রকাশ পায় নি তার আচরণে। সব দিক দিয়েই ঈপ্সিত পাত্র। দেখতেও সে খারাপ নয়, বরং এলার তুলনায় ভালই। আরও খবর নিয়েছে ও, যে বাড়িতে সে থাকে সেটা পৈতৃক। বাবা-মা নেই, ওরা চার ভাই-ই এখন মালিক সে বাড়ির। আলাদা ক'রে কিছু ভাগ হয় নি, তবে এক-চতুর্থাংশ তার প্রাপ্য, চাইলেই পাবে। কলকাতার বাড়ি যত ছোটই হোক, আর খুব ছোটও নয়—আটখানা ঘর আছে ওপর-নীচে মিলিয়ে—তার সিকি অংশের দাম খুব কম নয়। এ ছাড়া সে কাজও করে ভাল—কাঁকিনাড়া না শ্যামনগর কোথায় একটা বড় জুট মিলের কলকাতার অফিসে কাজ করে সে, অর্থাৎ কেরানীবাবুই, মিস্ত্রী কি কুলিকাবারী নয়। এর চেয়ে ভাল পাত্র তার মতো মেয়ে আর কি কামনা করতে পারে?

রাজী হয়েছিল এলা সাগ্রহেই। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর অসুবিধাটার কথাও

জানিয়েছিল। আইনতঃ বাধার কথাটা। কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সুনীল। সে তো একটা বিরাট জুচ্চুরি—লোকটা ঠকিয়ে চলে গেছে, তার ওপর দশ বছর নিরুদ্দেশ। সে বিয়ে বিয়েই নয়, কোন আইনেই সিদ্ধ নয় সে বিয়ে। তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

তবু খুঁতখুঁত করেছিল এলা। তখন সুনীল তাকে নিয়ে গিয়েছিল একদিন তার এক বন্ধু উকিলের কাছে। ছোকরা উকিল কিন্তু তাঁর অফিসঘর এবং আলমারি ভরা মোটা মোটা আইনের বই দেখে শ্রদ্ধা হয়েছিল এলার। তিনিও সব শুনে বলেছিলেন, আইনতঃ শান্তিপদ আর কোনদিন সে বিবাহের দাবি করতে পারবে না। তবু যদি এলার কোন সংশয় থাকে, সে-ই ইংরেজী বাংলা দুটো খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিক। সে বিজ্ঞাপন তিনিই লিখে দেবেন—কাগজে ছাপার ব্যবস্থাও তিনিই করবেন। 'কিছু-একটা-করা-হচ্ছে' এই বোধটা আসাতে নিশ্চিন্ত হয়েছিল এলা। টাকাটা গুনে দিয়ে এসেছিল সে-ই। সুনীলই দিতে চেয়েছিল কিন্তু এলা দিতে দেয় নি। বলেছিল, 'এখন থেকে আমার বোঝা আর তোমাকে টানতে হবে না। আর এ তো আমার বাবা-মা'র কৃতকর্মের ফল—এ বোঝা তুমি টানবেই বা কেন? তোমার কিসের দায়?'

সুনীল হেসেছিল শুধু একটু—স্নিগ্ধ মধুর হাসি। বাধা দেয় নি আর। সে হাসিতে যে কী আশ্বাস আর কী ভালবাসা তা এলা কাউকে বোঝাতে পারবে না। এর জন্যেই বুঝি তার অন্তরাত্মা পিপাসার্ত হয়ে ছিল এতকাল। মনের একটা প্রধান অংশ মরুভূমির মতো খাঁ-খাঁ করছিল এমনি একটি আশ্বাসের অভাবে।

সুনীল কথা কয় কম। বাক্যের শূন্যতা নীরব সহানুভূতিতে পূর্ণ ক'রে দেয়। সে না-বলা কথা দেহের কানে না হোক মনের কানে শুনতে পায় এলা। আরও ভাল লেগেছে সুনীলকে এই জন্যে যে, ভালবাসা কখনও জাহির করতে চায় নি সে। একবারও বলে নি সে নিজে থেকে যে, এলার জন্যে কতটা ত্যাগ স্বীকার করছে সে। এলাই শুনেছে ভাসা ভাসা—পাড়ার অন্য একটি মহিলার মুখে, তারপর জেরা ক'রে সবটা জেনেছে সুনীলের কাছ থেকে; জাহিরও যেমন করে নি, মধুর মিথ্যার প্রলেপে ঢাকতেও যায় নি রূঢ় সত্যকে। অপকটে এবং সহজেই বলেছে। না, দাদাদের কারও মত নেই, বৌদিদের তো নয়ই। ছোটভাইও রাজী নয়। তারা কেউ কোন সহযোগিতা করবে না। বৌ-ভাত বা কোনরকম উৎসবও সম্ভব নয় ও বাড়িতে। এলাকে প্রস্তুত থাকতে হবে বহু দুঃখের জন্য। হয়ত তাকে কেউ বরণ কি অভ্যর্থনা করবে না, হয়ত কেউ কথাও কইবে না ভাল ক'রে। হয়ত তাকে—মানে তাদের পৃথক ক'রে দেবে ওরা—সে সব পরিণামের জন্যেই যেন প্রস্তুত থাকে এলা।

বলে—বলা শেষ ক'রে আবারও একটু হেসেছিল সুনীল। অত্যন্ত মধুর হাসি। সহজেই বলেছিল কথাগুলো। সহজেই হেসেছিল।

কিন্তু অত সহজে হাসতে পারে নি এলা। অত সহজে নিতেও পারে নি

কথাটাকে। ভয় তার নিজের জন্যে নয়, ভয় সুনীলের জন্যেই। এমনভাবে সকলকে ছেড়ে তাকে নিয়ে যাওয়া—এটা কি ঠিক হচ্ছে? এলার মতো তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্যে জীবনকে বিড়ম্বিত করছে না তো সুনীল? সে কি পারবে এতটা সইতে? এখনও সময় আছে হয়ত—ভেবে দেখুক ভাল ক'রে।

ঠিক এই ভাষায় হয়ত বলতে পারে নি এলা, তবে এই কথাগুলোই বোঝাবার চেষ্টা করেছিল সে।

কিন্তু তার কথা শেষ করতে দেয় নি সুনীল, ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'আমি একবারই ভেবে দেখি, বুঝলে, কনে? আমি যাকে পছন্দ ক'রে নিয়ে যাচ্ছি সে আমার ওপর বিরূপ না হ'লেই হ'ল—আর কে কী ভাবল বা বলল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কিসের জন্যে? আর যে আমার মনের-মতো, তার জন্যে এটুকু ত্যাগ করতে পারব না? ওঁদের মনের-মতো পছন্দ-করা কাউকে বিয়ে করলেই বা ওঁরা কতদিন তার ওপর সদয় থাকতেন তারই বা লেখাপড়া কি? এমন বিয়েই তো বেশী হয়, মানে অভিভাবকদের পছন্দ-করা বৌ—তবু ক'দিন সংসার একত্র থাকে বলো তো? ভায়ে ভায়ে প্রীতি যদি থাকে, বৌয়ে বৌয়ে প্রীতি থাকা সম্ভব নয়। সে প্রীতি যখন যাবেই তখন দু'দিন আগে বা পরেতে কি এসে গেল? ও নিয়ে বাজে বাজে মন খারাপ ক'রো না। মাথা ঘামাবারও দরকার নেই।'

এলার মনে হয়েছিল সেই রাস্তাতে দাঁড়িয়েই একটা প্রণাম করে সে সুনীলকে। নিতান্ত সহস্র দৃষ্টির সামনে বলেই পারে নি। সুনীল লজ্জায় পড়বে হয়ত।

একটা অসহ্য সুখের বেদনায় যেন মনটা টনটন ক'রে উঠেছিল।

সুখেও যে ব্যথা লাগে—এই প্রথম বুঝল এলা।

ইচ্ছে হয়েছিল একটা ভয়ানক কিছু করতে।

তার এই আনন্দের এই সুখের বার্তাটা একটা অভিনব কিছু, অকল্পিত কিছু অভাবনীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর লোককে জানিয়ে দিতে চেঁচাতে ইচ্ছে করেছিল তার—চিৎকার ক'রে লোককে ডেকে বলতে ইচ্ছে করেছিলএই সৌভাগ্যের খবরটা।

আবার ভয় করেছিল—এত সুখ তার পোড়াকপালে সইবে তো?

সঙ্গে সঙ্গেই মনকে প্রবোধ দিয়েছিল। তার ঠাকুরমা বলতেন, 'ভগবান টানা সুখ বা টানা দুঃখু কাউকে দেন না। জীবনে দুটোই আসে। প্রথম বয়সে দুঃখু ভোগ করাই ভাল।' নিজের উদাহরণ দিতেন, 'দ্যাখ্ না—রাজার রাণী হয়ে ছিলুম, বুড়ো বয়সে সব্বস্ব খুইয়ে মুখ্খু অক্ষ্যাম ছেলের হাতে পড়ে কী দুর্দশা। তুই এ বয়সে দুঃখু পাচ্ছিস ভালই রে, ভোগান্তিটা বয়সের জোর থাকতে থাকতে কেটে যাচ্ছে। পরে তোর ভাল হবে, দেখিস!'

ঠাকুরমার কথাটাই ফলল। এতকালের এত দুঃখের পর নিশ্চয়ই ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।

হাসি পেয়েছিল তার পলাশের কথাটা মনে পড়ে। কোনমতেই বিয়ে বন্ধ করতে না পেরে একদিন ভাংচি দেবার চেষ্টা করেছিল। দুর্বলের শেষ অস্ত্র-আস্ফালনের মতো, মজ্জমান ব্যক্তির তৃণ-অবলম্বনের মতো। ওকে শুনিয়ে মাকে বলেছিল, 'বেশ হচ্ছে মা, একদিক দিয়ে ভালই হচ্ছে। কী লোকের পাল্লায় পড়েছে তা তো জানে না। আমাদের অফিসের মজুমদারবাবু ওদের পাড়ায় থাকে—বলে, ও তো মাতাল, কতদিন মদ খেয়ে মাতলামি করতে দেখেছি। মাতাল, জুয়াড়ী—কী নয় ও? রেস খেলে খেলে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দেনায় ডুবে গেছে। দাদারা খেতে দেয় তাই খেতে পায়—এক পয়সা সংসারে আনতে পারে নাকি? কাবলিওলার কাছে দেনা, তারা পয়লা তারিখে গিয়ে অফিসের দোরে দাঁড়িয়ে থাকে, লাঠি দেখিয়ে টাকা আদায় করে।…তাও নাকি ওর দাদারা বলেছে, আর অমন ক'রে ওকে টানতে পারবে না—পৃথক ক'রে দেবে। এক বিয়ের তো ঐ হাল—তবু সে গয়না-টাকার ওপর দিয়ে গেছে, এ ওর ছাল ছাড়িয়ে যদি চামড়ার দরে বেচে না খায় তো কী বলেছি!'

হায়রে! এতই বোকা এলা যে, ঈর্ষিত স্বার্থান্ধ লোকগুলোর কথা শুনেই জীবনের এতবড় সৌভাগ্যকে হেলায় ছেড়ে দেবে?

এই লোক! দেবতার মতো লোক! এ যদি মাতাল জুয়াড়ী হয় তো ভগবানকেও বিশ্বাস নেই। সত্যিই তার ওপর ভগবান দয়া করেছেন বলেই এই লোক তাকে দয়া ক'রে পায়ে ঠাঁই দিতে রাজী হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গে বাদ ক'রে, সারা পৃথিবীকে একদিকে আর ওকে একদিকে ক'রে এমনভাবে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবার কী দরকার ছিল তার? তার কি পাত্রী জুটত না? বাংলাদেশে পাত্রীর অভাব? মাতাল বদমাইশ ছেলেরও তো কত ভাল ভাল মেয়ে জুটে যায়। তবে? কিসের লোভে তাকে নিয়ে যাচ্ছে সে—ভালবাসা ছাড়া?

আর—এই কারণেই জেদ চড়ে গেছে তার। না করুক বিয়ের কোন আয়োজন—বিয়েটা যাতে কতকটা বিয়ের মতো মনে হয় সুনীলের—সে ব্যবস্থা করবেই, যতটা পারে। না-ই বা দিলেন তার বাবা জামাইয়ের উপযুক্ত দান—সুনীলের দাদারা না-ই বা পাঠালেন কিছু, অভাব সে রাখবে না কোন কিছুরই।

তার সঞ্চয় সামান্যই, সংসারের সবগুলো ফুটোর ওপর ছাতা ধরতে গিয়ে উপার্জনের প্রায় সবটাই বেরিয়ে যায়। প্রয়োজন ছাড়াও আদর আবদার আছে। সুতরাং থাকার মধ্যে মান্ধাতার আমলের এক সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের হিসেবে ডাকঘরে শ'তিনেক টাকা পড়ে ছিল। এ ছাড়া—সে বিয়ে করতে যাচ্ছে শুনে এবং আর চাকরি করবে না শুনে যেখানে কাজ করে সেখানকার মনিব সেই বুড়ি আড়াইশ' টাকা নগদ এবং একটা সিল্কের শাড়ি দিয়েছেন। এই ভরসা ক'রেই বাজার করা তার। তবু সে সবই করেছে। নিজের জন্যে লাল বেনারসী, লাল সায়া, জামা। ফুলশয্যার শাড়ি। এ ছাড়াও চার-পাঁচখানা সাধারণ শাড়ি। পুরনো সব কাপড়ই সে ছোট

বোনকে দিয়ে যাবে। অথচ শ্বশুরবাড়ি গিয়েই স্বামীকে বলা কাপড় কিনে দিতে—ছিঃ। তার চেয়ে লজ্জার আর কিছু নেই। কাপড় জামা সায়া। সবই চার-পাঁচ প্রস্থ। জুতো তো আছেই। এ ছাড়া টয়লেট। নিজের এবং সুনীলের। তার জন্যেও সে দেশী ধুতি, গরদের জামা, গেঞ্জি, তোয়ালে, মোজা-জুতো, আয়না-চিরুনি, তেল-সাবান, এসেন্স, রুমাল, সব খুঁটিয়ে কিনেছে। বিয়েতে বসবার জন্যে গরদও কিনেছে একখানা, তবে সে আসল গরদ নয়, সস্তা কাশী সিল্কের জোড়। সতেরো টাকা দাম। কী দরকারই বা বেশী দামী গরদের, ঐ একবার তো পরা, আজকালকার ছেলেরা কে আর অত গরদ পরে পুজো করছে?

একটা ট্রাঙ্ক কিনেছে সে, একটা স্যুটকেস। ট্রাঙ্কে নিজের সব নতুন জিনিস এবং স্যুটকেসে বরের—পরিপাটি ক'রে সাজিয়েছে। আজ তার যথার্থ আপসোস হচ্ছে এতদিন টাকা জমায় নি বলে। আর কিছুও যদি হাতে থাকত তো একটা ঘড়ি আর একসেট বোতাম দিত সে সুনীলকে। তাহ'লে আর কেউ কিছু বলতে পারত না, ওর দাদাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যেত।

কিন্তু উপায় নেই। ঐ কটা টাকা তো মোটে পুঁজি! এর মধ্যেই রেজেস্ট্রী করার খরচা রাখতে হবে। বিয়ের বাজার আছে। ভটচার্যি মশাইয়ের দীর্ঘ ফর্দ, সবই কিনেছে সে। তবে ভটচার্যি মশাই তাকে রেহাই দিয়েছেন, বলেছেন যোগাড়-যন্ত্র যা কিছু—মানে নৈবেদ্য ইত্যাদি গোছগাছ সব তিনিই ক'রে নেবেন এসে। তার জন্যে অবশ্য দক্ষিণা নেবেন একটু বেশী—কুড়ি টাকা। তা হোক, তার যে অন্য উপায় নেই। এ বাড়িতে কেউ যে সাজিয়ে-গুছিয়ে দেবে এমন তো একজনও নেই। কী ভাগ্যি যে বাবা বলেন নি—এ বাড়িতে হবে না ওসব। বলতেন বোধ হয়, যদি এলা তাঁর অনুমতি চাইতে যেত। অনুমতি না নিয়েই সে পাড়ায় বহু লোককে বলে এসেছে। এখন এসব বন্ধ করা মানে পাড়ার মধ্যে মাথা হেঁট। সেই জন্যেই কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হচ্ছে বিনয়বাবুকে।

অনেক লোককে বলেছে সে। অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাট জন। তাদের জন্যে জল-খাবারের আয়োজনও করতে হয়েছে। বাড়িতে রেঁধে খাওয়ালেই ভাল হ'ত। কিন্তু সে তো আর সম্ভব হ'লই না। অগত্যা প্লেটের ব্যবস্থাই করেছে সে। নিজে মুটের মাথায় দিয়ে মাটির ডিস গেলাস কিনে এনেছে। ভাল দোকানে অর্ডার দিয়েছে সিঙ্গাড়া, রাধাবল্লভী আর আলুর দম—সন্দেশ, ছানার পোলাও, রাজভোগ। একটা চপ কি কাটলেট এর সঙ্গে রাখতে পারলে ভাল হ'ত কিন্তু আর সঙ্গতি নেই ওর।

এইগুলো শেষ পর্যন্ত ওকেই সাজিয়ে দিতে হবে কিনা—বিয়ের কনেকে—সে ভাবনা একটা ছিল। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে ওকে বাঁচিয়ে দিলেন ওর এক ঠাকুরমা, বাবার মামী। তিনি নিজে থেকে স্বেচ্ছায় বলে পাঠিয়েছেন, এবেলা পারবেন না, সংসারের সব ভার তাঁর মাথায়, তবে ওবেলা এসে দাঁড়িয়ে থেকে সব করিয়ে নেবেন ঐ ওদের দিয়েই। বলেছেন পাড়ার মিত্তির গিন্নীর কাছে, তাঁকে দিয়েই খবর পাঠিয়েছেন, 'দেখি তো বৌয়ের কত বড় আস্পদ্দা, আমার মুখের

ওপর না বলুক দিকি। আর ঐ বিনেটা—আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে গিয়ে তবে আধেক দিন হাঁড়ি চড়েছে—তা মনে নেই ? মনে না থাকে মনে করাতে জানি আমি। চামার, চামার সব। আহা রে, বাচ্ছাটা নিজে নিজের বে'র বাজার ক'রে ক'রে গেল সারা হয়ে—কেউ একটা কাঠি নেড়ে উগ্‌গার করছে না গা। ওরা কি মানুষ ? মেয়েটাও যে তেমনি বোকা, যথাসব্বস্ব এনে সংসারে ঢেলে ওদের লোভ বাড়িয়ে দিয়েছে যে। তোর দশ আঙুলে খাটা, গু-মুত ঘাঁটা পয়সা—তুই জমা, তা নয়। বাপ ভাইকে লবাবী করাচ্ছেন। তেমনি হয়েছে এখন। মোদ্দা তুমি বলে এসো বৌমা, কোন ভয় নেই, সন্ধ্যেবেলা যাতে মান-ইজ্জত বাঁচে সে ভার আমার।'

তা শুনে আবার ওর মা মন্তব্য করেছেন, 'হ্যাঁ, তাই হোক, পাড়া থেকে আপনার লোক ধরে এনেই কাজ করাক। বলে, মা না বিয়োলো বিয়োলো মাসী, ঝাল খেয়ে ম'লো পাড়া প্রিতিবেশী। হোক না, কে কত করে দেখি না।'

তা যা হোক, শেষ মুহূর্তে কী ভাগ্যি মান বাঁচিয়ে দিলেন ওর এক ছোট কাকী। নিজের নয়, বাপের খুড়তুতো ভাইয়ের স্ত্রী। পাশের বাড়িতে থাকেন, এদের সঙ্গে আগে, মানে অভাবের সময় বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, ইদানীং বছর তিন-চার আবার আসা-যাওয়া হয়েছে। সুনীলের সঙ্গে যখন সে একাই রেজিস্ট্রী অফিসে যাচ্ছে তখন নিজে থেকেই প্রশ্ন করলেন, 'ও কী রে, তোর সঙ্গে কেউ যাচ্ছে না ?'

ম্লান নত মুখে জবাব দিয়েছিল এলা, 'কে আর যাবে কাকীমা। জানেনই তো—'

তিনি বলেছিলেন, 'এক মিনিট দাঁড়া তোরা—আমি যাচ্ছি।'

ঠিক দু'তিন মিনিটের মধ্যেই কাপড়টা পাল্‌টে একটা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি।

কে জানে কেন, সুনীলের এটা তত পছন্দ হয় নি। সে মুখটা ঈষৎ একটু বিকৃত করেছিল। বলেছিল, 'কী দরকারই বা। আমাদের যখন আপনার কেউ নেই, এ পৃথিবীতে দু'জনকেই শুধু দু'জনের অবলম্বন হয়ে দাঁড়াতে হবে তখন জোর ক'রে পরকে ধরে, আত্মীয় দাঁড় করানোর মানে হয় না। এ যেন নিজেকে নিজে ঠকানো, মনকে আঁখি ঠারা।'

কিন্তু এলার খুব ভাল লেগেছিল। তবু তো আপনার জন। মিথ্যে, পাতানো পাড়া-সম্পর্ক ও নয়—একটু রক্তের সম্পর্ক আছে। ছিটেফোঁটা হ'লেও বাপের বংশের রক্ত—স্বগোত্র। কাকীমাই সাক্ষী হিসেবে সই করলেন। সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে কালীঘাটে পুজো দিলেন। একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে ওদের চা মিষ্টি খাওয়ালেন নিজের খরচেই।

সন্ধ্যাবেলা সেই ঠাকুরমার সঙ্গে তিনিও এসে দাঁড়ালেন। বাবা বাড়িতে ছিলেন না, যথারীতি কাজে গিয়েছিলেন। কিন্তু এঁরা এসে দাঁড়াতে মা আর অসহযোগিতা করতে সাহস করলেন না। বোধ হয় চক্ষুলজ্জাই হ'ল একটু—অথবা এঁদের

'বাক্যি'র ভয়। কিংবা প্রথম সন্তানের জন্যে মন-কেমনই করল শেষ পর্যন্ত, কে জানে। সম্প্রদানের সময় তিনিই সম্প্রদান করলেন। লোককে খাওয়ানো, চা খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করলেন তারপর। রেখা আসে নি, তার নাকি শ্বশুরবাড়িতে এমনিই মুখ দেখানো ভার হয়েছে এই বিয়েতে, তবে বেলা খুব ছুটোছুটি করল। পলাশ যতটা সম্ভব বাইরে কাটিয়ে এসেছিল, কিন্তু এলা বুদ্ধি ক'রে তার সেই 'মনের-মতো'টিকে নেমন্তন্ন করায় খানিকটা পরে সে-ও এসে জুটল। ওরই মধ্যে হাল্কা পরিবেশে, এমন কি ঈষৎ একটু হাসিঠাট্টার মধ্যেই সন্ধ্যার পর্ব চুকল।

রাত এমন কিছু বেশী হয় নি—যখন ওদের ট্যাক্সি এসে সুনীলদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল—তখন পুরো সাড়ে দশটাও বাজে নি হয়ত, আশপাশের বাড়িতে রেডিও বাজছে তখনও, অধিকাংশ জানলাতেই আলো—কিন্তু এ বাড়িতে অন্ধকার থমথম করছে তখনই। মনে হ'ল এ বাড়ির সকলেই শুয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ, তাদের এটা দুপুর রাত।

রাস্তার আলোতেই এলা লক্ষ্য করল সুনীলের সদা-প্রশান্ত মুখেও বিরক্তির ছায়া। হয়ত ঠিক এতটা আশঙ্কা করে নি সে, এতখানি উপেক্ষা বা অপমানের জন্যে প্রস্তুত ছিল না সে-ও।

অনেক ডাকাডাকি ও বিস্তর কড়া নাড়ানাড়ির পর ওদের নীচের তলায় যে বৃদ্ধা ভাড়াটেটি থাকেন তিনিই এসে দোর খুলে দিলেন। কোথায় কোন্ মেয়ে-স্কুলে মাস্টারি করেন তিনি, নীচের ক্লাসে পড়ান—মাইনে কম, সুতরাং সকাল-বিকেল টিউশানি করতে হয়। একবেলা কুকারে খান, রাত ন'টা নাগাদ বাড়ি ফিরে একটু দুধ গরম ক'রে খেয়েই শুয়ে পড়েন, বাতের শরীর উঠতে বেরোতে কষ্ট হয় তাঁর। ঘুম ভাঙ্গলেও এতক্ষণ ওঠেন নি তাই, ওপরতলার লোকেদেরও ঘুম ভাঙ্গবে এই ভরসাতে ছিলেন। নিতান্ত ডাকাত-পড়াপড়ি শব্দেই উঠতে হয়েছে শেষ অবধি। অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে এসে দোর খুলে দিয়েই গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন, একটি কথাও কইলেন না কিংবা কোন সম্ভাষণও জানালেন না।

কনেচন্দন বেনারসী পরা বউ, নতুন ট্রাঙ্ক স্যুটকেস বাসনের ঝুড়িও উঠল অথচ সঙ্গে অপর কোন লোক নেই—শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভার গোড়া থেকেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, এখন সে রীতিমত অস্থির হয়ে উঠল। ব্যাপারটা ভাল নয় নিশ্চয়ই, হয়ত শেষ পর্যন্ত একটা হাঙ্গামাতেই পড়তে হবে। ভাড়া চুকিয়ে তাকে বিদায় করবার জন্যে সেও চেঁচামেচি জুড়ে দিল।

অগত্যা রাস্তার ওপরেই মালগুলো নামিয়ে নিয়ে তাকে বিদায় করতে হ'ল। এলাই ব্যাগ খুলে ভাড়া চুকিয়ে দিল। সুনীল একটু হেসে বলল, 'আছে নাকি তোমার কাছে? আমি পাটভাঙা জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়েছি, ব্যাগটা আনতে ভুলে গেছি—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আছে বৈকি।' কৃতার্থই হয়ে গেল এলা, এটুকু কাজে লাগতে পেরে।

প্রাপ্য ভাড়ার ওপরেও একটা আধুলি বেশী দিয়ে দিল সে।

তারপর দু'জনে ধরাধরি ক'রে মালপত্র ভেতরে আনতে হ'ল নিজেদেরই।

চাকর একটা আছে বুড়ো-মতো—সে নাকি আবার রাতকানা, একটু কালাও। তাছাড়া সে থাকে ওপরের চিলে-কোঠায়, তাকে ডেকে তোলাই এক হাঙ্গামা। অথচ সে কাজেও লাগবে না তেমন।

নিজেদেরই অগত্যা একটা একটা ক'রে মাল তেতলায় সুনীলের ঘরে তুলতে হ'ল। সংকীর্ণ সিঁড়ি, ভারী মাল নিয়ে তোলার অসুবিধা। এলার খুবই বিশ্রী লাগছিল। আরও খারাপ লাগছিল এইজন্যে যে, সে নিজেকে যেন সুনীলের কাছে অপরাধী বোধ করছিল। ওর জন্যেই তার এই নিরানন্দ বিবাহ, এই বরণহীন, অভ্যর্থনাহীন আত্মীয়-স্বজনের কলকোলাহলহীন নবজীবনের সূচনা।

কিন্তু সুনীল ততক্ষণে তার চিরাভ্যস্ত প্রশান্তি ফিরে পেয়েছে। সে বরং যেন মজাই পাচ্ছিল এইভাবে সংসার-যাত্রা শুরু হওয়ায়। ট্রাঙ্কটা নিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে হেসে বলল, 'কেমন জব্দ? ভার বইবার খুব শখ তোমার না? ভার বইয়ে ছেড়ে দিলুম গোড়াতেই!'

সুনীলের ঘর। তাদের ঘর! তাদের শয্যা।

কিন্তু যেমন এলোমেলো তার আসবাবপত্র, তেমনি ময়লা বিছানাটা। আশ্চর্য, একটু ফরসা চাদরও পেতে রাখে নি কেউ! মনটা যেন দমে গেল এলার। পরক্ষণেই মনে হ'ল, কে-ই বা পাতবে। তার বাড়ির মতো এখানেও তো অসহযোগ। সুনীল পুরুষমানুষ, তার পক্ষে নিজের ফুলশয্যার বিছানা গুছিয়ে পেতে রাখা কি সম্ভব?

তার অনুতাপ হ'ল, এতই করল—একটু বিছানাও কিনলে পারত নতুন। কথাটা মনেই হয় নি তার। অবশ্য টাকাই বা বাঁচল কৈ?

একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল, 'তোমার চাদর ওয়াড় কোথায় থাকে? দাও দিকি, এটা একটু পালটে ফেলি—'

সুনীল যেন অবাক হয়েই জবাব দিল, 'আবার কোথায় থাকবে, যা থাকে ঐ বিছানাতেই। রবিবারে রবিবারে সাবান কাচা হয়, তা এ রবিবারে কে জানে কেন কাচে নি দেখছি। অত খেয়ালও ছিল না আমার।...তুমি এত কিনেছ, একটা বেডকভার কেনো নি নতুন?'...

অপ্রতিভভাবে এলা বল্লে, 'না, অতটা খেয়াল হয় নি গো!'

সে সেই বিছানাই যতদূর সম্ভব টেনেটুনে ঝেড়ে ভদ্রলোকের মতো করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বালিশ তো মোটে একটাই। তাকে কি তাহ'লে পাশ-বালিশ মাথায় দিতে হবে নাকি?...না, সুনীলের সাংসারিক জ্ঞান নেই আদৌ। এটা তো ভাবা উচিত ছিল তারই। তার ঘরের অবস্থা এলা কি ক'রে জানবে? সে ভেবেছিল উলটে, সুনীল একটু ফুল-মালার যোগাড় ক'রে রাখবে। আজ তাদের বাসরশয্যাও বটে ফুলশয্যাও বটে। তার কথাটা মনে হয়েছিল, কিন্তু সে একেবারে শেষ

মুহূর্তে। তখন আবার নিজেই নিজের ফুলশয্যার মালা আনতে যাওয়া—সে কি সম্ভব। তাছাড়া—সুনীল যে এটুকুও করবে না, তা সে ভাবে নি। কোথায় একটা যেন সূক্ষ্ম অভিমান বোধ হ'তে লাগল তার।

প্রচণ্ড একটা হাই তুলে সুনীল বলল, 'নাও, এবার কাপড়চোপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ো। মিছিমিছি রাত ক'রে লাভ নেই।...কাল হয়ত তোমাকেই হাঁড়ি-হেঁসেল ধরতে হবে সকালে। এদের মতলব কি এখনও তো বুঝছি না।'

সে ধুতি ছেড়ে তার ময়লা লুঙ্গিটাই পরতে যাচ্ছিল। এলা বলল, 'ওমা, ঐ লুঙ্গি পরবে কি—তোমার জন্যে নতুন ধুতি এনেছি যে।'

সে স্যুটকেসটা খুলে ওর সামনে ধরে একটু আনন্দগর্ব লজ্জামেশানো হাসির সঙ্গে বলল, 'দেখেছ, কত কি কিনেছি তোমার জন্যে? তোমার ফুলশয্যার তত্ত্ব।'

একটু প্রসন্নই হ'ল সুনীলের মুখ। সেও হেসে বলল, 'তাই দেখছি। কিন্তু তা বলে এখন আমি ঐ জরিপাড় ধুতি পরে সঙ্ সাজতে পারব না। ঐ কাপড় পরে কি শোওয়া যায়?—আড়ষ্ট আড়ষ্ট লাগবে। যেদিন শ্বশুরবাড়ি নেমন্তন্ন করবে সেইদিন বরং পরব।'

নিমেষে ম্লান হয়ে গেল এলার মুখ।

ওরা কি নেমন্তন্ন করবে কোনদিন জামাইকে? কে জানে।

সেও একটা সাধারণ শাড়ি পরে এসে বিছানায় বসল। একটু হেসে বলল, 'শোব যে তা তো আমার বালিশের ব্যবস্থা রাখো নি। তোমার হাতে মাথা রেখেই কি সারারাত চলবে? সীতাদেবীর মতো?'

'হ্যাঁ, তা বটে। ওটা খেয়াল হয় নি। একটা বালিশ দেখছি কিনতে হবে। তা তুমি বরং কাল যখন ফিরবে তখন গড়িয়াহাটের মোড় থেকে কিনে এনো।'

'আমি ফিরব? আমি আবার কাল কোথা থেকে ফিরব?' এলা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

'ও, কাল আর ডিউটিতে যাবে না বুঝি? দেখি তাহলে আমিই না হয় আসার পথে—। তা তুমি ক'দিন ছুটি নিয়েছ?'

'ক'দিন ছুটি কি গো। সে চাকরি তো কাল আমি ছেড়ে দিয়ে এসেছি। চাকরিই করব তো তোমার সংসার কে দেখবে?'

'চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছ! সে কি? এ কাণ্ড করতে তোমাকে কে বললে! আমাকে কৈ বলো নি তো এসব পাগলামির কথা।'

অকস্মাৎ যেন সুনীলের সেই চিরকালের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যায়, ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তার মুখের চেহারাটা।

তারপর হাতের সবে-ধরানো সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'কাল ভোরে উঠেই গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা ক'রো—যেমন ক'রে হোক, চাকরিটা ফিরে পাওয়া চাই। হাতে-পায়ে ধরতে হয় তাও ধরো।'

এই প্রথম এলার মনে হয় কোথায় একটা কি বড় রকমের গোলমাল হয়ে গেছে।

তার কেমন ভয়ও করতে থাকে। বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে। এই দীর্ঘদিনের পরিচয়ের মধ্যে সুনীলের এমন উগ্র চেহারা সে আর কখনও দেখে নি।

সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'কিন্তু আমি যে—মানে আমি যে নতুন লোক দিয়ে এসেছি তাদের। সে তো আজ থেকে কাজ করছে—'

'বেশ করেছ। মাথা কিনেছ। তাহ'লে—এদিকে চলবে কিসে? আমার বলে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দেনায় ডুবে আছে, মাসকাবারে যা হাতে পাই তাতে বিড়ি-সিগারেটের খরচাই ওঠে না। দাদার হাতে কাল সকালেই কিছু টাকা ধরে দিতে না পারলে কালই ভেন্ন ক'রে দেবে। তখন ডান হাত মুখে উঠবে কিসে?'

তারপর একটু থেমে বলল, 'টাকা কী আছে হাতে? একশ' টাকা কাল সকালেই আমার চাই!'

'টাকা?' আড়ষ্ট শুকিয়ে যাওয়া অবাধ্য জিভটাকে টেনে টেনে কোনমতে বলে এলা, 'টাকা বোধ হয় আর মোটে চার-পাঁচটা পড়ে আছে ব্যাগে। পোস্টাপিসেও গোটাদশেক। সবই তো এইসব—মানে বিয়েতে খরচ করেছি।'

'কেতাথ করেছ! মাথা কিনেছ একেবারে!' কুৎসিত কটূক্তি ক'রে ওঠে সে, কদর্য একটা গাল দেয় এলাকে।

'তুমি কি ভেবেছ এত কান্ড ক'রে এতদিন ধরে তোমার পেছনে ঘুরে, সকলের কাছে নিচু হয়ে তোমাকে ঘরে এনেছি তোমার রূপে মোহিত হয়ে? কেন, মেয়ে কি আমার আর জুটত না? আয়নায় নিজের মুখ দেখেছ কোনদিন? বয়স তো আমার সমানই হবে বোধ হয়।···কিসের জন্যে এসব করলুম আমি? তোমার ঐ চাকরির লোভেই তো। তোমাকে বসিয়ে আমি খাওয়াতে পারব না—সোজা কথা। চাকরি ছেড়ে থাকো তো—আবার সেই তোমার কে অনিলাদি না কে আছে তার কাছে যাও, ইউনিয়নের অফিসে গিয়ে ধন্না দাও। টাকা আনতেই হবে—আমার কাছ থেকে এক পয়সাও পাবার আশা ক'রো না। আনো, খেতে দাও ভালই—ঘর করতে রাজী আছি। নইলে পেছনে লাথি মেরে তাড়াতে আমার এক মিনিটের বেশী দেরি হবে না। মোকদ্দমা ক'রেও কোন সুবিধে করতে পারবে না—আগের বিয়ে নাকচ হয় নি —এ বিয়েই সিদ্ধ নয়। সাফ সাফ কথা আমার কাছে—বুঝে সমঝে কাজ করো!'

মাথার মধ্যে কিসের এত আওয়াজ হচ্ছে বুঝতে পারে না এলা। কে যেন ড্রাম পিটছে না? কানেই বা অবিরল এ ঝাঁঝাঁ শব্দ কিসের?

বাপের বাড়ি বা আত্মীয়মহলে ফেরার কোন উপায় নেই, এ কথা বলাও চলবে না। একটি কথাও কাউকে বলতে পারবে না মুখ খুলে। সে পথ কোথাও খোলা রাখে নি সে।

হয় কাল থেকেই আবার ছুটোছুটি করতে হবে—থান পরে, শুধু হাতে নার্স সেজে বেরোতে হবে আবার—নয়তো শেষ আশা-ভরসা লেকের জল।

আশপাশের বাড়িতে রেডিও থেমে গেছে অনেকক্ষণ, নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে

চারিদিক। দূরে বড় রাস্তাতেও আর গাড়িঘোড়া বিশেষ চলছে না।

গভীর শান্তি চারিদিকে, গভীর নিস্তব্ধতা। ওদের ঘরের মধ্যেও আর বিশেষ কোন শব্দ নেই। আর একটা গালাগাল দিয়ে ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়েছে সুনীল পাশবালিশ জড়িয়ে।

শুধু এলার মাথার মধ্যেই সেই ড্রাম পেটানো আওয়াজটা হয়েই চলেছে এখনও।

এক প্রহরের খেলা

হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেল অসীম। মনটা যেন সজোরে কে নাড়া দিয়ে গেল। এরকম কখনও বোধ হয় নি ওর। কখনও যে হবে তাও জানা ছিল না। জীবন সম্বন্ধে বেপরোয়া সে চিরদিন, কোথাও কোনখানে শিকড় গাঁথতে দেবে না সে মনকে —এই তার চিরদিনের প্রতিজ্ঞা। সেই কারণেই—খেলা হিসেবে, একটা মজা হিসেবে—কৌতুক করতেই এ কাজে এগিয়েছে সে, নইলে সত্যিই কিছু পয়সার এত অভাব তার নেই। সে একটু 'খরচে' বটে, বছরে একমাস পাওনা ছুটিতে বিদেশে ভ্রমণ তার বাঁধা, আর তাতে অন্তত হাজারটি টাকা খরচা হয়ই; এছাড়াও পুজো ইত্যাদি পর্বে চার-পাঁচটা দিন ছুটি হাতে পেলেই সে বেরিয়ে পড়ে কোথাও না কোথাও, এবং তাতেও বেশ কিছু খরচা হয়ে যায়; কারণ ভ্রমণ করতে বেরিয়ে কার্পণ্য করতে পারে না সে কোনদিনই,—তবে তার আয়ও নিতান্ত মন্দ নয়। বড় সওদাগরী অফিসে কাজ করে, মাইনেও পায় শ' চারেকের মতো। আরও উন্নতি হ'তে পারে তার অনায়াসেই, একটু দায়িত্বপূর্ণ আর পরিশ্রমের কাজ করতে রাজী হ'লেই তার মাইনে লাফ দিয়ে বেড়ে যেতে পারে—প্রমোশন তো কয়েকবার সেধেই এসেছে—সে নিজেই ইচ্ছা ক'রে তা নেয় নি। অত ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় যেতে রাজী নয় সে, ওসব তার বরদাস্ত হয় না। ভগবান যখন অল্প বয়সে তার বাবা-মাকে কেড়ে নিয়ে তাকে সকল ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করেছেনই—তখন আর কেন? এমনি হেসে-খেলে—অর্থাৎ যথেষ্ট ঘুমিয়ে, বেড়িয়ে, আড্ডা দিয়ে, ক্রীকেট ম্যাচ্ দেখে, জলসায় গান শুনে ও মাসে একদিন দু'দিন থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখে—জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ারই ইচ্ছা তার। ঝঞ্ঝাটের ভয়ে বন্ধু-সংখ্যাই আর সে বাড়ায় না। এমন মুক্ত জীবন—অসংখ্য বন্ধুই তো জোটবার কথা—কিন্তু মনের মতো গুটি পাঁচ-ছয় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া কাউকে সে আমল দেয় না। থাকে সে একটা মেস্-এ, কিন্তু পৃথক ঘর নিয়ে। আয়তনে ছোট তবু আলাদা; বহুদিন ধরেই এক জায়গায় আছে ব'লে খুব খরচও লাগে না—আর সেইটাই তার নিজস্ব বাড়ীর মতো হয়ে গেছে। সুতরাং যা আয় তাতে বেশ ভালই চলে যায়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আছেন এক দাদা, তিনিও দিল্লীতে বড় চাকরি করেন, সেইখানেই ঘর-বাড়ীও বুঝি

করেছেন—কাজেই তাঁকে কোনরকম সাহায্য করার প্রশ্নই ওঠে না। বরং তিনিই এটা-ওটা পাঠান—পুজোয় কাপড়, জামা, স্যুট—কতো কি! ভাইপো-ভাইঝিদের জন্মদিনে সামান্য কিছু উপহার পাঠানো ছাড়া তার তরফ থেকে কোন দায়-দায়িত্ব নেই।

সুতরাং নিছক কৌতুকের জন্যেই এই অদ্ভুত প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল সে।

আর কৌতুকটা জমেও ছিল পুরোপুরি। বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল সে। একটু আগেও দামী দেশী ধুতি সিল্কের পাঞ্জাবি প'রে সিগারেট খেতে খেতে গুনগুন ক'রে গান গাইছিল—তখনও তার মনটা ছিল নির্ভাবনার আকাশে, কৌতুকের পাখা মেলে আনন্দের রোদে খেলে বেড়াচ্ছিল আপন মনে।

কিন্তু হঠাৎ এ কী হ'ল?

বিয়ের সময় ভাল ক'রে চেয়ে দেখে নি সে, কারণ কোন কৌতূহল বোধ করে নি। বিবাহের পর যে বধূর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না, এমন কি পরে যাকে কোনদিন জনসমাজে 'চিনি' বলেও দাবী করা যাবে না, যার সমাজস্তর থেকে চিরকাল সরে থাকবে ব'লে সে প্রতিশ্রুত, হঠাৎ দেখা হ'লেও আলাপের বা ঘনিষ্ঠ-তার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করা চলবে না—সে কেমন দেখতে হ'ল জেনে বা তাকে ভাল ক'রে দেখেই বা লাভ কি? সে যেমন আছে থাক।

এমন কি, তার সেই স্বল্পসংখ্যক বন্ধু, যাদের এ বিবাহে নিমন্ত্রণ করতে পেরেছিল, তারা যখন ঈর্ষাতুর কণ্ঠে কানের কাছে গুঞ্জন করতে লাগল যে, 'ওঃ! ফার্স্টক্লাস মাল মাইরি! এমন জিনিস এতকাল ছিল কোথায়? করলি তো এমন ভাবে—ইস্!' তখনও সে খুব একটা আগ্রহ বা কৌতূহল বোধ করে নি মন্দিরা সম্বন্ধে, বা তাকে দেখবার চেষ্টা করে নি।

শুভদৃষ্টির সময় মুখ তুলে তাকাতে হয়—তাকিয়েছেও, কিন্তু সেও তো কেবলি নিয়মরক্ষা, তাতেও ভাল ক'রে দেখা ঘটে ওঠে নি। শুধু চকিতে একবার, এক লহমার জন্য চোখে চোখ পড়েছিল, আর তখনই, সেই একবার মাত্র মনে হয়েছিল যে, চোখ-দুটি বড় ভাল, শুধু দেখতেই ভাল নয়—বুঝি তাতে এক রকমের ভাষাও আছে, অবোধ মূক পশুর মতো শুধুই ড্যাবড়েবে বড় চোখ নয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তারপর সে কথাও আর মনে ছিল না।

আজ এখন—এইমাত্র—দৈবক্রমেই চোখটা প'ড়ে গেল। স্ত্রী-আচারের অভিনয়-টুকু সেরে মহিলারা বিদায় নিতে, দরজাটা বন্ধ ক'রে ফিরে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল—খাটের ওপর, তাদের তথাকথিত দাম্পত্য-শয্যার এক প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে মন্দিরা; দরজার মাথায় লাগানো ডবল ফ্লোরেসেন্ট বাতির সব আলোটা গিয়ে পড়েছে ওর মুখে, আর সেই আলোতে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছো ওকে। মন্দিরা যে এত সুন্দরী, সত্যি সত্যিই এমন অসামান্য রকমের ভাল দেখতে—তা সে কখনও কল্পনাও করে নি! সত্যি কথা বলতে কি, সুশ্রী বা সুন্দরী মেয়ে বলতে এতদিন ওর যা কল্পনা বা অনুমান ছিল—এমন কি তার এই ভবঘুরে জীবনে

বহু মেয়ে দেখবার ফলে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার কোনটার সঙ্গেই তো মেলে না এ রূপ।

এ যেন সমস্ত জানাশোনা, সমস্ত কল্পনা স্বপ্নকে অতিক্রম ক'রে গেছে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'নিঃশ্বাস-কেড়ে-নেওয়া-রূপ'—এ তাই।

অবশ্য প্রসাধনেরও বাহাদুরী আছে খানিকটা। কিন্তু প্রসাধন তো আরও বহু মেয়েকে করতে দেখেছে সে, রূপসজ্জার বহু বৈচিত্র্যই সে নিত্য দেখতে পায় শহরের পথে-ঘাটে। নববধূর রূপসজ্জার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে অবশ্য, তাতে সাধারণ মেয়েকেও কিছুটা অসাধারণ মনে হয়—কিন্তু নববধূও তো এ পর্যন্ত বিস্তর দেখল সে। রাস্তায় চলতে চলতে চকিতে দেখা নয়—কাছ থেকে বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবেই দেখেছে সে বোধ করি একশোটিরও বেশি, কিন্তু তাতেও ঠিক এমন চমক লাগবার মতো তো কাউকে মনে হয় নি। রূপসজ্জা বরং অনেককেই মানায় না—কারুর কারুর ক্ষেত্রে ঈশ্বরদত্ত চেহারাকে বিকৃত ক'রে তোলে, সজ্জা বিদ্রূপ করে রূপকে। এক্ষেত্রে তা নয়—এ যেন রূপ ও সজ্জা পরস্পরকে সহায়তা করছে, একে অন্যকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলেছে। বেনারসী শাড়ীতে, ঝকঝকে পালিস-করা অলঙ্কারে, ফুলের গহনায়, চারু ললাটের সুচারু চন্দনলেখায়—যেন এক অনির্বচনীয় মোহের সৃষ্টি করছে ঐ মেয়েটিকে ঘিরে, সবটা মিলিয়ে ওকে পুরাণের ইন্দ্রাণী ব'লে মনে হচ্ছে।

এই মেয়ে তার বৌ? তার নব-বিবাহিতা স্ত্রী?

হ'লে-হ'তে-পারত তার জীবন-সঙ্গিনী?

সে কী ঠিক দেখছে?

তার দৃষ্টিতে কোন বিভ্রান্তির ছায়া নামে নি তো? অথবা—কোন মূল্যবান নেশা বা স্বপ্নর রঙ?

কিন্তু নেশা তো সে করে নি। করেও না সাধারণতঃ।

আর স্বপ্ন? তাই বা কৈ? সে তো জেগেই আছে যতদূর সম্ভব। তবে?

বোধ করি বিস্ময়বিমূঢ়তা কাটিয়ে ফেলার জন্যই, সহজ স্বাভাবিক সুস্থ হবার জন্যই—একটা সংক্ষিপ্ত শিস দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে ওর ঠোঁট দুটোই ঈষৎ সংকুচিত হ'ল শুধু—কোন স্বর বা সুর ফুটল না। বোধহয় সঙ্কোচে ও কিছুটা সম্ভ্রমেই—ওর কণ্ঠ কোন প্রকার বাচালতা করতেও সাহস করল না।...

বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল অসীমের সেই ধাক্কার ভাবটা কাটিয়ে ফেলতে, তারপর যেন কোনমতে নিজেকে টেনে এনে খাটের পাশেই একটা চেয়ারে বসল সে। আরও একটু প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টায় হাত বাড়িয়ে পাশের তেপায়া থেকে সিগারেটের টিনটা টেনে নিয়ে একটা সিগারেটও ধরাল। কিন্তু সেই সময়ই—দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা সিগারেটের সামনে ধরবার সময় লক্ষ্য করল যে, হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে।

এ কী লজ্জায় ? সঙ্কোচে ? ভয়ে ?

কিন্তু তার কোনটারই তো কোন কারণ নেই। লজ্জার যদি কোন কারণ থাকেই তো সে অপর পক্ষেই আছে। সংকোচও তাই। তার সঙ্কোচের কি কারণ থাকতে পারে ? আইনত-বিবাহিতা স্ত্রীর দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখার তো তার ষোল আনা অধিকারই আছে—আর চেয়ে দেখারই তো কথা।

ভয়ের তো কোন কথাই ওঠে না।

তবে ?

তবে এ কি নিছক হৃদয়াবেগ ? ইমোশ্যন ?

কিন্তু এ ধরনের ইমোশ্যন জাগতে পারে মনে—এমন পরিবেশ বা পূর্ব-ইতিহাসও যে এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। মন্দিরার সঙ্গে তার কোন পরিচয় ছিল না কখনও, পূর্বরাগের তো প্রশ্নই ওঠে না। তাকে দেখলই বলতে গেলে এই প্রথম। তা ছাড়া, যার সঙ্গে কোন প্রণয়সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া তো দূরে থাক, হয়ত আর কখনও দেখাই হবে না, শুধু আজকের রাতটা তারা কোনমতে পরস্পরকে সহ্য করবে বলে প্রতিশ্রুত—তার জন্যে কোন হৃদয়াবেগ অনুভব করা কি সম্ভব ? শুধু ওরা এক ঘরে থাকবে—এইমাত্র, পাছে পাশাপাশি শুতে অসুবিধা বোধ করে জামাতা, সেজন্য বিবেচক শ্বশুর একটি ইজিচেয়ারের ব্যবস্থা করতেও ভোলেন নি। সুতরাং স্পর্শ করার কোন কথাই ওঠে না। আলাপ করারও কোন প্রয়োজন নেই।

তবে ?

এই তবেরই কোন উত্তর খুঁজে পায় না—যুক্তির দোরে বৃথা মাথা খুঁড়ে মরে এ নিরুত্তর প্রশ্ন।

অথচ হাত যে কাঁপছে এটাও ঠিক।

মনের মধ্যেও প্রবল একটা আলোড়ন চলছে। অননুভূত এক রকমের কাঁপন লেগেছে বুকে।

এ রকম কখনও বোধ করে নি সে এর আগে।

এ কি ক্ষোভ, ঈর্ষা—নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য আত্মগ্লানি ? না কি আর কিছু ? একেই কি লোভ বলে ? তবে কি সে কোন কামনাই অনুভব করছে ঐ রূপসী মেয়েটি সম্বন্ধে ? কোন স্থূল দেহজ কামনা ?...

কে জানে এ কী !

প্রাণপণে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে অসীম। নির্বিকার ঔদাসীন্যের সঙ্গেই ব'সে ব'সে সিগারেটে টান দেয়। কিন্তু সেটাও যেন কেমন বিস্বাদ লাগে।... নেশা শুরু করবার প্রথম ক'দিনের কথা বাদ দিলে, এই প্রথম ওর সিগারেট ভাল লাগল না। অত্যন্ত অরুচিকর বোধ হ'ল বস্তুটা। খানিক পরে সেটা য়্যাশ-ট্রেতে টিপে নিভিয়ে দিয়ে শুধুই স্থির হয়ে ব'সে রইল খানিকটা।

তারপর আর-একবার আড়ে চেয়ে দেখল মন্দিরার দিকে, নিজের স্ত্রীর দিকে।

তেমনিই স্থির হয়ে ব'সে আছে সে। পাষাণ-প্রতিমার মতো। হঠাৎ দেখলে

সন্দেহ হয় চোখের পল্লবটাও পড়ছে কিনা।

অতিকষ্টে কণ্ঠস্বরটাকে আয়ত্তে এনে এবার অসীম কথা বলল, 'আ—তুমি শুয়ে পড়ো না! বেশ আরাম ক'রেই শোও। আমি—আমার এখন ঘুম পায় নি তত। পেলে আমি ঐ ইজিচেয়ারটাতেই শুতে পারব।'

হঠাৎ কথাগুলো ব'লে ফেলে নিজেরই প্রগল্‌ভতা ব'লে মনে হ'ল অসীমের। অনভ্যস্ত বাচালতা। ওর পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক—অপরিচিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে যেচে কথা কইতে যাওয়া।

একটু অপ্রস্তুতই হ'ল যেন।

কিন্তু মন্দিরার তরফ থেকে কোন উত্তর এল না। কথাও কইল না, নড়েও বসল না। শুধু পাষাণ-প্রতিমার মতোই স্থির হয়ে রইল।

এবার একটু বিস্মিত বোধ করল অসীম, একটু কৌতূহলও। আর-একবার তাকিয়ে দেখল ওর দিকে। এবার সোজাসুজিই তাকাল, ভাল ক'রে।

এবং—এই প্রথম ওর সন্দেহ হ'ল যে, ঐ আশ্চর্য সুন্দর মুখে কোথায় যেন একটা বিষাদের ভাব আছে। ঠিক হয়ত বিষণ্নতা নয়, ঠিক হয়তো কোন দুঃখের অভিব্যক্তিও নয়—কবি যাকে বলেছেন, 'করুণ কোমলতা'—এ যেন তাই। ঐ আপাতভাবলেশহীন মুখে, ঐ সম্মুখনিবদ্ধ স্থির-দৃষ্টিতে একটা কি আছে, যাতে পুরুষের বুকে সহানুভূতি জাগে, তার মন ওকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

অসীমও আর স্থির হয়ে ব'সে থাকতে পারল না। কিসের একটা অস্বস্তি তাকে চঞ্চল ক'রে তুলল।

সে উঠে গিয়ে ওদিকের জানলার কাছে দাঁড়াল একবার। কিন্তু সেটা গলির দিকের জানলা, সামনের বাড়ির খানিকটা দেওয়াল ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। বিরক্ত হয়ে আবার ঘুরে তেপায়াটার সামনে এসে দাঁড়াল। সিগারেটের টিনটার দিকে হাতও বাড়াল একবার—কিন্তু কিছু পূর্বের অরুচিকর অভিজ্ঞতা মনে প'ড়ে যাওয়ায় আবার সরিয়ে নিল।

কিছুই করবার নেই আর। কিছুই না। শুধু ঐ ইজিচেয়ারে শুয়ে প'ড়ে রাত্রি প্রভাতের প্রতীক্ষা করা ছাড়া।

কিন্তু রাতও তো অনেক বাকী। হাতের নতুন ঘড়িটা দেখে নিল একবার। বারোটা। এখনও পাঁচটি ঘণ্টা কাটাতে হবে এই ঘরে।

তেপায়াটার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে। তেমনি দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। বোধ করি একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিল।

তারপর আর-একবার—তেমনি অন্যমনস্ক ভাবেই স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখল। আর—

সেই প্রতিমার মতো স্থির সুন্দর মুখে, সেই বিষণ্ন করুণ অসহায় ব'সে থাকবার ভঙ্গীতে—সেই আশ্চর্য গ্রীবার ওপর এলিয়ে-থাকা বিপুল কবরীতে কী

ছিল কে জানে—কিছুতেই আর নিজেকে সামলাতে পারল না অসীম। মন্দিরার কাছে না এসে, কথা না ব'লে থাকতে পারল না।

তেপায়াটার ও-পার দিয়ে ঘুরে একেবারে সামনাসামনি এসে দাঁড়াল।

তারপর যেন একটু স্নেহকোমল কণ্ঠেই বলল, 'ওহো, ওরা বুঝি তোমার ফুলের গহনাগুলো খুলে দিয়ে যায় নি? ওগুলো-সুদ্ধ শুতে তো বড় অসুবিধা হবে। খুলে দেব আমি?'

এবারও কোন উত্তর দিল না মন্দিরা, শুধু এইবার ওর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল অনেকখানি। পাষাণ-প্রতিমায় এই প্রথম যেন প্রাণ-স্পন্দন দেখা দিল।

কিন্তু ওর উত্তরের পরোয়া করল না অসীম। ওর চুপ ক'রে থাকাটাকেই সম্মতির লক্ষণ ব'লে ধ'রে নিল।

আশ্চর্য, হঠাৎ কেমন ক'রে যে এতটা মরীয়া হয়ে উঠল ও, তা যেন নিজেই ভেবে পেল না।

মন্দিরার স্খলিত একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে তারে-গাঁথা কঙ্কনটা খুলতে শুরু ক'রে দিল।

তবুও হয়ত গোড়ার দিকে একটু সঙ্কোচ ছিল, ছিল কিছুটা অস্বস্তি। হাতটাও হয়ত কাঁপছিল প্রথমটা, ললাটের কোণে কোণে ঘাম দেখা দিয়েছিল অকারণেই।

কিন্তু সে অল্পকালই। ঐ প্রথমটায়ই শুধু। তারপরই কেমন যেন সহজ হয়ে গেল সে। যা কিছুক্ষণ পূর্বেও ছিল অসম্ভব, তাই সম্ভব ও স্বাভাবিক হয়ে গেল অনায়াসে।

বালা-তাগা-মুকুট, একে একে সবই খুলে নিল সে।

হয়ত ওপক্ষ থেকে কোন বাধা বা প্রতিবাদ না আসাতেই এতটা সহজ হ'তে পারল ও।

আনত মাথাটা একটু তুলে ধ'রে মুকুটের তারের বাঁধনটা খুলতে খুলতে মুহূর্তের জন্যে একটু বিভ্রান্তিও এসেছিল অসীমের—হঠাৎ কেমন মনে হয়েছিল যে এটা ওর সত্যিকারের বিয়ে, সত্যিকারেরই ফুলশয্যা। খেলাঘরের মিথ্যে বিয়ে নয়, 'প্রভাতের রথচক্ররবে রাত্রি যবে জাগিবে উন্মনা' তখন এই নব-পরিণীতা বধূকে চিরকালের মতো ছেড়ে যেতে হবে না।

অবশ্য সে ভুল ভাঙতেও দেরি হয় নি।

বরং সেই ক্ষণিক মোহের জন্যে লজ্জিতই হয়ে পড়েছিল মনে মনে।

একে একে সব গহনাগুলোই যখন খোলা শেষ হয়ে গেল তখন আর করার কিছুই রইল না, সামনে থাকারও কোন অজুহাত না।

তখন একটু ক্ষীণকণ্ঠে শুধু একবার বলল, 'মালাটা খুলে ফেলে এবার তুমি ভাল ক'রে শুয়ে পড়ো, কেমন?'

এর কোন প্রতিবাদ বা ওপক্ষ থেকে কোন সৌজন্য আশা করেছিল কিনা কে জানে, কিন্তু মিনিট-কতক কেমন যেন উৎসুক ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ আর-এক কান্ড ক'রে বসল। ওদিক থেকে একখানা চেয়ার টেনে এনে খাটের কাছে—প্রায় মন্দিরার সামনাসামনি ব'সে পড়ল। কেন বসল, কী আশায়—তা ওকে জিজ্ঞাসা করলেও ও বলতে পারত না। না ব'সে পারল না বলেই বসল বোধহয়।

জীবনে প্রথম এই শ্রেণীর আবেগ বোধ করল অসীম। তাই তার সঙ্গে লড়াই করার মতো, সে আবেগকে প্রতিরোধ করার মতো কোন চেষ্টাই করতে পারল না। সে রকম কোন সঞ্চয় তো ওর নেই।

মন্দিরা শুয়ে পড়বার উপদেশটা শুনতে পেয়েছিল কিনা বোঝা গেল না। অন্তত শোবার কোন চেষ্টা করল না এটা ঠিক। তাই ব'লে মুখ তুলে তাকালও না অসীমের দিকে। এমন কি ওর এই এত কাছে ব'সে পড়াটা সম্বন্ধে অবহিত বলেও যেন মনে হ'ল না। সে তেমনি কোলের-ওপর-প'ড়ে থাকা দুটি বন্ধ জোড় হাতের দিকে চেয়ে ব'সে রইল স্থির হয়ে।

সদ্য-বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম রাতটিতে—তাদের 'সোহাগ-রাতে'—পরস্পরের অতি নিকটে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। প্রণয়-রজনীর সমস্ত পরিবেশই প্রস্তুত—অবস্থাও অনুকূল। দুটি হৃদয়েই কাব্য রচিত হবার কথা। অন্তত এক রোমাঞ্চকর, আবেগ-থরোথরো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে—প্রথম পরিচয়ের নবীন বিস্ময়ানুভূতির মধ্য দিয়ে, বহু প্রতীক্ষিত প্রণয়ালাপের উন্মত্ততায় বাতাসের মতো উড়ে যাবার কথা—বাকী রাত্রির এই সামান্য সময়টুকু।

কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কিছুই ঘটল না। সময় যেন পা টেনে টেনে চলছে, তার প্রতিটি পদক্ষেপ এদের শুনিয়ে শুনিয়ে। নবদম্পতির একজন পাথরের মতো নিঃশব্দে ব'সে আছে। আর-একজন প্রাণপণ চেষ্টা করছে অপরের সম্বন্ধে উদাসীন থাকবার, মনকে কঠিন ক'রে তোলবার। চোখ দুটোকেও সে চেষ্টা করছে অন্যত্র নিবিষ্ট করবার—ঘরের নানাস্থানে, খাটের ছত্রিতে বাঁধা রজনীগন্ধার শীষে, ওধারের দেওয়াল-আলমারীতে, বড় ঘড়িটায়—মায় তেপায়ার ওপরে সিগারেটের টিনটায়—কিন্তু অবাধ্য মনের প্রেরণায় অথবা নবানুভূত বিস্ময়ের আকর্ষণে, আবার ফিরে এসে পড়ছে সামনের জড়ো-হওয়া দুটি হাতে, হাতের ওপরের সুডৌল দুটি বাহুতে এবং সর্বসমেত সেই বাহুযুগলের অধিকারিণীর আনত সুন্দর মুখে।

অবশেষে অন্যমনস্ক হবার বৃথা চেষ্টা ছেড়ে দিল অসীম, সেও একটু ঝুঁকে প'ড়ে মন্দিরার নত দৃষ্টির নাগাল পাবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'তোমার তো ঘুম আসছে না দেখছি, তা এমনভাবে কাঠের পুতুলের মতো চুপ ক'রে ব'সে থেকে লাভ কি···আর হয়ত আমাদের কখনও দেখাই হবে না—এসো না তার চেয়ে একটু আলাপ-পরিচয় ক'রে রাখা যাক্। কী বলো ? তাতে দোষ আছে কিছু ?'

এবারেও কোন উত্তর দিল না মন্দিরা, শুধু ওর মাথাটা যেন আরও একটু নত

হয়ে পড়ল সামনের দিকে। কিন্তু অসীমের সন্দেহ হ'ল, হয়তো অকারণেই, যে কথা কইতে খুব অনিচ্ছাও নেই তার। আর একটু উৎসাহ পেলেই সে কিছু বলবে। হয়ত সে কিছু বলতেই চায় বরং।...

মানুষের এত অদম্য লোভ হয় অপরকে স্পর্শ করার ? ঐ শিথিল দুটি হাতকে নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ?

এ রকম অবস্থা নিজের কখনও কল্পনাও করে নি অসীম।

তবু সে প্রাণপণে নিজেকে সংযতই করল। কণ্ঠস্বরকেও যতটা সম্ভব সহজ ক'রে বলল, 'বাস্তবিক—কী যেন তোমার নাম, মন্দিরা না ? তোমার মা ডাকছিলেন টুণ্টু ব'লে—দুটোই বেশ ভাল কিন্তু। হ্যাঁ, যা বলছিলুম—বাস্তবিক বলছি মন্দিরা, বিয়ের আগে যদি তোমাকে দেখতুম তাহ'লে তোমার বাবার প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হতুম না। তুমি ভাবছ বড্ড হ্যাংলার মতো কথা হয়ে যাচ্ছে—না ? তা হয়ত হবেও। কিন্তু সত্যিই আর তোমাকে ছাড়তে আমার ইচ্ছে করছে না একদম।'

বলতে বলতেই—নিজের মনের মধ্যেই যেন সংযমের বাঁধ কোথায় শিথিল হয়ে এল অসীমের। গলাটা যে কেঁপে গেল তা ঐ অদূরবর্তিনী টের পাক বা না পাক, অসীম নিজে টের পেল। আরও দুর্বলতা প্রকাশ পাবার ভয়ে হঠাৎ চুপ ক'রে গেল, আর মনে মনে নিজেকে ক্রমাগত প্রশ্ন করতে লাগল যে, এই সহজ কথাগুলোর মধ্যে এমন দুর্বল হয়ে পড়বার মতো কী আছে ? কেন সে এমন দুর্বল হয়ে পড়ছে, ছেলেমানুষের মতো ?

বোধ করি মনকে ধমক দিয়েই আবার শক্ত করল একটু। একটু হাসবারও চেষ্টা করল। পরিহাসের ভঙ্গী ক'রে বলল, 'কিন্তু এখনও তো সময় যায় নি। আচ্ছা, আমি যদি এখন তোমাকে না ছাড়ি, যদি জোর ক'রে ধরে রাখি ? হাজার হোক আমার বিবাহিতা স্ত্রী তো তুমি এখন। তোমার বাবার সঙ্গে আমার যা চুক্তি তার কোন লেখাপড়াও তো নেই। ষোল আনা এক্তারই আমার আছে এখনও। দ্যাখো—ক্লেম দেব নাকি ?'

আবারও হাসল অসীম। জোর ক'রেই হাসল। যেন খুব বড় রকমের একটা রসিকতাই করছে সে। নিতান্ত কৌতুকছলেই কথাগুলো বলছে। কিন্তু তার মুখের হাসি আর অন্তরের ঈর্ষাতুর অনুশোচনার মীমাংসা ঘটবার আগেই আর-এক কাণ্ড ঘটে গেল।

এটার জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিল না সে। সুদূরতম কল্পনাও হার মেনে গেল বাস্তবের কাছে।

অসীমের শেষ কথাগুলো ভাল ক'রে শেষ হবার আগেই—তার কণ্ঠস্বরের রেশ ঘরের সেই শব্দহীন আবহাওয়ায় মিলিয়ে যাবার আগেই—সামনের পাষাণ-প্রতিমায় প্রাণ সঞ্চার হ'ল।

ঘটনাটা কি ঘটছে অসীম সে বিষয়ে অবহিত হবারও সময় পেল না। তার

পূর্বেই অকস্মাৎ মন্দিরা খাট থেকে নেমে একেবারে ওর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল যেন, 'তা পারবেন ? পারবেন আমাকে ধ'রে রাখতে ? ...একটু আশ্রয় দেবেন আমাকে ? আমি—আমি আপনার স্ত্রীর অধিকার চাই না, শুধু ঝিয়ের মতো আপনার বাড়িতে থাকতে পেলেই খুশী থাকব। দয়া ক'রে আমাকে একটু আশ্রয় দিন, আমি যে আর পারছি না !'

অভিনয় বলেই মনে হবার কথা, অতি-নাটকীয় অভিনয়। মেয়েটি সম্বন্ধে এই স্বল্প কিছুক্ষণ ধ'রে যে মোহ সৃষ্টি হয়েছিল মনের মধ্যে, তা রূঢ়ভাবে ভেঙে যাওয়াই উচিত—আর সেইরকম একটা প্রতিক্রিয়াই হয়েছিল অসীমের মনে প্রথমটায়। নিদারুণ ঘৃণায় ওষ্ঠটা বিকৃত হয়ে উঠেছিল কিন্তু কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে যে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটি তাতে আবার একটু সংশয়ও জাগল মনের মধ্যে।

কান্নাটা বড়ই বুকফাটা, বড়ই স্বতঃস্ফূর্ত ব'লে মনে হচ্ছে।

তা ছাড়া, কোন পুরুষই সুশ্রী তরুণী মেয়েদের সম্বন্ধে কোন হীন ধারণা সহজে করতে চায় না। বরং উলটোটাই স্বাভাবিক। চোখের সামনে খারাপ কিছু করতে দেখলেও সে মনে মনে সেই মেয়ের হয়ে যুক্তি দিতে থাকে—তার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে বেড়ায়। অনেক সময় জেনেশুনে আত্মপ্রবঞ্চনা করে।

এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হ'ল না। অসীমও পুরুষ, বয়সও তার বেশী নয়। মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মনের দিগন্তে মিলিয়ে গেল মুহূর্ত মধ্যে। অসীম বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আরে, আরে, এ কী কাণ্ড। ব্যাপার কি বলো তো ? এই ওঠো—ওঠো—স্থির হও। কথাটা খুলে বলো তবে তো বুঝব। শুধু শুধু এমন ক'রে কাঁদে না—ছিঃ। দ্যাখো পাগলের মতো কী করে। ওঠো, ওঠো, লক্ষ্মীটি, চোখ মোছ। এখুনি কে এসে পড়বে। প্লীজ প্লীজ—শান্ত হও।'

কী বলছে আর কী করছে তা তখন অসীমের জানবার বা ভেবে দেখবার কথাও নয়। অসংলগ্ন প্রলাপই বুঝি ব'কে গেল কতকগুলো, কিন্তু মন্দিরাও কি পাগল হয়ে গেল ? পাগলের মতোই কাণ্ড-কারখানা বাধিয়ে তুলল যে।

অসীমের পা-দুটোর মধ্যে মুখ গুঁজে সে এমন ভাবেই কাঁদতে লাগল যে, মনে হ'ল বুঝি তার বুকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। সে বুঝি তার বহুদিনের বেদনা সঞ্চিত রেখেছিল এই ক্ষণটির জন্য—আজ সুযোগ পেয়ে তাই নিঃশেষে ঢেলে দিতে চাইছে। সামান্য অবসর এখনই ফুরিয়ে যাবে—এই বুঝি তার ভয়।

বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল তাকে শান্ত ক'রে উঠিয়ে বসাতে। অনেক কথা বলতে হ'ল, অনেক সান্ত্বনা দিতে হ'ল। এসব ব্যাপারে একেবারেই অনভ্যস্ত অসীম—কিন্তু এ এমন একটা সময় যখন মানুষকে হিসেব ক'রে কথা বলতে হয় না, শুনতেও হয় না, এ সময়ের পাকা হিসেব কোন পক্ষই রাখে না।

কিন্তু কথার মধ্যে শব্দটাই সব নয়। শব্দের পিছনে যে অর্থ থাকে তা

সহানুভূতিই হোক আর বিদ্বেষই হোক—মানুষ ঠিকই বোঝে। অসীমের সস্নেহ প্রশ্রয়টুকু, তার সত্যকার সহানুভূতিটুকু ভুল বোঝবার কোন কারণ ছিল না মন্দিরার। বাধা যেটুকু ছিল তা লজ্জার ও সঙ্কোচের—অপরিসীম লজ্জা ও অপরিসীম সঙ্কোচ ঠিকই—তবু তা সেই সহানুভূতি ও প্রশ্রয়ের বাতাসে দূর হ'তে দেরি লাগল না।

জোর ক'রে মন্দিরাকে পাশে বসিয়ে, একহাতে ওর দুটি হাত চেপে ধ'রে আর একহাতে ওকে বেষ্টন ক'রে—কখনও বা প্রশ্ন ক'রে, কখনও বা নীরব থেকে ওকে সামলাবার অবসর দিয়ে, একে একে ওর সব কথাই জেনে নিল অসীম।

চরম লজ্জা ও নিদারুণ কলঙ্কের ইতিহাস সন্দেহ নেই—কিন্তু সেই সঙ্গে এক সুবিপুল ব্যথা ও নিরতিশয় বেদনার কাহিনীও।

এবার অসীমের পাথর হবার পালা।

পাথরের মতোই স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সে।

প্রস্তাবটা এনেছিল প্রশান্ত। ওর বহুদিনের বন্ধু।

কিন্তু ঠিক প্রস্তাব বলতে যা বোঝায় সে ভাবে আনে নি। কথার ছলে কথাটা উঠেছিল। এমনিই, কী একটা প্রসঙ্গে। সে প্রসঙ্গটা আজ আর মনেও নেই কারুর।

প্রশান্ত শুনেছিল তার বন্ধুর কাছ থেকে। সে বন্ধু আবার শুনেছিল তার মেসোমশাইয়ের মুখে। এমনিভাবে দু-তিন হাত বা দু-তিন মুখ ঘুরে এসেছিল সংবাদটা। প্রশান্তর বন্ধু প্রশান্তর কাছেই প্রস্তাবটা করেছিল। কারণ সেও তখন অনূঢ়। কিন্তু প্রশান্ত সে প্রস্তাবে রাজী হয় নি। রাজী হবার কথাও নয় কোন ভদ্রসন্তানের পক্ষেই।

অসীম বুঝি কী টাকার কথা তুলেছিল। কোথায়—বুঝি কৈলাসমানসে যাবার প্রসঙ্গেই। বলেছিল, 'অফিসে আগের দেনা এখনও শোধ হয় নি, এখন আর টাকার কথা তোলা যাবে না। কোথাও আলটপ্‌কা কোন টাকা পেয়ে গেলে চলে যেতুম এখনই।'

তাতে বুঝি শরদিন্দু বলেছিল, 'লটারির টিকিট কাট্‌ না। রেঞ্জার্স—? অনেক টাকা পেয়ে যাবি।'

'অত টাকায় আমার তো দরকার নেই। হাজারখানেক টাকা কোথাও থেকে পেয়ে গেলেই আমি খুশী।'

তাতে কিরীটী বলেছিল, 'রেস খেল তা'লে!'

ওকে ধমক দিয়ে উঠেছিল অসীম, 'ভদ্রসমাজে ও কথাটা মুখে আনিস নি কিরীটী, ওর চেয়ে বড় অভিশাপ আর নেই—অন্তত আমাদের দেশে। রেস খেলে বড়লোক হ'তে কাউকে দেখেছিস তুই?…সর্বস্বান্ত হয়ে পথেই বসে শেষ পর্যন্ত। ভয়ঙ্কর নেশা ও, মদের চেয়েও সাংঘাতিক। একেবারে কোন জ্ঞান থাকে না। একমাত্র ছেলের কঠিন অসুখের সময়ও ওষুধের টাকা নিয়ে রেস খেলে—এ আমি

চোখে দেখেছি।'

তারপর ঈষৎ সন্দিগ্ধ ভাবে প্রশ্ন করেছিল, 'তুই ওসব ধরেছিস নাকি ?'

'পাগল হয়েছিস। তাহ'লে আর আমাকে কারবার ক'রে খেতে হ'ত না। আমি ঠাট্টা করছিলাম।'

ঠিক এই মুখে বলেছিল প্রশান্ত, 'একটা বিয়ে করবি ? দ্যাখ। কোন দায়িত্ব থাকবে না, কোন দায় নয়—বৌ নিয়ে ঘর করতে হবে না, নিজের সমস্ত পথ খোলা থাকবে—শুধু একটি মেয়ের আইবুড়ো নাম খণ্ডে দেওয়া। দ্যাখ, নগদ দু'হাজার টাকা দেবে, এ ছাড়া বরাভরণ ঘড়ি আংটি যা দেবে—কাপড় জামা তো বটেই, সে-সব ফিরিয়ে দিতে হবে না, বিয়ের সমস্ত খরচ তাদের—মায় যদি বৌয়ের দু'একখানা গয়না রেখে দিতে চাস তো, তাও রাখতে পারিস—তারা আপত্তি করবে না।'

কৌতূহলটা অবশ্য হয়েছিল সকলেরই, 'কী রকম, কী রকম ?' একসঙ্গে প্রশ্ন ক'রে উঠেছিল সবাই।

প্রশান্ত যতটা জানত, যা জানত, তা-ই বলেছিল।

এক ধনী কন্যা ফেঁসে গেছে বুঝি। সে ফাঁস থেকে মুক্তি পাবার গোপন-পন্থা যা কিছু আছে সবই চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সে ফাঁস খোলে নি। প্রকাশ্যে কিছু করা তো সম্ভব নয়—তাই কন্যার পিতা এই ব্যবস্থা করতে চান। কোন সদ্বংশের শিক্ষিত ছেলে যদি তিনটি রাত্রির সামান্য অনুষ্ঠানে রাজী থাকে তো তিনি তাকে ঐ টাকা ও ঐসব জিনিস দেবেন। মাত্র ঐ তিনদিনের অনুষ্ঠানই—তারপর আর পাত্রের কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। বৎসরখানেক পরে তিনিই বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা ক'রে বরকে মুক্তি দিয়ে দেবেন।

কিরীটী প্রশ্ন করেছিল, 'কেউ যদি একেবারেই নিয়ে নেয়, সব জেনেশুনেই ?'

'না, তা তিনি দিতে রাজী নন—মানে মেয়ের বাবা।'

'কেন ?' প্রায় সমস্বরেই প্রশ্ন ক'রে উঠেছিল সকলে, 'কেন, যদি সৎপাত্রই কেউ রাজী হয় ?'

'কেন, তা ঠিক জানি না। জিজ্ঞাসা করি নি। তবে মেয়েটি শুনেছি খুব সুন্দরী, মেয়ের বাবারও যতদূর মনে হয় পয়সাকড়ি বেশ আছে। তিনি বোধহয় মেয়ের সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করেন।'

কথাটা ঠাট্টাচ্ছলেই বলেছিল প্রশান্ত।

অলস আড্ডার উপযুক্ত রসদ হিসেবেই। এ প্রস্তাবে যে কেউ রাজী হবে, এ ছিল তার স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে অসীম ব'লে উঠল, 'লাগা। আমি রাজী আছি।'

'সে কি রে। কী বলছিস যা-তা।'

'ঠিকই বলছি। আমার কী—আমারই তো সুবিধে। মা-বাপ নেই যে রাজী করাতে হবে, দাদা থাকেন বহুদূরে—দিল্লী হনোজ দূর অস্ত্। তিনি টেরও

পাবেন না। আমার ভয়টা কি? তাছাড়া ব্যাপারও তো মোটে তিন-চার দিনের।
…মোদ্দা তারপর ঠিক ঘাড় থেকে নেমে যাবে তো? ঘাড়ে চেপে থাকতে চাইবে না বরাবরের জন্যে? কিম্বা খোরপোশ আদায়ের চেষ্টা করবে না? লিখে-প'ড়ে দেবে কিছু?'

'তা জানি না। এসব কথা যে জানবার দরকার হবে তা তো আর ভাবি নি।'

'তুই খবর নে। এমন সুযোগ ছাড়ছি না। ডিভোর্স না হ'লেও ক্ষতি নেই। আমি কোন সত্যিকারের বিয়ে করতে যাচ্ছিও না, তার কথাও নেই। শুধু আমার ওপর কোন জুলুম না হয় এর পরে—এইটুকু দেখিস!'

দৃঢ় কণ্ঠেই বলে অসীম। তবু এটা যে ওর তামাশা নয় তা বুঝতে কিছু বিলম্ব হয়েছিল বৈকি! নিরস্ত করবার চেষ্টাও করেছিল সকলে কিন্তু অসীমের জিদ চেপে গেছে। সে বললে, 'দূর! জীবনে তো কোন য়্যাডভেঞ্চার হ'ল না, এইটেই না হয় হোক। মন্দই বা কি? ভদ্রলোকের বিপদ উদ্ধার হবে, আমারও পকেটে কিছু আসবে—এমন সুযোগ ছাড়ব কেন? তোদের মধ্যে আমারই সুবিধে বেশী, কথাটা জানাজানি হয়ে পড়লেও এমন কোন ক্ষতি হবে না আমার। তবে ঐ একটা পয়েণ্ট ঠিক থাকে যেন—বেরিয়ে আসার পথটা খোলা চাই, অভিমন্যুর মতো চক্রব্যূহের প্যাঁচে পড়তে রাজী নই আমি। একজনের ফাঁস খুলতে গিয়ে আমি না একেবারে নাগপাশে জড়িয়ে পড়ি।'

অগত্যা প্রশান্তকে কথাবার্তা চালাতে হ'ল। বন্ধুকে ধ'রে তার মেসোমশাই, তাঁকে ধ'রে মেয়ের বাবার কাছে পৌঁছল।

পাত্রের মোটামুটি সামাজিক ও আর্থিক যোগ্যতার বিবরণ শুনে ঘোষালমশাই লাফিয়ে উঠলেন। হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন যেন।

শর্ত—প্রশান্ত যা শুনেছিল তা সবই ঘোষালমশাই স্বীকার পেলেন। কেবল লেখাপড়ার মধ্যে যেতে রাজী হলেন না। তার বদলে তাঁর জন-দুই সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে দিয়ে জামিন দেওয়ালেন। তাঁদের অসীমও চিনত—অন্তত নামে—খুবই সম্ভ্রান্ত লোক তাঁরা, সুতরাং সে আর পীড়াপীড়ি করল না।

বিবাহের সব ব্যবস্থাই ঘোষালমশাই করবেন কথা ছিল। তিনিই করলেন। পাত্র মজঃফরপুরে থাকে, হঠাৎ বিয়ে ঠিক হ'তে চার-পাঁচটি বন্ধু নিয়ে চলে এসেছে, এই কথা রটনা ক'রে তিনি যেমন বরযাত্রীর সংখ্যাল্পতা ঢেকে নিলেন তেমনি তাঁর বাড়ীতেই ফুলশয্যা হওয়ার কৈফিয়তটাও দিতে পারলেন। তিনিও অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া আর কাউকে বলেন নি—ঐ হঠাৎ বিয়ে হওয়ার অজুহাতে বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করার দায়ও এড়িয়ে গেলেন।

এ পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই কেটেছিল। নগদ টাকা আগেই দিয়েছিলেন ঘোষালমশাই, সেটা ব্যাঙ্কে জমা আছে। বাকী এই বরাভরণের ঘড়ি বোতাম আংটি ফাউণ্টেন-পেন ইত্যাদি সুটকেসে ভ'রে নিয়ে ভোরবেলা গিয়ে নিজের মেসে

চুকবে—এই ঠিক আছে। এমন সে হামেশাই বিদেশে যায় দু-চারদিনের জন্যে, কাজেই কেউ সন্দেহমাত্র করবে না। বিয়ের নবলব্ধ জিনিসগুলো দু-চারদিন পরে একে একে ওরই কেনা জিনিস ব'লে চালাতে পারবে। কাপড়-জামাগুলো পরে সুবিধামতো এক সময় ওঁরা পৌঁছে দেবেন প্রশান্তর বাসায়—সেগুলো সুবিধে হয় ব্যবহার করবে, নয় তো কাউকে দান করবে।

অর্থাৎ আর এই ক'টি ঘণ্টা কেটে গেলেই সে আবার মুক্ত, নিশ্চিন্ত। এটা নিতান্তই অভিনয়, সে অভিনয়ের মজুরীও আগাম মিলে গেছে—এখানকার সঙ্গে, এই মেয়েটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক অতঃপর তার আর থাকবে না। এটা একটা স্বপ্নের মতোই একদিন মনে হবে, কৌতুকাবহ স্বপ্নের মতো। কোন স্মৃতিও থাকবে না হয়তো, বরাভরণের জিনিসগুলো বেচে দিলে সে দিক দিয়েও নিশ্চিন্ত।

কিন্তু নাটকের একেবারে শেষ অঙ্কে এ কী হ'ল ?

এর জন্য তো সে প্রস্তুত ছিল না। এ-রকম মহড়াও তো দেওয়া ছিল না তার!

মেয়েটির পদস্খলন হয়েছে—অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে—তার লজ্জা ঢাকবার জন্যেই এই ব্যবস্থা। হয়তো কোন হীন অন্ত্যজ লোকের দ্বারাই এ কাণ্ড হয়েছে, যার সঙ্গে সাময়িক বিবাহ দেওয়াও অসম্ভব—এ-ই ভেবেছিল অসীম। হয়তো ঠাকুর বা চাকর—কিংবা আরও নিম্নস্তরের কেউ। এমন তো হামেশাই হয় আজকাল। এ-রকম প্রত্যক্ষ কতকগুলো ঘটনার খবরও সে রাখে।

এই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিল সে। অত মাথাও ঘামায় নি।

কিন্তু এখন এ কী শুনল!

যা শুনল তার জন্যে কোন প্রস্তুতি ওর মনের মধ্যে কোথাও ছিল না। এমন কখনও ভাবে নি সে। একেবারেই অপ্রত্যাশিত এই ইতিহাসটা।

ওর বেপরোয়া ছন্নছাড়া মনও এ ইতিহাস শুনে ঘৃণায় শিউরে উঠল।...

ঘোষালমশাইয়ের আয়ের থেকে ব্যয় কিছুদিন ধরেই বেশী চলছিল। একটু চাল দেখিয়ে চলতে ভালবাসেন তিনি। অফিসে মাইনে পেতেন মোটা টাকা কিন্তু তার চেয়ে বেশী খরচ হয়ে যেত তাঁর। এরই সমতা রক্ষা করতে তিনি প্রথম ফাট্‌কা খেলা ধরেন। সাবধানে খেলে তাতে পেয়েও ছিলেন দু'পয়সা। সে-ই আরও কাল হ'ল। সতর্কতাটা আর রইল না, চালটাও গেল বেড়ে। ফলে একদা আসন্ন জেল বাঁচাতে অফিসের টাকা ভাঙতে হ'ল। তারপর একদিন সেটাও সামনে এসে দাঁড়াল প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের চেহারা নিয়ে। তখন আর বিক্রী করার বা বাঁধা দেওয়ার মতো এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে ঐ বিপুল অঙ্কের ভগ্নাংশও শোধ হয়। সর্বস্ব বিক্রী করলে হয়তো হ'ত কিন্তু যথার্থ ইজ্জতের চেয়ে বাইরের লোক-দেখানো ইজ্জৎটাই বড় হ'ল। সে সব বাহ্যিক চাল বজায় রেখে আর যা করা সম্ভব তিনি তাই করলেন —সতেরো বছরের অপূর্ব সুন্দরী কন্যাটিকে কাজে লাগালেন।

তারপর থেকে রেহাই নেই মন্দিরার। তার পিতার বহু ধনী বন্ধুর সঙ্গেই তাকে 'বেড়াতে' যেতে হয়েছে বার বার। তাতে মোটা টাকা আসে। ঘোষালমশায়ের

দেনা শোধ হয়েছে, চাকরি যাবার ভয় গেছে—জীবনের বহু বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করতে পেরেছেন তিনি।

হঠাৎ এই বিপদে না পড়লে কোন হাঙ্গামাই হ'ত না।

যতদূর যা চেষ্টা করবার তা করেছেন। যিনি প্রধানত এর জন্য দায়ী—তিনি খুবই অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোক। যে দু'জন ঘোষালমশাইয়ের শর্ত রক্ষার জন্য জামিন হয়েছিলেন—তাদেরই একজন তিনি। তিনিও বহু চেষ্টা করেছেন। এর পর ডাক্তারদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁদের যেসব ডাক্তারের সঙ্গে কারবার—তাঁরা কেউই এ কাজ করতে রাজী হন নি। অন্যত্র যেতেও ভরসা হয় নি—লোক-জানাজানি থানা-পুলিশ হবার ভয়ে। তাছাড়া মূলধন খোয়াবার ভয়ও ছিল—অর্থাৎ মেয়েটার জীবন। এমন বহু অকালমৃত্যুর কথা কাগজে প্রায়ই পড়েন তাঁরা।

অগত্যা এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে ঘোষালমশাইকে।

একেবারে বিয়ে দেওয়া চলত বৈকি। টাকার জোরে সবই সম্ভব হ'ত কিন্তু ঘোষালমশাই তাতে রাজী নন। যে রাজহংসী সোনার ডিম পাড়ে সে হাতছাড়া হ'লে তাঁর দিন চলবে কিসে? বিশেষত রিটায়ার হবার সময় আসন্ন। সুতরাং আইনত একটা বিবাহ হবে আর সে পাত্র কোনরকম দাবী-দাওয়া না রেখে চলে যাবে—সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না, এই রকম ব্যবস্থাই করতে চেয়েছিলেন তিনি।

দৈব অনুকূল, স্রেফ খেয়ালের বশেই অসীম রাজী হয়ে গেল। এমন সুপাত্র পাবেন তিনি, কখনও আশা করেন নি ঘোষালমশাই। একেবারে যারা অন্তরঙ্গ তাদের কাছে তো মাথা তুলে পরিচয় দিতে পারবেন। যে সন্তান আসছে তারও একটা ভাল রকম পিতৃ-পরিচয় পাওয়া গেল।

থেমে থেমে, কান্নায়-বুজে-আসা গলায়—কখনও বা অসীমের প্রশ্নের উত্তরেই—একটু একটু ক'রে এই চরম লজ্জা ও অপমানের কাহিনী বিবৃত করল মন্দিরা। তারপর আর-একবার উচ্ছ্বসিত প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'আমাকে বাঁচান—আমি আর পারছি না। আমাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করা সম্ভব নয় তা আমি জানি, কোনদিন তা আশাও করব না। আপনি আবার বিবাহ ক'রে, সত্যকার বিবাহ ক'রে সুখী হোন—শুধু আমাকে এই অপমান থেকে বাঁচান। আপনার বাড়ীতে আমি দাসীবৃত্তি করতে পারলেও সুখী হবো।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকল অসীম।

অনেকক্ষণ, মন্দিরার মনে হ'ল এক যুগ।

তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই মন্দিরা, আমি যেমন ক'রে হোক্ এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাবই। খেলার ছলে হোক আর যাই হোক, নারায়ণ সাক্ষী ক'রে তোমাকে গ্রহণ করেছি যখন—তখন দায়িত্ব একটা আছেই। তুমি স্বেচ্ছায় চলে যেতে আলাদা কথা।...তোমার বাবাকে কথা দেওয়া আছে বটে

—কিন্তু এখন তোমার অসৎ বাপের সঙ্গে অসৎ চুক্তির থেকে এই অনুষ্ঠানের মর্যাদাই আমার কাছে বড়।'

অসীমের একটা হাত তেমনি বেষ্টন করাই রইল মন্দিরাকে, আর একটা হাতে ধরা রইল দুটি কোমল স্বেদার্দ্র হাত—নিঃশব্দে ব'সে কেটে গেল রাত্রির বাকী দুটি অবশিষ্ট ঘণ্টা। মন্দিরার দুই চোখ দিয়ে অবিরল ধারে জল গড়িয়ে পড়তেই লাগল কিন্তু বৃথা আর কোন মৌখিক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না অসীম।

এর পরের ইতিহাস তো খুবই সংক্ষিপ্ত।

খবরের কাগজে বেরিয়েছিল খানিকটা—আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন।

পরের দিন ভোরবেলা চলে এসেছিল অসীম ঠিকই। কিন্তু সে শুধু উঠেপড়ে লেগে একটা ফ্ল্যাট ঠিক করার জন্যেই। ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট, সেই সুদূর বৈষ্ণব-ঘাটার কাছে কোথায় যেন, তবু তা পৃথক্ ফ্ল্যাটই। ফ্ল্যাটে দখল নিয়ে সামান্য সামান্য কিছু আসবাব কিনে ঘর সাজিয়ে বৌকে নিতে গেল অসীম।

ঘোষালমশাই প্রথমে বিস্মিত তারপর মহা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। চুক্তিভঙ্গটা যে এ-পক্ষ থেকে হ'তে পারে তা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি। জোচ্চোর বদমাইশ বলে গাল দিলেন—তারপর দারোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দিয়েই তাড়িয়ে দিলেন।

সঙ্গে সাক্ষী নিয়ে গিয়েছিল দু'জন—অসীম সেইদিনই নালিশ ক'রে দিল। বেআইনী ভাবে স্ত্রীকে আটক রাখার অভিযোগ। ঘোষালমশাইয়ের দেওয়া টাকাতেই ভাল উকীল রাখল সে। তদ্বির-তদারকেরও অভাব হ'ল না। বন্ধুদের সকলকে সব কথা খুলে বলে নি সে অবশ্যই, কিন্তু এতদিন পরে ওর ঘর-সংসারে মতি হয়েছে তাতেই তারা খুশী, তাছাড়া এ একটা মজাও বটে। তারাও মেতে উঠল এ মোকদ্দমায়।

ও-পক্ষেও অবশ্য টাকার অভাব হ'ল না। তদ্বিরেরও না।

কারণ প্রথমত শিকার হাতছাড়া হয়—দ্বিতীয়ত কেলেঙ্কারীর ভয়।

গোপনে মোটা টাকার 'অফার' এল। কিন্তু অসীম তা নিল না। তবে আশ্বাস দিয়ে দিল যে, ও-পক্ষ যদি আসল কথা ফাঁস না করে, সে-ও করবে না। কারণ ও ঘৃণিত কথা প্রকাশ ক'রে কোন লাভ নেই তারও।

ঘোষালমশাই আদালতে যুক্তি দিলেন অসীম কায়স্থ, জাত ভাঁড়িয়ে বিয়ে করেছে। বিদেশ থেকে এসেছি বলেছে—অনেক মিথ্যে কথাও বলেছে সে, সেই-জন্যেই তিনি মেয়ে পাঠাতে চান না। অসবর্ণ বিবাহ তাঁদের বংশে কখনও হয় নি —ও-বিবাহ তাঁরা স্বীকার করেন না—ওটা তাঁরা মানিয়ে নিতে রাজী নন।

অসীম তার উত্তরে হাকিমের সামনে একটি চিরকুট দাখিল করল। ওর জামা-জুতোর মাপের জন্যে তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন—এক লাইন লিখে। সে হাতের লেখা ঘোষালমশাইয়ের, এবং তার ওপর নাম-ঠিকানাটাও লেখা তাঁরই। সে-নামের সঙ্গে পদবীও যুক্ত আছে—অসীম বসু।

সুতরাং সে আপত্তি টিকল না।

আদালত মন্দিরাকেও প্রশ্ন করলেন, সে স্বামীর ঘরে যেতে চায় কিনা। সে সাগ্রহে জানাল যে চায়।

অগত্যা ঘোষালমশাইকে সুবর্ণডিম্ব-প্রসবকারিণী রাজহংসীর মায়া ছাড়তেই হ'ল শেষ পর্যন্ত।

তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'দেখে নেব।'

অসীম স্থির নির্মম দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে জবাব দিল, 'তা'হলে আমিও দেখে নেব। তোমাকে আর তোমার লম্পট বন্ধুদেরও। বরং তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখো—তারা কি বলে।'

অসীমের ফ্ল্যাটে এসে উঠল মন্দিরা। বিজয়গর্বেই এল বলতে হবে।

তার ঘর, তার সংসার।

তার স্বামীর ঘর।

কথাটা তার যেন বিশ্বাসই হ'তে চায় না কিছুতে।

সবটা অবিশ্বাস্য, অবাস্তব বোধ হয়।

বন্ধুরা এনেছে ঘর-সংসারের খুঁটি-নাটি জিনিস।

সেদিকে দেখিয়ে বলল অসীম, 'ঘর-সংসারের কাজ কিছু জানো—মানে ঠিকে-ঝিতে চলবে? না কমবাইন্‌ড্ হ্যান্ড রাখতে হবে? রান্না? রান্নার কিছু জানো?'

মাথা হেঁট ক'রেই ছিল মন্দিরা। সেইভাবেই বলল, 'ঝিও চাই না। সব কাজই আমি করব।'

'না, না, অতটা দরকার নেই। ঠিকে-ঝি ঠিক ক'রেই রেখেছি। মানে, আপিসের মাইনেটা আপাতত খুব পর্যাপ্ত নয় কিনা। তবে ভেবো না, সে আমি বাড়িয়ে নেব শিগ্‌গিরই। একটু চেপে কাজ করলেই হবে।'

কথাটা হচ্ছিল ওদের শোবার ঘরে। দুটি ঘরের ফ্ল্যাট—বাইরে কিরীটি প্রশান্তর দল হৈ-হৈ করছে—সুতরাং শোবার ঘর ছাড়া ওর যাবার জায়গাই বা কৈ?

কিন্তু এ ঘরে ঢুকেই পাথর হয়ে গিয়েছিল মন্দিরা।

একটিমাত্র শয্যা, দু'জনের উপযোগী অবশ্য, কিন্তু একই খাটে!

শুভ্র সুন্দর শয্যা—আনকোরা নতুন। ছত্রিতে ছত্রিতে রজনীগন্ধার শীষ বাঁধা। পাশের তেপায়াতে একজোড়া জুঁইয়ের গোড়ে—

একখানা টেলিগ্রাম হাতে ক'রে এসেছিল অসীম এ-ঘরে। এতক্ষণে সেটা মনে পড়ল বুঝি। বলল, 'দাদা-বৌদি ওধারে মামলা-মারফৎ খবর পেয়ে খুব রাগ করে-ছিলেন, তাঁদের না জানিয়ে বিয়ে করার জন্যে। কিন্তু দেখছি এখন রাগটা কিছু পড়েছে। টেলিগ্রাম করেছেন তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। চলো ঘুরে আসি এই-বেলা। এখনও হাতে কিছু আছে।'

'কিন্তু—' ভয়ার্ত হরিণীর মতো এবার মুখ তুলে চায় মন্দিরা, 'কিন্তু সত্যিই কি আপনি আমাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করতে চান?'

'ওমা, তবে এত কাণ্ড করলুম কেন ? বা রে ! তুমি কি ভেবেছিলে সবই তামাশা !'

'কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরে যাবো !...অহরহ প্রতি মুহূর্তে আমার অপরাধ আমাকে বিড়ম্বিত করবে !'

'ছিঃ ! কে বলেছে তোমার অপরাধ। পরের অপরাধের বোঝা তুমি বইতে যাবে কেন ? ও-সব ভুলে যাও ! আজ থেকে তোমার নতুন জীবন শুরু হ'ল !'

'কিন্তু অপরাধের প্রমাণ যে আমার সঙ্গে—আমার দেহেই রয়েছে। ওকে নিয়ে কী করব ?'

'কী আর করবে। দিল্লী থেকে ফিরে এসে শিশুমঙ্গলে কার্ড করাতে হবে—আর অন্য সব ব্যবস্থা, সে হয়ে যাবে এখন ! সে তুমি কিছু ভেবো না !'

এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পায় যেন ওর কথা শুনে।

তবু সে ব্যাকুলভাবে বলতে যায়, 'আপনি বুঝতে পারছেন না কেন কিছুতেই—'

বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল অসীম, 'তুমিই বুঝতে পারছ না মন্দিরা, আমি যখন তোমাকে ঘরে এনেছি, সব দায়িত্ব নিয়েই এনেছি ! আমার স্ত্রীর সন্তান আমারও সন্তান, এটা বোঝ না কেন ? তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না ! এখন পারো তো একটু চা করো লক্ষ্মীটি ! আর ওদের কিছু মিষ্টি দাও—মিষ্টি বোধ হয় আনানোই আছে কোথাও !'

সে ওর গালে একটা ছোট্ট টোকা দিয়ে এ-ঘরে চলে এল !—আর কোন বাদানুবাদের অবসর না দিয়েই।

সত্যাগ্রহী

নতুন বাসায় এসে বেশ খুশীই হয়েছিলাম। একে তো আজকাল মনের মতো ফ্ল্যাট পাওয়াই প্রায় অসম্ভব (অবশ্য আমাদের পকেটের মাপে, নইলে পাঁচ-সাতশ' টাকা ভাড়া দিতে পারলে আর ভাল ফ্ল্যাটের অভাব কী ?), তায় এমন ভদ্র পরিচ্ছন্ন শান্ত পরিবেশ, এ একেবারে দুর্লভ যোগাযোগ বলতে হবে ! এবার একটু শান্তিতে লেখাপড়া করতে পারব ভেবে বেশ খানিকটা আশান্বিতও হয়ে উঠেছিলাম ।

অবশ্য প্রথম প্রথম বেশ শান্তিতে কেটেও ছিল। এর আগের বাসার ডাইনে-বাঁয়ে উর্ধ্বে-অধে (একটা তিনতলা বারাক বাড়ীর দোতলার ফ্ল্যাটে থাকতাম আমরা) দিন-রাত যে কেচাকেচি, ঝগড়াবিবাদ বিকট হৈ-হল্লা ও বিকটতর হাসি, যখন-তখন তারস্বরে গান এবং আর কিছু না হোক অকারণ উল্লাসে মধ্যে মধ্যে অনর্থক পৈশাচিক চিৎকার লেগে থাকত, তার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে অন্তত বেঁচেছিলাম। এ পাড়ার বাড়িগুলো নিতান্ত গায়ে গায়ে নয়, তাছাড়া বাসিন্দারা

অধিকাংশই বড় সরকারী চাকুরে কিংবা অধ্যাপক শ্রেণীর, দু'একজন উকীল ডাক্তারও আছেন অবশ্য—তবে তাঁরা কেউই খুব হৈ-হল্লা করার লোক নন। সুতরাং অতঃপর একটা গালভরা বিষয় ও তদোধিক গালভরা নামের একখানা মোটাসোটা বই লিখে ফেলাও অসম্ভব হবে না—মনে মনে এমন একটা আশ্বাসও উঁকিঝুঁকি মারছিল।

অবশ্য খুব যে একটা চেঁচামেচি এক্ষেত্রেও হয়েছিল—তা নয়।

নিতান্ত খুব শান্ত পরিবেশ ব'লেই সেটুকু গোলমাল কানে এসেছিল।

কোন এক ভদ্রলোক কোন ছেলেপুলেকে মারছেন আর তর্জন করছেন—তারই আওয়াজ। গোলমাল তাকে বলা চলেও না ঠিক, কারণ তর্জনটা হচ্ছিল এক তরফাই। অপরপক্ষ একেবারে নিরুত্তর, এমন কি কোনরকম কান্নাকাটির শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল না।

খুব কাছেই কোথাও, তবু ঠিক কোন্ দিক থেকে আসছে তা বুঝতে পারি নি। তা নিয়ে মাথাও ঘামাই নি। অভিভাবকদের ছেলে শাসন করা ব্যাপারটা একেবারেই সাধারণ ঘটনা। এ তো ঘরে-ঘরেই আছে। তা ছাড়া দু'চার মিনিটের মধ্যেই সেটুকু শব্দও থেমে গেল।

কিন্তু এই ধরণের বিশেষ একটি তর্জনের শব্দ অতঃপর দু-একদিন অন্তর-অন্তরই পাওয়া যেতে লাগল। বেশীক্ষণও নয়, খুব বেশীও নয়। তবে এই পাড়ার একেবারে শান্ত স্তব্ধ আবহাওয়ায় একটু বেমানান, এই যা। কয়েকদিন শোনবার পর একটু কৌতূহলও বোধ করলাম। কে এমন অবাধ্য বেয়াড়া ছেলে যাকে প্রায়ই শাসন করতে হয়, অথচ যে জবাব দেয় না, কাঁদেও না—কোন্ বাড়ির, কাদের ছেলে?

অবশেষে একদিন কৌতূহলটা মেটাবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। সাধারণতঃ আমি বাজারে যেতাম একটু দেরি ক'রেই—কারণ সকালে প্রাতঃকৃত্য, প্রাত্যহিক বেল এবং তার খানিকটা পরে চা খাওয়া ইত্যাদিতে আমার অনেকটা সময় প্রয়োজন হয়, ঠিকমতো প্রস্তুত হয়ে রাস্তায় বেরোতে বেরোতে আটটা বেজে যায়; গৃহিণী রাগারাগি করেন প্রত্যহই। এখানে সব সুবিধা, কেবল বাজার কিছু দূরে, অতএব ফিরে আসতে আসতে ন'টা বেজে যায়, তারপর চাকরে সাড়ে ন'টায় ভাত দেয় কি ক'রে? আবার ভাত খেয়ে বিশ্রাম না করলে চলে না। গৃহিণীর বক্তব্য যে, এতগুলি বদভ্যাসের অন্তত একটা না বাদ দিলে বা না বদলালে চাকর থাকবে না।

শুনতে শুনতে 'দুত্তোর' বলে একটা য়্যালার্ম দেওয়া ঘড়ি কিনে এনে ছ'টার জায়গায় সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে প্রায় সওয়া সাতটাতেই সেদিন বাজারে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

আর বাড়ি থেকে বেরোতেই দৃশ্যটা চোখে পড়েছিল।

আমাদেরই পাশের বাড়ির ভদ্রলোক। দোতলা ছোটগোছের বাড়ি নিয়ে থাকেন—নিজের কিনা তা জানি না—তবে মনে হয় নিজেরই। সামনে একটু বাগান-মতোও আছে। ভদ্রলোক উকীল, নাম বঙ্কিমবাবু, প্রায়ই আমার সঙ্গে বেরোন,

কালীঘাট ডিপো পর্যন্ত এক বাসেই যান। বাজারেও দেখা হয় মধ্যে মধ্যে। সেই সূত্রে সামান্য একটু আলাপও হয়েছে।

এই তর্জনের শব্দটাই যে প্রত্যহ শুনি তাতে কোনও সন্দেহ রইল না। তেমনি একটা চাপা অথচ মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ তর্জন চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ির এত কাছে বলেই চাপা হ'লেও শুনতে পাই, দেখতে যে পাই না তার কারণ আমাদের ফ্ল্যাটটা ওদিকে, এদের আর আমাদের মধ্যে একটি সিঁড়ি ও এক সার ঘরের ব্যবধান আছে।

বঙ্কিমবাবু দেখি তাঁর এক ফালি বাগানে দাঁড়িয়েই ছেলেকে শাসন করছেন। এক হাতে কানটা ধরে আর এক হাতে ঠাস ঠাস ক'রে চড় মারছেন।

'বলবি, আর বলবি সত্যি কথা ? আর কখনও বলবি। তোর সত্যি কথা বলা একেবারে জন্মের মতো যদি ঘুচিয়ে না দিই তো আমার নাম নেই। হারামজাদা বজ্জাত বদমাইশ কোথাকার!'

মনে হ'ল ভুল শুনছি। কিম্বা ভদ্রলোকই রাগের মাথায় উল্‌টোপাল্‌টা বলছেন। সত্যি কথা বলার জন্যে কেউ কখনও ছেলেকে শাসন করে ?

কিন্তু ছেলেটিকেও তো আমি জানি। বলাই নাম ওর—অন্তত সেই নামে ওর বাবা ডাকেন—পনেরো-ষোল বছরের ছেলে, বেশ শান্তশিষ্ট ধরনের, প্রায়ই দেখি বাগানের গেটের কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন দিন কোন অসভ্যতা বা বাচালতা লক্ষ্য করি নি। হৈ-হল্লা তো নয়ই। তবে ?

রহস্য আরও ঘনীভূত হ'ল—যখন ওপরের বারান্দা থেকে বলাইয়ের মা'র গলা পাওয়া গেল। ভদ্রমহিলা যে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন—অথবা এখনই এসে দাঁড়ালেন—তা লক্ষ্য করি নি। তিনিও চাপা অনুনয়ের সুরে বললেন, 'না গো না' কাল তিনবার মিথ্যে বলেছে—আমি নিজে স্বকর্ণে শুনেছি। মিছিমিছি অতবড় ছেলেটাকে রোজ রোজ অমন ক'রে মেরো না পাঁচজনের সামনে, একেবারে বিগড়ে যাবে। অভ্যেস কি আর একদিনে পাল্টায় ?'

'পাঁচজনের সামনে' শব্দ দুটোতেই বোধ হয় সচেতন হয়ে উঠে আমার দিকে অর্থাৎ রাস্তার দিকে তাকালেন বঙ্কিমবাবু। চোখোচোখি হওয়াতে তিনি লজ্জা পেলেন—আমি পেলাম। তাঁর ছেলেকে তিনি শাসন করছেন—আমি কেন হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকি সেদিকে ?

অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে সরে গেলাম সেখান থেকে।

কিন্তু সত্য কথা বলতে কি কৌতূহলটা থেকেই গেল। বরং আরও প্রবল হ'ল—বলাই উচিত। বঙ্কিমবাবুর কথাগুলোকে উল্টোপাল্টা ব'লে ভাবা চলত অনায়াসে যদি না ওঁর স্ত্রী আবার শেষের ঐ কথাগুলো বলতেন।

ব্যাপারটা যেন ক্রমশঃই বড্ড গোলমেলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে না ?

সেদিন বাজারে বড় গোলমাল হয়ে গেল। অর্থাৎ সারাক্ষণ অন্যমনস্ক হয়েই বাজার করলুম বলতে গেলে। ফলে ফরমাশী জিনিসের একটাও কেনা হ'ল না—এমন কি নিত্য-নৈমিত্তিক যেটা—আলু সেটাই ভুল হয়ে গেল।

আমার গৃহিণী কপালে চাপড় মেরে আত্মধিক্কার দিলেন, 'এই লোককে নিয়ে আমার সংসার করার সাধ যে কেন তাও জানি না। আবার চাকরকে এই এত পথ পাঠাব তবে রান্না হবে। ধন্যি ধন্যি।...মাথাতে কি কিছু থাকতে নেই—ঐ ছাই-ভস্ম বইখাতা আর ছাত্তর ছাড়া।...তাও যদি আমার ন'দির ভাসুরের মতো দু' পয়সা রোজগার করতে পারতে তো বুঝতুম। বলি সেও তো একটা নামকরা প্রফেসার গো, কিন্তু সে টিউশানি ক'রে বই লিখে মানের বই লিখে তোমার তিনগুণ রোজগার করছে দ্যাখো গে যাও। তার ওপর সে সংসারও করছে; তোমার মতো শুধু কেলাস আর ছাত্তর আর পড়ানো নিয়ে এমন উন্মত্ত হয়ে নেই।'

এর পর আর কিছু বলা উচিত নয়, তবু খাওয়ার সময় লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেলি কথাটা।

'ও হরি। অবাক করেছে। তুমি সেই কথা ভেবে মাথা খারাপ করছ সেই থেকে। না, মাথাটা তোমার সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে—চিকিচ্ছে করাও।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

'ওমা, ওর কথা আবার এ পাড়ায় কে না জানে। কম বদমাইশ ছেলেটা। বাপ-মার হাড় ভাজাভাজা ক'রে খাচ্ছে একেবারে।'

তবু বিস্ময়ের অবসান হয় না। বিহ্বল হয়ে বলি, 'কিন্তু ছেলেটাকে তো তেমন—'

'হ্যাঁ—মিচ্‌কেপড়া শয়তান। হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি ওর।'

এবার আসল কথাটা মনে পড়ে যায়; বলি, 'কিন্তু মিথ্যে কথা বলে—না সত্যি কথা বলে? সত্যি কথা বলার জন্যে বাপ মারবে কেন? আমরা তো জানি ছোটবেলা থেকে এইটেই শেখানো হয়—সদা সত্য বলিবে। তা'হলে? ব্যাপার যে কি সেইটেই তো বুঝতে পারছি না।'

'ওগো মশাই, সদা সত্য বলিবে—ও কথাটা পুঁথিপত্তরেই ভাল। ঘর-সংসার করতে গেলে কি অত যুধিষ্ঠির হওয়া চলে। তাও তো যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যে বলতে হয়েছিল। তার ওপর বঙ্কিমবাবু হলেন গে উকীল, মিথ্যে কথা বলাই ওঁদের ব্যবসা, ওঁর বাড়িতে যদি অমন সত্যিবাদী গজিয়ে ওঠে তো কি বিপদ বাধে বলো দিকি।'

তবু কথাটা যে ঠিক মাথায় ঢুকছিল না সেটা বোধ করি আমার চোখের চাউনি দেখেই বুঝতে পারলেন আমার গৃহিণী। তাঁর মুখে একটা অসীম অনু-কম্পা ফুটে উঠল।

'বুঝতে পারলে না? ছেলেটা যদি বাড়ির মধ্যে বসে সত্যি কথা বলে তাহলে তো কোন অসুবিধা হয় না। ছোঁড়ার যত ঝোঁক ঐ বাইরের ঘরে। ধরো বঙ্কিমবাবু হয়তো কোন মক্কেলকে বোঝাচ্ছেন যে পরের দিন তাঁর অনেকগুলো কেস আছে, নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পাবেন না—ছেলেটা দুম ক'রে ব'লে বসল, "তবে যে বাবা তুমি বলছিলে কাল দিদির জন্যে পাত্তর খুঁজতে যাবে চুঁচড়োয়।" কী

অপ্রস্তুত হ'তে হয় বলো তো। একেবারেই যেদিন কাজকর্ম থাকে না, সেদিন হয়তো সকাল ক'রে আদালত থেকে এসে ঘুমোন ভদ্রলোক, কিন্তু সেকথা কি মক্কেলকে বললে চলে? সেদিন অমনি চলে এসেছিলেন, কে এক মক্কেল গিয়ে খুঁজে পায় নি, সন্ধ্যাবেলা এসে সে-কথা বলাতে বঙ্কিমবাবু সবে শুরু করেছেন—“হ্যাঁ, আজ একটা কমিশন ছিল কি না, মোটা টাকার ব্যাপার, তাই বেরিয়ে গিয়েছিলুম—” অমনি কুটুস ক'রে ছেলেটা বলে উঠল, “কমিশন বুঝি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি চুকে গেছে বাবা, তুমি তো সেই বেলা দেড়টায় বাড়ি চলে এসে ঘুমোচ্ছিলে!” আচ্ছা এর পর কোন্ ভদ্রলোকের মাথা ঠিক থাকে বলো দিকি!'

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলুম। সত্য এক্ষেত্রে শুধু সত্য নয়—ইংরেজীতে যাকে বলে য়্যাগ্রেসিভ অর্থাৎ গায়ে-পড়া সত্য, তাই।

তখন আর কথা বাড়াবার অবকাশ ছিল না, দশটা বেজে গেছে, সেদিন আবার সকাল সকাল ক্লাস—সুতরাং ও প্রসঙ্গে ঐখানেই ইতি টানতে হ'ল তখনকার মতো।

তারপর সারাদিন অবশ্য আর কথাটা মনে ছিল না, সহস্র কাজের মধ্যে ভুলে গিয়েছিলাম। কৌতূহল মোটামুটি নিবৃত্ত হয়েছে, অহরহ মনে খোঁচা দেবার আর কারণ নেই, কাজেই মনে থাকার কথাও নয়।

কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে বাস থেকে নেমে আমাদের অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তাটায় পড়তেই প্রথম যাকে দেখতে পেলাম—সে হোল শ্রীমান বলাই। ওদের গেটটা ধরে বড় রাস্তার দিকেই চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এমনিই দাঁড়িয়ে থাকে সে বেশির ভাগ। ভীড়ে মেশার চেয়ে দূরে থেকে ভীড় দেখতেই তার ভাল লাগে বোধ হয়।

ওকে দেখেই সব কথাগুলো মনে পড়ে গেল। কেমন একটা কৌতূহল বোধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটু কৌতুকও। গতিটা ঈষৎ একটু বাঁকিয়ে ওর কাছাকাছি এসে পড়লাম। এর আগে কোনদিন ওর সঙ্গে কথা বলি নি কিন্তু আজ একটু থেমে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কী, বাবা কি করছেন? ফিরেছেন কাছারী থেকে?'

ছেলেটা একবার যেন ভয়ে ভয়ে ওদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে নিল, তারপর গলাটা নামিয়ে প্রায় ষড়যন্ত্রকারীর মতো ফিসফিস ক'রে বলল, 'বাবা তো আজও সেই দুটোর সময় ফিরে এসেছে। ঘুমোচ্ছে সেই থেকে পড়ে পড়ে। মক্কেলদের অবশ্য তা বলা চলবে না, তারা কেউ এলে বলতে হবে যে বাবা এই বাড়ি ফিরলেন, একটা জরুরী কনসালটেশ্যান ছিল, হাইকোর্ট গিছলেন—তা আপনি তো আর মক্কেল নন, তাই আপনাকে বললাম!'

সত্য কথাটা বলতে পেয়ে ছেলেটা যেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। বেশ একটা মধুর হাসিতে ভরে গেল ওর মুখখানা।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সশব্দে দোর খুলে বেরিয়ে এলেন বঙ্কিমবাবু।

'কী বলছিল, কী বলছিল ও হতভাগা বাঁদরটা বলুন তো—আপনাকে কী বললে ও?'

চেয়ে দেখি বলাইয়ের মুখটা ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেছে। একটু মায়াই হ'ল। বললাম, 'না, আমি এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম তোমার বাবা কি করছেন। তা ও বললে, হাইকোর্টে নাকি একটা কি কনসাল্‌টেশ্যন ছিল আপনার, তাই একটু আগে ফিরেছেন।'

'বলেছে, তবু রক্ষে!'

স্পষ্ট একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল বঙ্কিমবাবুর মুখে। কিন্তু সে নিতান্তই স্বল্পস্থায়ী। আমি বা তিনি আর কিছু বলার আগেই বলাই বলে উঠল, 'না বাবা, আমি বলেছি যে মক্কেল এলে ঐ কথা বলতে হবে। উনি তো আর মক্কেল নন, তাই ওঁকে যা আসল কথা তাই বলেছি যে, তুমি দুটোর সময় বাড়ি ফিরে এসে ঘুমোচ্ছ।'

অন্ধকার হয়ে উঠল বঙ্কিমবাবুর মুখ। রাগে দাঁত কিড়মিড় ক'রে উঠলেন তিনি। নিতান্ত আমি আছি ব'লেই বোধ হয় হাতটা বাড়াতে গিয়েও বাড়াতে পারলেন না।

'দেখলেন! দেখলেন হারামজাদার কাণ্ডটা! আপনি ওকে বাঁচাবার জন্যে একটু রেখে-ঢেকে বলতে গেলেন—কী রকম অপ্রস্তুতটা আপনাকে ক'রে দিলে!...না, না, হাসবেন না সূর্যবাবু, এ হাসবার কথা নয়। আমার পক্ষে এ মারাত্মক প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। আসুন আসুন—একটু দয়া ক'রে অফিসঘরে বসবেন চলুন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ সব কথা বলা যায় না—'

আমি তাড়াতাড়ি বলতে গেলাম, 'আমি বরং খানিক পরে আসবখন্—মুখহাত ধুয়ে চা খেয়ে?'

'না না—দয়া ক'রে এখনই একটু বসে যান। চা এক কাপ না হয় গরিবের ঘরেই খাবেন। বেশীক্ষণ আটকাবও না আপনাকে। কিন্তু এমন হয়েছে, কথাটা কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে না পারলেও আর চলছে না। ছেলে তো নয়—গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে।'

অগত্যা ও'র পিছু পিছু যেতে হ'ল ভেতরে।

আমাকে তাঁর অফিস ঘরে বসিয়ে এক দৌড়ে একবার ভেতরটা ঘুরে এলেন ভদ্রলোক—বোধ করি চায়েরই ফরমাস ক'রে এলেন—তারপর ওধার থেকে তাঁর চেয়ারটা টেনে এনে একেবারে সামনাসামনি বসলেন আমার।

'আপনি তো মশাই নামকরা প্রোফেসর একজন—না-না, আপনি ঘাড় নাড়লে কি হবে, আপনার নাম আমি অনেকের মুখেই শুনেছি—ছেলেরা নাকি আপনার ইশারায় ওঠে বসে, সব আপনার হাতধরা।...আপনি দয়া ক'রে একটা উপায় বাত্‌লান দিকি।...অনেকদিন ধরেই ভাবছি আপনার কাছে যাবো পরামর্শের জন্যে—কিন্তু লজ্জাও তো করে, বুঝলেন না, এ কি আর পরের কাছে বলবার মতো কথা!'

ক্ষোভে উত্তেজনায় সঙ্কোচে ভদ্রলোকের গলা যেন বুজে এল। কিছুক্ষণের মতো থামলেন তিনি। একটু উৎসুকভাবে তাকালেন আমার মুখের দিকে। কিন্তু

আমিই বা কি বলব ? মুখে যথাসম্ভব সহানুভূতির ভাব আনবার চেষ্টা করলাম শুধু।

একটু পরে তিনি যেন একটু কুণ্ঠিতভাবেই আবার বললেন, 'শুনেছেন সব নিশ্চয়ই—এ কেলেঙ্কারী আর এ পাড়ায় কারই বা জানতে বাকী আছে বলুন, পাশাপাশি বাড়ি সব, ওর মা বলেন, যা করবে বাড়ির মধ্যে করো—পাড়ায় ঢিঢিক্কার না হয়। কিন্তু সব সময় কি আর অত হিসেব ক'রে চলা যায় ? আপনিই বলুন, মানুষের শরীর তো, কী রকম অসহ্য রাগ হয় বলুন দিকি !'

আমি বললাম, 'আমি কিন্তু এতকাল শুনি নি, আজ সকালের ঐ ব্যাপারটা দেখে বাড়িতে গিয়ে বলতে কিছু কিছু জানতে পারলুম।'

'যাই হোক, জেনেছেন তো। এখন কী করি তাই বলুন ! আপনি তো অনেক সাইকোলজিটজি পড়েছেন, এর কোন উপায় হয় না ? অথচ দেখুন ছেলেটার এদিকে সব ভাল, যাকে বকাটে বলে তা আদৌ নয়। পড়াশুনাতেও বেশ মাথা—ফার্স্ট, সেকেন্ড হয় ক্লাসে। এই এক রোগেই সব নষ্ট হয়ে গেল !'

'দেখুন, এ হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ব্যাধি।' সবিনয়ে স্বীকার করি, 'এর প্রতিকার বাত্‌লানো আমার কর্ম নয়। এ রকমের কেসের কথা দু'একটা পড়েছি বটে, তবে ঠিক সেভাবে তো পড়াশুনো করি নি কোনদিন।'

তারপরই প্রসঙ্গটা তখনকার মতো ছেদ টেনে সরে পড়বার গরজে তাড়াতাড়ি বলি, 'আমি বরং আমার দু'একজন বন্ধুকে—যাঁরা এই সাবজেক্‌ট্‌ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন—জিজ্ঞাসা ক'রে দেখব। যদি কোন রকমের চিকিৎসার কথা বলেন, তাও আপনাকে জানিয়ে দেব।'

'খুব ভাল হয়, খুব ভাল হয় তা হ'লে !' কৃতজ্ঞগদ্‌গদ কণ্ঠে বলে ওঠেন ভদ্র-লোক, 'যা বলবেন তাই করব। এ সব চিকিৎসা কোথায় হয় তা তো জানি না, তাহলে সেখানেই নিয়ে যেতাম এতদিন।'

'দেখি, আমি খোঁজ নিয়ে সব জানিয়ে দেব আপনাকে।' আশ্বাস দিয়ে বলি।

ততক্ষণে চাও এসে পৌঁচেছে। কানাভাঙ্গা কাপে অপেয় এক-প্রকার গরম পানীয়। একেই বোধহয় মক্কেলের চা বলা হয়। কোনমতে চোখ-কান বুজে তার খানিকটা গলাধঃকরণ ক'রে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

বঙ্কিমবাবুও আমার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এলেন। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'সত্যি, তবু অনেকটা ভরসা পেলাম আপনার কথাতে। আমি তো তাই বলি বাড়িতে, অতবড় একটা পণ্ডিত লোক এসেছেন পাড়ায়—এ আমাদের কতটা জোর, কতখানি ভরসার কথা !'

বলাই তখনও তেমনি গেট ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে টুক্‌ ক'রে বলে উঠল, 'তুমি কোথায় তা বললে বাবা, মা-ই তো বলছিল যে পাড়ার লোক বলাবলি করছে লোকটা নাকি খুব পণ্ডিত, বিলিতি ডিগ্রি আছে—তুমি তো বরং বললে লোকটা বড্ড দেমাকে চালবাজ, পাড়ার কারুর সঙ্গে মেশে না, অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে

না—আরও কত কী !···এখন দেখছ তো কেমন ভাল লোক। আমার এক মাস্টার মশাই তাই বলছিলেন, অত বড় পণ্ডিত তবু কেমন ভদ্র, মাটির মানুষ একেবারে—'

আরও কত কী বকে গেল সে। কিন্তু সেটা দাঁড়িয়ে শোনার মতো মানসিক অবস্থা নয় আমার। কোনমতে শ্রুতিসীমার বাইরে যেতে পারলেই বাঁচি তখন।

বঙ্কিমবাবুর মুখের ভাবটাও অনুমান মাত্র করতে পারলাম, তাঁর মুখের দিকে চাইতে আর সাহস হ'ল না। তাড়াতাড়ি ফটকটা খুলে বাইরে বেরিয়ে দ্রুত বাড়ির পথ ধরলাম।

এর তিন-চারদিন পরে কী একটা উপলক্ষে সকাল ক'রে বাড়ি ফিরছি, দেখি শ্রীমান বলাইদেরও স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে, সেও বই খাতা হাতে বাড়ি ফিরছে। গলির মোড়েই দেখা হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হ'ল ওকে একটু বাজিয়ে দেখলে মন্দ হয় না।

নিজে থেকেই ডেকে বললাম, 'কী বলাই, ছুটি হয়ে গেল ?'

'হ্যাঁ স্যার।' সপ্রতিভভাবে কাছে এগিয়ে এল।

'কী করবে এখন ? ঘুমোবে ?'

'না স্যার, এমনিই—গল্পের বইটই পড়ব। ঘুমোতে আমার ইচ্ছে করে না।'

'তা হ'লে চল না আমাদের বাড়ি। একটু গল্প করা যাক।'

'এক্ষুণি আসছি স্যার—এক মিনিট।'

সে যেন লাফিয়ে উঠল একেবারে। আমাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে একছুটে নিজেদের বাড়িতে ঢুকে, জানলা গলিয়ে বইখাতাগুলো বাইরের ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়েই আবার একছুটে বেরিয়ে এল।

'চলুন স্যার। ওঃ, আমার কত দিনের শখ, আপনার লাইব্রেরী দেখব। আমাদের হিস্ট্রীর স্যার বলেন, আপনার নাকি অনেক ভাল ভাল বই আছে।'

'কিন্তু সে তো তোমার ভাল লাগবে না বাবা, সে ছবির কি গল্পের বই নয়। মোটা মোটা ভারী বই সব—ইংরিজী, ফরাসী ভাষায় লেখা।'

একটু ম্লান হয়ে গেল—মুহূর্তের জন্য। তারপরই আবার উজ্জ্বল মুখে বলল, 'তা হোক, তবু চেহারাটা তো দেখতে পাব। আর কাল ইস্কুলে গিয়ে গল্প করলে স্যারেদের যা হিংসে হবে।'

আপন মনেই সে হেসে নিল খানিকটা। প্রসন্ন সকৌতুক হাসি।

ওকে নিয়ে গিয়ে লাইব্রেরী ঘরেই বসালাম। বাড়িতে বলে দিলাম ওকে কিছু জলখাবার দিতে। দেখলাম বুঝুক না বুঝুক, বইয়ের দিকে ঝোঁক খুব, যেন ভাল ভাল বইতে হাত বুলিয়েই আনন্দ ওর। গল্প ক'রে বুঝলাম ছেলেটা সত্যিই ভাল, খাঁটি ইস্পাত। ঠিক মতো গড়ে নিতে পারলে ধারালো তলোয়ার হয়ে উঠবে একদিন।

একথা সেকথার পর আসল কথাটা তুললাম, বললাম, 'আচ্ছা বলাই, তোমার ব্যাপারটা কী বলো দিকি? এত মার খাও, বকুনি খাও—তবু এমন গায়ে পড়ে সত্যি কথা বলতে যাও কেন? যেখানে শুধু চুপ ক'রে থাকলেই চলে, মিথ্যে কথাও বলতে হয় না, সেখানেও নিজে এগিয়ে গিয়ে এমন বিভ্রাট বাধাও কেন?'

ঘাড় হেঁট ক'রে রইল বলাই। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, পাখার নিচে বসে থাকা সত্ত্বেও তার কপালে চুলের কোণে কোণে ঘাম দেখা দিয়েছে। গলার খাঁজটাও যেন চিকচিক করছে।

একটু অপেক্ষা ক'রে থেকে আবারও বললাম, 'এইটেই যদি খুলে বলতে পারো, তাহলে বুঝব তুমি সত্যি-সত্যিই সত্যবাদী।'

এবার মুখ তুলে তাকাল। লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে বেচারী। চোখ দুটোও যেন কেমন ছলছল করছে।

একবার মাত্র আমার চোখের দিকে তাকিয়েই আবার মুখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'একদিন জেদ ক'রে বদমাইশী করবার জন্যেই ওটা অভ্যেস করেছিলুম, এখন আর ছাড়তে পারছি না। এখন কত চেষ্টা করি চুপ ক'রে থাকার কিন্তু কী যে হয়, কথাটা যেন কে জোর ক'রে বলিয়ে দেয়।'

বিস্মিত হয়ে বলি, 'কিন্তু জেদ ক'রে তখন অভ্যেস করেছিলে কেন?'

আরও হেঁট হয় ওর মাথাটা। প্রায় চুপি চুপি বলে, 'সে তিন চার বছর আগের কথা, বাড়ির স্যার একটা টাস্ক দিয়ে গিয়েছিলেন—মনে ছিল না। বকুনি খাবার ভয়ে মিছে কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম যে বাবার শরীরটা খারাপ ছিল, ডাক্তারের বাড়ি যেতে হয়েছিল তাই করতে পারি নি। সে স্যার বড্ড কথায় কথায় মারতেন, সেই জন্যেই যা মুখে এসেছিল বলে ফেলেছিলাম। কিন্তু সেইদিনই কী জন্যে বাবা সে ঘরে এসে পড়লেন। মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গেল। স্যার তো খুব মার-লেনই—তিনি চলে যেতে বাবা চেলাকাঠের বাড়ি এমন মারলেন, চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল, এখনও তার দাগ আছে। তার চেয়েও বড় কথা—বললেন, আমি তাঁর মাথা হেঁট ক'রে দিয়েছি—এমন ছেলে যাঁর তাঁর আর ভদ্র সমাজে মুখ দেখানো উচিত নয়। এই ছেলের জন্যে তাঁকে একদিন আত্মহত্যা করতে হবে। তার পরদিন থেকে রোজ আমাকে সামনে বসিয়ে একশ' আটবার ক'রে লেখাতেন —সদা সত্য কহিবে। রোজ ভোরে আর শোবার আগে দশবার ক'রে বলিয়ে নিতেন যে কোন দিন কোন কারণেই মিছে বলব না। সে-ই আমার কেমন রোখ্ চেপে গেল, বুঝলেন, মনে মনে ঠিক করলুম যে সত্যি কথা বলেই বাবাকে জব্দ করতে হবে। ···সেই যে অভ্যেস করলুম আর এখন ছাড়তে পারি না। খুব চেষ্টা করি, আমি নিজেই বুঝতে পারি বাবা কী রকম অপ্রস্তুত হন, অপমানিত হন আমার জন্যে, কিন্তু তবু—। কী যে হয়!···এক একদিন নিজেরই চোখে জল এসে যায়।'

ছেলেটার দেখি সবই বিচিত্র। যাই হোক তবু কাছে টেনে এনে মাথার পিঠে হাত বুলিয়ে বলি, 'মিছে কথা কোন অবস্থাতেই বলা ঠিক নয় অবিশ্যি, কিন্তু

শাস্ত্রে আছে, প্রাণ রক্ষার্থে, মান রক্ষার্থে, খেলার সময়, ইয়ার্কি ক'রে আর স্ত্রীর কাছে মিছে বলাটা তেমন দোষের নয়। এটা তো মান রক্ষারই ব্যাপার, আর বাবার মান সকলের চেয়ে বড়। তা তুমি শুধু চুপ ক'রে থাকার অভ্যেসটাই করো না বাপু। যেমন ক'রে এই অকারণ সত্যি বলার অভ্যেস করেছ তেমনি চেষ্টা করলেই আবার তা ছাড়তেও পারবে।'

খানিকটা মাথা হেঁট ক'রে বসে থেকে আস্তে আস্তে বললে, 'খুব চেষ্টা করছি, আরও করব স্যার। কিন্তু কী জানেন, আমার মনে হয় ভাল অভ্যেসটা করাই শক্ত, খারাপটা চট্ ক'রে হয়ে যায়।'

তারপর কি ভেবে একেবারে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে—'আচ্ছা আমি আসি স্যার' বলে বেরিয়ে গেল।...

ইতিমধ্যে একজন ভাল ডাক্তারের নাম-ঠিকানাও যোগাড় ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম বঙ্কিমবাবুর কাছে, কিন্তু তিনি সেখানে গিয়েছিলেন কিনা অথবা তার ফলাফল কী হ'ল তা জানতে পারি নি।

ব্যস্তও ছিলাম ক'দিন খুব।

তবে যতই ব্যস্ত থাকি, কথাটা মনে ছিল। ছেলেটার সম্বন্ধে কোথায় যেন একটু দুর্বলতাও দেখা দিয়েছিল মনের মধ্যে। তাছাড়া কৌতূহল তো ছিলই।

সময় মিলল একেবারে দিন দশেক পরে।

হাতে খুব জরুরী কাজ না থাকলে নিজেই বাজার করতে যাই। সেদিনও বাজারের থলি হাতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ওঁদের বাড়িতে ঢুকব মনে মনে এ সংকল্প ছিলই কিন্তু তার দরকার হ'ল না। ওঁদের ফটকের সামনে আসতেই দেখি বঙ্কিমবাবুও থলে হাতে বেরোচ্ছেন, পিছনে বলাই।

'এই যে, বাজারে চল্লেন ? ভালই হ'ল, চলুন একসঙ্গে যাই।'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন বঙ্কিমবাবু, 'তারপর, ভাল আছেন তো ? কদিন দেখতেই পাই নি আপনাকে। ছেলেটা কেবল বলে, যাই খবর নিয়ে আসি। তা আমিই বারণ করি, বলি, তুই তো গিয়ে কেবল বক বক করবি, ওঁরা কাজের মানুষ, ক্ষতি হয় ওঁদের।'

'না না, গেলেই পারত। আপনার ছেলের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে।'

তারপর গলাটা একটু নামিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'তারপর, গিছলেন নাকি ডাক্তার বোসের ওখানে ?'

'না না—তার দরকারই হয় নি।' সোৎসাহে গলা ছেড়েই বলে ওঠেন বঙ্কিমবাবু, 'সেই জন্যেই তো আরও কদিন খুঁজছি আপনাকে। আপনিই তো পেশেণ্ট সারিয়ে দিলেন মশাই, আপনার কাছে গিয়েছিল, আপনি বুঝি খুব লজ্জা দিয়েছেন ওকে, তার পরই একেবারে চেঞ্জ, সে ছেলেই নয় আর। এখন একদম চুপ ক'রে থাকে। বেঁচেছি মশাই, ওঃ—যা হয়েছিল।......আপনার ঋণ শোধ হবার নয়।'

খুশী হলাম। আত্মপ্রসাদও বোধ করলাম একটু। দু' পা পিছিয়ে সস্নেহে বলাইয়ের কাঁধে হাত রাখলাম অর্থাৎ আমার তরফ থেকেও কৃতজ্ঞতার একটা নীরব স্বীকৃতি জানাতে চাইলাম।

বলাই খুশিতে যেন গলে গেল। কিন্তু তার মধ্যেই গলা নামিয়ে বলল, 'আমি অনেকটা শুধরে নিয়েছি স্যার, কিন্তু সে জন্যে নয়, বাবা কেন ডাক্তারের বাড়ি যায় নি জানেন? ঐ যে আপনি লিখে দিয়েছিলেন, ডাক্তারের ষোল টাকা ক'রে ফী, হয়ত সপ্তাহে দু' তিন দিন নিয়ে যেতে হবে আমাকে—তাতেই বাবা পিছিয়ে গেল। বললে, "এ তো হাতীর খরচ, এত আমি পাব কোথা থেকে! ওঁর আর কি, মোটা মাইনের চাকরি করেন, বলে দিয়েই খালাস।……আমাকে মক্কেল ঠেঙ্গিয়ে খেতে হয়।"……তবে আর ডাক্তারের দরকার হবে না স্যার, দেখে নেবেন। আমি অনেক ভাল হয়ে গিয়েছি।'

নিরুত্তাপ

এই হাসপাতালেই আলাপ হয়েছিল ওদের। কৃষ্ণা বলে হাসপাতাল, আসলে টি-বি স্যানাটোরিয়াম। কী একটা গালভারী নামও আছে তার আগে। কিন্তু একশোবার ঐ দাঁতভাঙ্গা স্যানাটোরিয়াম শব্দটা উচ্চারণ করতে কেমন যেন ক্লান্তি বোধ হয় কৃষ্ণার, সে তাই সোজাসুজি হাসপাতালই বলে।

আলাপ হবার কথা নয়। নিয়মকানুনের কড়াকড়ি যথেষ্ট। কোন সুস্থ সহজ মানুষ না এই সাংঘাতিক সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যায়—সেজন্য কর্তৃপক্ষের সতর্কতার অন্ত নেই। তবু এর মধ্যেই ওদের একটু নিভৃত পরিচয়ের সুযোগ ঘটে গিয়েছিল।

কৃষ্ণা বোসের দিদি থাকে এখানে। আজকাল কলকাতার আশপাশে বা কাছাকাছির মধ্যে এত টি-বি স্যানাটোরিয়াম হাসপাতাল থাকতে এখানে আসাটা একটু বিস্ময়কর বইকি। কিন্তু ওদের উপায় ছিল না। ওর ভগ্নীপতি শশীবাবু একটু ভীরু প্রকৃতির নিরুদ্যম মানুষ—নিতান্ত কনিষ্ঠ কেরানী না হ'লেও খুব বড় গোছের অফিসার কেউ নন—সাধারণ চাকুরে। স্ত্রীর এতবড় নিদারুণ অসুখের কথা শুনেও তিনি পাড়ার ডাক্তারের নির্দেশমতো ওষুধ ইঞ্জেকশ্যন দেওয়া ছাড়া আর কিছু ক'রে উঠতে পারেন নি। ছেলেদের একটু সরিয়ে দেওয়াও হয়ে ওঠে নি তাঁর দ্বারা। এমন কি অসুখটার খবর পেয়ে তাঁদের 'কম্‌বাইন্ড হ্যান্ড'টি যখন পলায়ন করেছে, তখন নিজেই রেঁধে খেয়ে এবং খাইয়ে অফিস করেছেন, একটা লোকও খোঁজ করতে পারেন নি।

এর মধ্যেই খবর পেয়ে কৃষ্ণার ছোড়দা জয়ন্ত এসে পড়েছিল। জয়ন্ত নতুন মিলিটারী অফিসার হয়েছে—হাল আমলে। বয়স কম, পদবীও এমন একটা কিছু

বড় রকমের নয়—কিন্তু অত্যন্ত সুশ্রী চেহারা, বিনম্র ভদ্র স্বভাব এবং অল্প বয়সের জন্য সে তার ওপরওয়ালাদের বিশেষ প্রিয়। সেই সুযোগ নিয়েই একজন বড় কম্যাণ্ডিং অফিসারকে ধরে এই শৌখিন পার্বত্য স্যানাটোরিয়ামে কনশেসন-রেটে ভর্তি করার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে জয়ন্ত তার দিদির। জামাইবাবু কৃতজ্ঞচিত্তে এসে স্ত্রীকে পৌঁছে দিয়ে গেছেন এবং এই টাকার সবটা না হোক বেশির ভাগ তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব তাও জানিয়েছেন। বাকীটা জয়ন্তই দিতে রাজী হয়েছে।

কলকাতা থেকে বহুদূরে পাহাড়ের ওপর এই হাসপাতাল। এখানে হুট বলতেই কারও পক্ষে এসে দেখে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই এখানে যারা দেখতে আসে তারা দিন কয়েক থেকে যায়। সে জন্য একটা গেস্ট হাউসের ব্যবস্থাও আছে। এ ছাড়া আছে আশেপাশে কয়েকটা লজিং হাউস। কৃষ্ণা এমনি একটা লজিং হাউসেই এসে উঠেছিল।

এত দূরে বলেই কেউ আসে নি এতদিন। মল্লিকা যে তিন মাস এখানে এসেছে তার মধ্যে একজনও না। আসবেই বা কে, শশীবাবু তাঁর চাকরি আর ছেলেমেয়ে নিয়েই বিব্রত। তাঁরও, মা কি বোন এমন নিকট-আত্মীয় কেউ নেই—যার ভরসায় ছেলেমেয়েদের রেখে আসেন। নিতান্ত তিনি না এলে মল্লিকাকে আর কেউ হয়ত রাখতে আসতে চাইবে না বলেই, তিনি পাশের বাড়ির এক প্রতিবেশিনীর জিম্মায় তাদের রেখে এসেছিলেন, সে ভদ্রমহিলার ঘোরতর অনিচ্ছা জেনেও। অমন সাংঘাতিক রোগ যে বাড়িতে—সে বাড়ির ছেলেমেয়েরা কী পরিমাণ সে রোগের বীজাণু বহন করছে তার ঠিক কি, যদি তাঁর বাড়ি ছড়ায়!

কাজেই বার বার তাঁর ওপর এই অনভিপ্রেত ভার চাপানো ঠিক নয়।

আর আসবার মধ্যে মল্লিকার মা কি বড়দা। বড়দা থাকেন ব্যাঙ্গালোরে। তিনিও তাঁর নিজের সংসার নিয়ে বিব্রত, এমন কিছু বড় চাকরিও করেন না যে গাড়িভাড়া ক'রে দু'হাজার মাইল দূরে বোনকে দেখতে আসবেন। আর মা বললে গেলে চিররুগ্ন—তাঁর পক্ষে এতদূর ট্রেনে বাসে আসা অসম্ভব। কৃষ্ণারও আসা খুব সহজ ছিল না অবশ্য, বি-এ পাশ ক'রে পুরো এক বছর বসে থাকার পর সদ্য একটা চাকরিতে ঢুকেছে—এর মধ্যেই ছুটি চাওয়া শোভনও নয় সঙ্গতও নয়; চাইতও না সে—যদি না এখানকার ডাক্তার খোশলা চিঠি দিতেন যে রোগিনী দ্রুত উন্নতি করলেও—সকলের দ্বারা অবহেলিত হচ্ছে এই মনে ক'রে এখন তার মন যে রকম ভেঙ্গে যাচ্ছে তাতে অবস্থার আবার অবনতি ঘটাও বিচিত্র নয়। সুতরাং অবিলম্বে কোন নিকট আত্মীয়ের আসা দরকার। সেই চিঠি দেখিয়েই কৃষ্ণা এক মাসের ছুটি আদায় ক'রে এসেছে—যদিচ বিনা মাইনেয়। এখনও মাইনে-সুদ্ধ ছুটি তার পাওনা হয় নি।

ছুটি এক মাসের হ'লেও অতদিন থাকার ইচ্ছা ছিল না কৃষ্ণার, কারণ থাকা ব্যয়সাপেক্ষ। লজিং হাউসের ঘর-ভাড়াই দৈনিক তিন টাকা, এছাড়া খাওয়া-দাওয়ার খরচও চার টাকার কম নয়। যাকে বিনা মাইনেয় ছুটি নিয়ে আসতে হয়েছে তার

পক্ষে এ খরচা দুঃসহ। সব টাকাটাই ধার ক'রে আসতে হয়েছে, গিয়ে শোধ দিতে হবে, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি কাজে যোগ দিতে পারে ততই মঙ্গল।

কিন্তু মল্লিকা ওর কোন কথাই শুনল না। বিদায় নেবার প্রস্তাবেই কেঁদে আকুল হ'ল। বলল, 'এই বনবাসে আমাকে নির্বাসন দিয়ে তোরা কী ক'রে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারিস খুকী, আমি কী তোদের কেউ নই? এই রকমই যদি তোদের মনের ভাব তো এত হাঙ্গামাই বা করতে গেলি কেন—আর দুটো দিন ওখানে ফেলে রাখলেই তো সব দায়ে অব্যাহতি পেতিস। তোর জামাইবাবুও আর একটা বিয়ে করতে পারত, তোদেরও এসব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হ'ত না। কোনমতে মাস মাস হাসপাতালের খরচটা যোগালেই দায়িত্ব সব শেষ হয়ে যায়, না?...আসলে ওখানে থাকলে দেখাশুনো করতে হবে, ছোঁয়াচ লাগতে পারে বলেই এখানে এতদূরে সরিয়ে দিয়েছিস, সে কি আর আমি বুঝি না!' ইত্যাদি—

কৃষ্ণা টাকা-আনা-পাইয়ের কথাটা তার মাথাতে ঢোকাতে চেষ্টা করল কয়েক-বারই! কিন্তু তাতেও ফল হ'ল না। শশীবাবু যাবার সময় হাতখরচ বাবদ কিছু টাকা মল্লিকার কাছে রেখে গিয়েছিলেন, জয়ন্তও দু'দফায় শ'খানেক টাকা পাঠিয়েছে —মল্লিকা সেই সব টাকাই ওকে গছিয়ে দিল,—'আমার তো এখানে কিছু কেনারও নেই, খাওয়া ওষুধ কোনটার জন্যেই আমাকে নগদ টাকা বার করতে হচ্ছে না— শুধু শুধু হাতখরচের টাকা নিয়ে কী হবে? বরং তোর অনেকটা সুসার হবে, এটা তুই-ই রাখ!'

সুতরাং কৃষ্ণার যাওয়া হয় নি। ছুটির শেষ দিন পর্যন্ত তাকে এখানে কাটিয়ে যেতে হবে তা বুঝে সে সোজাসুজি অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণই করেছিল।

এখানে কাজ কিছু ছিল না। বইপত্রও বেশী আনেন নি। যা পাওয়া যায় এখানকার লাইব্রেরীতে দু-চারখানা—তাও নাকি বাইরের লোককে দেওয়া নিয়ম নয়। খবরের কাগজ পাওয়াই কষ্টকর। মল্লিকার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় ও স্থান বাঁধা—তার বাইরে যখন তখন দেখা করার নিয়ম নেই। সেটুকু ছাড়া বাকী সময়টা নিয়ে কৃষ্ণা পড়ল বিপদে। মানুষের জীবনে যে এত সময় আছে, এতকাল জানা ছিল না। বরং মনে হ'ত সময়ই কম। জীবনে অবসর নেই বললেই হয়।

প্রথম প্রথম অতটা মনে হয় নি অবশ্য। কারণ প্রথম দিকটাতে এখানকার প্রাকৃতিক শোভা দেখে সে বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরকম সে কখনও দেখে নি, দেখবে আশা করে নি। পার্বত্য শহর সে দেখেছে—দার্জিলিং শিলং—কিন্তু সে যেন অন্য জিনিস। এ একেবারে আলাদা। ঘন বন—বড় বড় পাইন গাছে ও সুবৃহৎ দেওদারে ছায়া-নিবিড়—নিচে খরস্রোতা স্বচ্ছসলিলা পার্বত্য নদী,— সবটা মিলিয়ে যেন এক স্বপ্ন-লোক মনে হয়।...মনে হয় পৃথিবীতে শান্তি আর সুষুপ্তি যদি কোথাও থাকে তা এইখানেই আছে। এ যেন সেই আদিমকালের ঋষিদের তপোভূমি। 'ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর' পংক্তিটি কবি লিখেছিলেন এই স্থান দেখেই। অরণ্যে পর্বতে ঝরণায় মনোরম এ স্থানটি কোন কবির কল্পনা

দিয়েই রচিত, বাস্তব কিছু নয়।

তবু তিন-চারদিন পরেই এই নিস্তব্ধতা তার বুকের ওপর যেন চেপে বসতে শুরু হ'ল। শান্তিই হয়ে উঠল অশান্তির কারণ। মল্লিকা কেন যে এত অস্থির হয়ে উঠেছিল এবার বুঝতে পারল সে। যারা শহরে মানুষ, সংসারী জীব—তাদের কাছে এ নির্জনতা বুকচাপ বলে মনে হবারই কথা। কৃষ্ণারও তাই মনে হ'ল—সে বাইরের বন্য পার্বত্য শোভা ছেড়ে মানুষের তৈরী স্যানাটোরিয়ামের বাগানে আশ্রয় নিল শেষ পর্যন্ত। এ-ও নির্জন, তবু মানুষের হাতের তৈরী—মানুষের স্পর্শ আছে মনে ক'রেও যেন আশ্বাস লাভ করা যায় একটা। আর—অদূরে মানুষও আছে, তাদের মৃদু কণ্ঠস্বর, তাদের রান্নার গন্ধ পাওয়া যায় এখানে এলে, সে যে বেঁচে আছে, কোন লোকালয়ে আছে তা মনে হয়। সেইটেই যেন পরম লাভ তার কাছে এখন।

ক্বচিৎ মানুষের দেখাও পাওয়া যায়।

অন্তত কৃষ্ণা পেল একদিন।

একেবারে ওধারের শেষ প্রান্তেই বসে ছিল কৃষ্ণা, যতদূর সম্ভব লোকের চোখ বাঁচিয়ে। কোন রসিক ব্যক্তি এখানে বসবার একটা ভারী চমৎকার ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছেন। দুটো বড় বড় লেবু গাছে আর রডোডেনড্রন গাছে জড়াজড়ি ক'রে যেখানে একটি রহস্য-ঘন ছায়ার সৃষ্টি ক'রে রেখেছে সেইখানেই এই আসনটি পাতা। কোন কবি ছাড়া এমন জায়গায় এই সামান্য কাঠের বেঞ্চি পাতার কথা ভাবতে পারত না। স্থান-মাহাত্ম্যেই সে বেঞ্চিটি অসামান্য হয়ে উঠেছে।

সেদিন সেখানে বসে থাকতে থাকতে বুঝি একটু দিবাস্বপ্নেই মগ্ন হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণা—হঠাৎ অস্ফুট কী একটা শব্দে চমকে উঠে দেখতে পেল ঝুঁকে-পড়া রডোডেনড্রনের পল্লবগুলো সরিয়ে এদিকেই আসছে একটি উনিশ কুড়ি বছরের শীর্ণ ছেলে।

এতদিনে লক্ষণগুলো জানা হয়ে গেছে কৃষ্ণার। শীর্ণ মুখ, চোখের কোলে ঈষৎ কালি, শ্রান্ত ভঙ্গী আর তার সঙ্গে একান্ত বেমানান একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। এ এখানকার কোন রোগীই। এবং যে-সব রোগী নিরাময়ের পথে যাচ্ছে—এ তেমন কেউ নয়। হয় সদ্য-আগত, নয় তো এর অবস্থা ভাল নয়।

কিন্তু বড়ই ছেলেমানুষ, বড়ই অসহায়। দেখলেই যেন মন-কেমন করে, মুখ দিয়ে প্রথমেই বেরিয়ে যায়, 'আহা রে! এই বয়সে এমন রোগে ধরল—'

ছেলেটি ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় তারও এইখানে এসে নির্জনে বসা অভ্যাস আছে, মধ্যে মধ্যেই আসে। বেশ সহজ সপ্রতিভতার সঙ্গেই এসেছে তাই। এখানে হঠাৎ কাউকে দেখবে—বিশেষ অল্পবয়সী মেয়েছেলেকে—তা আদৌ ভাবে নি। একেবারে সামনে এসে পড়ে থতমত খেয়ে গেছে, যাবে কি ফিরবে—ভেবে পাচ্ছে না।

কৃষ্ণা নিমেষে অবস্থাটা বুঝে নিয়ে তাকে সেই নিদারুণ সঙ্কোচ থেকে বাঁচিয়ে

দিল। খুব সহজ ভাবেই হেসে বলল, 'আসুন।···ফিরে যাচ্ছেন কেন? আমি বুঝি আপনার আসন দখল করেছি? তা এখনও তো যথেষ্ট জায়গা আছে এখানে। বসুন না—'

ছেলেটি আশ্বস্ত হ'ল। মুখের ক্লান্ত ভাবটাও যেন কেটে গেল একটু। সে খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, 'থাক—আমি এখানেই—মানে এই ঘাসের ওপরই বসছি।···মাটি শুকনো আছে, তাতে কোন দোষ হবে না।'

কৃষ্ণার মুখে একটু কৌতুকের হাসি দেখা দিল। একটু বোধ করি দুষ্টুমিরও।

'কেন, এত কাছাকাছি বসতে লজ্জা হচ্ছে?'

'না না—তা কেন! ছি, আপনি ভারী—। তা নয়। আমি—মানে আমি এখানকার পেশেণ্ট, আমার থুতু এখনও বীজাণুমুক্ত নয়। কাশিও হয় মধ্যে মধ্যে। কারও চার হাতের মধ্যে বসা উচিত নয় আমার।'

'তা হোক। আপনি বসুন এখানে। নইলে আমার ভারী খারাপ লাগবে। আপনি মাটিতে বসলে আমাকেও বসতে হয়।'

অগত্যা ছেলেটি সসঙ্কোচে এগিয়ে এসে বেঞ্চিরই একপাশে বসল। কিন্তু সে যে বিষম অস্বস্তি বোধ করছে তা বুঝতে বাকী রইল না কৃষ্ণার। এ সঙ্কোচ ভাঙ্গতে না পারলে এখনই কোন ছুতো ক'রে উঠে যাবে ছেলেটি। অথচ ওরও আজ একটা কথা-বলার লোক দরকার। কারও সঙ্গে কথা না বলে আর থাকতে পারছে না সে।

তার অনুমান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সত্য প্রমাণিত হ'ল। ছেলেটি একটু উশখুশ ক'রেই বলে উঠল, 'আপনি বসুন—আমি তা হ'লে যাই। ডাঃ খোশলা খুঁজছেন হয়ত—'

'মিথ্যে কথা। কেউ খুঁজছে না আপনাকে। বসুন দিকি। অত লজ্জা বোধ হয় তো বলুন—মেপে চার হাত ব্যবধান রেখে আমরা দুজনেই মাটিতে বসি।'

ছেলেটি মেয়েছেলের মতোই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল, কিন্তু জোর ক'রে কৃষ্ণার কথার প্রতিবাদও করতে পারল না। মাঝখান থেকে এই ঠাণ্ডাতেও তার কপালের কোণে কোণে ঘাম দেখা দিল।

তবে এবার আর তাকে আড়ষ্ট হয়ে থাকবার সুযোগ দিল না কৃষ্ণা। তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, 'আপনি ক মাস আছেন? বোধ হয় নতুন এসেছেন—না?'

'না, নতুন আর কই! হয়েও তো গেল বেশ—তা মাস চারেক হবে।'

'চার মাস? কিন্তু—'

'হ্যাঁ—চার মাসে যতটা সারবার কথা তা সারতে পারি নি। কে জানে পারব কিনা—**at all**।'

কথাটা আবার অস্বস্তিকর পরিবেশে গিয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিল কৃষ্ণা।

উপর্যুপরি প্রশ্নে একদিকে যেমন তার সঙ্কোচও ভেঙ্গে দিল, অপর দিকে তেমনি তার নাড়ি-নক্ষত্র জেনে নিল।

ছেলেটির নাম তপন। বি. এ. পড়ছিল, বা ওর বিশ্বাস এখনও পড়ছে। এবারই পরীক্ষা দেওয়ার কথা—মাঝখান থেকে এই অসুখটা এসে পড়েই সব হিসাব গোলমাল ক'রে দিল। বয়স ওর সত্যিই কম, এই কুড়ি চলছে। বাড়িতে বাবা মা আছেন, অবস্থাও তাঁদের খুব খারাপ নয়। বাবা হেডমাস্টার—এই অঞ্চলেই একটা বড় সরকারী ইস্কুলে কাজ করেন। মাইনে তো ভাল পানই, জমি-জমা এবং পৈতৃক অর্থও কিছু আছে। তপন, আর তার একটি ছোট ভাই—সংসারও ওদের ছোট।...

কাছাকাছি হবে বলেই বাবা ওকে এখানে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও এই চার মাসে দুবারের বেশী আসতে পারেন নি তিনি। মার হার্টের অসুখ, এতখানি পাহাড়ের ওপর বাস্-এ ক'রে আসা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। ভাইটি খুবই ছেলেমানুষ, তার সবে এই বারো বছর বয়স। তাছাড়া তার এখানে না আসাই ভাল, এসব বিশ্রী রোগের কাছে।...

প্রাথমিক সঙ্কোচটা কেটে যেতে যা একটু দেরি, তারপরই সব কথা গলগল ক'রে বলে গেল তপন। বলতে পেয়ে বেঁচে গেল যেন। বলবার মতো কাউকেই বোধ করি খুঁজছিল সে এতদিন—দৈবক্রমেই সেই মনের মতো শ্রোতা পেয়ে গেছে।

অবশ্য শুধু বলল না—শুনলও ঢের। কৃষ্ণার এখানে আসা এবং থাকার কারণ শুনে তপনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ও, তাহলে তো আপনি এখনও পনেরো ষোল দিন আছেন এখানে। খুব ভালো হ'ল। উঃ—বাবা, বেঁচে গেলাম আমি!' সোচ্ছ্বাসে বলে উঠল সে।

'কেন, আমার থাকার সঙ্গে আপনার বেঁচে যাওয়ার সম্পর্ক কী বুঝলাম না তো!'

কৃষ্ণা সবিস্ময়ে ও সকৌতুকে প্রশ্ন করে। তপনের ছেলেমানুষী সারল্য দেখে হাসি চাপতে পারে না কোনমতেই।

তপন কিন্তু আবারও রাঙা হয়ে ওঠে। তবু সত্য কথাটাই বলে শেষ পর্যন্ত, 'ভালো হবে মানে—এ কদিন তো দেখা-সাক্ষাৎ হ'তে পারবে রোজ। এখানে এসে, বুঝলেন—কথা কইবার লোক পাই না।...হিন্দুস্থানীই তো বেশির ভাগ—তাছাড়া এদের কেউই আমার বয়সী নয়। পড়াশুনোও কম, যাও-বা দু'চারজন শিক্ষিত আছেন, তাঁরা ভারী ভারী পড়া নিয়েই থাকেন। আর বাকী, দেখুন দিন-রাত শুধু—আজ কি খেতে দিলে, কাল কি খেতে দেবে—পয়সা চুরি করছে সবাই—এই নিয়েই আছে। ভাল লাগে না একদম!'

প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্যে মনোভাব গোপন ক'রে কৃষ্ণা বলে—'এখানে থাকলেই রোজ দেখা হবে আমার সঙ্গে—তারই বা ঠিক কি?'

'না, তা অবিশ্যি নেই কিছু—' নিমেষে মলিন হয়ে যায় তপনের মুখ, 'তবু—মাঝে মাঝে হবে তো? কোথায় আর ঘুরবেন এত!...আমি—আমি কিন্তু আপনার পথ চেয়ে থাকব—' একেবারে ছেলেমানুষের মতোই বলে সে।

এই প্রায়-সমবয়সী দুটি তরুণ-তরুণীর যে নিত্য এমন একান্তে দেখা হওয়া শোভন নয়—সে কথাটা, তপনের সেই সরল উৎসুক চোখ দুটির দিকে চেয়ে আর মনে করাতে পারল না কৃষ্ণা। এ যেন হরিণ-শিশুর মতোই সরল আর অসহায়, একে আঘাত দেওয়া যায় না।

কৃষ্ণা মুখে যাই বলুক দেখা হবার জন্য সেও কম উৎসুক ছিল না। দেখা হ'তেও লাগল তাদের প্রত্যহ। তপনের বয়স তার থেকে বছর দুই কমই হবে—কিন্তু মানসিক গঠনের দিক দিয়ে সে আরও ছোট থেকে গেছে। ছেলেমানুষের মতোই গল্প করে সে। গল্প করতে ভালও বাসে। একটু বেশী বকাই তার অভ্যাস বোধহয়, সেইজন্যেই এই ক-মাসে এত হাঁপিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কৃষ্ণার—এই ছেলেমানুষী বকুনি যত ভালও লাগে, তার মনও তত খারাপ হয়ে যায়। চার পাঁচ দিনেই ছেলেটি যেন বড় বেশী আপন হয়ে উঠেছে। কনিষ্ঠের মতো আত্মীয়ের মতোই তার সম্বন্ধে একটা স্নেহ অনুভব করে কৃষ্ণা। তাকে দেখলে অকারণ প্রীতিতে মন ভরে ওঠে তার। প্রীতি—আর সেই সঙ্গে একটা উদ্বেগও। লক্ষণ ভাল নয় ছেলেটির—চার মাসেও যদি এতটুকু উন্নতি না হয়ে থাকে, কখনই হবে কি ?···

অবশেষে একদিন কৃষ্ণা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আর-এম-ওর সঙ্গে দেখা করে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে তপনের আসল অবস্থাটা।

'তপন ? তপন রায়চৌধুরী ? ফ্রম দেওরিয়া ?' মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে শ্রীবাস্তবের। একটু চুপ ক'রে থেকে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলেন, 'ডাউট-ফুল। ভেরী ডাউটফুল।···একদম রেসপণ্ড করছে না কোন চিকিৎসা। আমি এ দেখি নি। প্রথমটা বেশ উন্নতি হয়েছিল, জ্বর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—ওজন বেড়ে-ছিল—তারপরেই যে কী হ'ল—'

গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়েন শ্রীবাস্তব।

'তবে যে আপনারা বলেন—আজকাল এ রোগে মরে খুব কম। সময়ে চিকিৎসা শুরু হ'লে বা হাসপাতালে এলে বিশেষ কেউ মরে না!'

'হ্যাঁ—সেভেন্‌টি-ফাইভ পারসেণ্টই সেরে যায় এটা ঠিক, হয়ত পারসেণ্টেজ আরও বাড়বে শিগ্‌গিরই—কিন্তু স্টিল, দেয়ার আর দ্য আদার্স। পঁচিশজনও তো আছে, সে কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন!'

'তাহ'লে—এরও কি, মানে একেও কি ঐ হতভাগ্য পঁচিশজনের মধ্যেই ধরতে হবে ?'

'টু বি ফ্র্যাঙ্ক—তাই ধরে রেখেছি আমরা। ওর অবস্থা খুব ভালো নয়। উনি কি আপনার কোন আত্মীয় ?'

'না—তবে কম্‌প্যাট্রিয়ট তো। বাঙালী—এই জন্যই একটু ইন্টারেস্টেড্।'

শ্রীবাস্তব নিঃশব্দে ঘাড় নাড়েন শুধু।

নিত্যই দেখা হয় অথবা দেখা করে ওরা, বিকেলে চায়ের আগে পর্যন্ত বসে গল্প করে ওখানে, লেবুগাছে আর রডোডেনড্রন গাছে জড়াজড়ি ক'রে যেখানে একটি নিবিড় আচ্ছাদন এবং আবরণ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। শারীরিক ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা নেই কোন পক্ষ থেকেই, বরং তপন একটু ব্যবধান রাখারই চেষ্টা করে; সাংঘাতিক রোগের বীজাণু না বাতাসে ভর ক'রে কৃষ্ণার দেহে প্রবেশ করে—সেজন্য ওর সতর্কতার অন্ত নেই যেন। কিন্তু বাইরের ব্যবধান যতই থাক—মনে মনে কৃষ্ণাকে একেবারে অতি নিকট আত্মীয়ের মতো, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই আঁকড়ে ধরেছে তপন। এই প্রবাসে এখন সে-ই যেন ওর একমাত্র আপন জন।...

সাত আট দিন এইভাবে কাটবার পর হঠাৎ একদিন আর দেখা পাওয়া গেল না তপনের। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে বসে রইল কৃষ্ণা। চায়ের ঘণ্টা পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর অবশ্য আর থাকার অর্থ নেই। সেও উঠে পড়ল।

এতকালের মধ্যে কখনও পুরুষদের ওয়ার্ডে যায় নি সে। যাওয়ার দরকারও হয় নি। আজ কিন্তু আর অকারণ সংকোচ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল না। চায়ের ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পর সে গুটি গুটি সেই দিকেই গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

তপন একটা পৃথক কেবিনে থাকে সেটা কৃষ্ণা জানত। কেবিনের নম্বরও জানা। সুতরাং খুঁজে পেতে অসুবিধা হ'ল না। কিন্তু কেবিনের কাছাকাছি গিয়ে দেখল স্বয়ং ডাঃ খোশলা খুব সন্তর্পণে কেবিনের দরজা বন্ধ ক'রে বেরিয়ে আসছেন।

অর্থাৎ অবস্থা ভাল নয়।

কৃষ্ণা দ্রুত এগিয়ে গেল খোশলার দিকে।

'এক্সকিউজ মি ডক্টর খোশলা, পেশেন্টের—আমি এই সতেরো নম্বর কেবিনের কথা বলছি—রায়-চৌধুরীর অবস্থা কি খারাপ কিছু?'

খোশলা চশমার মধ্য দিয়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ওর মুখের দিকে। তারপর খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'কেন বলুন তো, আপনি কি ওঁর কেউ হন?'

'না। এইখানেই আলাপ।' কৃষ্ণার অবাধ্য চোখ দুটো আপনিই যেন নেমে আসে মাটির দিকে।

'আই সী। কতদিনের আলাপ?'

'এই সাত আট দিন। কিন্তু কেন বলুন তো?' এবার কৃষ্ণার ভ্রু কুঞ্চিত করার পালা, 'তার সঙ্গে কি রোগীর ভাল থাকার কোন সম্পর্ক আছে? না, তা না জানলে রোগীর অবস্থা কেমন তা বলবার কোন বাধা আছে আপনাদের?'

এ তিরস্কারে লজ্জিত হবারই কথা। কিন্তু খোশলা তা হলেন না। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'তা থাকতে পারে। রোগীর একটা বিশ্রী রকম সেট্-ব্যাক হয়েছে হঠাৎ, কেন—সেইটেই বুঝতে পারছি না। সেই জন্যই খোঁজ করছিলাম—আপনি কিছু জানেন কিনা। হাউএভার—এখন যেন ওর সঙ্গে আর দেখা করার চেষ্টা করবেন না। ডে য়্যাণ্ড নাইট নার্স রাখার ব্যবস্থা করেছি আমরা—তাদের ওপর

ইনস্ট্রাক্‌শন্‌ দেওয়া আছে কাউকে দেখা করতে দেবে না।'

উত্তরের বা কোন অনুযোগের অপেক্ষা না ক'রেই খোশলা দ্রুত অন্য কেবিনের দিকে চলে গেলেন।

দেখা হ'ল একেবারে আরও সাত আট দিন পরে। কৃষ্ণা রোজই অপেক্ষা করে বাগানের সেই বিশেষ প্রান্তে। কদিনই করছে। এই ভরসাতেই করছে—জানে যে একটু ওঠবার মতো অবস্থা হ'লেই তপন আগে ছুটে আসবে এখানে। শেষের দিকে খানিকটা উদ্বিগ্নই হয়ে উঠেছিল—কারণ তার ছুটির সর্বশেষ মেয়াদের আর মাত্র কটা দিন বাকী, যাবার আগে একবারও কি দেখা হবে না তপনের সঙ্গে?…তার নিজের এমন কোন কষ্ট হবে না হয়ত সেজন্যে—কিন্তু তখন খুব দুঃখ পাবে তা সে জানে।…

কৃষ্ণাকে সেইখানেই দেখতে পাবে—এই এতদিন অদর্শনের পরেও—ঠিক আশা করে নি তপন। ওকে দেখে তার শীর্ণ রক্তহীন মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল।

'আছেন আপনি? ও, বাঁচা গেল। সত্যি—কী ভাবনা যে হয়েছিল। আর হয়ত দেখাই হ'ল না—শুধু এই কথাটাই ভাবছিলুম কদিন।'

'তা নাই বা হ'ত। তাতেই বা কি?' কৃষ্ণা খুব ভালমানুষের মতো প্রশ্ন করে।

'তাতেই বা কি?…কী যে বলেন আপনি। তাহ'লে আমার আপসোসের শেষ থাকত না। সত্যি, বিধাতা সব কেড়ে নিয়েছেন বলতে গেলে—তবু প্রায় এই শেষ সময়ে যে আপনার মতো বন্ধু মিলিয়ে দিয়েছেন—সেইজন্যই আমি কৃতজ্ঞ।'

'কী সব বলেন যা তা!'

'আর কি বলি। এবারেই টিকিট কাটবার কথা—নেহাৎ আর একবার আপনার দেখা পাওয়া অদৃষ্টে আছে বলেই হয়ত বেঁচে উঠেছি। সেকথা থাক—আপনার ছুটি আর কদিন?'

'পরশু নামতেই হবে।' একটু ম্লান হেসে বলে কৃষ্ণা।

'পরশুই?…আর দু'একটা দিন থাকা যায় না?'

'থাকলে হয়ত চাকরিটা আর থাকবে না।…কিন্তু আর দু'একটা দিনেই বা লাভ কি আপনার?'

'না—আমি যে কটা দিন থাকতুম সেই কটা দিন আপনি এখানে থাকলে বেশ হ'ত। আমি খুব বেশী সময় নিতুম না আর আপনার—এটা ঠিক।'

'আবার ঐসব কথা। তাহ'লে আমি আজই চলে যাব—এই পাঁচটার বাস্‌-এই।'

'না না। থাক, আর বলব না। এ কথায় যে আপনার মনে ব্যথা লাগছে সেইটেই তো আমার কাছে পরম লাভ একটা।'

আরও কিছু একথা সেকথার পর হঠাৎ কৃষ্ণা প্রশ্ন ক'রে বসল, 'আচ্ছা, আপনি কি কারও প্রেমে পড়েছিলেন এই অসুখের আগে?'

'প্রেমে? না তো!' তার পরেই খুব খানিকটা হেসে নেয় তপন, 'আপনি খুব

ফ্র্যাঙ্ক কিন্তু। এই জন্যেই এত ভাল লাগে আপনাকে। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?'

'এ রোগের হেতুটা খুঁজছি। বলে কোন স্ট্রং ডিজায়ার ফুলফিল্‌ড্‌ না হ'লে, কোন উগ্র ঐকান্তিক কামনা অপূর্ণ থাকলে এই রোগ চেপে ধরে—'

'বাজে কথা! দেহে বীজাণু প্রবেশ করলে তবে এ রোগ হয়। তার সঙ্গে ওসব ব্যাপারের সম্পর্ক কি ?'

'বীজাণু প্রবেশ করে ঠিকই—তবে এ বীজাণু নাকি অনেকের দেহেই আছে আমাদের মধ্যে। অন্য কোন দুর্বলতার কারণ থাকলেই চেপে ধরে—'

'কে জানে! কই, আমার তো তেমন কোন কারণ ঘটেছিল বলে মনে পড়ে না। এক বন্ধুকে খুব ভালবাসতুম বটে—খুবই ভালবাসতুম, সে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ায় একটু আঘাতও পেয়েছিলুম, তবে সে এমন সাংঘাতিক কিছু নয়। কোন য়্যাকিউট ডিজায়ারের তো প্রশ্নই ওঠে না। বরং ইদানীং একটা সে রকম ইচ্ছা দেখা দিয়েছে বটে—খুব ইদানীং—কিন্তু সে জন্যে অতদিন আগে রোগ চেপে ধরেছিল তা তো আর কেউ বলতে পারবে না।'

ইদানীং সে রকম ইচ্ছা যেটা দেখা দিয়েছে—সেটা কী, প্রশ্ন করা হয়ত সঙ্গতও নয়, শোভনও নয়। কেন কে জানে—সেটা বুঝি অনুমানও করতে পারে কৃষ্ণা। বুকের মধ্যেটা সেজন্যে বুঝি কেঁপেও ওঠে একটু। লজ্জায় সঙ্কোচে—এবং কী উত্তর পাবে সেই ভয়ে। তবু সে প্রশ্নই করে।

'এর মধ্যে আবার কী ইচ্ছা এমন দেখা দিল আপনার ? কাউকে দেখতে ইচ্ছা করছে ? মাকে ?'

'সে ইচ্ছা তো বহুকালের। সে তো আছেই। না—এ অন্য।'

'কী সেটা শুনি না।' নিজের কণ্ঠস্বরের অবিচল স্থৈর্যে নিজেই যেন অবাক হয়ে যায় কৃষ্ণা।

'সেটা—? আপনাকে তো সবই বলছি, কীই বা আর আটকাচ্ছে। তবু—ভারী লজ্জা করে। সে কথা বরং থাক—'

'বলুনই না। কেউ তো নেই এখানে। লজ্জাই বা এত কি! দুদিন পরেই তো আমি চলে যাব—আপনি যে কথা বলছেন তাও কেউ জানবে না। লজ্জার কোন কারণই থাকবে না।'

তবু একটুখানি চুপ ক'রে থাকে তপন। কেমন একটা লজ্জা-লজ্জা ভাব, হঠাৎ একটু সলজ্জ হাসিও ফুটে ওঠে তার সেই একান্ত শুষ্ক শ্রীহীন মুখে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'বলেই ফেলি, আপনি শিক্ষিতা মেয়ে, কিছু মনে করবেন না তা আমি জানি। আর কিছু নয়—পুরুষমানুষ হয়ে জন্মেছি, উনিশ কুড়ি বছর বয়স হয়েছে, মেয়েদের দিকে একটা বিশেষ আকর্ষণ বোধ করার কথাই তো। আমার বন্ধু-বান্ধবরা অনেকে ইস্কুল থেকেই শুরু করেছে ঐসব। আমি কিন্তু এতদিন কখনও সে রকম কোন ডিজায়ার ফীল করি নি।...এই কদিন থেকে শুধু বড্ড মনে হচ্ছে কথাটা। কেবল মনে হচ্ছে সব তো শেষ হয়ে যাচ্ছে—জিনিসটা কি

জানাও তো হ'ল না এখনও। একেবারে এমনি ভাবেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেব ? মানুষের যেটা সবচেয়ে বড় সাধ, সেইটেই মিটবে না।'

কোনমতে বলে ফেলে তপন চুপ ক'রে যায় একেবারে। আর কিছুতেই যেন চোখ তুলে তাকাতে পারে না কৃষ্ণার দিকে।

কৃষ্ণাও চুপ ক'রে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর বলে, 'কিন্তু সে সাধ মেটবার আর আশা নেই একথাটা আপনাকে কে বললে! ভাল হয়ে গেলে একদিন হয়ত বিয়ে-থা সবই করতে পারবেন।'

'ও মিথ্যা স্তোক নিজেই নিজেকে দিতে চেষ্টা করেছিলাম একসময়ে কিন্তু আর এমনভাবে ঠকাবার কোন মানে হয় না। শেষ যে এগিয়ে আসছে তা নিজেই বুঝতে পারছি। ডাক্তারের চোখেও সে রায় পড়েছি বহুদিন!'

আবারও একটা স্তব্ধতা নেমে আসে দুজনের মধ্যে।

তারপর কৃষ্ণা খুব চুপিচুপি বলে, 'এই কদিনই বা কথাটা এত ক'রে মনে হচ্ছে কেন ? তার কারণ কি—আমি ?'

তপনও প্রায় ততটুকু অপেক্ষা ক'রে তেমনই চুপি চুপি বলে, 'আপনি এমন খোলাখুলি জিজ্ঞাসা না করলে আমি হয়ত কোনদিনই বলতে পারতুম না—তবে আর মিথ্যা সঙ্কোচও করব না। হ্যাঁ, তাই। ডাক্তারেরা সন্দেহ করছেন আমার রিসেন্ট সেট্‌ব্যাকেরও সেইটেই প্রধান কারণ।'

'কিন্তু—আমি, আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড় তা জানেন তো ?'

'কে জানে—অত কিছু ভেবে দেখি নি সত্যি বলছি। আপনার সম্বন্ধে কোন কিছু খুঁটিয়ে ভাববারও চেষ্টা করি নি। শুধু এইটেই কদিন থেকে মনে হচ্ছে যে আপনি অদ্ভুত, আপনার তুলনা নেই। হয়ত এই দূর প্রবাসে, মৃত্যুর সামনাসামনি পৌঁছে আপনাকেই একমাত্র কাছে পেয়েছি বলে এমনটা মনে হচ্ছে—কে জানে! তবে মনে হয় যদি সুস্থ হয়ে উঠতে পারতুম কোনদিন তো আপনাকে পাবার জন্যে সেকালের মুনিঋষিদের মতোই সুদুশ্চর তপস্যা করতুম। থাক্‌গে সে কথা—। যা হবার নয় তা ভেবেই বা লাভ কি বলুন!'

চায়ের ঘণ্টা পড়ে যায়। দূর শৈলশিখরের একেবারে মাথায় সূর্য গিয়ে পৌঁছয়। ম্লান হয়ে আসে এর মধ্যেই চারদিকের আলো-ঝলমল অপরাহ্ন। তবু কোন দিকেই যেন খেয়াল থাকে না এই দুটি তরুণ-তরুণীর। নিচে, বহু নিচে নদীর একঘেয়ে আওয়াজের দিকে শুধু কান পেতে বসে থাকে ওরা। কোথায় একটা লরী যাবার শব্দও ওঠে—ভর্তি না খালি লরী শব্দ শুনে আঁচ করার চেষ্টা করে কৃষ্ণা। ওধারের পাহাড়ে ও কী পাখীটা ডাকছে ?……

এসব কথা পাড়া উচিত হয় নি। এসব কথা ভাবাও উচিত নয়। এখনই উঠে যাওয়া উচিত ওদের। চায়ের ঘণ্টাও তো পড়ল।…কিন্তু এই মৃত্যু-পথযাত্রী ছেলেটির চোখে মুখে যে একান্ত ইচ্ছাতুর করুণ অসহায় একটি ভিক্ষার ভাব ফুটে উঠেছে সেদিকে চেয়ে আর উঠতে পারে না কৃষ্ণা। অকস্মাৎ একটা উগ্র মমতায় মন

ভরে ওঠে ওর।

আর কিছুই ভাবে না সে, অগ্র-পশ্চাৎ কোন-কিছুই চিন্তা করে না।

এই অকালে, অসময়ে, অসংখ্য অপূর্ণ সাধ-আহ্লাদ নিয়ে যে অল্পবয়স্ক ছেলেটি চিরদিনের মতো বিদায় নিতে চলেছে এই শ্যামা তরঙ্গিণী-মেখলা সুন্দরী ধরিত্রী থেকে, তার সর্বাধিক বড় সাধটির কথাই ভাবে শুধু। তার নিঃস্ব রিক্ত জীবনটি পরিপূর্ণতায় সার্থক ক'রে দেওয়ার কথাই চিন্তা করে।

কথাটা চাপা থাকে না। কে যেন জানতে পেরেছিল, সে-ই বলে দেয়। রুষ্ট হয়ে ওঠেন কর্তৃপক্ষ, ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্যানাটোরিয়ামের অপর রোগীরা। ধিক্কার ও ভর্ৎসনার ঝড় বয়ে যায় কৃষ্ণার ওপর দিয়ে। প্রকাশ্যেই হত্যাকারিণী বলে অভিযুক্ত করেন তাকে সকলে। পুলিশে দেওয়া উচিত—এই কথাই বলেন। কে বুঝি চিঠিও পাঠান একটা স্থানীয় থানায়।

আরও বিক্ষোভের কারণ—সেইদিনই রাত্রি থেকে আবার তপনের অবস্থার দারুণ অবনতি ঘটেছে। এবার যে তার আর কোন আশা নেই এ শয্যা থেকে ওঠবার, তা বুঝতে বাকী থাকে না চিকিৎসকদের। এমন কি দু'একদিনের বেশী আর বাঁচিয়েও রাখা যাবে না তাকে—এও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্রমশ। ডাঃ খোশলা তার বাবাকে এক্স্প্রেস টেলিগ্রাম করেন আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন যে অন্তত সে বেচারী এসে যেন একবার জীবিত দেখতে পায় ছেলেটাকে।...

কড়া নোটিশ হয়েছে কৃষ্ণার ওপর, সেই দিনই তাকে চলে যেতে হবে। হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে আর না প্রবেশ করে সে—কারণ সেটা খুব নিরাপদ নয় তার পক্ষেই। রোগীরা কে কী ক'রে বসবে তা বলা যায় না। মল্লিকা দেখা করতে আসে লজিং হাউসেই। কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'করলি কি হতভাগী, এমন ক'রে বংশের—আমার মুখটা ডোবালি! আর ও যে ছোট ভাইয়ের বয়সী তোর!...ছি ছি!... মরণাপন্ন রোগী—একটু ভয়ও করল না যে ঐ রোগ যদি সেঁধিয়ে যায় তোর বুকে?'

কিন্তু না কর্তৃপক্ষের লাঞ্ছনা আর না দিদির অনুযোগ, কোনটাই যেন স্পর্শ করতে পারে না কৃষ্ণাকে। তার ভাবলেশহীন মুখে একটু অনুতাপের কি লজ্জার ছায়াও পড়ে না। নির্বিকার প্রশান্ত মুখে বসে থাকে সে। বাস ছাড়বার সময় হ'তে সেই ভাবেই গিয়ে বাস্-এ ওঠে। হাসপাতাল ও লজিং হাউসের চাকরবাকরাও কানাঘুষো শুনেছে—তাদের চোখের কোণে এবং ওষ্ঠের প্রান্তে বিদ্রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—কিন্তু কোনটাই কোন উত্তাপ কি অনুভূতি জাগাতে পারে না যেন তার মনে।

এমন কি বাস ছাড়বার মুখে একটি নার্স ছুটতে ছুটতে এসে যখন ওকে বলে যায় যে—এই মাত্র তপনের শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে এবং নিদারুণ শ্বাসকষ্টের মধ্যেও বার বার সে কৃষ্ণার নামই করেছে; মৃত্যুর পাঁচ মিনিট আগেও নার্সের হাতে ধরে

মিনতি জানিয়ে গেছে, কৃষ্ণাকে তার তরফ থেকে অন্তিম ধন্যবাদ এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবার জন্য; —তখনও ওর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা যায় না, চোখও বোধ করি বাষ্পাচ্ছন্ন হয় না একবারও। সে যেমন স্থির হয়ে বসে ছিল দূর-বিসর্পিত পথের দিকে চেয়ে—তেমনিই বসে থাকে, তেমনিই পাথরের মতো—তেমনি স্থির প্রশান্ত চোখ মেলে। নার্সটি বোধ করি হতাশই হয় একটু, খানিকটা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ঘাতকেরও হয়ত চাঞ্চল্য জাগে নিহতের মৃত্যু দেখলে। শিকারীও বোধ করি হরিণ-শিশুকে বধ ক'রে অনুতপ্ত হয়। এ হত্যাকারিণীর মনে কি অনুশোচনার কোন অস্তিত্বই নেই?

তবে তার বিস্ময় বা ধিক্কার প্রকাশ করার বেশী অবসরও মেলে না। বাস ছাড়বার সময় হয়েছিল—একটু পরেই ছেড়ে দেয়। কৃষ্ণা ওদের সকলের চোখের সামনে থেকেই অদৃশ্য হয়ে যায় মিনিট তিন-চারেকের মধ্যে।

বিবাহ ঘটিত

সত্যিই যে বাড়িতে কেউ নেই, তিনি একা এই একটা মুখরা ও প্রখরা ঝিয়ের ভরসায় পড়ে আছেন—বড় মেয়ে তরীও নেই—কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না মল্লিক মশাইয়ের।

শুনেছেন দু-তিনদিন আগেই, তরীও কাকে একটা বিয়ে ক'রে—কোন্ এক মাস্টারকে—তার ঘর করতে চলে গেছে—কিন্তু বিশ্বাস হয় নি।

মিথ্যে কথা। তরীর আবার বিয়ে কি! তিনকাল গত বুড়ী বলতে গেলে—মনে মনে হিসেব ক'রে দেখেন, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, একান্ন-বাহান্ন হবে—সামনের দাঁত ক্ষয়ে গেছে, মাথার অর্ধেক চুল পাকা, চুল উঠেও গেছে অনেক, হাতের শিরা বার করা, অম্বুলে রুগী—তাকে কে বিয়ে করবে? পাগল! এ তার চালাকি, ওঁকে জব্দ করার জন্যে কোথাও লুকিয়ে আছে এই বাড়িতেই, কিংবা কোন বোনের কাছে চলে গেছে।

তিনি ডাকাডাকি ক'রেই যান। মাঝে মাঝে ঝি মাধুর মা এসে খুব বকাবকি করে, এর মধ্যে একদিন পাখার বাঁটের বাড়ি দিয়েওছে কয়েক ঘা, তখন চুপ ক'রে যান। আর কেবল খাওয়ার বায়না করেন। তাঁকে বোঝানো যায় না যে দিনে দুবার জলখাবার আর দুবার ভাত, এর চেয়ে বেশী ক'রে দেওয়া সম্ভব নয় মাধুর মা'র পক্ষে। বিছানা কাপড়চোপড় নোংরা ক'রে রাখেন—সেও তাকেই করতে হয়। তা ছাড়াও ঘরদোর মোছা-ঝাড়া সবই আছে। নেহাৎ লিপু হাত ধরে বলে গেছে, একশো টাকা মাইনে দেয়, তাই—নইলে বুড়োর মুখে নুড়ো জেবলে দিয়ে সে চলে যেত কবেই।

মল্লিকবাবুর বয়স অবশ্য এখন আশিতে পৌঁচেছে, কিন্তু শয্যাগত তিনি বলতে গেলে গত পঁয়ত্রিশ বছরই। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই। স্ত্রী এতগুলি মেয়ে মানুষ করা, রান্না—স্বামী অতিরিক্ত পেটুক, প্রত্যহ রকমারি চাই তাঁর—সংসারের সহস্রবিধ খাটুনি—একা বহন করেছেন। একটি ঠিকে-ঝি শুধু ছিল। তাতেই শরীর ভেঙেছিল, হঠাৎ একদিন হার্টফেল ক'রে মারা গেলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি ছেড়ে দিলেন মল্লিক মশাই। বললেন, 'আমার হার্ট আরও খারাপ। যে কোন সময়ে মরে যেতে পারি। তাহলে এদের দেখবে কে? এদের জন্যেই আমার বাঁচা দরকার।'

অসময়ে চাকরি ছাড়লেন বলে অতি সামান্য পেনসন হ'ল। ভাগ্যে চেতলায় এই ছোট বাড়িটা ছিল, নইলে ভাড়া দেওয়া সম্ভব হ'ত না। বাড়ির নিচের তলায় ভাড়া ছিল আঠারো টাকায়, আর এই সামান্য পেনসন। তরী অর্থাৎ বড় মেয়ে তরুলতা সবে তখন ইস্কুলের পড়া শেষ করেছে, স্কুল ফাইন্যাল পাসও করেছে, কোনমতে অবশ্য, কিন্তু বাকী সব ইস্কুলেই পড়ছে। তরীকে পড়া ছাড়তে হ'ল —নইলে শয্যাশায়ী বাপ আর তিনটে বোনের ভার কে নেবে?

সে হ'লও অনেক দিনের কথা। মল্লিকমশাই কষ্ট ক'রে বেঁচে রইলেন এদের জন্যে—তাঁর জন্যে এদের প্রাণ যায় এই অবস্থা। তবু তার মধ্যেই একরকম ক'রে মেজ বোন লিপিকা বি-কম পাস করল। তার ভেতরেই সে শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিং শিখে নিয়েছিল। পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোককে ধরে, অনেক কান্ড ক'রে চাকরিও যোগাড় করল সে—ব্যাঙ্কের স্টেনো, মাইনে ভাল। গ্র্যাজুয়েট সে, এর ভেতর পরীক্ষা দিয়ে অফিসারও হতে পারে। তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু মনে হয় একটু আগে হাঁফ ছাড়ল।

লিপিকা সুন্দরী না হলেও সুশ্রী, চোখ দুটি ভারী সুন্দর—গ্র্যাজুয়েট। ভাল চাকরি করছে—তার জন্যে কোন কোন পাত্র চঞ্চল হয়ে উঠবে, এ স্বাভাবিক। এমনিও নানা স্থান থেকে ভাল ভাল সম্বন্ধ আসতে লাগল। মল্লিকমশাই বললেন, 'তোর লজ্জা করে না, পঙ্গু বাপ, দুটো কাঁচ বোন—তুই যাবি বিয়ে করতে!'

লিপিকা বললে, 'আমি কি বলেছি। আমাকে বলছ কেন? যারা সম্বন্ধ আনছে তাদের বলো না।'

দিদি সোজাসুজি বলল, 'আমি তাহলে আত্মহত্যা করব। বর এসে যখন দাঁড়াবে তার সামনে গলায় কাটারি বসাব।'

কথাটা ঐখানেই চাপা পড়ে গেল। তবুও আপিসের কেউ কেউ এগিয়েছিল —লিপিকাই হাত জোড় ক'রে তাদের নিরস্ত করল।

কিন্তু নিরস্ত হ'ল না একজন। পাঞ্জাবী ছেলে একটি। আমি তাকে জানতুম অনেক আগে থেকেই। বাপ জলন্ধরে থাকে, স্পোর্টিং গুড্‌সের কারবার, ছেলে এখানের খদ্দের সামলায়। ওর বাবার সঙ্গে আমার লেখক হিসেবে বন্ধুত্ব ছিল, ছেলেটাও—অর্জুন সিং—আমার খুব ন্যাওটা হয়ে গিছল। সে প্রায়ই আমার

কাছে আসত, আমি ওকে পছন্দ করতুম খোলাখুলি কথা বলত বলে। সব কথা, সব রকম কথাই আমার সঙ্গে আলোচনা করত, অযথা সঙ্কোচ করত না। মায় বাবার যে একটু-আধটু চরিত্রদোষ আছে সেকথাও, সেইসব মেয়েদের কথাও। এ বাড়ির কথাও সে-ই বলেছে। নইলে মল্লিকমশাই যদিচ আমার নিকট-প্রতিবেশী, এত ভেতরের কথা আমি জানব কি ক'রে?

লিপিকা ব্যাঙ্কের যে ব্র্যাঞ্চে কাজ করত, সেই ব্র্যাঞ্চেই অর্জুনের য়্যাকাউণ্ট। ওর কিছু ওভার-ড্র্যাফটেরও ব্যাপার ছিল, মালের কনসাইনমেন্টের ওপর টাকা ধার পেত। এটা ওর বাবাই এসে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে গিছল, ওদের কোন্ এক মন্ত্রীকে ধরে। সে যাই হোক, ব্যাঙ্কে প্রায়ই যেতে হ'ত অর্জুনকে। পরিচয় হতেও দেরি হয় নি। অর্জুন কারিৎকর্মা ছেলে, সে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ ক'রে ফেলল অল্পদিনেই।

অর্জুনের বিয়ে হয় নি। বয়সও বেশি নয় অবশ্য, তেইশ-চব্বিশ হবে—ছিপ-ছিপে সুন্দর চেহারা, বুদ্ধি-উজ্জ্বল দৃষ্টি, তাতে একটু কৌতুকের ছোঁয়া সব সময়ই লেগে থাকত। তবু বাবা পীড়াপীড়ি করছে—পাছে ছেলে বকে যায় এই আশঙ্কা। তারও নাকি প্রথম পদস্খলন হয় এই কলকাতাতেই। এক গৃহস্থবাড়ি। পাত্রীরই বা অভাব হবে কেন, একুশ সেট পোশাক, একুশ জোড়া জুতো, একুশখানা নতুন থালায় একুশ কিলো মিষ্টি এবং একুশ হাজার টাকা নগদ—এ পর্যন্ত 'অফার' এসে-ছিল, অর্জুন এত শীগগির বন্ধনে পা দিতে চায় নি।

এখন সেধে বন্ধন গলায় পরতে চাইল।

ইচ্ছা তো অপরিমাণ। অর্জুনের মতো ছেলেকে ভালো লাগবে এও স্বাভাবিক। কিন্তু দিদি আর বাবার কথা ভেবে সাহসে কুলোয় না।

অর্জুন পীড়াপীড়ি করে—প্রতিদিন আপিসের ফেরত লিপিকা যখন বাড়ি ফেরে তখন সঙ্গে যায়, এক এক দিন আসবার সময়ও অপেক্ষা করে বাস স্টপে।

শেষ পর্যন্ত ওর জন্যেই একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনে ফেলল অর্জুন।

নিজেরই যাকে পায়ে ধরতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে যার পায়ে পড়ে থাকতে—সে-ই পায়ে ধরছে বলতে গেলে। অর্থাৎ সুধাপাত্র নিজে থেকে ঠোঁটের কাছে এগিয়ে এসেছে—কিন্তু সে সুধা পান করা যাচ্ছে না। এ কি দুঃসহ যন্ত্রণা—পৌরাণিক ট্যান্টালাসের মতো।

অর্জুন পীড়াপীড়ি ক'রেই চলে, 'কী এমন বাধা বলো আমাকে!'

শেষে আর থাকতে পারে না, বলেই ফেলে লিপিকা। তখন অর্জুনের গাড়িতে ফিরছে সে, পথটা একটু বিলম্বিত করে অর্জুন ইচ্ছে ক'রেই, সে ক্যাসুরিনা এভিন্যুর এক পাশে গাড়িটা থামিয়ে হা-হা ক'রে হেসে ওঠে। যেন এমন মজার কথা আর কখনও শোনে নি। হেসেই যায় বহুক্ষণ ধরে। এ অবস্থায় গাড়ি চালাতে পারবে না বলেই গাড়ি থামিয়েছিল।

'কী হ'ল?' অবাক হয়ে যায় লিপু, অভিমানও হয়। ওর এই দুঃখে হাসছে অর্জুন।

'ওগো বাঙ্গালিনী, হাসছি তোমার বোকামি দেখে। লেখাপড়াই করেছ, আর এখন চাকরি করছ, কখনও আশপাশের মানুষের দিকে চেয়ে দ্যাখো নি, না? আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও মেশো নি বোধ হয়।'

'তা কি ক'রে মিশব। আমরা গরীব, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গেলেও পয়সা লাগে। তা বোকামিটা কি হ'ল বুদ্ধিমান মশাই?'

'আরে, আত্মহত্যা যে করে সে কি বলে কয়ে করে? তোমার দিদি আর যাই করুক—ঝগড়াঝাঁটি করবে, হয়তো শাপমন্যি করবে—কিন্তু সুইসাইড? নো, নেভার। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আর বাবা? তিনি কি করবেন? কিছু করতে গেলেও উঠতে হবে তো—তা যদি ওঠেন তাহলেই তো ধরা পড়ে যাবে হার্টের দোহাই দিয়ে এই পড়ে থাকা স্রেফ পাগলামি। তোমার বাবা—'মিথ্যে' শব্দটা আর ব্যবহার করব না।'

এরপর থেকে চাপটা বেশি আসে। কিন্তু অর্জুন প্রায় ওর সমবয়সী—তার প্রজ্ঞা বা অভিজ্ঞতার ওপর অতটা আস্থা রাখতে পারে না। ঐ ভয় দেখানোটা গত দীর্ঘকাল ধরে যেন জগদ্দল পাথরের মতো বুকে চেপে বসে আছে—সেটা যে ভুয়ো, কাগজের বাঘ, তা বিশ্বাস হয় না কিছুতে।

এর মধ্যে হঠাৎই একদিন অর্জুন বলল, 'এই, একটা কাজ করবে? একটা দিন চলো যাই—রাঁচি কি পুরী ঘুরে আসি। পুরীই ভাল, শনিবার সন্ধ্যেয় বেরোলে রবিবার সকালে পৌঁছব। ওখান থেকে আবার সন্ধ্যেয় চাপলে ভোরবেলা কলকাতা। তোমার পাশে বসে যে মেয়েটা—কী যেন, করবী নাম না?—মধ্যমগ্রামে থাকে, বাড়িতে বললেই হবে, ও খুব পেড়াপীড়ি করছে—একদিন ওর বাড়ি যেতে।'

ভুরু কুঁচকে লিপু বলে, 'তার পর? মতলব কি বল্যে দিকি!...তোমার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক পরিচয় দিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠব?'

'কোনো হোটেলেই উঠতে হবে না। ওখানে ক্যাম্পিং কোচ পাওয়া যায়, মুখ হাত ধুয়ে মন্দিরে চলে যাবো, সেখান থেকে একটু নির্জনে সমুদ্রের ধার—যাতে কোন চেনা লোক না দেখে—তারপর স্টেশনেই ফিরে এসে খাবো। চাও তো আর একটু এধার ওধার, চাই কি ট্যাক্সি ক'রে ভুবনেশ্বর ঘুরে আসতে পারবো। আমার সঙ্গে দীর্ঘকাল একঘরে কাটাবার কোন প্রশ্নই উঠবে না। ক্যাম্পিং কোচ না পাই, ওয়েটিং রুমে থাকব।'

ইচ্ছাটা এতদিনে প্রায় কামনার স্তরে পৌঁচেছে। উদগ্র কামনা, মন কিছুদিন ধরেই অর্জুনের সঙ্গ পেতে লালায়িত, একটু বেশী সময়—বেশীক্ষণ 'না' বলা সম্ভব নয়।

ট্রেনে গিয়ে যখন উঠল তখনই ব্যাপারটা বুঝল। এ. সি. ক্লাসের ব্যবস্থাও এবং একটিমাত্র যে কুপে বা দুজনের কামরা, তাতেই ওদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা।

তখনই বিদ্রোহ করা উচিত ছিল, ফিরে আসা মতলবটা না বোঝার মতো বোকা

নয় সে—কিন্তু আর পারল না। আর পারছে না সে অনেকদিন থেকেই। তাই ও নীরবেই উঠে বসল, নীরবই রইল। তার বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠেছে, সমস্ত শরীর ভেতরে ভেতরে কাঁপছে—

ট্রেন ছাড়বার পর দরজা টেনে দিয়ে পাশে বসে অর্জুন যখন হাত দিয়ে জড়িয়ে একেবারে বুকের কাছে এনে ফেলল তখনও বাধা দিতে পারল না। 'হিপোক্রিসী' ওর সহ্য হয় না কোনদিনই। এইটেই যে সে আশঙ্কা নয়, আশাই করেছিল সেকথা নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল। এবং স্বীকার ক'রে নিশ্চিন্ত হ'ল ওরা দুজনেই।

কলকাতায় ফিরে এসে অর্জুন বলল, 'তারপর? আর তো তোমার ফেরার পথ রইল না। এইটেই আমি চেয়েছিলুম, নইলে আমি চরিত্রহীন ছোটলোক নই। এ না হলে তুমি যুক্তি বুঝতে চাইবে না কোনদিনই, তা জানতুম।'

তবু কি একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, অর্জুন ইঙ্গিতে ওকে থামিয়ে বলল, 'দ্যাখো—যাওয়া আসা দুবারেই আমরা কোন প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করি নি। খেয়ালও হয় নি অত। ঘটনাটা যে শেষ পর্যন্ত ঘটবেই তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। সুতরাং এখন একটা বিপদ তো তোমার মাথার ওপর রইলই। তাছাড়া আরও দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করতে হলে আমার মন যে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেবে না—এমন কথা বলা যায় না। এখন তো আর সেই অজানাকে জানার তীব্র তৃষ্ণা রইল না। অন্যেও আসক্ত হতে পারি। দ্যাখো, আমি সব খুলেই বলছি। প্রতারণা করার ইচ্ছে আমার নেই।'

'কিন্তু—কিন্তু কি করবো তাই তো বুঝতে পারছি না, এ কি বিপদে ফেললে আমাকে! ওরা খুব আগলি সিন করবে না!'

'বোঝার কিছুই নেই। চলো দুজনে গিয়ে আজই কোন রেজিস্ট্রি আপিসে নোটিস দিয়ে আসি। তার পর বিয়েটা হয়ে যাক। তখন আর ওরা আগলি সিন ক'রে করবেনটা কি। দ্যাখো, আমি ব্যবসাদারের ছেলে, ব্যবসাদার। মানুষ চিনি। ওদের চিন্তা তোমার আয়টা হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে। সেইটে ওঁদের বুঝিয়ে দিও—মাইনের পাইপয়সা তুমি প্রতি মাসে দিয়ে দেবে, দরকার হয় দিব্যি গেলে বোলো।' তারপর একটু থেমে বলে, 'আমিও তোমাকে আমার বাবা-মার নামে, তোমাদের কালীঘাটের কালীর নামে দিব্যি গালছি, আমি এক পয়সা নেবো না তোমার কাছ থেকে। আমার যা আয় তাই যথেষ্ট। পৈতৃক ব্যবসা ছাড়াও আমি কিছু আলাদা ব্যবসা করি। তার টাকা আলাদা জমে। আমি অলরেডি টালিগঞ্জের দিকে একটা ফ্ল্যাট ঠিক করেছি। তোমার কাপড় গয়নার টাকা তোমার হাতে বিয়ের আগেই ধরে দেব, ফার্নিচারও—সব তুমি ইচ্ছেমতো কিনো। এছাড়াও তোমার নামে পঁচিশ হাজার টাকা F. D. ক'রে দেব। যদি কোনদিন ব্যবসায় খুব ঘা খাই—তোমাকে একেবারে পথে বসতে হবে না। চলো লক্ষ্মীটি, কোন অসুবিধে হবে না। বিয়ের পর শুধু দিন পনেরো আমার দেশে যাবে, বাবা-মাকে দেখিয়ে আনব—বাবা

খুশীই হবেন, বাঙ্গালীর মেয়ে তাঁর খুব পছন্দ। তারপর শান্তি। কোন গোলমাল হবে না। আমি বলছি।'

গোলমাল হয়ও নি। প্রথমটা সকলে খুব চেঁচিয়ে উঠেছিল—কিন্তু অর্জুনের সত্যিই মানবচরিত্রে জ্ঞান অসীম—সে শ্বশুরকে দুশোটা টাকা প্রণামী বলে দিল, আর চার প্যাকেট ভাল বিলিতী সিগারেট। দিদির জন্যে একজোড়া বালা। ছোট মেয়ে দুটোর কথাও ভোলে নি সে। ফলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই মল্লিকমশাইয়ের গলার সুর পালটে গেল, অর্জুনের মতো ভাল জামাই যে ভূভারতে কেউ পায় নি—হার্টের অসুখ ভুলে গিয়ে তারস্বরে তা বার বার ঘোষণা করতে লাগলেন।

তার পরও বহুদিন কেটে গেছে। ছোট বোন দুটোও বড় হয়েছে, খানিকটা ক'রে লেখাপড়াও শিখেছে। তাদের বিয়েও হয়ে গেল ক্রমে, এক এক ক'রে। বেশী লেখা-পড়ার জন্যে অপেক্ষা করে নি লিপিকা, হয়ত বুঝেছিল বেশীদূর যেতে পারবে না—প্রাণপণ চেষ্টায় যাকে বলে উঠে-পড়ে লেগে পাত্র যোগাড় করেছিল। মাঝারি পাত্রই দেখেছিল, যাতে খুব একটা খরচ না হয়। কারণ যা-ই খরচ হোক, সেই অর্জুনের কাছ থেকেই তো হাত পেতে নিতে হবে।

এ পর্যন্ত তরুলতার কোন বিকার দেখা দেয় নি মনে। শাশুড়ীর মতোই ভগ্নীপতিদের যত্ন আদর করেছে, সংসারখরচ থেকে বাঁচিয়ে বোনপো-বোনঝিদের দু-একটা জামা-পোশাকও দিয়েছে। সবাই ভাবত এই আইবুড়ো অবস্থা সে মেনেই নিয়েছে।

তরুলতা নিজেও তাই ভাবত।

কিন্তু অকস্মাৎই একটা বিপর্যয় ঘটে গেল।

ছোট বোন দীপিকা থাকে আসানসোলে, কাজেই সে যখন আসে দু-একদিন থেকে যায়। এর মধ্যেই তার দুটো ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। ছোটটাই ছেলে, যেমন দস্যি তেমনি বায়নাদার। বায়নার ফলে সারাদিনই তার মুখ চলে, বায়না থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে যে যা পায় খাবার জিনিস যুগিয়ে দেয়।

কিন্তু এসব খাবারে যত লোভ—ভাতে তেমনি অরুচি। দুপুরে খাবার সময় প্রায়ই একটা যুদ্ধ বাধে মা আর বেটায়। একদিন এমনি জোর ক'রে খাওয়াবার পর সবটাই বমি ক'রে দিল—ছেলের পেটে কিছু 'তলাল' না বলে দীপিকা পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল, এবং অবিলম্বে বড় ডাক্তার দেখাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল।

তরুলতার আর সহ্য হ'ল না, সে বলে উঠল, 'ডাক্তার দেখাতে হবে কিসের জন্যে! আড়াই বছরের ছেলে, কতটুকুই বা ওর পেট—সকাল থেকে কতবার খেল বল্ দিকি। সকালে দুধ ডিম রুটি, তার সঙ্গে আধখানা বড় কলা। তারপর বিস্কুট হয়েছে, সন্দেশ হয়েছে, চকোলেট হয়েছে, রান্নাঘরে গিয়ে মধুর মা'র কাছ থেকে এতগুলো আলুভাজা খেয়ে এসেছে—তার ওপর তুই এগারোটা না বাজতে বাজতে ভাত খাওয়াতে বসলি। তা ও যখন খেতে চাইছিল না ছেড়ে দিলেই হ'ত, মারধোর ক'রে ঠেসে ভাত খাওয়াতে গেলি কিসের জন্যে! সেই তো দুটো বাজলেই আবার

দুধ খাওয়াবি। বমি হয়েছে সে তো ভাল, নইলে ঐ ছিষ্টির খাবার তো পেটে পচত!'

দীপিকার চোখ মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

'কেন বল দিকি, তুমি আমার ছেলের খাওয়ায় এমন ভাবে নজর দাও! তাই তো বলি, অসুখ নেই বিসুখ নেই সুখসোমন্দা ছেলেটা বমি করে কেন? নিজের কিছু হ'ল না, সেই কালে বুঝি ডাইনীর মতো আমাদের ছেলেমেয়েকে নজর দাও। ঝকমারি হয়েছে এখানে আসা—এই শেষ। আমি আজই চলে যাবো, একাই চলে যাবো, তবু এই ডাইনীর ছোঁয়ায় আর থাকব না!'

সে-ই আগুন জ্বলল। অনেক ব্যর্থতা সয়েছে তরু, অনেক হতাশা। জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল, মরুভূমি হয়ে গেল প্রাণ—আশা আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ বলতে কিছু রইল না। ঐ বুড়ো মতলববাজ বাপের জন্যে ওর জীবনটা শ্মশান হয়ে গেল। কিন্তু তবু এমন জ্বালা, এমন প্রচণ্ড দাহ কখনও ভোগ করে নি সে।

প্রথম মনে হ'ল ঐ বুড়োটাকে আগে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারে। কিম্বা মারতে মারতে বাড়ি থেকে বার ক'রে দেয়—ওর কেমন হার্টের অসুখ, বিছানা থেকে উঠতে পারে না দেখুক সবাই।

আবার ভাবে গলায় দড়ি দিয়ে নিজেই মরবে, লিখে রেখে যাবে ওর মৃত্যুর জন্যে ওর বাপই দায়ী—

শেষ পর্যন্ত কোনটাই হয় না। দুদিন উঠল না কিছু খেল না—বেগতিক দেখে মাধুর মা যতটা যা পারল করল। তবু কি করবে, কি করলে এই মর্মান্তিক অবিচারের শোধ ওঠে ভেবে ঠিক করতে পারল না।

দিন তিনেক পরে একদিন মাধুর মা বললে, 'ঐ যে ওপারে ঐ ছোট্ট বাড়িটার একতলায় এক মাস্টারমশাই থাকে, ওকে দেখেছ বড়দি?'

'হ্যাঁ, দেখেছি বৈ কি। এক পাড়ায় প্রায় সামনাসামনি থাকি, দেখব না! ভদ্রলোক আছেনও তো প্রায় কুড়ি-একুশ বছর। এখন বুঝি আর পড়াতে যান না, দুপুরেও তো দেখি কি সব লিখছেন বসে বসে।'

'না, বয়েস বুঝি পার হয়ে গেছে, তাই রিটার না কি বলে তাই হয়েছে। মানে চাকরি গেছে। তা ওনার তাতে কোন দুঃখু নেই, ওনার কি সব বই আছে——ইস্কুলে খুব চলে, মানের বই-টই এমনি ধারা—তাতে আয় খুব। তা ঐ বুড়ো যে আস্তা পেরিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল গো!'

'তোর সঙ্গে? কেন লো?' তরু অবাক হয়ে যায়।

'ব'লো না। সে এক কাণ্ড! বে করে নি তো, বৌ নেই। আগে এক পুরনো চাকর ছিল সরে গেছে, এ একটা নতুন লোক এসেছিল। তাও খুব নতুন আর কি—আড়াই মাস তিন মাস হয়ে গেছে—কাল এতের বেলা ওনার ঘড়ি, কলম, সোনার বোতাম, ব্যাগ থেকে দেড়শোটা টাকা নে চম্পট দিয়েছে। তাই এখন দুর্দশার শেষ নেই। কোনমতে আজ চিড়েটিড়ে এনে খেয়েছে, আমাকে বলতে এয়েছেল আমি যদি

দুবেলা দুটো ভাত ফুটিয়ে দে আসি, যা হোক একটা কিছু ব্যান্নন—তাহলে আমাকে চল্লিশ টাকা দেবে মাসে। চা নিজেই ক'রে খায় বাবু—শুধু খাওয়া। তা আমি বলি যে বড়দিকে বলে—'

'এর আর দেখাদেখি কি আছে—যদি পারিস এক ফাঁকে ক'রে দিয়ে আসিস—আমাদের এখানে তো কারোর আপিসের ভাত দিতে হয় না। যদি তোর দু পয়সা হয় হোক না। তবে বাকী কাজ ?'

'সে নাকি ওপরতলার ঠিকে ঝি এসে ক'রে দেবে।'

কথাটা সেখানেই চাপা পড়ল কিন্তু চিন্তাটাকে চাপা দেওয়া গেল না।

লোকটার বয়স হয়েছে, তা হোক, বেশ শক্তসমর্থ আছে। রোজগারও আছে। লোকের অভাব। তথ্যগুলো পরপরই মাথায় জমতে থাকে।

শেষে বেলা তিনটে নাগাদ—মাধুর মা ঘুমোচ্ছে তখন—নিঃশব্দে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে ননীবাবু মাস্টারমশাইয়ের দোরে গিয়ে টোকা দিলে।

ননীবাবু দোর খুলে ওকে দেখে অবাক।

'এ, মানে, বাড়িতে কারও কিছু অসুখ-বিসুখ নাকি ?'

'আমাকে চেনেন ?'

'হ্যাঁ, এই মানে, দেখি তো আপনাকে প্রায়ই। সামনের বাড়ির মল্লিকমশাইয়ের মেয়ে তো ?'

'হ্যাঁ। চলুন ভেতরে যাই। কথা আছে।'

অগত্যা পথ ছাড়তে হ'ল ননীবাবুকে।

তরু ভেতরে এসে নিজেই একটা টুলে বসে পড়ল। তারপর কোন ভণিতা না ক'রেই শুরু করল, 'আপনাকে তো দেখাশুনো করার লোক নেই শুনলুম। দুটি ভাতের জন্যে আমাদের ঝিয়ের কাছে গিছলেন। এমন ভাবে চলতে পারবেন বেশী দিন ? বয়েস হচ্ছে, শরীর ভেঙে পড়বে ক্রমশঃ, দেখার লোক চাই তো ! এখনকার দিনে মাইনে করা লোক দিয়ে সে সেবা কি হবে ?'

'আপনি—মানে—হ্যাঁ—কথাটা ঠিক। তবে কী আর করব বলুন।'

'বিয়ে করেন নি কেন ?'

'ইস্কুল মাস্টার, তখনকার দিনে মাইনে তো বেশী ছিল না। তাই গোড়ায় সাহস করি নি। যখন বইটই লিখে দাঁড়াবার মতো হ'ল—তখন আর চেপে ধরে খোঁজ-খবর ক'রে বিয়ে দেয় তেমন কেউ ছিল না। মা দিদি বাবা কেউ না। তাই আর হয়ে উঠল না।'

'এখন করছেন না কেন ?'

'এখন ? আপনি কি পাগল ! বয়েস আমার উনষাট পার হয়েছে। আমার বিয়ে !'

'তাও হয়। তেমন মেয়েও আছে।'

'এ—মানে, ঠিক আপনার কথাটা বুঝতে পারছি না।'

'বোঝার কিছু নেই। আমিই আছি, আমাকে বিয়ে করবেন?'

ননীবাবু যেন কেমন ভয় পেয়ে গেলেন।

'আমাকে পাগল ভাবছেন? না, আমিও দায়ে পড়েই আপনার কাছে এসেছি। মনে মনে এমন একটি পাত্রের কথাই ভাবছিলুম। আমারও একান্ন হয়ে গেছে। রাঁধতে পারি, পনেরো বছর বয়েস থেকে এই সেদিন পর্যন্ত সংসারের রান্না, বাড়ির অন্য কাজ, এমন কি ঠিকে-ঝি না এলে বাসন মাজা পর্যন্ত করেছি। ছত্রিশ বছর ধরে শয্যাগত বাপের সেবা করছি—তা এ পাড়ার সবাই জানে। আপনিও শুনে থাকবেন। আমাকে বিয়ে করলে বিনা মাইনের একটা ভাল কম্‌বাইন্‌ড্‌ হ্যান্ড পাবেন, তার সঙ্গে একটা নার্সও। একেবারে অক্ষর পরিচয় নেই, তাও না। ভেবে দেখুন কথাটা।'

'মানে—ঠিক আমি—মানে কথাটা এত অপ্রত্যাশিত। তা আপনার এতে স্বার্থ?'

'একটা আশ্রয়। ভদ্রলোকের আশ্রয়, মানুষের সঙ্গে। ভবিষ্যতের চিন্তা করার সময় এসেছে। অবশ্য সে আপনারও।'

'কিন্তু—মানে—আমার কাছ থেকে সন্তানাদি আশা করছেন না তো?'

'না, আদৌ না। সে অবস্থা আমারও আর নেই। শুধু এই একঘেয়ে থ্যাংক-লেস খাটুনি থেকে অব্যাহতি পেতে চাই। আপনারও সেবাযত্ন হবে, আমিও একটা পুরুষ সঙ্গী পাবো।'

'কিন্তু, মানে—আপনার বাবা, বাড়ির লোক—তাঁরা রাজী হবেন?'

'বাড়ির লোক বলতে ঐ শয্যাগত আধাপাগল বাবা। তাঁর মত নেবার দরকার নেই। তাঁকে দেখার লোক আছে। আমার মেজ বোন সে ব্যবস্থা করেছে মাধুর মা'র সঙ্গে। কাউকেই জানাবার দরকার নেই। রেজেস্ট্রি হবার পর জানালেই হবে।'

'তা—মানে—সে কি ঠিক হবে? এই বয়সে? মানে আমার সঙ্গ যদি ভাল না লাগে?'

'আমি মানিয়ে নিতে জানি। না হলেও আপনার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করব না কথা দিচ্ছি। এতদিন ধরে দেখছি তো, জানলা দিয়ে—আপনার সঙ্গে অবনিবনা হবে না।'

একেবারে উঠে দাঁড়ায় তরু, 'তবে একটা কথা, এ বাড়ি ছাড়তে হবে। এ পাড়ায় থাকব না। আপনার দেশ কোথায়? সেখানে বাড়ি-ঘর নেই?'

'দেশ আমার জনাইয়ের কাছে। পাকা বাড়ির একটা অংশও আছে। তবে যাই নি অনেকদিন তো।'

'সেইটেই সারিয়ে-সুরিয়ে নিন। বেশ থাকতে পারব।'

'কিন্তু আমার বই-টই—পাবলিশার্স—ঐটেই তো আমার মোটা রোজগার—'

'ওখান থেকে আসা-যাওয়া করতে পারবেন না? বেশ পারবেন।'···

সেই বিয়েই হয়েছে। বাড়ি সারিয়ে খাট-বিছানা কিনে রেজেস্ট্রির পর সোজা

সেখানে চলে গেছে তরু নলীবাবুর সঙ্গে। একেবারে যাবার আগে লিপিকাকে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে গেছে। তাও ঠিকানা দেয় নি।

সেইজন্যেই মল্লিকমশাই ডেকে সাড়া পাচ্ছেন না বড় মেয়ের।

মিলনে বাধা

যে সব কারণে স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে—কঙ্করের তার কোনটিই ছিল না। সে মাতাল নয়, লম্পট নয়, পরস্ত্রী বা দাসী কোনদিকেই কখনও চায় নি—উপার্জন-অক্ষম অপদার্থ নয়, অশিক্ষিত নয়, এম. এ. পাস করেছে, তবে মূর্খ কিনা বলা শক্ত। তবু কেন কুহেলি যে স্বামী এবং তার বাড়ি ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে গেল, এ রহস্যটা অনেকের কাছেই অজ্ঞাত থেকে গেছে আজও।

কেবল আমিই জানি হয়ত কিছুটা। কারণ যে কলেজে সে চাকরি করছে, আমি সেই কলেজের গভর্নিং বডির মেম্বার। ওদের পাড়াতেই থাকি, কঙ্করের সঙ্গেও যথেষ্ট আলাপ আছে। তাই আমাকেই ধরতে এসেছিল কুহেলি এই চাকরির জন্যে। তাও কারণটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বলতে চায় নি। আমি বললুম, যথেষ্ট কারণ না থাকলে আমি তোমাকে রেকমেন্ড করব কেন, অনেক দুঃস্থ মেয়ে আছে এ পাড়াতেই, যাদের চাকরি হলে একটা ফ্যামিলি রক্ষা পায়।' তখনই বলেছে, বলতে বাধ্য হয়েছে। তাও সবটা বলেছে কিনা ঈশ্বর জানেন।

কঙ্কর লেখাপড়া করেছে, চাকরিও করছে—আমি বলছি আজ থেকে সাত আট বছর আগের কথা—তখনও হাজার টাকা মাইনে খুব কম ছিল না—সন্তানও হয়েছে তিনটি—তবু সে চিরদিনই সংসারে বেমানান। স্ত্রীপুত্র ঘরবাড়ি—এসব কোনটাতেই যেন তার কোন আসক্তি নেই।

তাহলে সে কি নির্লিপ্ত উদাসীন?

তাই বা বলি কি ক'রে। ছেলেমেয়েদের যে একেবারে ভালবাসে না তাও তো না। স্ত্রীর অসুখ হলে ডাক্তার ডাকে, তাকে পথ্য ক'রে দেয়, যা পারে রান্না করে ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়।

তবে?

আসলে সে রোম্যান্টিক। কবিতা লেখে, বাঁশি বাজায়, ছবি আঁকে। বোনাসের টাকায় পুজোর কাপড় জামা বা বিছানা বালিশ না কিনে সেই সব অপাঠ্য কবিতার বই ক'রে ছাপে, বিড়লার হল ভাড়া ক'রে ছবির প্রদর্শনী করে। একটা ছবিও বিক্রি হয় না, বই মোট বিক্রি হয়—হয়ত পাঁচ-ছ'খানা। দ্বিতীয় বই যখন দোকানে দিতে গিয়েছিল তখন কেউ জমা রাখতেও রাজি হয় নি।

ফলে ছেলেমেয়েরা গরম জামার অভাবে শীতে কষ্ট পায়, আত্মীয়-বান্ধবরা এসে ছেঁড়া বিছানা দেখে যায়। প্রাইভেট টিউটার রাখতে পারে না, বাবাও ছেলে-

মেয়েদের পড়া দেখে না—অথচ তাদের মাথা আছে, কোনমতে পাস করে—কিন্তু কুহেলি জানে, একটু সাহায্য করলে কি নজর রাখলে এরা অনেক ভাল ফল করতে পারত। তার ঘাড়ে সংসার। একটা ঠিকে-ঝি রাখতেই কষ্ট হয়—রাতদিনের লোক রাখা তো স্বপ্নের অগোচর। শুধু তো রান্নাই নয়, 'আর্টিস্ট' স্বামীর জন্যে ঘরদোরই গুছোতে হয় দিনের মধ্যে চোদ্দ বার। তিনটে ছেলেমেয়ের খাওয়া-পরা, তাদের চোদ্দরকম ফরমাশ—এ সবই তো আছে। ঝি না এলে বাসনের গোছা নিয়ে বসতে হয়। এক বালতি সাবান কাচা তো আছেই। কোন্ কালে যে সে লেখাপড়া শিখেছিল, তা যেন ভুলেই গেছে।

তাতেই শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে উঠেছিল। এই চাকরিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সরকারী ছোট ফ্ল্যাটও যোগাড় ক'রে নিয়েছিল, নামে এক কামরার ফ্ল্যাট, তবে আরও একটা ছোট ঘর আছে।

চাকরি অস্থায়ী, কারণ স্থায়ী চাকরির বয়স নেই আর। তবে আমি আশ্বাস দিয়েছি। প্রিন্সিপ্যালও। এইভাবেই চলে যাবে, মনে হয় কেউ বাগড়া দেবে না। অবশ্য ইতিমধ্যে একটা ভাল টিউশ্যানিও খুঁজে নিয়েছে কুহেলি। ঝুঁকি তো রইলই। তবে ওর মনে হ'ল যে কোন ঝুঁকিই এ জীবনের চেয়ে অনেক ভাল।

সব ঠিক ক'রেই কঙ্করকে বলতে গিয়েছিল কুহেলি।

কঙ্কর কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে চেয়ে থেকে অসহায়ভাবে বললে, 'একেবারে সব ঠিক হয়ে গেছে? আমাকে একটা চান্সও দিলে না!...তা যাও। কী আর বলব? আমার হাতে পড়ে দুঃখই পেলে।...দ্যাখো ছেলেমেয়েগুলো যদি মানুষ হয়।'

তখন কোন ছবির কথা ভাবছিল কঙ্কর, একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। বড় মেয়েকে বললে, 'একটা পান দিবি মা? চলেই তো যাচ্ছিস। এরপর তো দোকানের পান ভরসা।'

অনেকগুলি বদভ্যাসের (কুহেলির মতে) মধ্যে এও একটা। প্রায় অবিরাম পান আর জর্দা খাওয়া। সেটাও আগে ওকেই সাজতে হ'ত, এখন বড় মেয়ে কাজলই সেজে দেয়, সেজে রেখে দেয় ডিবে ভর্তি ক'রে।

কাজল বললে, 'কেন, আমি কোথায় যাব। আমিই দেব, দোকানে যেতে হবে কেন?'

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠ, সহজতর বলার ভঙ্গী।

বাবা ও মা দুজনেই স্তম্ভিত। মেয়েই বড়, সে ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে। তার জন্যেই কুহেলির আরও দুশ্চিন্তা। অনার্স যদি না রাখতে পারে তো এম. এ. পড়া হবে না। কী করবে আর! বিয়ে দেওয়া যাবে না, যদি নিজে করতে পারে সে আলাদা। কিন্তু চাকরি-বাকরি আজকাল 'কোনমতে পাস করা' গ্র্যাজুয়েটের পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

'সে কি! এ আবার কী কথা! তোদের জন্যেই তো আমার এত কাণ্ড করা। এখানে কার কাছে থাকবি, পড়াশুনোই বা করবি কখন!'

'এ লোকটা কার কাছে থাকবে, কী করবে সেটা ভেবেছ কি ?'

'অনেকদিন ভেবেছি। সে যদি নিজে কোনদিন না ভাবে তো আমি কী করব। তোদের মানুষ করব কি ক'রে !'

'জন্মের জন্যে বাবা ও মা দুজনের কাছেই ঋণ থাকে। ঋণের কথা ছেড়ে দিলেও দুজনেরই সমান দায়িত্ব এ ঘটনায়। যদি বাবার কথা কেউ নাও ভাবে, আমি ভাবব না এমন কোন কথা নেই। আমি এখানেই থাকব।'

কঙ্কর ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'না না, কাজল মা, এমন পাগলামি করিস না। সত্যিই তো—তোর পড়াশুনো আছে, ভবিষ্যৎ আছে। এখানে—না না, এ যে বিপুল কাজ। সময় পাবি কখন। আমি বেশ থাকব এখন। ঝিটাকে বলব, মধ্যে মধ্যে বাড়িঘর সাফ ক'রে দিয়ে যাবে—আমি হোটেলে টোটেলে খেয়ে নিতে পারব—'

কুহেলি বলে, 'তোর তো কলেজ আছে, বাবাকে দেখবি কখন ? তাকে দেখা মানে তো কচি ছেলে মানুষ করার থেকেও বেশি !'

'তাও তো কেউ কেউ করে মা। আমাদের ক্লাসেই একজন পড়ে। তার ছেলে হয়ে গেছে এরই মধ্যে, অবস্থাও তেমন ভাল না। হাউএভার, তুমি যাও। ভাই দুটোকে মানুষ করো—আমার কথা ভাবতে হবে না।'

তার পরেও বহু কথা হয়েছে, সময় নষ্ট হয়েছে বিস্তর। কিন্তু কাজলকে টলাতে পারে নি তার মা।

তার পর এই এতোদিন চলে গেছে। কাজল বি. এ. পাস করেছে কিন্তু অনার্স পায় নি। প্রাইভেটে এম. এ. দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল, তার আগেই শর্টহ্যান্ড টাইপ রাইটিং শিখে একটা চাকরি পেয়ে গেল। তাতেই যেন খুশি সে। একটা দিন-রাতের বুড়ী ঝি রাখতে পেরেছে, জানাশুনো বিশ্বাসী। ভোরে উঠে কঙ্করকে তিন বার চা দিয়ে রান্না ক'রে সাড়ে নটায় আপিস চলে যায়। বাকি কাজ সেই বুড়ীই সেরে নেয় সারাদিন ধরে। বড় ডিবের এক ডিবে পানও সেজে বাবাকে দিয়ে যায়। কঙ্করের একটু দেরিতে আপিস গেলেও চলে। ওকে সকলেই কৃপার চোখে দেখে, নিরীহ বলে ভালও বাসে।

কঙ্কর ছেলেদের খরচ বলে মাসে আড়াইশো টাকা দিত, কুহেলি সেটা প্রত্যাখ্যান করতে সাহস করে নি। বাকি টাকাতে সংসার চালাতে কাজলের খুবই কষ্ট হ'ত আগে আগে—কারণ লোক কমলেও ইংরেজীতে যাকে 'এসটাব্লিশমেণ্ট' বলে, বাংলায় 'ত' খরচা—তা কমে নি।

বাড়ি নিজের নয়, তবে বহুদিন আগে পঞ্চাশ টাকায় ঢুকেছিল, এখনও একশো টাকায় চলছে। একটা ছোট বাড়ির সম্পূর্ণ একতলা, এখনকার ফ্ল্যাটের থেকে ঢের প্রশস্ত। ওরা ছেড়ে দিলে চার-পাঁচশো টাকা ভাড়া পাবে হয়ত। কিন্তু বাকি খরচা তো ক্রমাগতই ঊর্ধ্বমুখী। দাঁতে দাঁত দিয়ে, বলতে গেলে কষ্ট ক'রে চালিয়েছে কাজল, এখন নিজের মাইনেটা যোগ হতে অত কষ্ট আর নেই। এটা ওটা শখের

জিনিসও কিনতে পারে।

কঙ্করের অত মান-অভিমান নেই, সে মধ্যে মধ্যে ছেলেদের দেখতে যেত ও-বাড়ি। তবে কুহেলির বাসা সেই ট্যাংরায়—কঙ্করের মনে হয় অনেক ঝামেলা। গোড়ায় গোড়ায় কুহেলি বোধ হয় চক্ষুলজ্জাতেই—কিংবা কাজলের না আসার মূলে এ লোকটার হাত আছে ভেবে এড়িয়ে চলত। পরে অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। তবে সে এ বাড়িতে আসে নি, হয়ত প্রতিবেশীদের টিটকারির ভয়ে।

কঙ্কর কুহেলির কাছে যেত দুমাস আড়াই মাস অন্তর, যেত ছেলেদের জন্যে এটা ওটা তাদের শখের জিনিস—ক্রিকেটের ব্যাট, ক্যারমবোর্ড, অথবা কিছু প্রয়োজনের জিনিস নিয়েও। কুহেলিরও বহুবার মনে হয়েছে মেয়ের কথা কিন্তু সাহসে কুলোয় নি কিছু দিতে। কে জানে যদি ফেরত দেয়। অবশ্য তারও আর্থিক অবস্থা খুব একটা সচ্ছল ছিল না। ইদানীং মাইনে বেড়েছে যেমন, খরচাও বেড়েছে। বড় ছেলে অবস্থা বুঝে সান্ধ্য-কলেজে ভর্তি হয়ে একটা পার্টটাইম চাকরি যোগাড় ক'রে নিয়েছে, তাই রক্ষা।

ছেলেরা বাবাকে ভালবাসে—তা কুহেলি লক্ষ্য করেছে বৈকি। করতে বাধ্য হয়েছে। বোধ হয় তারা বাবার অভাব বোধ করে। মেয়ে তো এলই না। আশ্চর্য, এতদিনে একবার খবরও নেবার কথা মনে পড়ল না তার। হাজার হোক মা তো। এক এক সময় প্রচন্ড অভিমান বোধ করে। সে অভিমান শুধু ছেলেমেয়েদের ওপর নয়—যেন জগৎসংসারের ওপরেই।

সে কি একাই দোষী। কী সহ্য করেছে সে। কতটা তা মেয়ে-ছেলে কেউ ভাবল না, বোঝার চেষ্টাও করল না। তারা সকলেই ঐ অপদার্থ দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকটার দলে হয়ে গেল। তাদের ভাবভঙ্গীতে মনে হয় মা একটা ঘোরতর অবিচার করেছে তাদের বাবার ওপর। আশ্চর্য।

কেন, কেন ? চিরকাল সে-ই সহ্য ক'রে যাবে ? কী পেয়েছে সে স্বামীর কাছ থেকে। ভালবাসা ? হায় রে, যদি ভালবাসতেও জানত। ছেলেমেয়ে হয়েছে নিতান্ত জৈব প্রয়োজনে। স্ত্রী যে মানুষ, তাও বোধ হয় ভাবে নি কোন দিন। সে আছে, সে তো থাকবেই। স্ত্রীর কথা ভাবে নি বলেই, সংসার সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব বহন করতে হয় নি বলেই—সে চিন্তাও ছিল না বলে ছেলেমেয়েদের আদর করতে পেরেছে, ভালবাসা দেখাতে পেরেছে। দেখানো ছাড়া কি। তাদের ঝি হরিমতী যে বলে 'শুকনো সোহাগ'—এ তো তাই।

এক এক সময় রেগে মনে মনে একাই উচ্চারণ ক'রে যায় শব্দ দুটো।

লোকটা পাথর। কেমন নির্লজ্জের মতো হাসিমুখে আসে এ-বাড়ি। মান-অপমান কোন জ্ঞান নেই যার—সে কি মানুষ।

প্রথম প্রথম কুহেলি যেমন ছেলেমেয়েদের মনোভাবে বিস্মিত হ'ত—বছর

পাঁচেক কাটার পর তেমনি হঠাৎ একদিন নিজের মনের গতি দেখে চমকে উঠল।

আরে, এ কী! সে যে কখন বা কবে থেকে মনে মনে স্বামীর পক্ষে যুক্তি দিতে, তার অসহায় অবস্থার জন্যে বেদনা অনুভব করতে শুরু করেছে, তা তো বুঝতেও পারে নি। আশ্চর্য তো!

লোকটা বড়ই একা। বড় দুঃখী। মেয়ে দেখছে ঠিকই—কিন্তু যতই যা করুক মেয়ে, কখনও স্ত্রীর মতো করতে পারে না। তাছাড়া নিঃসঙ্গতাটাই সব চেয়ে বড় কথা। কবিতা লেখা বাধ্য হয়েই ছেড়ে দিয়েছে। ছবি এখনও আঁকে—কিন্তু আগেকার উৎসাহ আর নেই। এসব ছবি বন্ধুবান্ধবদের উপহার দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজে লাগে না। তারাও সবাই টাঙায় কি? বোধ হয় না। বাঁশি বাজানোটা এখনও আছে। তবে তাই বা আর কত বাজাবে! বয়স তো হচ্ছে, এখন একটা মানুষের প্রয়োজন। কথা বলার মতো একজন সঙ্গীর।

ছেলেদের নাম ক'রেই এখানে আসে। কিন্তু গল্প করে ওর সঙ্গেই বেশি। একটু বেশি বকে আজকাল। আগে এরকম ছিল না। তখন যদি এর সিকিও কথা কইত ওর সঙ্গে তাহলে কুহেলির এত দুঃখ বোধ হ'ত না। আসলে একা বলেই—। পুরুষমানুষ মেয়ের সঙ্গে আর কত গল্প করতে পারে। সব কথা তো তার সঙ্গে আলোচনাও করা যায় না।

সেই জন্যেই বোধ হয় এত রোগা হয়ে যাচ্ছে লোকটা। যেন দ্রুত বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। কুঁজো হয়ে গেছে একটু অমন সোজা সবল লোকটা। মেয়ে যে খাওয়া-দাওয়ার যথেষ্ট যত্ন নেয় তা কুহেলি জানে। কঙ্করই গল্প করেছে। কিন্তু আসলে মানসিক কারণেই তো পুষ্টির অভাব ঘটে—এখনকার চিকিৎসকরা সকলেই তাই বলছেন।

ভাবতে ভাবতেই দুম ক'রে এক কাণ্ড ক'রে বসে কুহেলি। একটা বড় বোতল টনিক আনিয়ে রাখে। কঙ্কর এলে তাকে দিয়ে বলে, 'এটা খেয়ো দুবেলা ঠিক, খাওয়ার আগে খেতে হয়। নিয়মিত খেয়ো কিন্তু। তোমার তো মনে থাকবে না। গিয়ে কাজলের হাতে দিয়ে বলে দিও—দুপুরে ও রাত্রে। প্রিন্সিপ্যাল মিলের আগে যেন দেয় মনে ক'রে।'

কঙ্কর বাড়ি এসেছিল প্রায় নাচতে নাচতে। কিন্তু কাজল তার উৎসাহে যেন জল ঢেলে দিল। বললে, 'সত্যি, আশ্চর্য লোক তুমি বটে! তুমি স্বচ্ছন্দে হাতে ক'রে নিয়ে এলে! কেন, এত যদি দরদ, এখান থেকে চলে যাবার কী হয়েছিল?...খেয়ো তুমিই। হরিদিকে বরং বলে রেখো, মনে ক'রে দেবে!'

কঙ্কর অপ্রতিভ মুখে মাথার চুলগুলো নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। এ আবার এক কাণ্ড! মেয়ের মনের তল পাওয়াই ভার!

মনে কথাটা ছিলই, এখন এই ব্যাপারের পর জোর পেল কঙ্কর। দিন দশেক পরে আপিস থেকে টাকা ধার ক'রে সাড়ে ছশো টাকা দিয়ে একখানা ছুঁচের কাজ

করা দোরুখা পাড় তসরের শাড়ি কিনল কঙ্কর। মেয়েকে কিছু বলল না, দোকান থেকে নিয়ে সোজাই চলে গেল স্ত্রীর কাছে। মেয়েকে বললে সে আবার কী বলবে কে জানে, হয়ত তার তাড়নায় কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

কুহেলির সামনে রেখে বলল, 'ইয়ে—তোমার জন্মদিন আসছে না? বোধ হয় পরশু। তাই ভাবলুম—'

'আমার জন্মদিন যে বছরের মধ্যে কোন এক দিন পড়ে—এইটে মনে রেখেছ তাতেই আমি কৃতার্থ। তবে সেটা গত মাসেই চলে গেছে।'

বলল কিন্তু শাড়িটা যে তার পছন্দ হয়েছে, তাও বুঝতে পারল কঙ্কর। বহু-দিন পরে—বোধহয় পঁচিশ বছর পরে। খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল কুহেলি। নিজে জলখাবার ক'রে খাওয়াল। এরপর উপহার বিনিময় চলতে থাকাই তো স্বাভাবিক।

কঙ্করও পেল অনেক। ভাল জামার কাপড়। দামী ধুতি। ভাল জর্দা। এমনি ছোট ছোট প্রীতির নিদর্শন।

সবচেয়ে বড় কথা, একদিন গিয়ে দেখল পানের সরঞ্জাম আনিয়েছে কুহেলি। পান সেজেও দিল ক'টা।

তারপর একদিন হঠাৎ এসেও পড়ল—পাড়ার লোক কী বলবে, বলতে পারে তা গ্রাহ্য না ক'রেই। হরিমতী চেনে না, সে দরজাই খুলতে চায় নি প্রথমটা। সেই রকমই বলা আছে তাকে, অচেনা লোককে খুলবে না কিছুতেই। কুহেলি অপমানিত বোধ করল, অবুঝের মতো রেগেও উঠল। অদৃষ্টের এ পরিহাস যে ওরই সৃষ্ট তা মাথায় গেল না। নিজের ঘরে নিজের সংসারে পরিচয় দিয়ে ঢুকতে হচ্ছে, এই তো অসহ্য, তার ওপর এ বুড়ীটা তা বিশ্বাসও করতে চায় না।

সে ধমকের সুরে বলল, 'আমি দিদিমণির মা, মুখের চেহারা দেখেও বুঝতে পারছ না। কাজলের মা আমি!'

'তা হবে। কেমন ক'রে জানব বলো? এরা তো কিছু বলে, না। দিদিমণিকে শুধলে বলে, মরে গেছে। পাড়ার অন্য বাড়ির ঝিয়েরা বলে, তিনি কার সঙ্গে বেইরে গেছে।

গজগজ করতে করতে দোর খোলে হরিমতী।

কুহেলির মনে হ'ল সে ফিরে যায়, কিন্তু তারপরই মনে পড়ল তাহলে এদের সন্দেহ, এই অপমানকর কথা মেনে নেওয়া হয়। সে চোখমুখ লাল ক'রে কঠোর স্বরে বলল, 'কে কোন্ হারামজাদী বলেছে, ডেকে আনো দিকি—তার জিভ আমি সাঁড়াশি দিয়ে ছিঁড়ে নিই। আর তুমি, তোমার এত বড় আস্পদ্দা! তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছে—এইসব নোংরা কথা মুখে আনো! ছোটলোক কি সাধ ক'রে বলে!'

হরিও রেগে যায়, বলে, 'ছোটলোক ছোটলোক করো নি বলছি। তোমার ভদ্দর-নোকদের বাড়ির সব ধারা দেখে দেখেই এতটা কাল কাটল। আমাদের ছোটলোক বলো—আমরা অনেক পদে আছি! আমি নিজে আসি নি। ডেকে এনেছে দিদি-

মণি, সে যদি বলে এক্ষুণি চলে যাবো। বুড়ো হইছি, তবু কাজের অভাব হবে না।'

অবশ্য সাদৃশ্যটা সে মিলিয়ে দেখেছে বৈকি। 'ফটক'ও একখানা আছে বাবুর ঘরে। গিন্নী যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কুহেলি আর ঘাঁটায় না। মা বলতেন, পাঁকে ঢিল ছুঁড়লে নিজের গায়েই ছিটকে আসে।

কুহেলি ঘরদোর ঝেড়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে, মায় ভাঁড়ার-রান্নাঘরেরও পঙ্কোদ্ধার ক'রে পাঁচটার আগেই চলে যায়। আজ ওর ছুটি ছিল না, ইচ্ছে ক'রেই নিয়েছে, দুপুরে এখানে আসবে বলে।

কাজল বাড়িতে পা দিয়েই বললে, 'কে এসেছিল হরিদি! এমন ক'রে ঘরদোর গুছিয়ে রেখে গেছে! সামনের বাড়ির মাসিমা? কিন্তু তিনি তো কখনও আসেন না—'

'না গো না। তোমার গরভধারিণী এসেছিল। বাপরে, কী মেজাজ, আর কী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা!'

'মা এসেছিল? মা? সে কী, তুমি কি ক'রে জানলে? তুমি তো চেনো না। কাকে না কাকে দোর খুলে দিলে!'

'না না। মুখের চেহারা মিলিয়ে দেখে তবে দোর খুলেছি।'

কথাবার্তা যা হয়েছিল, তাও বলে। কাজল চুপ ক'রে যায়, ভুরু আগেই কুঁচকে ছিল, সে রেখাগুলো আরও গভীর হয়ে ওঠে এবং সহজে মিলোয় না।

শোনে কঙ্করও বাড়ি ফিরে। যে কখনও কিছু লক্ষ্য করে না, তারও চোখে পড়ে ঘরের শ্রী ফিরে যাওয়া। দেখে একটা নিঃশ্বাস পড়ে শুধু।

স্বপ্ন দেখার দিন চলে যাচ্ছে ক্রমশ, মন সংসারাভিমুখী হচ্ছে, তা কঙ্করও বুঝতে পারে এখন।

এর মধ্যেই কুহেলি একদিন বলে, 'বেশ তো নিশ্চিন্ত হয়ে মেয়ের সেবা নিচ্ছ, তার প্রতিও তো একটা কর্তব্য আছে। সে কথাটা মনে পড়ে না একবারও! এই ভাবে তোমার সেবা ক'রে বুড়ো হয়ে যাবে যখন—তা কে দেখবে? তাছাড়া যৌবনের ধর্ম তো একটা আছে! বিয়ের চেষ্টা করো এবারে!'

যেন মনে মনে একটা ধাক্কা খায় কঙ্কর।

সত্যিই তো! এ কথাটা তো একবারও ওর মনে আসে নি! মেয়ে তাকে ভালবাসে, সেইজন্যেই তাকে ছেড়ে যায় নি, সংসারটাও চালাচ্ছে, সুশৃঙ্খলে—এই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিল, অবস্থাটা উপভোগ করেছে। ওরও যে কিছু করণীয় আছে, যে কথাটা বহু পূর্বেই মনে পড়া উচিত ছিল—সে কথাটা ভাবে নি একবারও।

সে খানিকটা ফ্যালফ্যাল ক'রে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'তা হ্যাঁ, তা বটে। করা উচিত ছিল কিছু। কিন্তু আমি তো—তুমি তো জানই, আমি তো

এসব পারি না ; কি ক'রে কী করতে হবে তাও তো জানি না।'

'কোন্ দিনই বা কী জানলে।' কুহেলি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'কেবল নিতেই শিখেছিলে, নিতে গেলে দিতেও হয় এ তো সহজ কথা, প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের।'

তার পর বলে, 'দয়া ক'রে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দাও তো আপাতত। বক্স নম্বর দিয়ো। অন্য বিজ্ঞাপন পাঁচটা পড়ে দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে কিভাবে লিখতে হয়।'

একথা সেকথার পর ওঠবার সময় মাথাটাথা চুলকে কঙ্কর বলে, 'তা তুমিই একটা লিখে পাঠিয়ে দাও না, লক্ষ্মীটি, খোকা তো আপিসে যায়—যাওয়া আসার পথে দিয়ে আসতে পারবে। টাকাটা বরং আমি রেখে যাবো একদিন। কখনও তো এসব করি নি, লক্ষ্যও করি না। আমার মাথায় ঢুকবে না।'

বিজ্ঞাপন বেরোবার দিন দশেক পরে কুহেলি আপিস থেকে কঙ্করের আপিসে ফোন করে—এই প্রথম—'বিশেষ দরকার, আপিসের পরে অবশ্য আসবে।'

ছুটতে ছুটতেই যায় বলতে গেলে।

বহুদিন পরে উদ্বেগ বোধ করে। কারও জন্যে উদ্বেগ বোধ করা বোধ হয় এই প্রথম।

অসুখ? না, তাহলে আপিসে যাবে কেন?

না কি ছেলেদের কারও কিছু হয়েছে? তাহলে তো বলতই।

আপিসে কিছু? কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে ওকে ডাকবে কেন?

স্ত্রীর বাড়ি (তা ছাড়া আর কী বলা যায়?) পেঁৗছে কিছুটা আশ্বস্ত হ'ল। তেমনি একটু আশ্চর্যও হ'ল।

যে কখনও বিশেষ কিছু লক্ষ্য করে না, আজ তারও চোখে পড়ল, কুহেলির একটা অপ্রতিভ ভাব, চলতি ভাষায় অপ্রস্তুত বললেই ঠিক বোঝা যাবে, সেই সঙ্গে একটু বিষণ্ণও।

'কী ব্যাপার? জরুরী তলব।…তবু তুমি নিজে থেকে ডাকলে।' একটু হাসার চেষ্টা করে কঙ্কর।

কুহেলি এসব উপক্রমণিকার ধার দিয়েও যায় না। একেবারেই কাজের কথায় আসে।

'দ্যাখো, এভাবে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না।'

'তা—তার মানে? এভাবে মানে—কী ভাবে?' বিহ্বল ভাবে প্রশ্ন করে কঙ্কর।

'কথাটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। অভ্যস্ত নই তো, সংসারের সঙ্গে জড়িত নই কোনকালেই। শাশুড়ী-ননদ-জা, এসব তো দেখলুমই না বলতে গেলে—তাই কথাটা মনে আসে নি, সংসারী লোকের মনের গতি কোন্ পথে যায়। ছেলেপক্ষের দোষ দিচ্ছি না, এ স্বাভাবিক।'

তবু বুঝতে পারে না কঙ্কর। চেয়েই থাকে স্ত্রীর মুখের দিকে।

আরও আশ্চর্য হয়ে যায় ওর দ্বিধা আর কণ্ঠস্বরের জড়তায়। কুহেলির পক্ষে এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

'না মানে—বিয়ের কথা উঠলেই বাপের প্রশ্ন ওঠে, আমি মা চিঠি লিখছি—বাবা কেন লিখছেন না! আমরা আলাদা বাস করি, একথা শোনার পর আর কেউ চিঠির উত্তর দিচ্ছে না, যেখানে ফোন আছে—তারা নানা ওজর দিয়ে রিসিভার রেখে দিচ্ছে। কেবল একজন পরিষ্কার বললে, যার মা স্বামীর ঘর করে না, তাকে নিয়ে আসা মানেই তো খাল কেটে কুমীর ঘরে আনা!'

'তাহলে উপায়? কতকটা যন্ত্রের মতোই প্রশ্ন করে কঙ্কর। এসব কথার উদ্দেশ্য কী, সেটা বুঝতে পারে না। প্রসঙ্গ উঠলে তার বুকের মধ্যে কিরকম যেন হিমহিম ভাব বোধ করে, পা দুটো দুর্বল বোধ হয়।

'উপায় মানে—ইয়ে', আবারও সেই দ্বিধা, লজ্জা-লজ্জা ভাব, 'মেয়ের বিয়ে দিতে হলে কিছুদিন অন্তত আমাদের একত্র থাকা দরকার।'

কথাটা কোনরকমে বলে ফেলে যেন বাঁচে কুহেলি।

কঙ্করও অকূল অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটু আলো দেখতে পায় যেন। খুশি হয়ে ওঠে, হাসিও ফোটে একটু মুখে।

তারপর সেও একটু মাথা চুলকে লজ্জা-লজ্জা ভাবে বলে, 'তা কিছুদিনই বা কেন, অনেকদিন তো হ'ল—এখানে এ বাসা উঠিয়ে দিলেই তো হয়! যেমন ছিলুম আমরা—'

মাথা নামিয়ে প্রায় চুপিচুপি কুহেলি বলে, 'কিন্তু তুমি—তোমার খারাপ লাগবে না? আমাকে মাপ করতে পারবে?'

সেদিনও খুশিতে প্রায় নাচতে নাচতেই ঘরে ফিরেছিল কঙ্কর, কিন্তু বাড়িতে কাজলের মুখের দিকে চেয়ে কেমন একটু মিইয়ে গেল।

আর মিইয়ে যাবার জন্যে অকারণেই একটু রেগেও উঠল। রাগটা প্রধানত নিজের কাপুরুষতায়। স্ত্রী, তার নিজের বাড়িতে ফিরে আসবে—সে জন্যে আবার মেয়ের অনুমতি নিতে হবে নাকি! আশ্চর্য। ওর এত ভয়ই বা কী? ছোঃ! পুঁচকে মেয়ে, তার কথামতো চলতে হবে নাকি প্রত্যেক ব্যাপারে!

তবু—ঠিক তখনই বলতেও পারল না। পারল যেটা, সামান্য ত্রুটি ধরে—যা অন্য কোনদিনই নজরে পড়ে না—হরিকে বকাবকি করতে।

কাজল একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'তোমার আজ হয়েছে কী? খামোকা একটা বুড়ো মানুষকে বকাবকি করছ!'

'খামোকা আবার কী! দোষ করেছে তাই বলছি। আমার কি কোন স্বাধীনতাই নেই নাকি? নিজের বাড়িতে চোর হয়ে থাকতে হবে?'

কাজল বাপকে চেনে। বুঝল, কোন একটা কথা বলতে সাহস করছে না বলেই একজনের তাল আর একজনের ওপর এসে পড়ছে।

সে এসে হরিকে বলল, 'তুমি চুপ ক'রে যাও হরিদি, এ বকুনি ওঁর নিজেকে। কথা বাড়িও না।...'

ভরসা ক'রে কথাটা পাড়তে পাড়তে পরের দিন সকাল এসে গেল। ক্রমশ কাজলের আপিস যাবার সময়ও।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত কথাটা বলতেই হ'ল।

'তোর মা আর ভাইরা যে ফিরে আসছে রে।'

চমকে যে উঠল কাজল, সেটা ঠিক মুখের ভাবে প্রকাশ না পেলেও, উত্তর দিতে কিছু সময় নেওয়াতেই বোঝা গেল।

উত্তরও ঠিক তাকে বলা যায় না, পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কবে ?'

'কবে মানে কী ? কথাটা তো কাল হ'ল—তার পর দিন-টিন দেখে আসবে হয়ত। হয়ত এখনই বাড়ি ছাড়বে না। বড় খোকাকেও বলতে হবে, সে তো উপযুক্ত হয়েছে। তবে ঘরদোরগুলো একটু গুছিয়ে রাখিস। কলি ফেরালেও ভাল হয় একটু। কে করবে সেই সমস্যা।'

তবুও কাজল চুপ ক'রে আছে দেখে, কারণটাও খুলে বলতে গেল কঙ্কর।

কিন্তু কাজল মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ও চেষ্টাটা আপাতত বন্ধই থাক। দু-চারটে দিন সময় দাও। শুনেছি কোথায় একটা ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল হয়েছে—তবে সে বোধহয় অনেক খরচ। দেখি একটা ঘরটর দেখে উঠে যাবো। মা যদি ও ঘরটা ছেড়েই আসে, আমাকেও দিতে পারে—'

'তার মানে—তার মানে কী। এসব কী বলছিস। কী বলছিস তাই শুনি।'

কঙ্করের গলা চড়ে উঠতে থাকে ধাপে ধাপে। ওপরের বাড়িওলা গিন্নী ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আরও কে ছুটে আসে।

'চুপ করো। চেঁচিও না। মানে আর কী ? স্ত্রী না থাকায় নিশ্চয়ই তোমার অসুবিধে হচ্ছিল, কিন্তু আমারও কষ্ট কম হচ্ছিল না বাবা। আমিও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমাকে দেখার আসল লোক যখন আসছেই—আমাকে দিন কতক ছুটি দাও। আবার আরও বড় সংসারের বোঝা আমি আর বইতে পারব না।'

সে আর দাঁড়ায় না। দ্রুত বেরিয়ে চলে যায়।

তাড়াতাড়িতে যে বাইরে যাবার জুতোটা পরা হয় না, বাড়িতে পরার ছেঁড়া চটিটা পরেই বেরিয়ে পড়ে—তাও অত খেয়াল হয় না।

কাল বিকেল থেকে মেয়ের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও কঙ্কর মনে মনে একটু সুখস্বপ্নের রঙিন ছবি আঁকছিল, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনারও অন্ত ছিল না। সে ছবি প্রবল ঝড়ের মুখে এক টুকরো রঙিন মেঘের মতই কোথায় মিলিয়ে গেল।

ব্যর্থ সন্ন্যাস

দিগেশ মহারাজ যখন এখানের ভারপ্রাপ্ত হয়ে এলেন, দক্ষিণ ভারতের এই সুদূর শহরে—তখন একবারও ভাবেন নি, এখানে এত পরিচিত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হবে।

দিগেশ মহারাজ ডাক্তারী পড়েছিলেন পাটনা মেডিক্যাল কলেজে, সেখানে তাঁর য়্যানাটমীর অধ্যাপক ছিলেন ডাঃ পালিত—বাঙালী। তিনি মেধাবী ছাত্রটিকে স্নেহের চোখে দেখেছিলেন, নিজের বিষয় তো বটেই, চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত শাখাতে যাতে সর্বোচ্চ পদ পেতে পারে সেই চেষ্টাই করেছিলেন।

সেই উপলক্ষেই বাড়িতে যাতায়াত শুরু হয়েছিল। না, আপনারা যা ভাবছেন তা নয়, শিক্ষকের বাড়ি যাতায়াত শুরু হওয়া মাত্রেই গুরু-কন্যার প্রেমে পড়েছিলেন বা কন্যা প্রেমে পড়ল, তা কিছুই হয় নি। উপরন্তু, আশা ও কল্পনাতীত একটা ফলই হ'ল। ডাঃ পালিত বহুদিন ধরেই বেদান্তর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন, সেই উপলক্ষ ক'রে বহু সাধু ও সাধক সম্বন্ধে, তার মধ্যে প্রধান হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রিয় ছাত্রটিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করবেন এইটেই স্বাভাবিক। জমি বোধহয় প্রস্তুতই ছিল। ফসল ফলতেও বিলম্ব হ'ল না। পাস করার মাত্র এক বছর আর বাকী থাকতেই ছাত্র পাঠে ইতি দিয়ে সোজাসুজি গিয়ে সন্ন্যাস ও তার ভূমিকা স্বরূপ ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করলেন।

তারপর। যথার্থ অনুরাগের ফলে গুরুগৃহেও সবার প্রিয় হয়ে উঠতে বিলম্ব হ'ল না। শাস্ত্রচর্চাও অব্যাহত রইল, বরং তার আরও গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এর মধ্যে বহুদিন কেটে গেছে। পালিত মারা গেছেন। তাঁর ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, বোম্বেতে থাকে, মেয়ে কনকের বিয়ে হয়ে গেছে তাও শুনেছেন, তবে কোথায় এবং পাত্র কী করে তা আর খোঁজ করা হয় নি।

উনি যখন ছাত্র সে বহুদিনের কথা, এখন ওঁর বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, হয়ত এক আধ বছর বেশী হতে পারে।

দিগেশ মহারাজ যখনই যেখানের ভার নেন, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই এসব নিয়ম পুরাকাল থেকে চলে আসে—উনি বেদান্ত দর্শনের ওপর ক্লাস নেন। অবশ্যই ইংরেজীতে, নইলে এখানের শ্রোতারা বুঝবেন কেন। সেই উপলক্ষেই চার্জ নেবার চারদিনের দিনই রবিবার পড়ল, ক্লাসের দিন। উনি প্রস্তুতই ছিলেই। দেড়ঘণ্টা বক্তৃতার পর উঠে দাঁড়িয়েছেন, শ্রোতা তথা ভক্তের দল প্রণাম করছে, হঠাৎ একটি বাঙালী মেয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

এখানে বাঙালী, বিশেষ ক'রে মেয়েদের কণ্ঠস্বর শোনবার আশা করেন নি। বিস্মিত হয়েই তাকালেন একটু। বছর ত্রিশের মতো বয়স হবে, বিধবা, দু'তিন গাছি ক'রে চুড়ি হাতে, একটি সবুজপাড় শাড়ি। এয়োতির কোনো চিহ্ন নেই

কোথাও।

বিস্মিত হয়ে চেয়েই আছেন, মহিলা হেসে বললেন, ডাঃ পালিতকে মনে আছে আপনার? যাঁর জন্যে আপনার ডাক্তারী পড়া হ'ল না। আমি তাঁর মেয়ে, কনক। অতঃপর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে দেরি হবে কেন! ওর কথাও সব শুনলেন।

বিয়ে হয়েছিল এখানেই, ওঁরা নাকি চার পুরুষে এদেশের অধিবাসী। এখানে ওঁদের সম্পত্তি বিস্তর। পাত্র শিক্ষক, তবে সেটা তাঁর না করলেও চলত। ভদ্রলোক, শিক্ষিত, সবদিক দিয়েই আকাঙ্ক্ষিত স্বামী। কিন্তু বিয়ের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে একটি দু'বছরের ছেলেকে রেখে হঠাৎই মারা গেলেন।

সেই শোকে শ্বশুর পাগলের মতো হয়ে উঠলেন। বধূর দুই হাত ধরে বললেন, 'তুমি এখান ছেড়ে যেও না মা, বিপুল সম্পত্তি, জ্ঞাতিরা টেঁকে আছে—এই শিশুরই সব, তুমি তার সম্পত্তি না দেখলে সব কেড়ে নেবে।

সেইজন্যেই কোথাও যেতে পারে নি কনক। শেষ মাস চারেকের মধ্যেই শ্বশুরের সেরিব্রাল স্ট্রোক হ'ল। তারপর তিন বছর প্রায় অনড়, কথাও পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছিল। সে অবস্থায় তাঁকে ফেলে কোথায় যাবে সে! যাবেই বা কোথায়? ছেলের বিষয় সে যদি রক্ষা না করে তো সব যাবে। এই জন্যেই আরো। তবে ছেলেটা ভাল হয়েছে, মিশনারী স্কুলে দিয়েছে, ভালই পড়াশুনো করছে।

প্রথম যেদিন নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াবার প্রস্তাব করেছিল কনক, মহারাজ সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বলেছিলেন, 'যদি কিছু রেঁধে খাওয়াতে চাও, বাঙালী রান্না, এই চারজন আছি আমরা সকলের মতোই রেঁধে পাঠিয়ে দিও।'

হয়ত দুঃখিত হয়েছিল কনক কিন্তু কিছু বলে নি। পর পর তিন চার দিনই, কিছু কিছু রেঁধে পাঠিয়েছিল। এখানে মঠে মাছ হয় না, সেজন্যে দিন দুই মাছও রেঁধে পাঠিয়েছে।

এরপর কনক একদিন প্রস্তাব করল, 'বাবার বইগুলো আমার কাছে আছে, পড়ার চেষ্টা করি, ঠিক বুঝতে পারি না। আপনি যদি এক-আধ দিন অবসর সময়ে এসে আমাকে একটু গাইড করেন তো আপনার গুরু-ঋণটা অন্তত শেষ হয়।'

প্রথমেই বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন মহারাজ, কিন্তু এই শেষের কথাটায় কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়লেন। সত্যিই ডাঃ পালিত তাঁকে অপত্যস্নেহে লালন করেছেন, এ পথও তিনিই দেখিয়েছেন।

একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, 'চেষ্টা করে দেখব। তবে কথা দিতে পাচ্ছি না, নিয়মিতও না।'

কনক তাতেই কৃতার্থ হ'ল।

কাজের ফাঁকে ফাঁকেই অবশ্য আসতেন কিন্তু দু'চার দিন একটু নাড়াচাড়া ক'রে দেখলেন পণ্ডিত বাবা একেবারে অজ্ঞ রেখে যান নি। মোটামুটি ভাল পড়াশুনো করেছে। বইও বিস্তর সব ঝেড়ে মুছে ঠিক ক'রে রেখেছে, এর কোন কোন

বই ওঁরও পড়া হয়ে ওঠে নি।

ফলে একটু আধটু দেরি হতে লাগল বাড়ি ফিরতে। আগ্রহী ছাত্রী, পাঠে যত্ন আছে, যা পড়ে মনে রাখে, এমন ছাত্রীকে কোন্ শিক্ষক না পছন্দ করবেন?

এর মধ্যে দেরি হয়ে গেছে, সেখানে তো সেই ঠাণ্ডা ভাত, আমার সব করা আছে, একটু খেয়ে যান বলে একদিন চেপে ধরল কনক। একটু ইতস্তত ক'রে রাজী হয়েও গেলেন। তারপর অবশ্য আবিষ্কার করলেন অনেক কিছুই রান্না আছে। ভাল মিষ্টি খাবার, তাও বাড়িতে করা, শুধু লুচি ছ'খানা ভেজেছিল।

তারপর অবশ্য দু'একদিন বাধা দিয়েছিলেন। তারপর একদিন খেতে হ'ল। ক্রমশ পড়া খাওয়া ও গল্পে ফিরতে অনেক দেরি হতে লাগল। আরও কিছুদিন পরে খাওয়াটা প্রায় নিত্য হয়ে উঠল। বিলম্বও সেই মতো।

এর মধ্যে একদিন রাত আটটার পর প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া শুরু হ'ল। রাত একটা যখন বেজে গেল তখন আর ফেরার চেষ্টা করলেন না।

প্রত্যূষেই মঠে ফিরলেন। অকারণেই বর্ষার প্লাবন্যর কৈফিয়ৎও দিলেন একটা, বিরক্তির ভাবও দেখালেন যদিও বাকী সাধুরা কেউ একটি কথাও বললেন না।

এ নীরবতার অর্থটা বোঝা গেল দিনচারেক পরে। টেলিগ্রাম ক'রে হেড অফিস থেকে জানানো হয়েছে, যে সাধু হিসেবপত্র দেখেন, তাঁকেই সব চার্জ বুঝিয়ে যেন দিগেশ মহারাজ মঠ ত্যাগ করেন, এ সঙ্ঘেও না আর কোন দিন প্রবেশের চেষ্টা করেন।

টেলিগ্রামটা হাতে করে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন। ঘাড় না তুলেও বুঝতে পারলেন সবাই বাঁকা চোখে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। সাধুদের মুখভাব নির্বিকার কিন্তু মনোভাব জানতে বাকী নেই।

খানিক পরে হঠাৎই উঠে পড়লেন। অল্প দু'চারখানা বহির্বাস ও জামা, দুটো টুপি ও ক'খানা বই একটা ব্যাগে পুরে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। চার্জ বোঝাবার কিছু নেই, হিসেব ও ক্যাশ অন্য সাধুর হাতে। তাকে বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে। তারপর কি হ'ল, কোন্ ট্রেনে কোথায় গেলেন, টাকাপয়সা কে দিল, কোথায় থাকবেন, কী মতলব কিছুই বোঝা গেল না।

এঁরা হেড অপিসে রিপোর্ট ক'রে দিলেন সেই দিনই।

দিন পাঁচ-ছয় কনকও কোন খবর পায়নি। ভেবেছিলেন সেদিন রাত্রে থাকার জন্য বা থাকতে বাধ্য করার জন্য বোধহয় লজ্জিত এবং রুষ্টও হয়েছেন। উনি সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই যেতে চেয়েছিলেন, তাই থাকতে না দিলে হ'ত।

তারপর লোক পাঠিয়ে খবর নিতে গিয়ে শুনলেন যে তিনি আর ও মঠে নেই, কোথায় আছেন বা গেছেন কেউ জানে না।

কনক দীর্ঘকাল এখানে আছে, ধনী গৃহিণী, বাকী খবর বার করতে বেশি দেরি লাগল না।

সে একেবারে রণচণ্ডী মূর্তিতে আশ্রমে গিয়ে হাজির হ'ল।

আপনারা এই সাধু হয়েছেন! এত ছোট মন আপনাদের! সেদিন সেই প্রচণ্ড ঝড়-জলের মধ্যে তাঁকে ছেড়ে দিলে ভাল হ'ত? মহারাজ আমার বাবার ছাত্র। তাঁর কাছেই অদ্বৈত বেদান্ত শিখেছেন। আমি বিধবা হয়েছি, একা ছেলে নিয়ে থাকি, সম্পত্তি আগলাতে দিন যায়, কোথাও যেতে পারি না। আমি চেয়েছিলুম ওঁর কাছে একটু পাঠ নিই। তিনিও না বলতে পারেন নি। চলুন আমার সঙ্গে সেই সব বইয়ের ওপর তাঁর নিজের লেখা নোট দেখবেন। ছিঃ ছিঃ! এত ছোট মন আপনাদের! ছিঃ!

মহারাজদের তরফ থেকে অনেক কিছুই বলবার ছিল, কিন্তু রুদ্রমূর্তির সামনে আমতা আমতা করা ছাড়া কিছু বলতে পারলেন না। আমাদের বলছেন কেন? কর্তৃপক্ষ যা বলবেন তাই তো হবে। ইত্যাদি—

কনক ওঁদের সহজে ছাড়ল না। সোজা হেড অফিসেও এল ঝগড়া করতে। তবে সে খুব সুবিধে হ'ল না। তাঁরা পরিষ্কার বললেন, ঘরের মধ্যে কে কি করছে, কতটা নির্মল আছে তা আমাদের জানা সম্ভব নয়। সেই জন্যেই কতকগুলো কড়া নিয়মকানুন ক'রে রাখতে হয়েছে। সেকথা তাঁরও জানা আছে নিশ্চয়ই, এতটা কড়াকড়ি না রাখলে প্রতিষ্ঠান রাখা সম্ভব নয়, বিশেষ সাধুদের প্রতিষ্ঠান।...

এর পর অন্য সব পথ ধরতে হ'ল।

প্রথমত কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন নামধাম না দিয়ে সংকেতেই নিজের পরিতাপ এবং ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে। ইংরেজী বাংলা তামিল ইত্যাদি সমস্ত রকম ভাষাতে।

কোন ফল হ'ল না।

শেষে পুরস্কার ঘোষণা ক'রে বক্স নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন দিল। তাও বিশেষ কাজ হ'ল না। অবশেষে হতাশ হয়েই ফিরতে হ'ল। প্রতিদিনই নিজেকে অধিকতর অপরাধী মনে করে আর চোখের জল ফেলে।

কনক সব আশা ত্যাগ করার ঠিক দু'বছর পরে হঠাৎ একটা চিঠি পেল। জড়ানো লেখা, বাঁকাচোরা হরফ, তবু মনে হ'ল মহারাজেরই লেখা। তাতে লেখা—

'অনেকদিন কাগজ কলমের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, খবরের কাগজও পড়ি না। হঠাৎ যমুনোত্রী যাওয়ার সময় এক আশ্রমে একখানা পুরনো খবরের কাগজ হাতে পড়ল। তারই পার্সোনাল কলামে একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেখলাম। এ অনুনয় ও অনুতাপ তোমারই, তা বুঝতে পারলুম। মনটা নরম হওয়ার কথা নয়, তবু তুমি অকারণে অনেক কষ্ট পাচ্ছ, আমার অন্যায়ের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে, এই ভেবেই চিঠি দিচ্ছি। এক সাধুর আশ্রয়ে আছি আপাততঃ, তাঁর সঙ্গেই যমুনোত্রী গিয়েছিলুম। অতঃপর মণিমহেশে গিয়ে মাসকতক থাকব, ঐ সাধু-বাবার সঙ্গেই। তারপর তিনি অন্যত্র চলে যাবেন, আমিও অন্য আস্তানা খুঁজব।

...এই ঠিকানা থেকে চিঠি দিচ্ছি, তুমি মিছি মিছি কষ্ট পাচ্ছ হয়তো কি ব্যস্ত হচ্ছ, এই ভেবেই চিঠি দিলুম। তুমি যে এটা পেয়েছো, সেটা জানিও। অকারণে কষ্ট না পাও আর সেই জন্যেই জানাতে বলছি। আমি বেঁচে আছি আর সাধনার মধ্যেই আছি এটা জেনে খুশি হলে তো?'

চিঠি পেয়ে উত্তর দেবার চেষ্টা করল না কনক, সোজা বাড়িঘর সংসার প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রে নিজেই চলে গেল সেই ঠিকানায়।

ওকে দেখে দিগেশ মহারাজ অবাক।

'তুমি এই কর্ম ক'রে বসলে! এমন জানলে চিঠি দিতাম না।'

'কেন, কি হয়েছে তাতে? কেন ওঁরা এই অন্যায় মিথ্যে সন্দেহ ক'রে আপনার জীবনটা নষ্ট ক'রে দেবেন? কেন, কেন?'

'শুনেছি তুমি তার শোধ তুলতে ঝগড়া করতে গিয়েছিলে!'

'গেছিই তো। কেন যাবো না! ওঁরা এ অবিচার করবেন কেন?'

মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

এর মধ্যে ওঁকে দেখে কনকের চোখে জল এসে গেছে।

'এই চেহারা হয়েছে আপনার, বৃদ্ধ শীর্ণ অসুস্থ! এই তিন-চার বছরের মধ্যে! আবার বলছেন আমি অন্যায় করেছি ঝগড়া করতে গিয়ে!'

আস্তে আস্তে মহারাজ বললেন, 'ওঁরা নিয়ম করেছেন, তা করাই উচিত। কোনো অন্যায় করেন নি। তুমি ঠিক ক'রে বুকে হাত দিয়ে বলো দিকি, এইভাবে ক্রমে ক্রমে আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলে কিনা? আমি সাবধান হতে চেষ্টা করেছি প্রথমটা বলেই তোমার এ জেদ! তাই না?'

মাথা হেঁট করতে হয় কনককে এবার।

মহারাজ আরও বলেন, 'আমিও মনে মনে বিচার করেছি, আকর্ষণ একটু আমার দিক থেকেও ছিল। হয়তো তোমার এই জ্ঞানচর্চা থেকেই আকর্ষণের শুরু, কিন্তু সেইখানেই কি থেমেছে? আর তা থামে নি বলেই তোমার এতো আকুলতা!'

আবারও কনকের চোখে জল ভরে আসে। মাথা হেঁট ক'রে বলে, 'আমি আর আপনার কাছে কখনও আসব না, জীবনে দেখাও হবে না, চিঠিও দেব না, কেবল আপনি একটি প্রার্থনা রাখুন।'

'কি বলো!' শান্ত কণ্ঠে বলেন মহারাজ।

'আমার টাকা প্রচুর, জীবনে কোনো সাধ-আহ্লাদ মেটাতে পারি নি তা দিয়ে। ছেলে বড় হয়ে হয়তো সব উড়িয়ে দেবে। আপনি যেখানে হোক, যেমন পছন্দ, একটি বেদান্তমঠ করুন, সেই টাকাটা কেবল আমার কাছ থেকে নিন, এই ভিক্ষা!'

'না না!' প্রায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন মহারাজ। 'না না, আর কোনো বন্ধনে যেতে বলো না লক্ষ্মীটি। এই যে তীর্থে তীর্থে ঘুরি, খাওয়া পরা গরম জামা সব ঠাকুর যুগিয়ে দেন, আমি বেশ আছি। আর না।'

কনকও নাছোড়বান্দা। সেও মাটিতে পড়ে মাথা ঠোকে।

শেষে মহারাজ বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে। আমাকে একটা দিন ভাববার সময় দাও। তুমি তোমার ধর্মশালায় ফিরে যাও, স্নানাহার দেখছি কিছুই হয় নি, স্থির শান্ত হও, কাল ভেবে উত্তর দেব।'

সত্যিই কনক এই ক'দিনের ধকলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সে আর একবার কথা নিয়ে অতিথিশালায় চলে গেল। মহারাজও দরজা বন্ধ ক'রে ধ্যান-জপে বসলেন।

পরের দিন উঠে মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে আসতে খুব একটা দেরি হয় নি কনকের। দ্রুত এসে দরজায় ধাক্কা দিতে দেখল ঘর খালি। সেই সাধুবাবা আছেন, পাংশুমুখে তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতে তিনি ওপরে আকাশের দিক দেখিয়ে দিলেন, 'কোথায় আছে, কোথায় যাবে তা তো জানি না বেটি, দু'দিনের সাথী, আমরা কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামাই না।'

কনক বেশ ক'দিন ধরে খুঁজল। চারিদিকে বিজ্ঞাপন দিলে, পুলিস অফিসার-দের পুরস্কার দিতে চাইল, কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারল না। যেন মানুষটা উবে গেল কনকের জীবন থেকে।

শ্বেতন

রেল লাইনের ধারে, সরকারী জমির ওপরই, কিছু খোয়া কিছু বা মাটি জুড়ে চৌকি বা ইটের ওপর কাঠ পেতে ঘর তৈরি হয়েছে—ওপরে তেরপল কি পাতা কি প্লাস্টিকের চাদর—তার মধ্যেই এক একটি পরিবারে ছয়-সাতটি—কোথাও কোথাও বা আরও বেশি প্রাণী বাস করে। দু'দিকেই এমনি বসতি। একে আপনারা কলোনী না বলতে চান না-ই বললেন। তবে আমার মনে হয় একেই কলোনী বলা উচিত। আমেরিকায় বসতি বিস্তারের সময়ও হয়ত এমনিভাবেই কলোনী গড়ে উঠেছিল।

এদের সন্তান অনেক। এদের তা প্রয়োজনও। ছেলেমেয়ে একটু বড় হলেই খাটতে লেগে যায়। বাড়ির কাজ, দোকানে কাজ, চায়ের দোকানে, বাজারওলাদের তল্পীবাহক হিসেবে—অজস্র রকমের কাজ। মাইনে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ, বয়স ও যোগ্যতা হিসেবে। একটু বড় হলে পুরুষেরা রিক্‌শা চালায় বা হাতের কাজ শেখে। মেয়েরা বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের কাজ ক'রে বেড়ায়। ক্রমশ এদেরও সন্তান হয়—নতুন সংসার পত্তন করে তারা।

এর ভেতরই এদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, রান্না, খাওয়া, সঞ্চয়, ঝগড়া কাজিয়া সব চলে আর পাঁচটা সাধারণ সংসারের মতোই। তবে কলকাতায় ফুটপাথে যারা এমনি ঘর বাঁধে আজকাল—ভিক্ষা বা চুরিতে সংসার চালায়, বাজারের ভাঙ্গা ঝুড়ি জেবলে ইট পেতে রান্না করে—তাদের চেয়ে এরা কিছু সম্ভ্রান্ত। এদের মধ্যে বিয়ে-থা হয়, ভিক্ষাবৃত্তি ও তৎসহ বেশ্যাবৃত্তি এসব প্রয়োজন হয় না—হয়ত গোপনে কিছু

হয়—তবে সে কোথায়ই বা হয় না ?

এমনিই দুটো সংসারের মধ্যে একটা জায়গায় কলি এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। খোয়ার ওপরই। পাও কেটে থাকবে, কিন্তু সেদিকে কে নজর দেয় তখন! একেবারে লাইনের ধারে এসে পড়েছে, হয়ত এখনই ট্রেন এসে পড়বে, ওকে সরানোটাই বড় প্রশ্ন।

ছুটে এল অনেকেই, কানী জবা, অসীমার মা, সত্য, কার্তিক, ভোলা।

'কিরে কিরে, কে এটা—এমন মুখথুবড়ে এসে পড়ল। কাদের মেয়ে রে!'

কার্তিক আর শোভার মা এসে তাড়াতাড়ি টেনে তুলল।

তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে, মুখখানা মিষ্টি—খুব রোগা নয়। যৌবন-লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যৌবন-সন্ধি যাকে বলে সেই কাল তার। পরপর দুটো ফ্রক পরেছে, একটা আর একটার চেয়ে বড়—তাতেই ছুটতে গিয়ে পা বেধে পড়েছে।

পোশাক তো নিজের দেহেই দুটো—তাছাড়া সঙ্গে বিরাট একটা পুঁটুলি ধোপার মোটের মতো। পুঁটুলিটা দাঁড় করিয়ে রাখলে বোধহয় ওর চেয়ে উঁচুই হবে।

প্রশ্ন চারিদিক থেকে বর্ষিত হবে এ স্বাভাবিক।

কোথায় যাচ্ছে, এখানে এসে পড়ল কিভাবে—ইত্যাদি।

তার কোন কথারই উত্তর না দিয়ে কলি শুধু বলল, 'জল, একটু জল খাওয়াবে, বুক অবধি শুকিয়ে গেছে একেবারে!'

একজন তখন পথের ধারের টিউবওয়েল থেকে সবে জল নিয়ে আসছে, সে-ই একটা কলাইয়ের গ্লাসে জল ঢেলে ওর হাতে দিলে। প্রায় এক নিঃশ্বাসে জলটা খেয়ে নিয়ে গেলাস নামিয়ে রেখেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে—'চলি, গাড়ি আসছে।' বলে পুঁটলিটা তুলে নিলে।

এরা হয়ত বাধা দিত না। সেকথা অত মনেও হয় নি কারও, এটা রান্না-খাওয়া আতান্তরের সময়—কিন্তু বাধাটা এল অন্যভাবে।

কার্তিক রিকশা চালায়, বাইশ-তেইশ বছর বয়েস। সে তেল মেখে পুকুরে নাইতে যাচ্ছিল, এগিয়ে এসে খপ ক'রে কলির হাতটা চেপে ধরল, 'এই, কোন্ বাড়ি কাজ করিস রে?'

'কাজ করি না।'

'তবে? গাড়িতে কোথায় যাবি? কোথায় থাকিস? কোথায় যাবি?'

মেয়েটা এঁকেবেঁকে কার্তিকের হাত ছাড়াবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে বললে, 'ছাড়ো, ছাড়ো। আমার মা'র খুব অসুখ—তাকেই দেখতে যাচ্ছি।'

'তার মানে মা অন্যত্তরে থাকে। তা এখানে কার বাড়িতে ছিলি বল তো—'

'অত নিকেশে তোমার দরকার কি।' কলি রুখে ওঠার চেষ্টা করে।

প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দেয় কার্তিক। কেঠো হাতের চড়, বোধহয় পাঁচ আঙুলের দাগ পড়ে যায়।

পাশ থেকে কে একজন বলে উঠল 'আহা, মারিস কেন অমন করে!'

কার্তিক বলে উঠল 'এ চোর, বুঝতে পারছ না! দুপুরের ঝোঁকে বাবুদের বাড়ির জিনিস নিয়ে পালাচ্ছে। নইলে যার মায়ের অসুখ—ট্রেনে চেপে যাবে—সে ইস্টিশানের উলটো দিকে আসবে কেন? দৌড়ে আসছিল তাই এত তেষ্টা, ঘামছে দেখছনা কুল কুল ক'রে। হোঁচট খেয়ে পড়ল দৌড়ে আসতে যেয়ে। বাবুদের বাড়ি থেকে খোঁজ করতে এলে ইস্টিশানেই আসবে, তাই উলটো দিকে এয়েছে। এখেনে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে—গাড়ি এলে ছুটে যেয়ে ধরবে। ঘাঘী পাকা মেয়ে!'

বেগতিক দেখে কলি আচমকা এক ঝটকায় কার্তিকের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পুঁটুলি ফেলেই দৌড় দিল।

কিন্তু কার্তিকের ভাই শম্ভু সেই সময় বেরিয়েছে ঘর থেকে—সেও চান করতে যাবে। একনজরে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে দৌড়ে এসে ধরে ফেলল। ততক্ষণে কার্তিকও এসে গেছে—সে আর এক চড় কষিয়ে বললে, 'বটে, আমাদের সঙ্গে চালাকি! এই শম্ভো—ঐ দড়িগাছটা নে আয় তো, পিছমোড়া ক'রে বাঁধ ওকে এই ইলেক-ট্রিকের খুঁটির সঙ্গে, তারপর রাজীকে বল পুলিসে ফোন ক'রে দিতে। শংকুবাবুর বাড়ি ফোন আছে। সে বইটই লেখে, পুলিস তাকে খাতির করে।'

তবুও ঘাড় বাঁকিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা, কিন্তু সত্যিই যখন শম্ভু একগাছা ছাগল বাঁধা দড়ি এনে ওর হাত দুটো চেপে ধরে পিছনে আনল, তখন ভেঙ্গে পড়ল।

এর পর সব কথাই জানা গেল।

লাইনের ওপারে কিছুদূরে গেলেই যে বদ্যিপাড়া ওখানে মণিশংকরবাবুদের বাড়ি কাজ করে। বাবু কি সব বইটই লেখে—আবার কোথায় যেন মাস্টারীও করে। ছোট সংসার, বাবু, স্ত্রী আর একটা পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে।

মেয়েটার নাম নাকি কল্যাণী। সবাই ডাকে কলি বলে। বাড়ি এখান থেকে অনেক দূর। শিয়ালদায় গাড়ি বদল ক'রে যেতে হয় মধ্যমগ্রাম, সেখান থেকে বাসে কুড়ি মাইল। মা আছে, বাবা আছে। বাবা কিছু করে না। দাদাও আছে একটা। সে মার খ্যাচকানিতেই বাড়ি থেকে চলে গেছে। দত্তপুকুরে 'রেস্‌কো' চালায়, সেখানে নাকি একটা বেও করেছে। যদিও মোটে তার যোল-সতেরো বছর বয়েস।

মা পাড়ায় খাটে। নানা ধরনের কাজ। কিন্তু তাতে সংসার চলে না। ওকে আর ওর বোন এমন কি ছোট্ট ভাইটাকে সুদ্ধ কাজ ধরিয়ে দিয়েছে। তাই কি বাড়ির কাছাকাছি? ওর পরের বোন থাকে দমদমে। ছোট্ট ভাইটা হাওড়ায়। যেখানে দু-টাকা বেশী মাইনে মেলে সেখানেই মা পাঠাবে, কত দূরে কি কাজ তা ভাববে না। আট-ন' বছরের ভাই, তারা বড় বড় বালতি ক'রে জল তোলাত, কোমর ঘাড় ব্যথা করে, কাঁদে। একবার পালিয়ে চলে এসেছিল, মা বাবা মিলে বেদম মারতে মারতে আবার দিয়ে এসেছে।

হ্যাঁ, ঐ ওদের নাকি ঐ কোথায় বাঙাল দেশের দিকে ঘর ছেল। তা সে-সব ওরা জানে না। সে ওদের জন্মের আগের কথা। বাবা করে না কিছু—তাই বলে অসুখ-বিসুখ কিছু না, আসলে কুঁড়ে, আলসে। বসে বসে তামুক খায় আর ছেলেমেয়েদের ঠ্যাঙায়। পয়সা হাতে পেলে মদও খায়। মাকেও ঠেঙায় মধ্যে মধ্যে।

অনেক দিন পরে মণিবাবুদের এখেনে ভাল কাজ পেয়েছেল। অল্প লোক, অল্প কাজ। রাঁধতে হয় না। হ্যাঁ, রাঁধতেও সে জানে। ভাল রাঁধে। সবাই খেয়ে সুখ্যেত করে। এদের এখেনে গিন্নীই রাঁধে। ওকেও নিজেদের সমান খেতে দেয়। তিন-চারবার চা দেয়। টি ভি আছে, ঘরে বসে দিব্যি সিনেমা দ্যাখো, কেউ বলবার নেই।

কিন্তু মেয়ের এত সুখ মুখপোড়া মা'র সহ্যি হ'ল না। ব্যামোর ছুতো ক'রে ডেকে পাঠিয়ে বললে, 'তোমার আর ওখেনে কাজ করতে হবে না। মাসে প'য়ত্রিশ টাকা মাইনে আজকাল শুধু হাত নাড়লে পাওয়া যায়। আমি দমদমে এক পাঞ্জাবী বাড়ি কাজ ঠিক করেছি। তারা একশো টাকা মাইনে দেবে। তুমি কালই তোমার কাপড়-জামা নিয়ে চলে এসো। আমি গিয়ে রেখে আসব।'

একশো টাকা মাইনে কেউ এত সহজে দেয় না। কলির এই বয়সেই এটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে মাকে জেরা ক'রে জানল, রান্না, বাসনমাজা, ঘরদোর সাফ করা আর ডাঁই ডাঁই কাপড় কাচা। এর আগে যেখানে কাজ করত তার পাশেই পাঞ্জাবী বাড়ি ছিল, কলি নিজে দেখেছে। এইটুকু একটা ছেলে তিন বালতি কাপড় কাচত রোজ। এটা ওদের বাতিক। রান্না অবশ্য এমন কিছু নয়—রুটি ভাত আর একটা সবজি কি মাংস। ওরা আবার শুয়োরের মাংস খায়। খোসাসুদ্ধ কলাইয়ের ডালে মাংস দিয়ে একটা কি তৈরী করে—বলে তড়খা। এক দিন রাঁধলে তিন দিন চলে। কিন্তু তেমনি চোদ্দবার চা করতে হয়। চায়ের সঙ্গে পরোটা। দুধ জ্বাল। কাজ নেই কি। আরও শুনল যে বাড়িতে ওর কাজ ঠিক হয়েছে, সে বাড়ির ভেতরে জল যায় না। রাস্তার কল থেকে সব জল তুলতে হয়। একটা ভারী শুধু এক ড্রাম জল দিয়ে যায়—বাকী সব ওকেই তুলতে হবে।

ও বলতে গিছল, এত কাজ আমি করব কি করে?

মা খিঁচিয়ে উঠেছিল, 'করব কি করে ন্যাকা। কচি খুকী একেবারে। দেশে-ঘাটে হলে য়্যাদ্দিনে কোলে পোলা এসে যেত—তাই নিয়ে ধানসেদ্ধ করতে ধান ভানতে হ'ত। আমার এখন টাকার দরকার। চালে অন্তত দুখানা টিন ধরাতে না পারলে সামনের বছর বর্ষায় মাথা গুঁজে থাকা যাবে না।'

'কিন্তু আমার পুজোর পোশাক। বৌদি বলেছে ভাল ফ্রক দেবে একটা। এই দুটো মাস যাক না মা।

'না না। ভাল ফ্রক পরতে হবে না আর। যাকে খেটে খেতে হবে, তার আবার অতশত শৌখিতে কিসের। যাবি কোন্ ছেরাদ্দবাড়ি সে ফ্রক পরে শুনি।'

আরও আপত্তি করতে মা তার ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়ে ছিল। দিয়েছিল বেশ ভাল করেই

ঘাকতক। পিঠের জামা তুলে পিঠে কালসিটের দাগ দেখিয়েছে কলি।

তাতেই এই কাজ করেছে সে।

এখানে এসে বৌদিকে বলেছিল, 'আর কুড়িটা দিন যদি কাজ ক'রে যাই, ভাল ফ্রকটা দেবে তো?'

বৌদি বলেছে, 'তা কেন দেব, বা রে! এই পুজোর মুখ, এখন লোকও পাওয়া যাবে না, কেউ পুরনো কাজ ছেড়ে আসতে চাইবে? এলেও, সেও তখন নতুন জামা চাইবে। না না, তার চেয়ে তুমি মাইনে মিটিয়ে নিয়ে চলে যাও।'

তখনই এই মতলবটা মাথায় এসে গিয়েছিল কলির।

সে অত সহজে যাবে না। একটা ভাল ফ্রকের দাম এ বাড়ি থেকে আদায় ক'রে তবে যাবে।

তাই পরের দিন বৌদি যখন মাইনে মিটিয়ে দিতে গেল, তখন সে নেয় নি। বলেছিল, 'না বৌদি, আমি এখন যাবো না। পাঞ্জাবীর বাড়ির বেস্তর কাজ—আমি অত পারব না। আবার শুনেছি, না করলে মারধোর করে। আমি থেকেই যাই, কী আর করবে মা, এখেনে তো আর আসতে পারবে না। সে, যে আমাকে দিয়েছিল, সে এখন কটকে না কোথায় চলে গেছে!'

আজ সেই মতোই কাজ করেছে। অনেক জামাকাপড় বাইরে ছিল। কেচে দেওয়া হয়েছে—সেও ভাল ভাল জিনিস। ছেলেকে খাইয়ে বৌদি বাথরুমে ঢুকেছে—সেই ফাঁকে সব টেনেটুনে নিয়ে পুঁটুলি বেঁধে—সামনে টেবিলে পঁচিশটা টাকা ছিল—তাও নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দশ মিনিটের মধ্যে। তাতেই এমন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তার, আর দৌড়ে এসেছে এতটা।

হ্যাঁ, এদিকে বেঁকে এসেছিল সে ইচ্ছে করেই। যদি ট্রেন আসতে দেরি হয়, বৌদি খুঁজতে আসে।

পুঁটুলি খুলে দেখা গেল দুটো প্যান্ট, দুটো শার্ট, একটা পাজামা, ছেলের কতকগুলো ভাল ভাল জামা ইজের। একটা ছোট তোয়ালে, দুখানা ভাল শাড়ি, সিল্কের জামা, আরও কত কি। এ ছাড়া পাওয়া গেল একত্রিশটা টাকা।

ততক্ষণে মণিবাবুর স্ত্রী পাড়ার দু'চারজনকে খবর দিয়েছেন। জটলা শুরু হয়েছে, কাজ কিছু হয় নি তখনও।

ট্রেন একটা গেছে এই মাত্র—তাতেই যে সে পালিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন ওঁরা কি করবেন? পুলিসে খবর দেবেন, না আগে মণিবাবুর স্কুলে ফোন করবেন?

এই সময় কার্তিক আর শম্ভু মেয়েটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল।

আনন্দিত হলেন যত বৌদি, এইটুকু মেয়ের এই সাহসে বিস্মিত হলেন তার চেয়ে বেশি। খুব খানিকটা বকাঝকাও করলেন। তার মধ্যেই এক ফাঁকে চিরন্তন

জননী কথা কয়ে উঠল, 'মুখপুড়ী ভাতও খায় নি। অন্যদিন ওকে খেতে দিয়ে আমি নাইতে যাই। আজ এইজন্যেই রাজি হ'ল না।'

চুরির মাল সব বুঝে পেয়ে ওর কাপড় জামা ওকে ফিরিয়ে দিলেন। টাকাও আর নিলেন না। বললেন, 'ওটা ওর মাইনের চেয়ে বেশি অবশ্য, তবে যাক।'

এবার পাড়ার লোক একজন বললেন, 'ওকে পুলিশে দাও।'

কার্তিক বললে, 'মেসোমশাই (মেসোমশাই বলে বেশীর ভাগ ছোকরারা পাড়ায়—কাকা কি পিসেমশাই নয় কেন?), এই মেয়েকে পুলিসের হাতে দিলে ওর কি হাল হবে বুঝতে পারছেন না। আর কি ওর কোন পাত্তা থাকবে? না না, আমি খেয়ে নিয়ে ওকেও দুটো ভাত খাইয়ে একটা ট্রেনে তুলে দেব। একেবারে নষ্ট হতে দেওয়া ভাল না।'

উপস্থিত সকলেই কার্তিকের বিচার-বিবেচনা, দৃষ্টি ও সৎ বুদ্ধির প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন।

নিজের ঘরের কাছে এসে কার্তিক বললে, 'মা, এটাকে দুটো খেতে দে, এবার আমি চানটা সেরে নিই।'

কলি ব্যাকুলভাবে বলে, 'না, না, আমাকে ছেড়ে দাও, এখুনি গাড়ি আছে আমি চলে যাই।'

'থাম!' খিঁচিয়ে ওঠে কার্তিক, 'ওখানে শংকুবাবুকে বলা হয়েছে, তিনি পুলিসে খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন। এতক্ষণে সব স্টেশনের পুলিসকে জানানো হয়েছে। তোকে ধরে বাড়ি পেঁছৈ দেবার নাম করে কোথায় নে গিয়ে ফেলবে ঠিক আছে? এ জন্মে আর মাকে দেখতেই পাবি না। দেখি আমি যদি কিছু করতে পারি, কোন বাসে-টাসে—'

পুলিস! কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে!

এবার ডাক ছেড়েই কেঁদে ফেলল। কার্তিকের মা অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে টেনে ভাতের সামনে বসাল। মোটা মোটা শক্ত ভাত, জলের মতো ডাল, আর একটা শাকের তরকারি। এমন খাওয়া ওরা খায় নি কখনও। এখন তো পরের বাড়ি ভাল খায়—নিজের বাড়িতেও মা এর চেয়ে ভাল খাওয়াত।

তবু, পেটের জ্বালাও বড় জ্বালা। কোনমতে দু-চার গ্রাস খেতেই হ'ল।

কার্তিক খাওয়া-দাওয়া সেরে টেরি বাগিয়ে শার্ট আর একটা পুরনো প্যান্ট পরে তৈরী হয়ে নিল।

'কোথা যাচ্ছিস, বিকেলে গাড়ি বার করবি না?'

মা প্রশ্ন করে।

'দাঁড়াও, এর ছেরাদ্দ আগে মেটাই। ভালো এক আপদ ঘাড়ে চাপল!'

কলিকেও এক ধমক দিয়ে উঠল, 'নে নে, খর খর চল। আর নিড়বিড় করতে হবে না।'

কলি আর কি নেবে? এখন তার অতি সংক্ষিপ্ত জামা-কাপড়ের পুঁটুলিটা

তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ওর পিছু পিছু চলতে লাগল।

কার্তিক ওদের কলোনীর পিছন দিকটা ধরল।

এ জায়গাটা পাড়ার অধিকাংশ বাড়িরও পিছন দিক—কারণ তারপর রাস্তা, সকলেই রাস্তামুখো বাড়ি করে। জঞ্জাল ফেলার জায়গা এটা তাদের। তারই মধ্যে দিয়ে সাবধানে পা বাঁচিয়ে চলতে লাগল।

কলি বলে উঠল, 'এদিকে কোথায় যাচ্ছ ? এ তো রাস্তা নয় !'

'কোথায় যাচ্ছি সে কৈফেৎ তোমাকে দিতে হবে নাকি ! চল তাহলে সোজা ইস্টিশানেই যাই, পুলিসের জিম্মে করে দিয়ে আসি।'

আবারও কাঠ হয়ে যায় কলি। নিঃশব্দে ওর পিছু পিছু হাঁটতে থাকে।

খানিকটা গিয়ে ঝাঁপ ফেলা একটা দোকানঘরের সামনে থামল কার্তিক, পকেট থেকে চাবি বার করল। দোর খুলতে প্রথমেই নাকে এল বন্ধ ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ —সে-সঙ্গে আর একটা যেন চেনা গন্ধ—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল—মদের।

দেখল কলি, অনেক কি-সব ডেয়ো-ঢাকনা আছে ঘরে। কিছু বোতলও সাজানো আছে ছেঁড়া কাপড় চাপা। বোধহয় এখানে চোরাই মদের কারবার হয়।

এই বয়েসেই তিন-চার বাড়ি কাজ ক'রে অনেক শিখেছে কলি, অনেক বুঝেছে।

এর মধ্যেই একটা পুরনো তক্তপোশ, তাতে কার একটা ময়লা বিছানাও পড়ে।

কার্তিক আর দেরি করল না। বললে, 'নি ঢোক, ঐ চৌকিটায় বসে থাক, দেখে আসি এদিকে কোন পুলিস-টুলিস আছে কিনা।'

কলি এক পা পিছিয়ে বললে, 'না, আমি ওখানে ঢুকব না, তুমি আমাকে পুলিসের হাতেই দাও। যা হবার হবে। আমি ইস্টিশানেই যাচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে কলি কিছু বোঝার বা সতর্ক হবার আগেই একেবারে ওর গলা টিপে ধরল কার্তিক, প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে ঘরের চৌকিটার ওপর একরকম আছড়ে ফেলল।

প্রথম যখন একটু হুঁশ হ'ল কলির, তখন অত কিছু বোঝে নি। তারপর আর একটু সচেতন হয়ে উঠতে মনে হ'ল কারা যেন কথা কইছে।

আরও পরে বুঝল—দুজনে কথা কইছে। একজন কার্তিক আর একজন অন্য লোক।

অল্প বয়স, দৈহিক যন্ত্রণা বা ব্যথা যতই হোক, সক্রিয় হয়ে উঠতে দেরি হয় না। সে উঠে বসল চৌকির ওপর।

ঘর তেমনিই অন্ধকার, ঘরে ঢুকে যখন কার্তিক দরজা বন্ধ করে তখনও যেমন হয়েছিল। জানলা নেই কোথাও, হাওয়া কি আলো আসার কোন পথ নেই। সেই জন্যেই জামাটামা ঘামে এমন গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে।

এবার ওদের কথা আরও স্পষ্ট শুনতে পেল।

কার্তিক বলছে, 'আজ্ঞাইশো, না না, কী বলছ। যাঃ, তুমি ঠাট্টা করছ ! তুমি

একে বেচে পাঁচ-সাত হাজার বাগাবে আর আমি হাতের কাছে এনে যুগিয়ে দিলুম —মোটে আড়াই। অন্তত পাঁচ করো।'

'উঁহু, ওর এক পয়সা বেশি নয়। তুই তো মেয়েটাকে আলটপকা পেয়ে গেছিস, ঘরে বসে বলতে গেলে টাকা পাচ্ছিস। আমার ঝুঁকি কত বল দিকি। এখান থেকে বার করা—গাড়িতে নিয়ে যাওয়া—সেই অত দূরে পেঁছানো চাট্টি-খানি কথা নাকি। পথে পথে পুলিস, ঘুষই দিতে হবে কত। গাড়িভাড়া, লোকের খরচা—তাও পাঁচই যে পাবো কে তোকে বললে।...ধরা পড়ি তো সাতটি বছর জেল।'

'নিদেন তিন করো।'

'না। যা বলেছি তাই।'

দরজার কুলুপ খোলার শব্দ হ'ল। আলোও এসে পড়ল এক ঝলক—প্রায়-সন্ধ্যার লাল আলো।

কার্তিক আর একটা মোটা গোছের লুঙ্গি পরা লোক।

কলি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, 'ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে বেচে দিও না। আমার মা'র যে বড্ড অসুখ।'

'কে বলছে তোমাকে বেচে দেব।' মোলায়েম গলায় বলে সেই মোটা লোকটা। 'বেশ তো, তোমার মাকে না হয় বলে তাকে টাকা দিয়েই নিয়ে যাবো, সে তো আমার আরও সুবিধে।'

তারপরই গায়ে হাত দিয়ে বলে, 'এ কি, এর তো বেশ জ্বর। এই কেতো, ধর তো—একটা সুঁই দিয়ে দিই।'

পালাবার জন্য ছটফট করবার চেষ্টা করল বৈকি কলি, কার্তিককে কামড়ে দেবারও চেষ্টা করল, কিন্তু কার্তিক তখন তার মুখে রুমাল পুরে দিয়ে বুকে চেপে বসেছে—আর কিছুই করার ক্ষমতা রইল না।

মোটা লোকটা তার অভ্যস্ত সুনিপুণ হাতে অতি দ্রুত ইঞ্জেকশন-পর্ব সেরে নিল।

আরও মিনিট তিনেক, তারপরই সব কেমন আচ্ছন্ন হয়ে এল। কষ্ট দুঃখ কিছু আর মনে রইল না কলির। সব একাকার করা একটা অন্ধকার শুধু।

নবীন ও প্রাচীন

মহেশ সেন উইল করেন মৃত্যুর মাত্র মাস-খানেক আগে। তখন তাঁর স্ত্রী লীলা সেনের মনের ও দেহের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। স্বামী দীর্ঘদিন শয্যাগত, ইদানীং তিনি চোখেও দেখতে পাচ্ছিলেন না। এই অবস্থায়, মৃত্যু আসন্ন দেখেই উইল করছেন। কাজেই লীলা পাশে বসে থাকলেও কি লেখা হচ্ছে তা দেখার

অবস্থা ছিল না, দু চোখ চোখের জলে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে তখন। চুয়াল্লিশ বছরের দাম্পত্যজীবন, মহেশ লীলার চেয়ে বয়সে অনেকটা বড় হলেও লীলা সুখী ছিলেন, দুজনের মনে কখনও চিড় খায় নি। মহেশ তাঁর চাকরি ও পরবর্তী জীবনে ব্যবসা নিয়ে থেকেছেন—সংসারের দিকে কখনও তাকান নি। স্ত্রীই সেখানে সর্বময়ী কর্ত্রী। মহেশ তাতে নিশ্চিন্ত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। দুজনেরই ভালবাসা অমলিন ছিল শেষ পর্যন্ত।

কেন উইল করছেন—সে প্রশ্ন মনের মধ্যে ছিল নিশ্চয়ই। একটি মাত্র মেয়ে—তাকে শিক্ষিত সুদর্শন স্বামীর হাতে দিয়েছেন, এ সবই তো তারা পাবে, তবে আবার উইল কেন? বিস্মিত হলেও প্রশ্ন করার অবসর ছিল না, মনেরও সে অবস্থা নয়। তবে উত্তর পেয়েছিলেন উইল করার সময়ই। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলেও কানে শুনতে বাধা ছিল না। স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তিই তাঁর কন্যা পাবে, স্ত্রী লীলার জীবন-স্বত্ব মাত্র। দান বা বিক্রয় করতে পারবেন না। ব্যবসা যদি জামাই চালাতে চান তো চালাবেন—কেবল তাঁর নতুন কেনা লেক টাউনের ছোট বাড়িটা পাবে তাঁর ছোট ভাইয়ের ছেলে অশোক; উইলের প্রোবেট নেওয়া বা অন্য ট্যাক্স প্রভৃতি তাঁর সম্পত্তি বা নগদ টাকা থেকে দেওয়া হবে। সে অবস্থা অশোকের নয়, সুতরাং তার ওপর যেন এ দায় চাপানো না হয়। স্ত্রী যেমন সম্পত্তি দান বিক্রয় করতে পারবেন না, তেমনি তাঁর জীবদ্দশায় বসতবাড়ি, পুরীর বাড়ি বিক্রী করা যাবে না, তাঁদের যুক্ত নামে যে সব শেয়ার কেনা আছে, তাও না। লীলার নামে যে নগদ টাকা রইল তা তাঁরই—ইচ্ছামতো খরচ করতে পারবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

উইল লিখে নিচ্ছিলেন জামাইয়ের বন্ধু উকীল, সই মহেশ আন্দাজে করলেন, সেজন্যে টিপ নেওয়াও হ'ল, এবং প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁর সঙ্গে স্ত্রী লীলারও সই রইল—পাছে সই মিলছে না বলে কোন বিতর্ক বাধে। রেজিস্ট্রারকে বিশেষ ফী দিয়ে আনানো হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গেই সে-পর্বও চুকে গেল।

মহেশ যেন নিজের অবস্থা বুঝে নিয়েই এত তাড়াহুড়ি কাজটা সেরে নিয়েছিলেন।

উইল করার পরের দিন থেকেই তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটল। শেষ দু'-সপ্তাহ তো বলতে গেলে 'কোমা' অবস্থায় কাটল।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে যখন উইলের প্রোবেট নেবার কথা উঠল তখন লীলা অনেক সামলে নিয়েছেন। বৃথাই এতবড় ব্যবসাদারের ঘর করেন নি, ভেঙ্গে পড়ার লোক তিনি নন। কিন্তু প্রোবেট নেবার আগে উইল পড়ে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। সবই ঠিক আছে, কেবল অশোককে বাড়িটা দেবার কথাটা লেখাই হয় নি। লেখার আগে বোধ হয় উকীল-বন্ধুকে বলা ছিল, সে সুকৌশলে ঐ অংশটুকু বাদ দিয়ে গেছে। তখন যে লীলার পড়ে দেখার অবস্থা থাকবে না, সেটা আন্দাজ করেই।

লীলা অবাক যত হলেন, আঘাত পেলেন তার চেয়ে বেশী।

খানিকটা বিহ্বলভাবে মেয়ে-জামাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'সে কি রে। তোরা এত পেলি, তবু ঐ একরত্তি একটা ছোট বাড়ি—সেটার জন্যে একটা মুমূর্ষু মানুষকে ঠকালি। তার নিজের ছোট ভাইয়ের ছেলে, শুধু তাই নয়, সেই বাল্যকাল থেকে এ বাড়িতেই সে মানুষ। আমাকে জ্যাঠাইমা কোন দিন বলে নি, মা বলেই ডেকেছে।'

মেয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তুমি থামো দিকি। বাবার মরবার আগে ভীমরতি হয়েছিল, আমাদের তো তা হয় নি। তাঁর দেবার ইচ্ছে থাকলে তিনি তখনই তো ওটা অশোকদার নামে কিনতে পারতেন, এতদিনের মধ্যে একটা অন্য বাড়ি কি ফ্ল্যাটও তো দানপত্র করে দিতে পারতেন। বাবা অনেক করেছেন ওর জন্যে। মানুষ করেছেন, বিয়ে দিয়েছেন, চাকরি করে দিয়েছেন—আবার কেন? মিছিমিছি ওঁর ঐ একটা খেয়ালের জন্যে আমার ছেলেমেয়ের ক্ষতি করি কেন!'

জামাই ফোড়ন কাটল, 'এমন দেবতার মতো জ্যাঠা—এতদিন ভুগলেন, অশোকদা কদিন এসেছেন মা! ওঁর যে খুব একটা কৃতজ্ঞতা বোধ আছে তা তো কোনদিন আমার মনে হয় নি।'

লীলার বিহ্বল ভাবটা একটু কেটেছে। তিনি বিরস কণ্ঠে শুধু বললেন, 'তার কথাটা তুমি বুঝতে পারবে না বাবা, সে যেখানে থাকে সেখান থেকে এই রিজেন্ট পার্কে আসতে গেলে যাওয়া আসায় আড়াই টাকার মতো খরচ। ছোট থেকেই তার আত্মসম্মান জ্ঞান একটু বেশী। লেখাপড়া শেখাতে আমরা চেয়েছিলুম কিন্তু সে একটা পাস করেই পশু-চিকিৎসার ইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেল। পাস করার পরও ইনি বলেছিলেন আমার ব্যবসায় ঢোক, তাতে ঢের বেশী মাইনে দিতে পারব—তাতে জবাব দিয়েছিল, 'না, সে আমার কেবলই মনে হবে আমার যা পাওয়া উচিত তার থেকে বেশী দিচ্ছ আমাকে। তারপর—মানুষের মন তো, কখন মনিব কর্মচারীর সম্পর্ক ভুলে গিয়ে আত্মীয়র দাবী উঠবে মনে—কর্তাত্তি করতে যাবো, কে তখন সেটা মনে করিয়ে দেবে—তখন আঘাত পাবো অনেকখানি। দূরে থাকাই ভালো। তুমি যে আমার বাবার কাজ করেছ, মা বাবা হারিয়ে আমি মা-বাবাই পেয়েছিলুম এখানে—সেকথা যেন কোনদিনই ভুলে না যাই, বা তেমন কোন অকেশন না ঘটে।'…সরকারী পশু-হাসপাতালে চাকরি—যতই বা মাইনে পায়। বিয়ে করতে চায় নি, ইনিই জোর করে দিয়েছিলেন, বৌ, দুটো ছেলেমেয়ে, বাড়িভাড়া করে থাকা—মাসের শেষে শুধু ডাল ভাত খেয়ে কাটে।'

জামাইও শুষ্কস্বরে বললে, 'এত আত্মসম্মান জ্ঞান যখন তাঁর—তাঁকে বাড়িটা দান করতে যাওয়াও বাবার ঠিক হয় নি।'

ঠিক জামাইয়ের নাম করলেন না লীলা, শুধু বললেন, 'চারিদিকে আত্ম-সম্মানের অভাব দেখে দেখে বোধহয় ও জিনিসটার কথা উনি ভুলেই গিছলেন।'

আর কিছু বলেন নি লীলা, মেয়ে-জামাইকেও কোন অনুরোধ করেন নি, সংসার যেমন চলছিল, আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে তেমনিই চলছে মনে হবে। শুধু

কর্তৃত্বটা ক্রমে ক্রমে ছেড়ে দিতে লাগলেন। মেয়েও যে সেটা চায় তা বুঝেই হয়ত। তিনি তেতলায় নিজের মহলে একটা গ্যাস আনিয়ে নিজের রান্না নিজে ক'রে নিতেন, একটি ঝি ছিল, সে নিচের বড় সংসারেই খেত। কোনো দিন ভাল কিছু করলে নাতি-নাতনীর জন্যে নিচে পাঠিয়ে দিতেন।...

কর্তা মেয়ের বিয়ে দেবার সময় পাত্রের রূপ ও ডিগ্রি দেখে ভুলে গিছলেন, লীলা ভোলেন নি। তাঁর একটা সংশয় ছিলই মনের মধ্যে। এখন এই বছর দুইয়ের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেল যে মনুষ্যচরিত্রে তাঁর জ্ঞান অভ্রান্ত। জামাইটি অপদার্থ, যাকে বলে রাঙামুলো। এত বড় কনট্র্যাক্টরি ব্যবসা অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যে গুটিয়ে এনে সেই টাকাটা নিয়ে শেয়ার মার্কেটে ফটকাবাজী করতে গিছল, তার সবই ডুবেছে। ইতিমধ্যে একটি ফ্ল্যাট-বাড়িতে দুটি ফ্ল্যাটও বিক্রী হয়ে গেছে। সেই টাকায় অন্য কী একটা ব্যবসার চেষ্টা করছে। মায় কর্তা যে কিছু রপ্তানি কারবার করতেন—তার স্বত্বও বিক্রী ক'রে দিয়েছে জামাই।

লীলা শুনেছেন সবই, শুনছেন। মেয়েকে বা জামাইকে কিছুই বলেন নি কোন দিন। এ বাড়িটা অন্তত ওরা বিক্রী করতে পারবে না। শেয়ারও না। সে উনি নিজের ব্যাঙ্কে লকারে রেখে দিয়েছেন। জয়েণ্ট য়্যাকাউণ্টে হাজার উনত্রিশ টাকা ছিল, নিজের ব্যক্তিগত য়্যাকাউণ্টেও হাজার দশ-বারো—বন্দোবস্ত আছে শেয়ারের সুদ বা ডিভিডেণ্ড ঐ হিসেবেই সোজা ব্যাঙ্কে চলে যাবে, বোধ হয় দশ-বারোটা বিশ একুশে দাঁড়িয়েছে। তিনি এই নিয়েই এবার নিজের খেলা শুরু করলেন।

তাঁর এক বাল্যসখীর ছেলে ভাল কনট্র্যাক্টর হয়েছিল। সে একটু সাবেক ধরণের ছেলে, সেই মান্ধাতার আমলের মতো লীলাকে সইমা বলত, পুজোর সময় শাড়ি দিতে কখনই ভুল হ'ত না তার। ভবেশ নাম, মোটামুটি সৎ, এই কথা রটে যেতে কাজও বিস্তর পায়—সরকারী ঠিকে নেয় না। লাভের বেশী ঘুষ দিতে হয় বলে।

তাকেই একদিন ডেকে পাঠালেন লীলা। ওপরের ঘরে বসিয়ে অবস্থাটা বুঝিয়ে বললেন। মেয়ের এবং নাতি-নাতনীর যে পথে বসতে খুব একটা দেরি হবে না সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। এর পর চাপ আসবে ও'র ওপর। ও'র টাকাটা ওদের দেবার জন্যে। তার আগেই তিনি টাকাটা লগ্নী করতে চান।

দমদম য়্যারপোর্টের কাছাকাছি তাঁর একটা ছোট্ট জমি আছে, কাঠা পাঁচেকের মতো। সেও এক বান্ধবী টাকার জন্যে কেঁদে পড়াতে তিনি কিনে নিয়েছিলেন। সে কথা বোধহয় কর্তাও ভুলে গিছলেন। মেয়ে জামাই অত জানেও না। ও'র এই হাজার পঞ্চাশ টাকায় একটা ছোট্ট বাড়ি হবে ? যাতে অন্তত পাঁচ-ছশোর মতোও ভাড়া ওঠে ?

একটু ভেবে নিয়ে ভবেশ বলল, 'পাঁচ কাঠা এখন অনেক জমি সইমা। ওর অর্ধেক ছাড়া থাক—তেমন বুঝলে ওটা বিক্রী করতে পারবেন। আমি আপনাকে বাকী আড়াই কাঠাতেই ওপর-নিচে দুটো ফ্ল্যাট ক'রে দিতে পারব হয়ত। দুখানা বেডরুম, একটা বাথ পাইখানা, সামান্য একটু ঝুল বারান্দা, ভেতরে একটু খাবার

টেবিলের মতো জায়গা। এখনকার দিনে আপনি সাতশো ক'রে ভাড়া পাবেন অনায়াসে।'

'ঐ টাকায় হবে?'

'দেখা যাক না। না হয় কিছু ধার লাগবে। ঐ জমিটা তো রইলই।'

ভবেশ সব ভারই একা বহন করেছে বলে বিশেষ কেউ টের পায় নি। মধ্যে কিছুদিন মেয়ে নাতি নাতনী দার্জিলিং গিয়েছিল, সে সময় জামাই প্রায় কোন-দিনই এ বাড়ি আসত না।

এরা যখন খবর পেলে তখন বাড়ি অর্ধেকেরও ওপর হয়ে গেছে। মেয়ে জামাই যুগ্ম আক্রমণ করল এসে। জামাই বললে, 'মা, আপনি নাকি দমদমে বাড়ি করছেন? কৈ আমাদের তো বলেন নি!'

'বলবার কোনো প্রয়োজন কি ছিল? আমার জমি আমার টাকা—এর জন্যে আগে থাকতে তোমাদের অনুমতি নিতে হবে বলে আমার মনে হয় নি!'

'হাতের টাকা সব নিঃশেষ করলে, আমাদের বিপদ-আপদ তো আছে!' মেয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে।

'সেই জন্যেই তো নিঃশেষ করলুম মা, জামাই যেমনভাবে টাকা নষ্ট করছেন—শেষ পর্যন্ত আমার ঐ টাকাটুকুতেই হাত বাড়াতে হবে তা বুঝেছিলুম। এ তবু একটা সম্পত্তি হয়ে রইল, ভাড়া দিলে আমার দিন অন্তত কেটে যাবে—যে কটা দিন বাঁচি।'

জামাই উষ্ণ কণ্ঠে বললে, 'আমি বদখেয়ালী ক'রে টাকা ওড়াচ্ছি, তা তো আর নয়—ব্যবসায় উত্থান পতন তো আছেই।'

'উত্থান তো কৈ দেখছি না কোথাও। খবর সবই আমি পাই বাবা, আমি ব্যবসাদারেরই ঘর করেছি এতকাল।' প্রসঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ টেনে উঠে চলে গেলেন লীলা।...

হঠাৎ শোনা গেল উনি নবদ্বীপে ধুলোটের উৎসবে যাবেন, সঙ্গে দাসী তারিণী যাবে শুধু—দিন দশেক দেরি হবে ওঁর ফিরতে। দু'একদিন বেশীও হ'তে পারে।

যাঁর সঙ্গে যাবেন—তাঁর কথাও বলেছেন, মহেশবাবুরই এক বন্ধু, নবদ্বীপে তাঁর নিজের বাড়ি আছে—তিনিই এখান থেকে নিয়ে যাবেন, আবার পৌঁছে দেবেন।

এর পর একেবারে চিঠি এল পুরী থেকে—লীলা এখানে আর ফিরবেন না। নতুন বাড়ির ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন। ওঁর দিন কেটেই যাবে। জামাই মেয়ের ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই।

কি ব্যবস্থা ক'রে গেলেন—তা নিয়ে উদ্বেগে সে রাতটা অনিদ্র কেটে গেল প্রায়—পরের সারাটা দিন। ছুটোছুটি ক'রে সংবাদটা পাওয়াও গেল শেষ পর্যন্ত। লীলা

নতুন বাড়ি বিক্রী করেছেন, সেই টাকায় উনি লেক টাউনে অশোকের নামে একটি বাড়ি কিনে দিয়েছেন। রেজেস্ট্রী হয়ে গেছে। দলিলে ইসাদী হিসেবে লীলা সই করেছেন, তা ছাড়াও স্বতন্ত্র একটা কাগজে লিখে দিয়ে যাচ্ছেন, স্বামীর শেষ ইচ্ছা অনুসারেই উনি এই কাজ করলেন, নইলে তাঁর মৃত আত্মা শান্তি পেত না। লীলাও অশোককে ছেলের মতোই মানুষ করেছেন—তার ভবিষ্যৎ দেখা ওঁরও কর্তব্য মনে করেন।'

আরও খবর পেল জামাই, বাকী আড়াই কাঠা জমি বিক্রী ক'রে সেই টাকা হাতে ক'রেই পুরী গেছেন, ভবিষ্যতে শেয়ারগুলোর ডিভিডেন্ড তো জমা হবেই, তত দিন ওতেই চলে যাবে।

উপার্জন

যদিও ট্রেনটা ফেল হয়ে গেল এবং স্টেশন-মাস্টার জানিয়ে দিলেন যে, কাল সকালের আগে আর কলকাতায় যাবার গাড়ি নেই, তবু হরকুমার একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাসই ফেললে। যাক্‌গে ট্রেন—অত ছুটোছুটির তার দরকারই বা কী? না হয় একটা দিন গেলই।

হরকুমার স্টেশনের বাইরে এসে বেশ প্রসন্ন মুখেই চারদিক তাকালে। আজ তার সবই ভালো লাগছে। সত্যিই, আর তার কোথাও কোনো তাড়া নেই—তার কাজ একরকম শেষ হয়েছে, পুরস্কারও সে পেয়েছে মোটা। একসময় ছিল, যখন তার উদ্বেগ দুশ্চিন্তার সীমা থাকত না এমন ক'রে গাড়ি ফেল হ'লে, কিন্তু আজ সে নিশ্চিন্ত। মাটি তৈরি করা, বীজবপন থেকে শুরু ক'রে বৃক্ষপালন পর্যন্ত তার সব কাজ সারা হয়ে গেছে, এমন কি ফল-সুদ্ধ তার গৃহজাত হয়েছে, বাকি আছে শুধু ভোগ—তাতে তাড়া কী? ধীরে সুস্থে করলেই হবে।

অবশ্য কাজ যে করবার নেই তা নয়, অনেক টাকাকে কি আর আরও অনেক করা যায় না! খুবই যায়, কিন্তু সে ইচ্ছে তার আদৌ নেই! ওর মনে মনে বরাবরই সম্পদের একটা সীমারেখা টানা ছিল, কল্পনার সে সীমাকে বাস্তব যখন ছাড়িয়ে গেছে তখন আর দরকার কী! এই যুদ্ধ যখন বাধল তখন সবাই বলাবলি করেছিল যে, বাতাসে টাকা উড়বে এবার, যে ধ'রে নিতে পারবে সেই বড়লোক। কথাটা তখন বুঝতে পারে নি হরকুমার। ওর ছোট্ট মুদিখানার দোকানে ব'সে তামাক খেতে খেতে পাঁচজনকে ডেকে কথাটা বুঝতে চেষ্টা করত। ইস্কুল ছেড়ে ও চাকরি করতে যায় নি—চাকরি যত মোটাই হোক, আয় যে তার সীমাবদ্ধ, তা হরকুমার জানত। তাই ছোটভাইকে নিয়ে কলকাতার শহরতলীতে ও অল্প বয়সেই মুদিখানার দোকান খুলেছিল। পাড়ার লোকে বলাবলি করত, 'বামুনের ঘরের গরু—মুদিখানার দোকান খুলে ভদ্রলোকের মুখ ডোবালে'—কিন্তু, তাতে শুধু সে হাসত,

কখনও তাতে নি।

যাই হোক—ক্রমশ ব্যাপারটা সে বুঝল। যথাসর্বস্ব খুইয়ে সে পাগলের মতো দাঁতমাজা বুরুশ, লেখবার কালি, কাঠের বোতাম এই সব কিনে ঘর বোঝাই করলে —তাতে আয় বাড়ল, কিন্তু সে-ও এমন কিছু নয়। মিলিটারি কনট্রাক্টের জন্য ছুটোছুটি ক'রে সামান্য যে সব উচ্ছিষ্ট ওর অদৃষ্টে জুটতে লাগল তাতেও পেট ভরে না—যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়, লাভ সে পরিমাণ মেলে না। যাদের টাকার জোর আছে তারা চুপ ক'রে ব'সে থেকে এর চেয়ে ঢের বেশী লাভ করে—এই ব্যাপারেই। হরকুমার সবই দেখত, সবই বুঝত—অথচ কিছুই করতে পারত না, শুধু হাত কামড়াত। টাকা তার ঘরে আসছে বটে, কিন্তু এত ধীরে যে, টাকা কোনো কাজে লাগে না।

তারপর একসময় ভাগ্যলক্ষ্মী হঠাৎ মুখ তুলে চাইলেন—এল পঞ্চাশের মন্বন্তর। তার আভাস পেয়েই হরকুমার ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—না হয় সব যাবে, আবার সেই মুদির দোকান ভরসা করবে। অবশ্য তা আর করতে হ'ল না। বারো টাকার চাল যখন চল্লিশ টাকায় বিক্রি হ'ল তখনও হরকুমার ছাড়ে নি, অল্প লাভে বিচলিত হবার লোক সে নয়। গোপনে ষাট পঁয়ষট্টি, এমন কি সত্তর টাকাতেও বিক্রি করেছে সে চাল। চাল আর লোহা—হঠাৎ যেন হাজার হাজার টাকা সেধে ঘরে আসতে লাগল, না চাইতেই। শুধু তাই নয়, সেই টাকারই পথ ধ'রে বোধ হয়, কনট্রাক্ট আসতে শুরু হ'ল মোটা মোটা। ধলভুমগড়ে বাঁশ আর গৌহাটিতে খড়, পার্বতীপুরে রেলের লাইন পাতা—কোনো কনট্রাক্টেই পিছ-পা হয় না হরকুমার। একটা মানুষ দশটা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। অন্য কনট্রাক্টররা কুলি পায় না, অথচ ওর কাজে লোকের অভাব নেই। তার কারণ ও বরাবরই জানে যে, বেশী লোভ করা ঠিক নয়। টাকা যেমন সে পেয়েছে, লোকজনকেও দিয়েছে দু'-হাতে। সাহেবরা ঠিকাদার হিসাবে তাকেই পছন্দ করতেন বেশী, তার কারণ অসম্ভব শব্দ তার অভিধানে ছিল না। তাঁদের সে প্রীতির সুযোগও হরকুমার কম নেয় নি। একই খড় কাগজে কলমে ঘুরিয়ে দিয়ে দু'বার সরবরাহ করা হয়েছে, একটা দেওয়াল-গাঁথার মজুরি তিনবার বিল করা হয়েছে। তাতে সে নিজে খুশী ছিল, ওপরওয়ালাদের খুশী ক'রে দিয়েছিল—ষাট টাকা দিয়ে হুইস্কির বোতল কিনে সাহেবদের ঘর বোঝাই ক'রে দিয়েছে সে।

এইখানেই কিন্তু চুপ ক'রে থাকে নি হরকুমার। টাকা যেমন ঘরে এসেছে, তেমনিই খাটিয়েছে সে। বড় জমি একসঙ্গে কিনে ছোট ছোট প্লটে বিক্রি করেছে। ঠিকাদারির দৌলতে মাল-মসলা যোগাড় ক'রে সে ছোট বাড়িও তৈরি করেছিল খানকতক, সব ক'টাই মোটা লাভে বিক্রি হয়ে গেছে। কাগজ, ছাপাখানা থেকে শুরু ক'রে ওষুধ পর্যন্ত, কালোবাজারে কোনো ব্যবসাটাই তার ফাঁক যায় নি। তার ফলে আজ সে দশ-বারো লক্ষ নগদ টাকা, কলকাতা ও শহরতলীতে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ বিঘা জমি এবং খান-আষ্টেক-দশ ভাড়াটে বাড়ির মালিক। দু'তিন

বছরেই এই অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্য ওর হাতে এসেছে। এছাড়া খুব বড় একটা চলতি ছাপাখানা কিনেছে সে, তার সঙ্গে একটা পেটেন্ট ওষুধের কারবার। বড় বড় কয়েকটা কোম্পানিতে শেয়ারও কিনে রেখেছে—আর ছুটোছুটি করবার তার দরকার নেই। মুদির দোকানটা সে ছোটভাইকে দিয়ে দিয়েছে, তাকে একখানা বাড়িও ক'রে দিয়েছে। মায়ের পেটের ভাইকে সে দেখে নি এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। ব্যস্—এইবার তার ছুটি।

বাইরে তার যা কিছু ছিল সব আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিয়েছে, বাকি ছিল এখানকার দেনা-পাওনা মেটানো—আজ তাও শেষ ক'রে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। সব চুকিয়ে দিয়েও সাতাশ-শ' টাকা নগদ এবং একখানা ষোল হাজার টাকার চেক পকেটে ক'রে ফিরেছে সে।

এইবার সে চায় জীবনটা একটু উপভোগ করতে। দার্জিলিঙে, মিহিজামে আর পুরীতেও একখানা ক'রে বাড়ি আছে তার। সে একমাস ক'রে কলকাতায় আর এক-মাস ক'রে এই সব জায়গায় কাটাবে—এই তার কল্পনা। যে দুটো ব্যবসা হাতে রইল তাতে বেশি কিছু করতে হবে না, মধ্যে মধ্যে এসে দেখে গেলেই হবে। পুরানো কর্মচারী আছে, সবাই বেশ বিশ্বাসী আর পাকা। তাছাড়া বাঙালী কেরানীরা পুকুরচুরি করতে সাহস পায় না তাও সে জানে।

হরকুমার আর একবার উজ্জ্বল চোখে চারদিকে তাকালে। সারাজীবন ছুটো-ছুটি করা আর ভূতের ব্যাগার খাটা মূর্খের কাজ। পয়সা যদি ভোগ করাই না গেল তো রোজগার ক'রে লাভ কী? সে থামতে জানে, থেমেওছে। এইবার সমস্ত রকমে উপভোগ করবে সে এই হঠাৎ-পাওয়া সম্পদ। নাই বা হ'ল সে বিড়লার মতো বড়লোক। অত পয়সা কী কাজে লাগত তার? বড়জোর খবরের কাগজে নাম ছাপাবার জন্য কিছু দান করতে পারত—এই তো! অপরের ভোগের জন্য নিজে সারাজীবন খেটে যাওয়ার কোনো অর্থ খুঁজে পায় না হরকুমার, নিতান্ত আহাম্মকি ব'লে বোধ হয়। ভারতবর্ষটা ভ্রমণ করবে সে—সপরিবারে নয়, মেয়ে-ছেলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সে পছন্দ করে না—একা ফার্স্ট ক্লাসে চ'ড়ে—সঙ্গে শুধু একটা ছোকরা চাকর থাকবে। বিভিন্ন প্রদেশের জলহাওয়া, খাবার এবং স্ত্রীলোক সবই সে পরখ ক'রে দেখতে চায়। সঙ্গে বেশী লোক থাকলে অসুবিধা। এতে তার বড়জোর হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচ হবে, হিসেব ক'রে দেখেছে সে। বিলেতে যাবার ইচ্ছে নেই—সেখানে নাকি বারোমাসই বর্ষা হয়, তাছাড়া যত পয়সাই তার হোক না কেন সমস্ত পৃথিবীটা দেখা কারুর পক্ষেই যখন সম্ভব নয়, তখন সে চেষ্টা না করাই ভালো। যারা সারাজীবন পয়সাই রোজগার ক'রে যায় তারাও তো পৃথিবী ঘোরবার সময় পায় না। সুতরাং, তাতেই বা সুবিধা কী? কখনও যদি আমেরিকা বা জাপান, কি ঐ রকম দেশে, যাবার ইচ্ছে হয় তো সে চ'লেই যেতে পারবে, সে টাকা তার আছে।

ট্রেন চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাড়াটে গাড়িগুলো একে একে স'রে পড়তে শুরু করেছিল। আবার সেই রাত দশটায় ট্রেন আসবে কলকাতা থেকে, তখন গাড়ির দরকার। শেষ একখানা গাড়ি হরকুমারের মুখ চেয়ে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, আর থাকতে না পেরে তার গাড়োয়ান হেঁকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি বাবু, গাড়ি চাই নাকি ?'

'গাড়ি ? নু-না ! গাড়ি চাই না।'

গাড়ি চ'ড়ে সে আর কোথায় যাবে ? কোথাও পেঁছিবার যখন তাড়া নেই, তখন মিছিমিছি গাড়ি চেপে লাভ কী ? কোথাও রাতটা কাটাতে হবে এই তো ? তা তার জন্যও বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। এ শহরের ডাকবাংলো, হোটেল সবই ওর পরিচিত—তবে ওর সঙ্গে বিছানাপত্র কিছুই নেই, এই যা বিপদ। হোটেল কি ডাকবাংলোয় থাকতে হ'লে একটা বিছানা চাই। পুজার পর, এখন প্রথম শীতের সময়—বাইরে হিমে প'ড়ে থাকাটা খুব আরামদায়ক নয়।

অবশ্য, হরকুমারের ওষ্ঠের প্রান্তে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল, যে সব স্থানে গেলে বিছানার জন্য ভাবতে হয় না—সে সব বাড়ি তো রয়েছেই। সেই বিশেষ পল্লীটা যে এই শহরের কোথায়, তাও হরকুমারের জানা ছিল। বছরখানেক আগে এক পাঞ্জাবী ঠিকাদারের সঙ্গে তাকে আসতে হয়েছিল, যদিও সে বেশীক্ষণ থাকে নি। তখন একটা রাত কোথাও বৃথা কাটাবার কথা হরকুমার ভাবতে পারত না।

আজ গেলে মন্দ হয় কি ? আজই তো সে সম্পূর্ণ ছুটি পেলে তার জীবনযুদ্ধ থেকে, এই তো উপযুক্ত দিন। অতঃপর যদি জীবনটা উপভোগ করতেই হয় তো আজ থেকেই শুরু করা যাক না—

হরকুমার একটু ন'ড়ে চ'ড়ে উঠল। গাড়িটা চ'লে গেছে বটে, তবে গাড়ির দরকারও ছিল না—পল্লীটা এমন কিছু দূরে নয়। সে স্টেশন-এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে বাঁদিকের রাস্তাটা ধরলে। এই ভালো, একটা ডেরায় পেঁছে তাদের দিয়েও হোটেল থেকে কিছু খাবার আনানো চলবে। লুচি কিংবা পরোটা আর মাংস—

এখানে নিজে কখনও আসে নি বটে, তবে ঠকবার লোক সে নয়, কোথায় খবর নিতে হয় তা জানে। গলিতে ঢোকবার মুখেই যে চালাটায় চায়ের আর পানের দোকান, সেইখানে পান-সিগারেট কেনবার অছিলায় দাঁড়িয়ে খবর নিলে সে। ভালো মেয়েমানুষ ? হ্যাঁ, আছে বৈকি। চেহারা যদি চান তো সুশীলা, একেবারে কাঁচা সোনার রঙ্—তবে মানুষ ভালো হচ্ছে আমাদের চাঁদু, ও এ পথে নতুন, বেশী দিন আসে নি, বেশ মেয়ে।

রূপে লোভ নেই হরকুমারের, রাতটা কাটাতে হবে কোথাও, মানুষটাই ভালো হওয়া দরকার। একটু সেবা, দুটো মিষ্টি কথা—ব্যস্। সে সিগারেটটা দড়ির আগুনে ধরিয়ে নিয়ে (দেশলাই বাঁচাবার অভ্যাস এখনও যায় নি তার) মুখ তুলে প্রশ্ন করলে, 'তাহ'লে চাঁদুর বাড়িটা কোন্ দিকে হ'ল ভাই ?'

'ঐ যে সোজা গিয়ে ডান-হাতি, টিনের বাড়ি টিনেরই দেওয়াল দেখছেন—হ্যাঁ, ঐটে—'

তা চাঁদু মানুষটা সত্যিই ভালো। খুশী না হয়ে পারলে না হরকুমার। ঘরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদু ওর জুতাটা খুলে নিলে, কোটটা খুলে টাঙিয়ে রাখলে পেরেকে, তারপর ফরসা তোয়ালে ভিজিয়ে মুখ-হাত-পা মুছিয়ে দিয়ে একটা মোটা তাকিয়া এগিয়ে দিয়ে ব'লে গেল, 'আরাম ক'রে বসুন—তামাক খান তো ? তামাক সেজে আনি।' চাঁদুকে মোটে ব'লে দিতেই হ'ল না যে, সারাদিন ঘোরাঘুরির পর একটু বিশ্রাম করতেই এসেছে, কেমন ক'রে যেন চাঁদু নিজেই বুঝতে পারলে। ওর ঘরের আসবাবগুলোও ভালো, এ রকম মফঃস্বল শহরে হরকুমার মোটেই এত পরিচ্ছন্ন ঘর ও পরিষ্কার শয্যা আশা করে নি। পানও'লাটা মিছে কথা বলে নি, ভালো সন্ধানই দিয়েছে সে।

তামাক সেজে এনে দিয়ে চাঁদু প্রশ্ন করলে, 'চা খাবেন ? চা করব ?'

'চা ?' হরকুমার ওর শ্যামবর্ণের সুশ্রী মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'চা অবশ্য আমি একটু আগেই খেয়েছি, তবু খেতে বাধা নেই, কর একটু। তবে—' তবেটা যে কী, তা হরকুমার ভাঙলে না। আসলে ও কিছু খেতে চায়। কিন্তু, এ সব ক্ষেত্রে তার আগে টাকা বার ক'রে দিয়েই খাবার ফরমাস করা উচিত ব'লে সে চেপে গেল। একেবারে রাত্রের খাবার আনতে দেবে সে—বার বার খাবার আনালে চাঁদু কী মনে করবে।

চাঁদুও 'তবে'র পিছনে কী আছে প্রশ্ন করলে না। ওর ফিরতে একটু দেরিই হ'ল। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ পরে চা আর চারটি চিঁড়ে ভাজা নিয়ে ঘরে ঢুকল চাঁদু। একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললে, 'ঘরে স্টোভ থাকলে কী হবে—কেরোসিন নেই তো! গুল জেলে তবে চা করতে হ'ল। এখানে আর যারা আছে, হোটেল থেকে চা আনিয়ে দেয়, আমার সে ভালো লাগে না। হোটেলে যা ছিরির চা!'

ওর আন্তরিকতা এবং যত্নে মুগ্ধ না হয়ে পারল না হরকুমার। বহুদিনের কর্ম-ক্লান্ত দেহ ওর, সত্যকথা বলতে কি, একটু গৃহসুখই চাইছিল। বেশ্যাবাড়ি এসে সেটা ঠিক বেশ্যাবাড়ির মতো না দেখালে অনেকে হতাশ হয়। কিন্তু, হরকুমার সে দলের নয়, এখানে এসে হঠাৎ পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস পেয়ে সে খুবই খুশী হয়ে উঠল।

আরাম ক'রে চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে বললে, 'আঃ!···কেরোসিন পাচ্ছ না বুঝি মোটেই ? আচ্ছা, মনে ক'রে দিও যাবার সময়। এখানকার কেরোসিনের এজেন্ট যে, সে আমার আলাপী লোক, তাকে একখানা চিঠি দিয়ে যাব'খন, তোমার অন্তত কেরোসিনের অভাব থাকবে না।'

ও যে এই শ্রেণীর যত্নে খুশী হয়েছে তা বুঝতে পেরে চাঁদুরও মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কাছে এসে ব'সে হরকুমারের পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে একসময়

বললে, 'খাবার কি হোটেল থেকে আনাব, না নিজে করব ?···করতে আমার একটুও কষ্ট হবে না। তবে যদি আমার হাতে খেতে না চান তাহ'লে হোটেল থেকে আনাতে হবে—'

'না না, সে কী কথা।' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল হরকুমার, 'সে কী কথা! আমরা কোথায় না খাচ্ছি যে, তোমার হাতে খাব না। তা নয়, তবে তোমার কষ্ট হবে ব'লেই—'

'আমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না!' গলায় জোর দিয়ে বললে চাঁদু, 'এই তো সবে সন্ধ্যে, একটু মাংস আনিয়ে নিই। পরোটা আর মাংস সাড়ে দশটা-এগারোটার মধ্যেই হয়ে যাবে। উনুনে আঁচ দিই, কেমন ?'

আলস্য ও আরামে জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলে হরকুমার, 'দাও। মোদ্দা একেবারে আমাকে একা ফেলে রেখে দিও না, মধ্যে মধ্যে কাছে এসে বোস—বসবে তো ? এই নাও—'

সে শার্টের পকেট থেকে একটা পাঁচটাকার নোট বার ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিল চাঁদুর সামনে। তারপর বাকি চা-টুকু এক চুমুকে পান ক'রে নিয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে পিঠটা ছড়িয়ে আবার ও একটা আরামের শব্দ ক'রে উঠল, 'আঃ— !'

চাঁদুকে আরও কাছে টেনে এনে হরকুমার বললে, 'সারারাতই দেখছি গল্প ক'রে কেটে যাবে।···রাত ওধারে তিনটে বেজে গিয়েছে।···বেশ লোক কিন্তু তুমি। মাইরি! খুব ভালো লাগছে তোমাকে, তোমার কথা আমার অনেকদিন মনে থাকবে। যেভাবে তোমার সঙ্গে গল্প ক'রে রাত কেটে গেল, মনে হচ্ছে যেন আমার বিয়ে-করা পরিবার, নতুন বৌ। বিয়ের পর প্রথম প্রথম এমনি কাটত বৌয়ের সঙ্গেও —সে কতকালের কথা, কিন্তু, এখনও বেশ মনে আছে আমার, চোখ বুজলেই চোখের সামনে দেখতে পাই।'

চাঁদু ওর আলিঙ্গনের মধ্যেই যেন শিউরে উঠল। কতকালের কথা বটে, তবে তারও অমনি সব কথাই মনে আছে! চোখ বুজলে এখনও সে সব দেখতে পায়। তার বর কোন্ স্যাকরার দোকানে কাজ করত, আয় সামান্য, দেখতেও এমন কিছু ভালো ছিল না, তবু চাঁদু তাকে সেদিন সত্যিই ভালোবেসেছিল। তার সে বরের সঙ্গে সেদিন সে স্বর্গের দেবতাকেও বদল করতে রাজি ছিল না।···মনে আছে, সেও এমনি ক'রে সারারাত গল্প ক'রে কাটিয়ে দিত এক-একদিন, আবার ভোরের দিকে চাঁদুকেই দুষত, বলত, 'বলি এ কান্ডটা কী করলে বল তো ? কাল দোকানে গিয়ে কাজ করতে হবে না ?—কাজ করব, না ঢুলব ?' কিন্তু, তার মুখ দেখলে মনে হ'ত সে মোটেই বিরক্ত হয় নি, বরং খুশীই হয়েছে।···আজ তার কথা মনে হ'লে লজ্জায় অপমানে ওর যেন মাথা কুটে মরতে ইচ্ছা করে।

হঠাৎ ওর চমক ভাঙল একসময়। শুনতে পেলে হরকুমার বলছে, 'তোমাদের কি এই অঞ্চলেই বাড়ি ? এইখানেই আছ বরাবর ?'

'ওমা ছি!' গলায় জোর দিয়ে বলে চাঁদু, 'বাড়ি আমাদের হুগলী জেলায় ছিল। যখন আর উপায় রইল না, এই পথেই পা দিতে হ'ল, তখন এখানে পালিয়ে এলুম। অনেক দূর, দেশের লোক কেউ জানতে পারলে না। নিজের দেশে থেকে কি কেউ এ কাজ করতে পারে?…'

হ্যাঁ, সেদিনের কথা চাঁদুর মনে আছে বৈকি। ওর বর যখন মারা গেল তখনও শ্বশুরবাড়ি ছাড়ে নি, পরের বাড়ি কাজ ক'রে, ধান ভেনে ও বুড়ী শাশুড়ীকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। জিনিস-পত্রের দাম যখন চড়তে শুরু হ'ল তখন আর সেই সামান্য আয়ে কুলোত না, তবু চাঁদু হাল ছাড়ে নি—একবেলা খেয়ে, একদিন অন্তর খেয়েও চালাচ্ছিল। জমিজমা বিশেষ কিছু ছিল না কখনই—যেটুকু ছিল অক্ষয়ের অসুখের সময়ে বাঁধা পড়েছিল সব। সেটাও বিক্রি ক'রে দিলে, কিন্তু তবু সে সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে কতক্ষণ আর সে ক'টা টাকা? তারপর এল পঞ্চাশ সাল—চাল কোথাও নেই—একমুঠো টাকার বদলে দু'-মুঠো চাল এই হিসেবে বিক্রি হ'তে শুরু হ'ল। অত টাকা গতর খাটিয়ে মেলে না, ভিক্ষে ক'রে একঘটি ফ্যানও পাওয়া যায় না। ঘটি-বাটি-কাপড়—যা যেখানে ছিল সব বিক্রি হয়ে গেল, তারপর আরম্ভ হ'ল নিরম্বু উপবাস। হয়তো নিজে সেদিন সে উপবাস ক'রে মরতেও পারত, কিন্তু বুড়ী শাশুড়ীর যন্ত্রণা চোখে দেখতে পারে নি সে। শুধু সেই জন্যই ও প্রথম এ পথে পা বাড়ায়—এইটুকু ওর সান্ত্বনা। হয়তো ঈশ্বর ওর এই পাপ ক্ষমা করতেও পারেন। গ্রামের হিন্দুস্থানী দোকানদার গোপনে ওকে সের পাঁচেক চাল দিয়েছিল, তার বদলে নিয়েছিল ওর ইজ্জত—

আর একবার শিউরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হরকুমার হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'অমন শিউরে উঠছ কেন বল তো বার বার? শীত করছে?'

'না অমনি—' অপ্রতিভ জবাব দিলে চাঁদু।

হরকুমার বললে, 'না, তোমার কাছে এসে বড় খুশী হয়েছি। সম্ভব হ'লে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতুম, কিন্তু দেশে-ঘাটে আর এসব করতে চাই না। আমার বউও বড় দজ্জাল। যদি কখনও বাইরে বেরুই তখন তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব —আচ্ছা সে পরের কথা।'

তাড়াতাড়ি সামলে নিলে হরকুমার। আবেগের মাথায় কিছু ব'লে ফেলা ঠিক নয়, ওতে ঠকতে হয়। নানা অভিজ্ঞতা সে চায়—ঘরের স্ত্রী তো নয় যে, একজনকে নিয়েই জীবন কাটাতে হবে।

চাঁদু হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল, 'আপনি কী করেন?'

'আমি?' হেসে বললে হরকুমার, 'আমি করতুম আগে ব্যবসা, আজ থেকে ছেড়ে দিয়েছি। আর কিছুই করব না।'

'তবে?'

'মানে, তবে চলবে কিসে? এই তো জানতে চাইছ? চলবে—তার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছি। অনেক টাকা করেছি এই যুদ্ধের বাজারে, বুঝেছ? অনেক টাকা। আর

কিছু রোজগার না করলেও চলবে। দিন যদি ভালো ভাবে চ'লেই যায়, বেশী খেটে লাভ আছে কিছু? তুমি কী বলো।'

'তা তো বটেই', চাঁদু উত্তর দিলে, 'এত টাকা কিসে কিসে করলেন?'

'এই সব নানা রকম ব্যবসা। তবে বেশী টাকা পেয়েছি গত বছরের আগের বছর চাল বেচে।'

চাল! আবার সব অপ্রিয় কথা মনে প'ড়ে যায় চাঁদুর। চাল! আগে যা সামান্য জিনিস মনে হ'ত। তারাও কত চাল ভিক্ষে দিয়েছে,—মুঠো—মুঠো। গরিবের সংসার, কিন্তু কেউ ফিরে যায় নি কোনোদিন ওদের দোর থেকে। চাল ভাত—এ যে আবার দিতে কষ্ট হয় তা-ই জানা ছিল না। অথচ, সেই চালের জন্য কী না করতে হ'ল! চাঁদুর বাবা, মা, ভাইরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে কলকাতা যাচ্ছিল, কতক পথে মারা গেল, কতক কলকাতা পৌঁছে। মরবার আগে শেষ দেখা পর্যন্ত হ'ল না—হয়তো তাদের দেহগুলোরও সদ্‌গতি হয় নি, কোথায় খানায় প'ড়ে পচেছে, নয়তো ডোমে কুড়িয়ে ফেলে দিয়েছে।

সে মরতে পারে নি—বড় যন্ত্রণা। তাকে ইজ্জত দিতে হয়েছিল, নিজের জন্য যত না হোক্‌—বুড়ী শাশুড়ীর মুখ চেয়ে আর থাকতে পারে নি। অক্ষয় যে মরবার সময় ওর হাতেই বুড়ো মায়ের ভার দিয়ে গিয়েছিল।...কিন্তু, অত ক'রেও শাশুড়ীকে বাঁচাতে পারে নি সে। চাল যখন এসে পৌঁছল, তখন দীর্ঘ উপবাসে হজম করার শক্তি চ'লে গিয়েছে তার, ভাত খেতে পারল না। শাশুড়ী মরে পড়েছিল ঘরে, দু'দিন সৎকার করার লোক পাওয়া যায় নি, সেই হিন্দুস্থানীটাই লোক ঠিক ক'রে দেয় তার পরে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে চাঁদুর মাথা যেন গরম হয়ে ওঠে। সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল।

'কী হ'ল?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে হরকুমার।

'কিছু না। মাথাটা কেমন করছে, একটু জল দিয়ে আসি।'

হিন্দুস্থানীটাই ওকে রেখে দিতে চেয়েছিল। চাল টাকা সব দেবে ভরসা দিয়েছিল, কিন্তু সে প্রবৃত্তি ওর হয় নি। শাশুড়ীকেই যখন বাঁচাতে পারলে না, তখন স্বামীর ভিটেতে ব'সে পাপ আর সে করতে পারবে না। গ্রামের আর একটি মেয়ে এখানে চ'লে এসেছিল, এই শহরের নামটা সে জানত। তাই একদিন চ'লে এল এখানেই। পাপ যদি করতেই হয় সোজাসুজি করাই ভালো।

মাথায় জল দিয়ে এসে বসতেই হরকুমার প্রশ্ন করলে, 'এমন ঠাণ্ডার দিনে মাথায় জল দিয়ে এলে? শরীর কি খারাপ নাকি?'

'না—ও আমার মধ্যে মধ্যে হয়।'

'না, না, ও ভালো কথা নয়। ভালো ক'রে চিকিৎসা করিয়ো।' কণ্ঠে সস্নেহ উদ্বেগ ফুটে ওঠে হরকুমারের। 'টাকা তো এখন ভালো রোজগার হবারই কথা তোমার। আর তা না হ'লেও ভাবতে হবে না। আমি তোমাকে অনেক টাকা দিয়ে

যাব'খন—বুঝেছ, ভালো ক'রে ডাক্তার দেখিয়ো।...না, তোমার ওপর বড় খুশী হয়েছি, বড় ভালো মেয়ে তুমি।'

চাঁদু আর শুলো না। ওর কাছ ঘেঁষে ব'সে প্রশ্ন করলে, 'চালের ব্যবসাতে এত লাভ কী ক'রে করলেন?'

হরকুমারের মুখে একটা তৃপ্তি আর গর্বের হাসি ফুটে উঠল। সে বললে, 'চালের দাম যে চড়বে তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। বারো টাকায় চাল কিনে রেখেছিলুম, সেই চাল বিক্রি করেছি পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর টাকা পর্যন্ত। চল্লিশ টাকায় কিনে ষাট টাকায় বেচেছি। তা-ও হয়েছে। মোদ্দা, টাকা যে সে সময় কী ক'রে এসেছে তা ভাবলে আজও অবাক লাগে।'

আবার একটা শিহরণ। একটা শৈত্য যেন চাঁদুর সর্বাঙ্গে বয়ে গেল। যেন এরাই, হয়তো বা এই লোকটাই তার মা, বাবা, ভাই, শাশুড়ী সকলের মৃত্যুর জন্য দায়ী—শত শত গ্রামবাসী, তার অসংখ্য আত্মীয়-কুটুম্ব। কী কষ্ট পেয়েই না মরেছে তারা, বাপ-মায়ের মৃত্যু সে চোখে দেখে নি বটে, কিন্তু আরও বহু লোককে সে শুকিয়ে মরতে দেখেছে। এখনও যখন একা থাকে সে, মনে হয় ঠিক একা সে নেই, তার আশেপাশে সেই সব কঙ্কালগুলো চলাফেরা করছে, ভাত খেতে বসলে মনে হয় যেন তারা পাতের কাছে ঘিরে এসে বসেছে। তাদের অতি ক্ষীণ নিঃশ্বাসের শব্দসুদ্ধ সে সময় যেন শুনতে পায়।......সেই সব শীর্ণ, প্রেতের মত শীর্ণ মূর্তি। একটা পাত্‌লা চামড়া ছাড়া পেটের কাছটায় কিছু যাদের ছিল না, চোখ যাদের খুঁজে পাওয়া যেত না। শেষ মুহূর্তে যাদের মুখে খাদ্য দিলেও যারা খেতে পারে নি—শুধু খেতে পারছে না এই যন্ত্রণায় আকুলি-বিকুলি ক'রে যারা মরেছে।

হয়তো হরকুমারের শেষের দিকে একটু তন্দ্রাই এসেছিল, হঠাৎ একসময়ে সে উঠে ব'সে বললে, 'এই যে দিব্যি ফরসা হয়েছে। আমি যাই, সাড়ে সাতটায় ট্রেন, এটা ফেল করলে চলবে না।...একটু চা চাপাতে পার?'

'দিচ্ছি আমি চা ক'রে—আপনি মুখে হাতে জল দেবেন তো? বাইরের দাওয়ায় জল গাড়ু সব আছে।'

কেমন যেন শান্ত কঠিন কণ্ঠস্বর চাঁদুর। কিন্তু, হরকুমারের সেদিকে কান ছিল না। অত লক্ষ্য করবার কথাও নয় তার। সে হাত-মুখ ধুতে বেরিয়ে গেল।

চা খেয়ে, জামা-জুতো পরা শেষ ক'রে হরকুমার পকেট থেকে নোটের গোছা বার করলে, 'এই নাও, কৃপণতা করব না, পুরো দু'শ টাকাই তোমায় দিয়ে গেলুম। কেমন খুশী তো?'

যেন এক পা পিছিয়ে গিয়ে চাঁদু বললে, 'ও টাকাটা আপনি রাখুন। টাকা আমার দরকার নেই—'

একটু বিস্মিত হ'ল, অসন্তুষ্টও হ'ল হরকুমার। বিরক্ত কণ্ঠে বিদ্রূপ এনে বললে, 'কি, এ টাকাও পছন্দ হ'ল না? এত টাকা আর কেউ দিত একসঙ্গে? এখানে

তো এক টাকা আট আনা রেট। আচ্ছা, আরও পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছি, কাল অত যত্ন করেছ, আমিও তোমাকে খুশী করব এই প্রতিজ্ঞা—'

'না না, টাকায় আমার দরকার নেই—আপনি যান, যান বলছি—'

সহসা যেন চিৎকার ক'রে উঠল চাঁদু, তারপর পাগলের মত, ওর হাত থেকে নোটের গোছাটা টেনে নিয়ে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'বেরিয়ে যান আপনি এখান থেকে, বেরিয়ে যান বলছি!'

হরকুমার যেন একটু ভয় পেয়েই এক লাফে নিচে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কে জানে পাগল কিনা, কী ক'রে বসবে তার ঠিক কি! সে আর দাঁড়াল না—সোজা স্টেশনের পথই ধরলে। শুধু যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে দেখলে চাঁদু তখনও সেই নোটের টুকরোগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে আরও ছোট ছোট ক'রে ছিঁড়ছে!*

ভাগ্য-গণনা

হাত-দেখানো বাইটা নাকি দুলালের বাবারও ছিল। সুতরাং ওটা ওর পৈতৃক ব্যাধি বলা যেতে পারে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

তবু ওর বাবা কখনও এমন বাড়াবাড়ি করেন নি। কলকাতার রাস্তার ধারে যে সব হিন্দুস্থানী পণ্ডিতরা পাখী, পুঁথি আর খড়ি নিয়ে বসে থাকেন পেভমেণ্টের ওপর আঁকজোক্ কেটে,—তাদের থেকে শুরু ক'রে রাজজ্যোতিষী, সম্রাট-জ্যোতিষীর দল কাউকেই তিনি বাদ দেন নি বটে, অর্থও পাঁচ আনা থেকে শুরু ক'রে পঁচিশ পর্যন্ত নির্বিচারে খরচ করেছেন; আংটিতে আর মাদুলীতে দুই হাতের আঙ্গুল ও বাহুমূল ভরে গিয়েছিল; কবচ করার জন্য ও গ্রহযজ্ঞ করার জন্য যে কত টাকা খরচ করেছিলেন তার হিসাব রাখা বা পাওয়া সম্ভব নয়; তবু, এতটা পাগলামি তাঁর ছিল না। ওধারে মাত্র একক পুরুষ এগিয়ে এলেও নেশাটা বেড়ে গিয়েছিল দশ পুরুষের মাপে।

দুলালের এ রোগটা দেখা দিয়েছিল ছেলেবেলা থেকেই।

যখন আমাদের সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত তখনই দেখেছি টিফিনের পয়সা জমিয়ে রাখত, যেদিন কলকাতায় যাবে সেদিন কোনো পথের ধারের জ্যোতিষীকে হাত দেখাবে বলে। এ ছাড়া কতগুষে ছেঁড়াখোঁড়া জ্যোতিষের বই সংগ্রহ করত তার ঠিক নেই—কোথা থেকে পেত এইটেই আশ্চর্য! বটতলায় ছাপা সব সস্তাদরের বই, তার মধ্যে কোনো-কোনোটা আবার পয়ার ছন্দে লেখা, ছড়ার বইয়ের মতো। কোনদিন হঠাৎ অসময়ে ইস্কুলে ছুটি হয়ে গেলে আমরা যখন হৈ-হৈ করে বেরিয়ে পড়তুম কার বাগান থেকে ডাব আর কার বাগান থেকে আনারস চুরি করব এই চিন্তা নিয়ে, দুলাল তখন ইস্কুলের পেছনদিকে মণ্ডলদের বাগানে ঢুকে বড় বকুলগাছটায়

---

*১৯৪৪ সালে লিখিত

ঠেস্ দিয়ে বসে বসে ঐ সব পুঁথি পড়ত আর নিজের হাতের রেখার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখত। কখনও বা কী সব হিসেব করত মনে মনে আকাশের দিকে চেয়ে।

ওর বাবা নাকি তিনখানা কুষ্টি করিয়েছিলেন ওর—তিনজন জ্যোতিষীকে দিয়ে। সেইগুলো থেকে জন্ম-কুণ্ডলীর নকল ক'রে নিয়েছিল দুলাল। সে আবার ওর পকেটে-পকেটেই ঘুরত, ফাঁক পেলেই, মানে কোনো বড় দরের বই হাতে এলে—সে মিলিয়ে দেখত আগে সেই সব রাশিচক্রের সঙ্গে।

আমরা ছেলেবেলায় বিস্তর ঠাট্টা-তামাশা করেছি, ইদানীং আর কিছু বলতাম না, মানে ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ফলে দুলালও যদিচ্ছা ঐ সব ছাইভস্ম নিয়ে মাথা ঘামাত, কোথাও কোনো বাধা ছিল না।

তারপর ইস্কুল ছেড়ে কলেজে উঠে সবাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লুম। দুলাল ওদের সদরের কলেজেই ভর্তি হ'ল, আমরা চলে এলুম কলকাতায়। আরও কিছু-দিন পরে কেউ ওকালতি করতে চলে গেল, কেউ ইস্কুল মাস্টারী নিলে—কেউ বা কেরানীগিরি অর্থাৎ যে যার জীবনযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। শুধু দুলালেরই এসব দরকার ছিল না। ওর ঠাকুর্দা তেজারতি ক'রে যা জমিয়ে গিয়েছেন, তা ওর বাবা হাত দেখিয়ে আর কত ওড়াবেন? বিশেষত দুলালরাও মাত্র দুটি ভাই। সুতরাং দুলাল দেশেই থেকে গেল, আমাদের সঙ্গেও যোগাযোগটা খুবই শিথিল হয়ে এল—কদাচিৎ কখনও দেশে গেলে দেখা হ'ত।

কাজেই সেদিন যখন হঠাৎ দুলাল আমার মেসে এসে উপস্থিত হ'ল—দুপুর রৌদ্রে হাঁফাতে হাঁফাতে, তখন বিস্মিত হয়েছিলুম বৈকি। বিশেষত দুলাল কল-কাতায় আসে খুব কম, এলেও নিজের কাজে আসে, কাজ সেরে চলে যায়। আমার মেসে গরজ ক'রে তো আসতে দেখি না বড় একটা।

সেটা একটা ছুটির দিন, মানে কলেজের ছুটি—অফিসের নয়। নির্জন মেসে জমিয়ে দিবানিদ্রা দেব বলে সবে কাগজখানা নিয়ে শুয়েছি এমন সময় ওর ঐ আকস্মিক আবির্ভাব।

'কী হে, ব্যাপার কি? এস এস!'

ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা ওর, চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। স্নানাহার হয় নি, বুঝতেই পারলুম।

অগত্যা উঠে বসে আগেই বললুম, 'তুই বোস একটু, ঠাণ্ডা হ। আমি দেখি ঠাকুর পাততাড়ি গুটলো কিনা। আগে তোর খাওয়ার ব্যবস্থাটা ক'রে আসি।'—

দুলাল খপ্ ক'রে আমার হাতটা ধরে ফেলে বললে, 'উঁহু, উঁহু—তুই বোস। আমার খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। সকালে একটা হেভি ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, তাতেই আমার চলবে। তা ছাড়া, ঠিক এখন নাওয়া-খাওয়ার মুড নেই। মনটা বড্ড বিক্ষিপ্ত ভাই। ওসব এখন ভাল লাগবে না।'

আমি ওকে একটি ধমক দিয়ে শান্ত করলুম, 'আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে আর

জ্যাঠামো করতে হবে না। আমি এক মিমিটে সব ব্যবস্থা ক'রে আসছি।'

তারপর ঠাকুরকে কথাটা বলে, চাকরকে এক পেয়ালা চা আনতে পাঠিয়ে ফিরে এসে বসে যখন বললুম, 'নাও, এবার বলো—কী ব্যাপার।' তখন কিন্তু আর ও কথা বলে না, কেমন একটা উদাসীন অথচ বিমর্ষ ভাবে ও-পাশের জানলাটার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। একটু অপেক্ষা ক'রে ওর হাতে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বললুম, 'কী রে, চুপ ক'রে রইলি কেন, বল্ কি বলছিলি।'

একান্ত নির্লিপ্ত ভাবে সে বললে, 'না থাক গে, মিছিমিছি তোকে ব্যস্ত করা। যাক্ আমি আসি ভাই এখন—'

সে উঠতেই যাচ্ছিল, ওর জামাটা টেনে রেখে একটু কঠিন কণ্ঠে বললুম, 'ওসব ওস্তাদি রাখো দিকিনি শ্যাম, বসো। অমন ক'রে হঠাৎ এসে আমার কাঁচা ঘুমটি নষ্ট ক'রে কৌতূহল জাগিয়ে দিয়ে চলে যাবে—সে হবে না। চা এল ব'লে, একটু পরে ভাতও তৈরি হবে। কথা বলো না বলো তোমার ইচ্ছে—মোদ্দা, খাওয়া দাওয়া না ক'রে যেতে পারবে না। দোরে তালা লাগিয়ে দিতে বলব এখনই—'

বলতে-বলতেই চা এসে পৌঁছে গেল। কিছু বিমর্ষ কিছু বা হতাশ ভাবে একবার আমার দিকে আর একবার চায়ের পেয়ালাটার দিকে তাকিয়ে শেষ অবধি বসেই পড়ল দুলাল। চায়ে আসক্তি ওর অসাধারণ, সেটা বাল্যকাল থেকেই জানি। চায়ে চুমুক দিলেই ওর মেজাজ প্রকৃতিস্থ হবে।

হ'লও তাই। নিঃশব্দে দু-তিন চুমুক পান করবার পরেই হঠাৎ ব'লে ফেল্‌লে। 'বাবা ত' ভাই আমার ম্যারেজের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, ক্ষেপে উঠেছেন একেবারে। কী করি বল দেখি?'

'হুর্‌-রা···আরে এ যে অপ্রত্যাশিত শুভ সংবাদ। সন্দেশ খাওয়া এখনই। ছোটলোক, তুমি আবার মুখ শুকিয়ে এসেছ। কবে? কখন? কার সঙ্গে?'

দুলাল বিরক্ত হলেও প্রকৃতিস্থ হয়েছিল। সে বললে, 'যা যা—সব তাইতে চ্যাংড়ামি করিস নি। সন্দেশ বাজারে ঢের আছে, কিনে খেগে যা।'

'আহা, তুই চটিস কেন। এ ঘটনা তো বহু-পূর্বেই ঘটা উচিত ছিল। বড়লোকের বড় ছেলে, এই সাতাশ আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত যে অবিবাহিত আছ, এইটেই তো আশ্চর্য।'

'সে চেষ্টা কি আর চলে নি মনে করছ? খুবই চলেছে। প্রাণপণ চেষ্টায় এতদিন কোনমতে ঠেকিয়ে রেখেছিলুম। কিন্তু আর বোধ হয় পারি না—এতদিন তাড়িয়ে দেব, ত্যাজ্যপুত্র করব ব'লে ভয় দেখিয়ে আসছিলেন, তাতে তত সুবিধে করতে পারেন নি—কারণ আমি সব সময়ই বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে প্রস্তুত ছিলাম। এবার উল্‌টো চাল ধরেছেন—বলেছেন আত্মহত্যা করব। ইন্ ফ্যাক্ট্—তিনদিন উপোস ক'রে পড়েছিলেন, আজ ভোরে আমার কাছ থেকে ওয়ার্ড নিয়ে তবে জল খেয়েছেন।'

একটু বিদ্রূপের স্বরেই বললুম, 'তা তোমারই বা এত কোশিস্ কেন বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখার ? তোমার কি বিয়ের বয়স হয় নি এখনো ? বিয়ে করাটা কি তোমার মতে একটা ভয়ংকর ব্যাপার ?'

আবার সেই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ফিরে এল তার চোখেমুখে। সে বললে, 'বিয়ে করাটা তোমাদের কারুর কাছেই ভয়ঙ্কর নয় জানি—কিন্তু আমার কাছে খানিকটা বটে। তোরা তো ওসব মানিস না, আমি জানি আমার ফেট্-এ কি আছে।'

এই বলে একটু থেমে বেশ নাটকীয়ভাবে ধীরে ধীরে অথচ মর্মান্তিক চাপা কণ্ঠে সে ডান হাতখানা আমার চোখের সামনে মেলে ধরে বললে, 'আমার বিধবা-বিবাহ যোগ আছে হাতে। হরস্কোপেও তাই বলে।'

কোনোমতে হাসি খানিকটা কমিয়ে রেখে বললুম, 'ও এই। সিলি।'

তৎক্ষণাৎ হাতটা গুটিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে সে বললে, 'তোমাদের কাছে সিলি হ'তে পারে কিন্তু এটা আমার কাছে সারাজীবনের প্রশ্ন। যে যে আমার হাত দেখেছে, তিন-চারজন ছাড়া সবাই বলেছে ঐ এক কথা।'

'সর্বনাশ। তিন-চারজনেরও বেশি লোককে দিয়ে তুই হাত দেখিয়েছিস ?'

খুবই বিরক্ত মুখে চুপ ক'রে রইল দুলাল।

তখন খানিকটা সান্ত্বনা দেবার জন্য বললুম, 'তা বেশ তো,—বাবা তো তোকে আর বিধবা বিয়ে দেবার জন্য জোর করছেন না। বিধবাই বা বিয়ে করতে যাবি কেন ? কুমারী মেয়ের কি অভাব আছে ?'

'বড্ড বোকার মতো কথা বলিস্ তুই শান্ত। বিধবা কি আর জেনে করব ? যদি লুকিয়ে দেয় ? বিধবা হবার কথা যদি চেপে যায় ? সেটা জান্‌ছি কি ক'রে ? ভাগ্য বলবান। তোরা জানিস না বটে, বাট ট্রুথ ইজ ট্রুথ।'

একটু ভয়ে ভয়েই বললুম, 'তা বিধবা-বিবাহটা তো আর শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। বিদ্যাসাগর মশাই—'

'হ্যাং ইয়োর শাস্ত্র।...শাস্ত্র আইনের কথা যেন কেউ বিয়ের ব্যাপারে না টানে। যেখানে মনের সঙ্গে মনের যোগ হবে—হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের, সেখানে শাস্ত্র আসে কোথা থেকে। তোরা কি কেউ পাঁজি দেখে ভালবাসিস ? বিধবা বিয়ের আইডিয়া-টাই আমি হেট্ করি। আই হেট্ ইট্ ফ্রম দি ভেরি কোর অফ মাই হার্ট।'

উত্তেজিত যত হয় দুলাল ততই বেশী ইংরেজি বলে। এইটেই ওর চিত্তচাঞ্চল্যের প্রমাণ। ক্রমে ক্রমে ব্যাকরণকে সংহার করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ওর কথা সবটাই ইংরেজিতে দাঁড়াবে—এবং তা বেশির ভাগই ভুল।

ওকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে খুব নরমভাবে বললুম, 'কিন্তু এত ঘৃণাই বা কেন ? ধর, যদি একেবারে অল্পবয়সে বিধবা হয়ে থাকে তো তার আবার বিয়ে দেওয়া উচিত মনে করিস না কি ?'

'খুবই উচিত মনে করি—বাট নট ফর মি। আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। আমার ওয়াইফ আমার আগে আর একজনকে ম্যারি করেছিল ভাবতেই যেন কেমন

লাগে। যতবার কিস্ করতে যাবো, যতবার ফণ্ড্ল্ করব, ততবারই মনে হবে যে আমার আগেও আর একজন ঠিক এম্নি করেছে ওকে, এবং এ-ও তখন ঠিক এমনি ভাবেই সে সোহাগ আদর মেনে নিয়েছে, হয়ত খুশিও হয়েছে; তাকেই হয়ত ভাল-বাসত ঠিক, আমার কাছে এটা করছে অভিনয়—ভাবতেও মাথা গরম হয়ে ওঠে। অব্নক্সাস্।'

দুলালের যে এত ভাবাকুলতা আছে তা জানতুম না। মনে করতুম ফলিত জ্যোতিষের মধ্যেই ওর জগৎটা বুঝি সীমাবদ্ধ। সুতরাং বেশ একটু বিস্মিতই হলুম। এবং এক্ষেত্রে কী বলব বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে রইলুম।

একটু পরে দুলালই হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার হাত দুটো ধরে বললে, 'ভাই একটা কাজ করবি? প্লিজ?'

'কী বল না বাপু, অত ভনিতা না ক'রে—'

'মেয়ে ঠিক করেছেন বাবা দক্ষিণের দিকে, গোবিন্দপুর গ্রাম, বারুইপুর থেকে যেতে হয়। ও'র অবশ্য জানাশুনো মেয়ে। মানে ও'র কে এক ক্লাস-ফ্রেণ্ডের, তবু আমি ঠিক নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।...তুই একদিন যাবি একবার কষ্ট ক'রে? মানে ওখানে গিয়ে—ইন্কগ্নিটো অফকোর্স—আশে-পাশে একটু খোঁজখবর করবি? ঠিক কি ইতিহাস—জানবি? লোকাল ইন্ফরমেশনস্?'

দুঃখ হ'ল বেচারার জন্য। ভাগ্যকে এত বিশ্বাস তবু তাকেই ঠেকাতে চায়। মনে হ'ল একবার বলি কথাটা, 'যদি জানো যে ভাগ্য বলবান তো সেখানেই আত্ম-সমর্পণ করছ না কেন?' কিন্তু পরেই ভেবে দেখলাম যে তাতে হিতে বিপরীত হবে। হয়ত আর বিয়েই করবে না।

মুখে বললাম, 'নিশ্চয়, সার্টেন্‌লি! আমি এই রবিবারেই যাবো। তুই নাম ঠিকানা দিয়ে যা।' একটা কাগজে নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে দুলাল বললে, 'দেখিস্ ভাই, ওরা কিন্তু না বুঝতে পারে যে তুই খবর নিতে গেছিস, তাহ'লে হয়ত মিছে কথা বলবে—খুব হুঁশিয়ার।'

'ঠিক আছে। সে তুই নিশ্চিন্ত থাক্। গোয়েন্দাগিরি করা আমার পুরানো অভ্যেস। কেউ টের পাবে না। নে, এখন ওঠ্ চান টান করবি চল—'

আরও কিছুক্ষণ বকবার ও বকাবার পর তবে দুলালকে কলতলায় পাঠানো গেল।

বলা বাহুল্য, গোবিন্দপুর না গিয়েই আমি প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট দিলুম মেয়ে সম্বন্ধে। ওর এক মামাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছিলুম মেয়ে তাঁদের বিশেষ জানাশোনা, খুব ভাল মেয়ে। সুতরাং মিছিমিছি কষ্ট করতে যাবার দরকার কি? প্যাগলকে সান্ত্বনা দেওয়া বইত না?

যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল। গরমের ছুটি পড়ে গিয়েছিল ততদিনে ব'লে আমি দেশে এসেছি, ফলে বিয়ের ঝঞ্ঝাট অনেকটা আমার ওপরও এসে পড়ল। ওর বাবার

আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস, তিনি সোজাসুজি আমাকে আঁকড়ে ধরেছেন একেবারে। আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছেন যে বিয়ের আটটা দিন অর্থাৎ শুভ-সূচনী পুজো পর্যন্ত আমি আর কোথাও নড়ব না।

বিয়ের দিনটা দুলাল একটু বিমর্ষ হয়ে ছিল বটে কিন্তু ঠিক বিবাহ করতে যাত্রা করার পর আর অতটা দেখি নি। দীর্ঘপথ, আগাগোড়া টানা বাস্-এর ব্যবস্থা হয়েছিল, হল্লা করতে করতে যাওয়া হ'ল। সে হৈ-হল্লার তাপেই বোধ হয় দুলালের মনের জমাট অবস্থাটা গলে এসেছিল ; সেও খুব হাসিখুশীতে মেতে উঠল।

আমি বরাবরই তার দিকে একটু কড়া নজর রেখেছিলুম। নিজেরও উদ্বেগ ছিল, ওর বাবারও তাই অনুরোধ। দেখলুম দুলাল আবার গম্ভীর হ'ল শুভদৃষ্টির সময় থেকে। প্রথমটা একটু চমকে উঠেছিলুম, তবে কি দুলালের বৌ পছন্দ হয় নি ? কিন্তু না পছন্দ হবারই বা কারণ কি ? বৌটি সত্যিই ভাল দেখতে, এমন কি সুন্দরীও বলা চলে। তবে ?

একটু ফাঁক্ পেতেই ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললুম, 'কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্। মাইরি, খাসা বউ হয়েছে তোর।'

সে শুধু বললে, 'হুঁ।'

'হুঁ কি রে ? পছন্দ হয় নি তোর ? অমন দেবী-প্রতিমার মতো মেয়ে—?'

'পছন্দ হয়েছে বলেই তো ভাবছি।' সংক্ষেপে উত্তর দিলে সে।

'কী ভাবছিস ? পছন্দ হয়ে থাকে তো ভাববার কি আছে ? মনের সুখে ঘর করবি। তোর তো আর আমাদের মতো তেল-নুন-লক্‌ড়ীর চিন্তায় ঘুরে বেড়াতে হবে না।'

উত্তরের জন্য চেপে ধরি ওকে।

দুলাল একটু চুপ ক'রে থেকে কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেয়, 'মনের সুখে ঘর-করার কথাই ভাবছি। যদি অমন বৌকেও ভালবাসতে না পারি? যদি এর পর অন্য—মানে অন্য কোনো কথা শুনি ?'

কথাটা ব'লে একটু যেন শঙ্কিত, একটু জিজ্ঞাসু ভাবে চায় ও।

'পাগল না কি রে তুই!' ধমক দিয়ে উঠি, 'কী আবার শুনবি, বলছি না আমরা খবর নিয়ে এসেছি ভাল ক'রে। আচ্ছা পাগলামী! এখনও ঐ কথা ভাবছিস ?'

অপ্রতিভ দুলাল আবার বাসরে গিয়ে বসল।

তারপর থেকে অবশ্য আবার ওকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। বর-কনে নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে ফেরা গেল। হাসি ঠাট্টা গল্প-গুজবে পথটা মধুর হয়ে রইল।

পরের দিন বৌভাত, নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ রইল না। পাড়াগাঁয়ে এখনও ক্রিয়াকর্ম হ'লে দুপুরেই খাওয়া হয়। সে খাওয়া শুরু হ'ল বেলা একটায়, শেষ হল রাত দশটায়। দুলালও খাটলে খুব। তারপর বেশ যেন একটু সাগ্রহে ও আনন্দের সঙ্গেই ফুলশয্যার ক্রিয়া-কলাপগুলো সেরে নিলে। বুঝলাম বধূর সঙ্গে পরিচয়ের জন্য ও অধীর হয়ে আছে। আমরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।...

তারপরের দিন বেলা দশটা নাগাদ হঠাৎ দুলাল এসে আমাকে বললে, 'শান্ত, গঙ্গাস্নান করতে যাবি ? তুই আমি, আর—আর বৌ ?'

বিস্ময়ের শেষ রইল না। হঠাৎ গঙ্গাস্নান, তা আবার নতুন বৌকে নিয়ে। কী ব্যাপার ?

ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে দুলালই কারণটা খুলে বললে, 'না, মানে আমার একটা মানসিক ছিল।'

'তা বেশ তো। মাও তো বোধ হয় যাবেন বলছিলেন, একদিন বৌকে নিয়ে—'

'না না, মা নয়, সে বড় ঝামেলা। সে যান তো যাবেন আর একদিন তাঁর বৌকে নিয়ে। আজ এমনি তুই, আমি আর মায়া—এই তিনজন।'

গঙ্গা এখান থেকে মাইল-দেড়েক। আমরা হেঁটেই যাব অবশ্য কিন্তু নতুন বৌকে ও কি ক'রে নিয়ে যাবে ? বললাম, 'পাল্‌কী ডাকতে হবে নাকি ?'

সে প্রশ্নের উত্তরে বললে, 'না না—আমি যে একখানা বেবি অস্টিন কিনেছি, পুরোনো হাল্‌কা গাড়ী, বেশ চলে যাবে মাঠের ওপর দিয়ে—'

'বাবা-মাকে বলেছিস ?'

'সে ভাই আমি পারব না। মাকে নয়, তুই বরং বাবাকে ব'লে একটু মত করিয়ে নিয়ে—।'

সে একেবারে কাকুতি মিনতি।

অগত্যা আমাকে যেতে হ'ল বাবা-মার কাছে। বাবা একটু সন্দিগ্ধ ভাবে চেয়ে রইলেন ওর মায়ের দিকে কিন্তু মা বললেন, 'তা যাক না। সত্যিই হয়ত মানসিক টানসিক আছে। আর কীই বা করবে, শান্ত তো সঙ্গে রইল।'

ছোট গাড়ী। দুলালই নিয়ে চলল আমাদের। মায়ার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম ভাল ক'রে—তাতে দুঃখ বা অশান্তির চিহ্ন নেই—সলজ্জ হাসি মুখ। আরও নিশ্চিন্ত হলুম।

গাড়ী অনেকদূরে গেলেও শেষ খানিকটা পথ হেঁটেই যেতে হ'ল। সেইজন্য দুলাল নিয়ে গেল অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী একটা আঘাটায়। বললে, 'একটু নির্জনও হবে, অথচ বেশ পরিষ্কার। এখানে আমি অনেকদিন চান করেছি।'

কিন্তু জলে নামতে গিয়ে ওর মনে পড়ল যে গামছাগুলো কাগজে জড়ানো ছিল, সে প্যাকেটটা ফেলে এসেছে গাড়ীতেই। আমার দিকে চেয়ে একটু বিপন্ন মুখেই বললে, 'শান্ত, একটু যাবি ভাই ? প্লিজ ? নয়ত—না হয় তুই থাক্‌—'

সেটা খুবই অনিচ্ছা। তাছাড়া নতুন বৌয়ের সঙ্গে নির্জন ঘাটে একা থাকব কেন ? সুতরাং আমিই আবার ফিরে গেলাম গাড়ীতে। সমস্ত পাড়টা উঠে, আরও খানিকটা গিয়ে তবে গাড়ী—যেতে আসতে মিনিট পনেরো-কুড়ি তো বটেই।

ফিরে আসবার সময় কাছাকাছি আসতেই অকস্মাৎ একটা যেন চাপা আর্তনাদ কানে এল। খানিকটা গোঙানি, খানিকটা কান্না—কিংবা ঠিক তাও নয়, অব্যক্ত একটা ভয় পাওয়ার আর্তনাদ।

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখি মায়াকে গঙ্গার জলে নামিয়ে চেপে ধরেছে দুলাল। সে ছটফট্ করছে ওর হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য। কিন্তু পাগলের বজ্রমুষ্টি থেকে ছাড়া পাওয়া তার কাজ নয়। কাছাকাছি কোথাও লোক নেই ব'লেই বোধ হয় মায়া চেঁচিয়ে ওঠে নি—কিংবা অত্যধিক ভয়েই তার গলা ধরে এসেছে, কেমন একটা অস্ফুট অস্বাভাবিক কান্নার আওয়াজ বেরোচ্ছে তার, আর দুলাল চাপা তীক্ষ্ণকণ্ঠে ওকে বলে চলেছে, 'বলো, বলো, এই গলা-জলে দাঁড়িয়ে বলো যে এর আগে তোমার আর একবার বিয়ে হয় নি। বলো বলো শিগ্‌গির!'

ক্রমশঃই কথাগুলো দ্রুত হয়ে আসছে, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, হিংস্র।

খাড়া পাড়, আগের দিনের বৃষ্টিতে পিছল, নামতে দেরি হ'ল, আমার ভয় হচ্ছিল মেয়েটা বুঝি মারাই যায়। যা নেতিয়ে পড়েছে। কোনমতে ছুটে এসে এক ঝট্‌কায় ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মায়াকে টেনে তুললুম ওপরে, তারপর রাগের চোটে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মারলুম দুলালের গালে এক চড়।

'হতভাগা বাঁদর কোথাকার। একেবারে পশু হয়ে গিয়েছ? আমরা সবাই—তোমার বাবা মা—সকলে পরামর্শ ক'রে তোমাকে ঠকিয়েছি, না?'

দুলাল মার খেয়ে রাগ করল না। এতখানি উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় কতকটা নির্জীব হয়েও পড়েছিল। ম্লান হেসে বললে, 'তোমরা ঠকাবে কেন—ঠকতেও তো পারো। এ যে আমার অদৃষ্টলিপি। ভাগ্য বলবান!'

'এত জানো, কবে মরবে জেনে রাখতে পারো নি? তাহ'লে আমরা নিশ্চিন্ত হতুম!' তখনও রাগটা সামলাতে পারি নি, হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে গেল, যদিও পরক্ষণেই বুঝলুম মায়ার সামনে বলা উচিত হয় নি।

দুলাল কিন্তু অদ্ভুত একরকম ভাবে আমার দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠেই বললে, 'কেন জানব না, জানি তো। আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর পরে আত্মহত্যা ক'রে মরতে হবে আমাকে। তিনজন জ্যোতিষীকে দেখিয়েছি।'

'তবে বিয়ে করলে কেন?' আমার কণ্ঠে বোধ হয় বিদ্রূপই ফুটে ওঠে।

'সেও যে আমার অদৃষ্ট।' সহজ ভাবে দুলাল উত্তর দেয়।

বাড়ি ফিরতে ওর বাবা সব শুনে বিষম অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। নববধূর কাছে তাঁর লজ্জা ও সঙ্কোচের শেষ রইল না। তিনি মায়ার দুটি হাত ধরে বার বার বলতে লাগলেন, 'তুমি আমাদের ক্ষমা করো বৌমা, ও যে এমন পশু হয়ে গিয়েছে তা জানতুম না—তাহলে বিয়েই দিতুন না ওর, এটা ঠিক।'

মা নিঃশব্দে চোখের জল মুছতে লাগলেন। আমিই বরং আশ্বাস দিয়ে বললুম যে, 'কিছু ভাববেন না—মায়াই সব ঠিক ক'রে নেবে'খন!'

এরপর ক্রমশঃ আবার ওর সঙ্গে সম্বন্ধ শিথিল হয়ে এল। তার প্রধান কারণ ওখানকার চাকরি ছেড়ে মীরাট চলে এসেছি অধ্যাপক হয়ে। গরমের ছুটিতেও আর বিশেষ দেশে ফেরা হয় না, কেননা বিস্তর খরচ। স্ত্রী-পুত্রকেও এখানে এনে

বাসা করেছি।

তবে খবর পাই বৈকি মধ্যে মধ্যে। দুঃসংবাদ যত।

দুলালের বাবা মারা গেছেন। মায়া বেচারী কিছুতেই ওর সঙ্গে ঘর করতে পারে নি। ঠিক কি হয়েছিল অতদূরে থেকে তার সংবাদ না জানলেও দুলালের ঐ সংশয়ই যে তাদের মনের মিল হবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এটুকু শুনেছি। কিন্তু শুনে দুঃখিত হওয়া ছাড়া আর করবার কি আছে? আমরা কি করতে পারি! পাগলের হয়ত চিকিৎসা হয়—কিন্তু কেই-বা তা চাড় ক'রে করছে?…

বছর চারেক পরে ভাই-ঝির বিবাহ উপলক্ষে দেশে ফিরেছি; খবর পেয়ে দুলালই এল দেখা করতে। ওর সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইতে আজকাল ঘৃণা বোধ হয়—কইলামও না, ও কিন্তু খানিকটা বসে থাকার পর চলে যাবার সময় আমার দুটো হাত ধরে খুব বিমর্ষভাবে বললে, 'তুই কথা না কোস্ শান্ত—তোকে কিন্তু আমি ছাড়ব না। আমার তো গোনা দিন ফুরিয়ে আসছে, মা আর মায়ার ভার তোকেই নিতে হবে। বেচারী মায়া, ওর যদি একটা ছেলেও হ'ত তবু তাকে নিয়ে দিন কাটাতে পারত, কিন্তু পাছে আবার একটা পাগল জন্মায় সেই ভয়ে ও-চেষ্টাই করি নি।'

ওহো! কথাটা তো ভুলেই গিয়েছিলুম। সেই পাঁচ বছর যে শেষ হয়ে এসেছে। কী সর্বনাশ!

অনেক বোঝালাম ওকে। খামোকা আত্মহত্যাই বা করবে কেন? কী এমন দুঃখ?

ও বললে, 'না না, দুঃখের তো কথা হচ্ছে না, বরাতে যা আছে তা ঠেকাবো কি ক'রে?'

অর্থাৎ বদ্ধ পাগল। অনেক বুঝিয়েও কোনো ফল হ'ল না। হিসেব করলাম আর মোটে তিন দিন আছে ওর সেই পাঁচ বছর পূর্ণ হবার। ছুটে গেলাম ওর মার কাছে; মা, ওদের সরকার মশাই, বুড়ো চাকর সকলকার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করলুম যে এই তিনটে দিন বিশেষ ক'রে শেষ দিনটা সবাই ওকে চোখে চোখে রাখবে, দিনরাতের এক মুহূর্তও নজর-ছাড়া করবে না। ইতিমধ্যে আমি গিয়ে জোর ক'রে মায়াকে তার বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে এলাম—যদি পুনর্মিলন একটা হয়। দুলালকে বললাম যে আমার সঙ্গে এবার কাশী চলুক, ভৃগুসংহিতার মতে ভাল ক'রে সব গনিয়ে দেব।

মনে হ'ল যেন এই কথাটা শেষ পর্যন্ত ওর প্রাণে লাগল। বেশ হাসি-খুশি হয়ে উঠল, এমন কি এ প্রস্তাবও করলে যে মায়াকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে, ভৃগুসংহিতা যদি বলে তাহ'লে আর কি, নিশ্চিন্ত হ'তে পারে ও।

তবু আমরা পাহারা শিথিল করলুম না। শেষ দিনটা সমস্ত রাত জেগে রইলেন মা আর মায়া, বুড়ো চাকর ঘরের বাইরে বসে বসে তামাক খেলে। যাই হোক ভালয় ভালয় সে দিনটা কেটে গেল।

পরের দিন সকালে উঠে ওকে ডেকে বললুম, 'কি বন্ধু তোমার মরবার দিন তো পেরিয়ে গেল। এবার বুঝলে যে ওসব কিছু নয়? ভাগ্যকে অত সহজে জানা যায় না। সে সত্যিই অ-দৃষ্ট।'

দুলাল যেন একটু বিমর্ষ ভাবেই বললে, 'হুঁ', তারপর অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন বসে বসে ভাবলে। মিনিট কতক দেখে আমি ওকে একটা ঠেলা মেরে বললুম, 'কীরে, কি ভাবছিস্?'

'না এমনি। আশ্চর্য। এতগুলো পুঁথি মিলোলুম। এত হিসেব করলুম। সব ভুল।...যাক্ গে—তাহ'লে কাশীতেই যাওয়া যাক, কি বলিস? ভাল ক'রে সব দেখিয়ে শুনিয়ে আনব নতুন ক'রে আগাগোড়া। এ্যাঁ?'

'তাই তো বলছি। সে বাবা ভৃগুসংহিতা, চালাকি তো নয়, সেখানে ভুল হবার উপায় নেই। বলিস তো লুধিয়ানায় খুব বড় করকোষ্ঠী বিচারক একজন আছেন, তাঁর কাছেও নিয়ে যেতে পারি।'

খুব জোর দিয়ে বলি কথাগুলো। যে রোগের যা মন্ত্র। কাঁটা দিয়ে যদি কাঁটা তোলা যায়, মন্দ কি?

দুলাল যেন আঁধারে কূল পেল। সাগ্রহে বললে, 'তবে ঐ কথাই পাকা রইল। কবে কলেজ খুলবে তোর? কবে যাবি এখান থেকে? আমি বলি কি ও দুটোই—'

'তাই হবে। দু'জায়গাতেই নিয়ে যাবো তোকে, ভাবছিস্ কেন!'

আশ্বাস দিয়ে বলি ওকে।

দুলাল যারপরনাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। হাঁক ডাক ক'রে অনেকদিন পরে পর পর তিন পেয়ালা চা খেয়ে আমাকে নেমন্তন্ন করে বলল, 'আজ এইখানে খেয়ে যাবি, একসঙ্গে বসে খাবো। না, না, কোন কথা শুনব না।'

দুপুরে স্নান করার আগে আমি বসে তেল মাখছি। ও বললে, 'দাঁড়া, দাড়িটা কামিয়ে নেই। এ তিনদিন ওরা তো ক্ষুর ছুঁতেই দেয় নি। অশৌচের মতো দাড়ি হয়েছে।'

তা নিক। আমি তো এই দোরে বসেই তেল মাখছি। তাছাড়া সেদিন যখন পার হয়ে গেছে, ওর মনেও নতুন আশা এসেছে, তখন আর ভয় কি!

ও চেয়ারে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল, আমার দিকে পাশ দিয়ে, জানলার দিকে মুখ ক'রে। আমিও একটু তেল মাখতে মাখতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছি। অকস্মাৎ অদ্ভুত একটা আওয়াজ, যেন হাসিরই একটা বিকৃত চেষ্টায় চমকে উঠে দেখি দুলাল ক্ষুরটা পুরো বসিয়ে দিয়েছে নিজের গলায়। তারপর হাসবার একটা চেষ্টা করতে করতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ছুটে যাবার আগেই টলে পড়ে গেল সে। মাথার কোণটা টেবিলের পায়ায় ঠেকে উঁচু হয়ে রইল। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে দুলাল, 'কী, ভাগ্য নাকি কিছু নয়, ও নাকি অ-দৃষ্ট। আমি জানি যে—'

আরও কি বলবার চেষ্টা করলে কিন্তু কথা জড়িয়ে গিয়ে একটা ঘড়-ঘড়

আওয়াজ বেরোল খানিকটা। তারপরই সব থেমে গেল। মুখের ওপর সেই বিকৃত হাসিটা শুধু স্থির হয়ে লেগে রইল।

কৌতূহল

মনোরমাকে বোধহয় দোষও দেওয়া যায় না ঠিক। কারণ দীর্ঘকালই তিনি এ কৌতূহল চেপে রেখেছিলেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেক বেশী সময় চুপ ক'রে ছিলেন। মেয়েদের হিসেবে তো অবিশ্বাস্য রকমের বেশী। পুরো একটি বছর বুকের মধ্যে প্রশ্নটা চেপে রেখে দিয়েছিলেন তিনি।

শুধু যদি নিজের কৌতূহলই হ'ত তো তবু কিছু বলবার ছিল—সেটা তো ছিলই, অহরহ তাঁকে পীড়িত ক্ষতবিক্ষত করত সে কৌতূহল—কিন্তু তাছাড়াও, বাড়িসুদ্ধ লোক তাঁকে নিরন্তর নানা প্রশ্নে বিরক্ত বিব্রত করেছে এই দীর্ঘকাল ধরেই।

কেন ?

কেন ?

কেন ?

অনবরত এই প্রশ্নের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর স্বামী—তাঁর সন্তানের পিতাও অব্যাহতি দেন নি। 'প্রশ্ন ক'রো না' বারবার-করা এই কাতর অনুরোধেও স্থির হ'তে পারেন নি তিনি—পারেন নি নিজেকে সংযত করতে। স্ত্রীর এই মৌনতা ছেলেমানুষী বলে মনে হয়েছে তাঁর—মনে হয়েছে তাঁর বুদ্ধির প্রতি ধিক্কার এটা।

তবু তিনি বা বাড়ির অপর কেউ যে সমীরকেই সোজাসুজি প্রশ্নটা ক'রে বসে নি এই রক্ষা।

তবে সেও যে পারে নি তার জন্যও মনোরমাকে প্রাণ-পণ করতে হয়েছে। বহু লোকের অপ্রীতির কারণ হয়ে কঠোর ভাবে শাসন করতে হয়েছে সবাইকে—স্বামীকে সুদ্ধ, ফলে সেই অকারণ কঠোর শাসনের কারণ দর্শাতে গিয়ে কৈফিয়ত দিতে গিয়েও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কী বলবেন তিনি, কীই বা কৈফিয়ত আছে দেবার মতো। জনে জনে মিথ্যা বলতে বলতে তাঁর কল্পনার ভাণ্ডারও আজ নিঃশেষিত। একদিকে সমীর আর একদিকে এই গোটা সংসারটা—পরিচিত অর্ধ-পরিচিত আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষে পরিপূর্ণ একটা ছোটখাটো জগৎ বলতে গেলে সেটা—এই দুইয়ের মধ্যে সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো, দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতো থাকতে হ'ত তাঁকে। এক মুহূর্তের জন্যও সে ব্যবধান সরিয়ে নেবার জো ছিল না।

কেন ?

গুরুদেবের হুকুম। গুরুদেবের অনুশাসন।

অথচ কেন যে গুরুদেবের হুকুম তা জানবার উপায় নেই। তাঁকেও বলেন নি গুরুদেব। তার চেয়েও বড় কথা—এটা যে গুরুদেবের হুকুম, তাঁরই নিষেধ—সে কথাটাও জানবার হুকুম ছিল-না। শুধু যদি এটুকুও বলতে পারতেন যে, 'গুরুদেব নিষেধ করেছেন—কেউ কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না' তাহলেও বেঁচে যেতেন তিনি, গুরুর আদেশরূপ বর্মই রক্ষা করত তাঁকে। কিন্তু সে উপায় নেই। গুরু-দেবের অমোঘ স্পষ্ট নির্দেশ, 'আমি যে এসেছিলাম—একথা যে বলে গিয়েছি, তাও কাউকে বলো না।'

চারিদিকে যেন হাত-পা বাঁধা মনোরমার। পড়ে মার খাওয়া ছাড়া তার যেন কোনো উপায় নেই।

এই গুরুদেবের কাছে তাঁর দীক্ষা নেওয়াটাও এক বিচিত্র রহস্যে জড়িত।

বোনের সঙ্গে গিয়েছিলেন হরিদ্বার দেরাদুন হয়ে মুসৌরী পাহাড়ে বেড়াতে। ভগ্নীপতি ইনকাম্-ট্যাক্স কমিশনার, সেই সুবাদে বহু লোকের সঙ্গে পরিচয়, খুব কম ভাড়ায় একটা বড় বাড়ি পেয়েছিলেন। কুলড়ী বাজারের এক প্রান্তে বাড়িটা, বাজার থেকে বেশ খানিকটা দূরে কিন্তু সে বাড়ির সঙ্গে দুটি পাহাড়ী চাকরও পেয়েছিলেন বলে কোনো অসুবিধে হয় নি—দোকান-বাজারের কাজটা তারাই করত।

এদের মধ্যে একটি চাকর তাঁর দিদিকে একদিন বলল যে ঐ যে পাশের ঘন জঙ্গল, ঐখানে আজ মাসকতক হ'ল এক খুব বড় সাধু এসে আছেন। ও পাহাড়ে 'ভালু' তো আছেই, 'শের'ও আছে, বড় ময়াল সাপও বেরোয় মধ্যে মধ্যে। কিন্তু ঐ 'মহাত্মা' ঐখানে একটা ঝোপড়ায় বাস করেন—ওঁর কোনো ভয়ডর নেই। 'ভিচ্ছা কে লিয়ে'ও নামেন না, কোনো ভক্ত কিছু পেঁাছে দিয়ে এলে সেবা করেন —নইলে কিছুই খান না।

এমনি গল্প করছিল তারা অলস মধ্যাহ্নের কর্মহীন অবসরে। রোদ পোয়াতে পোয়াতে এসব দেশে যেমন গল্প করে মানুষ।

সেই দিনই রাত্রে কিন্তু মনোরমা স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিচ্ছেন। দস্তুরমতো যেন হোম-যাগ ক'রে দীক্ষা হ'ল তাঁর—যেমন তাঁর এক মাসীমার বেলায় হ'তে দেখেছিলেন, তেমনিই। প্রত্যেকটি ক্রিয়াই বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলেন। শুধু তাই নয়, শেষরাত্রের এই স্বপ্নের ফলে উত্তেজনায় লেপের মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠে যখন ঘুম ভেঙ্গে গেল তাঁর, তখন আরও আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে স্বপ্নে লব্ধ দীক্ষার বীজমন্ত্রটি পর্যন্ত তাঁর মনে আছে। গুরু যে ইষ্ট-দেবতার ধ্যানমূর্তি দেখিয়ে দিয়েছেন সে মূর্তি মনের মধ্যে এখনও প্রত্যক্ষ জ্বল-জ্বল করছে।

ঐ বিচিত্র স্বপ্নের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তাঁকে সারা সকালটাই যেন কেমন অভিভূত ক'রে রাখল। কিন্তু সেইখানেই বিস্ময়ের শেষ নয়। সেই দিনই ডাকে

তাঁর স্বামী হরিশবাবুর কাছ থেকে এক বিচিত্রতর চিঠি পেলেন তিনি। এটা ওটা প্রয়োজনীয় কথায় শেষে হরিশবাবু লিখেছেন : "দ্যাখো, একটা কথা ভাবছিলুম, তোমার অত দীক্ষা নেওয়ার শখ, অথচ আমার জন্যে যদি অপেক্ষা করতে হয় তাহ'লে হয়তো অনন্তকালেও ও কার্যটি তোমার হয়ে উঠবে না। কারণ ওসবে আমি আজও তেমন বিশ্বাসী নই, কোনদিন হবো কিনা তাও জানি না। তবে তোমার যদি ইচ্ছা হয় তো তুমি নিতে পার, আমার জন্যে তোমার কোনো ইতস্ততঃ করার দরকার নেই। শুনেছি এক্ষেত্রে স্বামীর একটা অনুমতি প্রয়োজন হয়—সে অনুমতি আমি লিখিতভাবেই দিয়ে রাখছি। কথাটা লিখলুম এই জন্যে যে হরিদ্বারের দিকে অনেক ভাল ভাল সাধুসন্ন্যাসী আছেন শুনেছি, তেমন কারও যদি দেখা পাও এবং তাঁর কাছে তোমার দীক্ষা নিতে ইচ্ছা হয় তো নিয়ে নিতে পারবে। আমাদের গুরুবংশ নাকি লোপ পেয়েছে, সুতরাং সেদিক দিয়েও কোনো বাধা নেই। আমার তরফ থেকেও কোনো বাধা রইল না।"

রাত্রের স্বপ্ন এবং পরবর্তী দিনের এই চিঠি—এ দুটোর মধ্যে বাহ্যতঃ কোনো যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু মনোরমার এই চিঠিটা পড়তে পড়তে বার বার রোমাঞ্চ হ'তে লাগল। এর মধ্যে তিনি ঈশ্বরেরই স্পষ্ট নির্দেশ দেখতে পেলেন। তিনি তখনই দিদিকে গিয়ে চেপে ধরলেন—ঐ সাধুকে দর্শন করতে যাবেন একবার।

দিদি তো অবাক। মাথা খারাপ হ'ল নাকি মনোরমার। কোথায় যাবে সে সাধু দর্শন করতে। কে না কে সাধু—ঐ দুর্গম পাহাড়ের ওপর জঙ্গলে বাস করে—সাধু কিংবা চোর-ডাকাত-বদমাইশ কেউ তার ঠিক নেই—এসব অশিক্ষিত পাহাড়ীদের কাছে গেরুয়াপরা বা ছাইমাখা লোক মাত্রেই মহাত্মা, ওদের কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে! ওদের কথায় যারা নাচে তাদের চেয়ে আহাম্মক বোধহয় দুনিয়ায় আর দুটি নেই। ইত্যাদি, ইত্যাদি—

প্রতিনিবৃত্ত করার যত রকম চেষ্টা সম্ভব তা সবই করলেন দিদি কিন্তু মনোরমার তখন জিদ চেপে গিয়েছে। তিনি একবার স্বচক্ষে দেখবেন ঐ সাধুই তাঁর স্বপ্নে-দেখা সেই গুরুদেব কি না।

অনেক তর্কবিতর্ক রাগারাগির পর দিদি হাল ছাড়তে বাধ্য হলেন। তবে তাঁর নিজের বাতের শরীর, তিনি ঐসব খাড়া পাকদণ্ডী পথ ভাঙ্গতে রাজী নন। মনোরমার মাথায় যখন 'ছোমা' চেপেছে তখন সে যেতে পারে, পাহাড়ী দুজন চাকরকেই সঙ্গে নিয়ে খাওয়াদাওয়ার পর কাল সকাল সকাল যেন বেরিয়ে পড়ে, যাতে বিকেলে চায়ের সময়ে ফিরে আসার কোনো অসুবিধা না হয়।

তাইতেই রাজী হলেন মনোরমা কিন্তু কৌশলে খাওয়ার ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন। ভরা-পেটে পাহাড় ভাঙ্গতে অসুবিধা হবে এই অজুহাতে একটু দুধ ছাড়া কিছুই খেতে রাজী হলেন না। কিছুদিন আগেই হরিদ্বারে এক পণ্ডিতের কাছে শুনেছেন, দুধ জল ফলের রস ও ঔষধ, এগুলি খাওয়ার মধ্যে ধর্তব্য নয়, এসব খেয়েও দেবকর্ম চলে।

সাধু দর্শনের পুণ্য—সে যথার্থ সাধু হয় তো দেবদর্শনেরও বেশী। সে পুণ্যফল খোয়াতে রাজী নন তিনি।

মনে মনে একটা আবছা আকারহীন আশা থাকলেও সেখানে গিয়ে যে ঠিক স্বপ্নে-দেখা সাধুকেই দেখতে পাবেন শেষ পর্যন্ত এমন আশা করতে সাহস করেন নি মনোরমা। কিন্তু সেই অঘটনই ঘটল। ওঁদের চাকর পিয়ারেলাল প্রথমেই যে সাধুর ঝোপড়ায় গিয়ে পৌঁছল তিনিই ওঁর সেই স্বপ্নে দেখা গুরু।

বলা বাহুল্য মনোরমা একেবারে তাঁর পায়ের ওপর আছড়ে পড়লেন।—'ঈশ্বর আমাকে হাত ধরে এখানে টেনে এনেছেন বাবা, আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না, দীক্ষা দিন দয়া ক'রে।'

সন্ন্যাসী হাসলেন একটু। তারপর বললেন, 'যে ঈশ্বর হাত ধরে টেনে এনেছেন বেটি, সেই ঈশ্বরই তো তোকে দীক্ষা দিইয়ে দিয়েছেন। ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারিস না কেন?'

গা শিউরে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন মনোরমা। দু' হাত জোড় ক'রে বললেন, 'তাহ'লে স্বপ্নে যে মন্ত্র পেয়েছি ও-ই আমার গুরুদত্ত বীজ বাবা?'

চুপ ক'রে রইলেন সন্ন্যাসী। ঈষৎ যেন বিরক্তির কুঞ্চন তাঁর ভ্রূতে। এক কথা একশোবার বলতে গেলে যেমন বিরক্তি বোধ হয়—তেমনই।

আবারও ভয়ে ভয়ে বললেন মনোরমা, 'আপনার মুখ থেকে একবার মন্ত্রটা পাব না বাবা?'

'না।' রূঢ় শোনাল সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর, 'যা পেয়েছ তা ভগবান দিয়েছেন, খুশী হয় তো মাথায় তুলে নাও, না হয় তো ছেড়ে দাও, আমাকে আর দিক্ ক'রো না।'

মাথা হেঁট ক'রে বললেন মনোরমা, 'অপরাধ মাপ করবেন বাবা। অল্পবুদ্ধি মেয়েছেলে আমরা—কী বলতে কী বলে ফেলি। মাথায় ক'রেই নিলাম। কিন্তু আপনার কাছে আসতে পারব তো?'

'না।' আবারও সেই কঠিন রূঢ় অনুজ্ঞা, 'এখানে থাকব না। অন্য কোথাও চলে যাব।'

'আর কখনও কোনদিনই আপনার দেখা পাব না বাবা? যদি কখনও কোনো দরকার হয়?'

'যদি দরকার হয় তো আমিই তোমাকে দেখা দেব। আর সে দরকার আমিই বুঝব।'

এরপর আর কথা চলে না। দূর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে চলে আসতে হ'ল। সঙ্গে কিছু ফল ও মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলো একটু ভয়ে ভয়েই নামিয়ে দিয়ে এলেন। শুধু আর একটি প্রশ্ন করলেন আসার আগে, 'বাবা, গুরু-দক্ষিণা তো একটা দিতে হয় শুনেছি—।'

'আমি কি দীক্ষা দিয়েছি তোকে? যে দিয়েছে, যেভাবে পেয়েছিস সেই ভাবেই

তো তাকে দক্ষিণা দেবার কথা। দিস্ নি?'

তখন মনে পড়ল যে স্বপ্নে তিনি দক্ষিণাও দিয়েছেন গুরুকে। কী দিয়েছেন তা আর মনে নেই, তবে কী যেন একটা দিলেন সেটা মনে আছে।

ঘাড় নেড়ে নীরবেই চলে এলেন মনোরমা।

এরপর বহুদিন চলে গেছে। ছেলের বয়স ছিল তখন দশ-বারো। এখন তেইশ-চব্বিশ হবে। ঠিক ঠিক সন তারিখের হিসেবটা রাখতে পারেন নি মনোরমা। প্রয়োজনও বোধ হয় নি তেমন।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁদের কলকাতার বাড়িতেই এসে উপস্থিত হলেন সেই সন্ন্যাসী।

সে সময়টা বাড়িতে কেউ নেই। হরিশবাবুর তখনও ফেরার সময় হয় নি; সমীর গেছে তার ক্লাবের হয়ে খেলতে বাইরে কোথায়—ফিরতে রাত হবে। মেয়ে দুটিই বিদেশে। গরমের ছুটি উপলক্ষে মাসীর বাড়ি গেছে আম খেতে। ওদের মেসোমশায় নিজে এসে নিয়ে গেছেন। থাকার মধ্যে আছে এক ঠাকুর চাকর—তারা সে সময় রান্নার দিকে ব্যস্ত। বলতে গেলে গোটা বাড়িটাতেই মনোরমা তখন একা। তিনিও সদ্য গা-ধোওয়া শেষ ক'রে ছাদে উঠেছেন। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় কলকাতার বাড়ির ছাদে ছাদে অদ্ভুত একটা হাওয়া বইতে থাকে, মিষ্টি লোভনীয় বাতাস—সে হাওয়া কোথা থেকে আসে, এই ঘিঞ্জি গলির মধ্যে কেমন ক'রে প্রবেশ করে তা কেউ জানে না। মনোরমাও সেই দুর্লভ হাওয়াটুকু উপভোগ করছিলেন। সন্ধ্যা যে প্রায় উৎরে যেতে বসেছে, ঠাকুরদের তাকে তখনও প্রদীপ বা ধূপধুনো পড়ে নি—পুরুষরা আসবার আগেই নিরিবিলি আহ্নিক পুজোটা সেরে নেওয়া দরকার—এ সব কথাই মনে ছিল তাঁর। তবু হাওয়ার মায়া কাটিয়ে যেতে পারছিলেন না। অবশেষে যখন আশপাশের বাড়ির ছাদগুলোও ঝাপ্সা হয়ে আসতে লাগল তখন আর কোনমতেই থাকা গেল না। আর ঠিক সেই সময়ই—নীচে নামবার জন্য পিছন ফিরেই দেখলেন সিঁড়ির দরজার কাছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর গুরুদেব।

অনেকদিনের কথা তবু চিনতে দেরি হ'ল না। কারণ চেহারা ওঁর এতটুকু বদলায় নি। ঠিক যেমনটি দেখেছিলেন—স্বপ্নে ও চাক্ষুষ—সেই দশ-বারো বছর আগে—ঠিক তেমনিটিই আছেন।

তবে চমকে উঠেছিলেন ঠিকই। ভয়ও একটু পেয়েছিলেন। কখন কি ক'রে উঠে এসেছেন উনি—এতটুকু টের পান নি মনোরমা। পায়ের শব্দও পান নি। এই আধো অন্ধকারে হঠাৎ এমন ভাবে নিঃশব্দে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে ভয় পাবারই কথা। ঠিক দেখছেন কি না—সে সন্দেহও একটু হয়েছিল। শঙ্কা সংশয় অবিশ্বাস সবটা জড়িয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন বিমূঢ় বিহ্বলতায় তাঁকে অনড় ক'রে দিয়েছিল।

কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তেই।

তারপরই দ্রুত ছুটে এসে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছিলেন।

'এতদিনে কি মেয়েকে আপনার মনে পড়ল বাবা! এতদিনে আসবার সময় হ'ল আপনার!'

অভিমান-গাঢ় কণ্ঠস্বর। ভক্তিতে আবেগে রুদ্ধপ্রায়।

কিন্তু সে অভিমান বা আবেগ সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করল বলে মনেও হ'ল না। তিনি সহজ অবিচলিত কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ মা, আজই আমার সময় হ'ল। কিন্তু শোন্, আমার হাতে বেশী সময় নেই, এখনই আমাকে চলে যেতে হবে। সময় তোর হাতে আরও অল্প। কেন তা এখনই বুঝবি। তোর ছেলের সামনে খুব বিপদ। কী বিপদ তা বোঝাতে পারব না তোকে—তুইও জানতে চাস নি। ওর বাঁচবার আশা খুবই অল্প, সাধারণ কারও সাধ্য নেই যে বাঁচায়। এক তুইই পারিস ওকে বাঁচাতে—কিন্তু যা বলব তাই শুনতে হবে। দেখ, রাজি আছিস?'

কী শুনছেন তা মনোরমা ভাল ক'রে বুঝতেই পারেন নি তখনও। তিনি জেগে আছেন না ঘুমোচ্ছেন—যা দেখছেন বা শুনছেন তা বাস্তব না স্বপ্ন—কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। শুধু একটা কথাই এর মধ্যে মাথায় ঢুকেছে যে তাঁর সমীরের খুব বিপদ, তার জীবন-সংশয়।

তিনি তেমনি আচ্ছন্ন বিহ্বলতার মধ্যেই কতকটা যন্ত্রচালিতের মতো উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, যা বলবেন তাই শুনব। কিন্তু কী রকম বিপদ আমার সমীরের—কী হবে তার বাবা?'

সে কথার উত্তর দিলেন না গুরুদেব, কথাটা শুনতে পেলেন কিনা তাও বোঝা গেল না। তিনি শুধু বললেন, 'আজ শেষ রাত্রি থেকে ওর জ্বর হবে। অজ্ঞান অচৈতন্য জ্বর। ভুল বকবে, ভয় পাবে। ডাক্তার ডাকতে পারিস কিন্তু কোনো ফল হবে না। কাল থেকে তিন দিন—দিন ঠিক নয়—তিন রাত ওর সমূহ বিপদ। সন্ধ্যার আগে থেকে সূর্যোদয়ের পর পর্যন্ত ওর বিছানায় ওকে ছুঁয়ে বসে থাকতে হবে তোকে। কোনো কারণেই উঠতে পাবি না ওকে ছেড়ে। ছেলের যা-ই হোক, যত অসুস্থই বোধ হোক—তুই উঠবি না। ভীষণ ভয় পাবে মধ্যে মধ্যে—সে আতঙ্কে ওর মুখ-চোখের অবস্থা হয়ে উঠবে ভয়ংকর, বিকট বিকট চিৎকার ক'রে উঠবে হয়তো সে-সময়, সে চিৎকারে বুকের রক্ত জল হয়ে যাবে হয়তো—কিন্তু তুই ভয় পাস নি, আর—যা বললুম, ওকে ছেড়ে বিছানা ছেড়ে উঠিস নি। তিন রাত্রি কাটাতে পারলে আর কোনো ভয় নেই। তবে ছেলেকে কখনও জিজ্ঞাসা করিস নি যে কী দেখছে ও, কেন ভয় পাচ্ছে। আর আমি যে এসেছিলুম, এই কথা বলে গেছি—একথাও না কেউ টের পায়। কাউকে বলতে পারবি না—কোনদিন। এ আমার আদেশ, মনে থাকে যেন!'

'মনে থাকবে বাবা। কিন্তু সমীর—সমীর আমার বাঁচবে তো?'

'যা বললুম তা যদি ঠিক ঠিক করতে পারিস তো বাঁচবে!'

তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন—অর্থাৎ নীচে নামবেন।

প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন মনোরমা, 'আপনি সত্যি সত্যিই এখনই চলে যাবেন বাবা? একটুও বসবেন না? একটা দিনও একটু গুরুসেবা করতে পারব না?'

'না। আজ আর সময় হবে না। সময় তোরও নেই বেটি, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার চেষ্টা করিস নি। ছেলের কথা ভাব, ইষ্টকে চিন্তা কর!'

বলতে বলতেই নেমে গেলেন তিনি। মনোরমা প্রণাম করবার জন্য ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, মাথা তুলে আর দেখতে পেলেন না। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমনিই নিঃশব্দে চলে গেছেন। ছুটে নিচে নেমে এলেন তিনিও, পাগলের মতো সদর দরজা খুলে রাস্তাতেও বেরিয়ে এলেন কিন্তু কোথাও দেখা গেল না সে সন্ন্যাসীকে। যেন বাতাসে মিশিয়ে গেছেন তিনি, শূন্যে অন্তর্হিত হয়েছেন। ফিরে এসে ঠাকুর চাকরকে প্রশ্ন করলেন কিন্তু তারা কিছুই জানে না। শুধু যাওয়া নয়, ওঁর আসাও টের পায় নি তারা—রীতিমতো অবাক হয়ে গেল মনোরমার কথা শুনে। আরও খানিক বৃথা এঘর ওঘর করার পর তিনি যখন তাঁর শোবার ঘরে ঠাকুরের তাকের সামনে এসে বসলেন তাঁরই এক একবার সন্দেহ হ'তে লাগল যে তিনি সত্যিই দেখেছেন তাঁর গুরুদেবকে—না এটা আগাগোড়া স্বপ্ন একটা। জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখেছেন হয়তো—কিংবা মাথার গোলমালে সবটা কল্পনা করেছেন।

কিন্তু সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ রইল না, যখন মাঝরাত্রে পাশের ঘরে ছেলের গোঙানিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল তাঁর।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল সন্ধ্যাবেলার ঘটনাটা। ধড়মড়িয়ে উঠে আলো জেবলে পাশের ঘরে এলেন। দেখলেন সমীরই ঘুমের মধ্যে গোঙাচ্ছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন অস্বাভাবিক তাপ—জ্বর একশো চার-পাঁচের কম নয়।

ওঁর হাঁকডাকে হরিশবাবুও উঠলেন। তখনই ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিলেন, মনোরমা নিষেধ করলেন। বললেন, 'এত রাত্রে কোথায় ডাক্তার পাবে, কেউই হয়তো আসতে চাইবেন না, তাছাড়া এই তো সবে এখন জ্বর এল, ডাক্তার এসে কিছু বুঝতে পারবেন না। তার চেয়ে কাল ভোরেই যেয়ো—এখন বরং তুমি একটু ধরো, ওর মাথাটা ধুইয়ে দিই, জ্বর খুব বেশী, সেই জন্যেই এত গোঙাচ্ছে, হয়তো মাথার যন্ত্রণাও আছে।'

অগত্যা হরিশবাবু নিরস্ত হলেন। অপ্রসন্ন মুখে বালতি ক'রে জল এনে বিছানার প্রান্তে খবরের কাগজ পেতে মাথা ধোয়াতে ধোয়াতে গজগজ করতে লাগলেন, 'দিন দিন যেন বদভ্যেস বাড়ছে ছেলেপুলেদের, যেখানে সেখানে ফুটবল খেলতে যাবেন, যা-তা খাবেন আর ফিরে এসে ঘামের ওপর বালতি বালতি জল ঢালবেন। মনে করেন যে বাবা মা সব ওল্ড্ হ্যাগার্ড্স্—ওরা কেবল বাজে বকে! আর ওঁদের লোহার শরীর, কিছুতেই কিছু হবে না। হ'লে তো সেই মাগো আর

বাবাগো। ম্যাও সামলাতে তো সেই ওল্‌ড্‌ হ্যাগার্ডের দল! কৈ, তখন তো বন্ধু-বান্ধবরা কেউ আসে না। যাদের সঙ্গে হৈ হৈ ক'রে খেলতে যাও!…তোমারও দোষ আছে, এক ছেলে বলে আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে একটি বাঁদর ক'রে তুলেছ, একটিও কথা শোনে না!' ইত্যাদি। শেষের খোঁচাটা বলা বাহুল্য মনোরমাকে। অন্য সময় হ'লে সে খোঁচা তিনি নীরবে হজম করতেন না, কারণ অন্যায় আদর হরিশবাবুই দেন চিরকাল, যা কিছু শাসন বরং করেন মনোরমাই কিন্তু আজ আর কোনো উত্তর দিলেন না তিনি। কথাগুলো সব তাঁর কানেও যায় নি। ভাবছিলেন সন্ধ্যার সেই প্রায়-স্বপ্নে-দেখা ঘটনাটার কথা। ভয়ে পাথর হয়ে গেছেন যেন তিনি, স্বামীকে সাহায্য করতেও হাত পা উঠছে না আর। তাঁর কেবলই ভয় হচ্ছে যে তাঁর বুকের এই অস্বাভাবিক ধকধকানি না বাইরে থেকেই হরিশবাবু শুনতে পান এবং কৈফিয়ত চেয়ে বসেন, এত ভয়ের কারণ কি! সাধারণ জ্বর বৈ তো আর কিছু নয়!

আরও ভয় করছে ওঁর—পারবেন তো গুরুদেবের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে? যদি না পারেন—? ভাবতেও যে পারছেন না—যদি না পারেন তো কী হবে। বড় সাংঘাতিক কথা যে বলে গেছেন তিনি—সেই সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী সন্ন্যাসী। বড় সর্বনেশে কথা!…

পরের দিন সকালেই হরিশবাবু ডাক্তার ডেকে আনলেন। থার্মোমিটার বাড়িতে ছিল না কিন্তু জ্বর যে একশো চার-পাঁচের কম নয় তা গায়ে হাত দিয়েই বোঝা যাচ্ছে। বার বার মাথা ধোয়ানোতেও কমে নি সে জ্বর। ডাক্তার অবশ্য ওঁকে অভয় দিলেন যে আজকালকার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাগুলো এই রকমই হচ্ছে, বড় ব্যাদ্‌ড়া জ্বর, সহজে নামতে চায় না। একেবারে ছুঁলেই একশো চার। হরিশবাবুর কথাই ঠিক, এই গরমে রোদে পুড়ে জলে ভিজে ফুটবল খেলার ফলেই এটা বেশী হয় ছেলেদের। কথা তো শোনে না, ঠাণ্ডা-গরমে সর্দিগর্মি মতো হয়।

কিন্তু বাড়িতে এসে ভাল ক'রে রোগীকে পরীক্ষা করার পর ডাক্তারের মুখে যে একটু বিহ্বলতা ফুটে উঠল তা হরিশবাবু লক্ষ্য না করলেও মনোরমা করলেন। সর্দি নেই কোথাও, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার অন্য কোনো লক্ষণই নেই। হয়তো মাথার যন্ত্রণা আছে—তা নইলে আচ্ছন্ন অবস্থাতেও অল্প গোঙাবে কেন! তবে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ঠিক নয়—এটা ডাক্তার তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতায় বেশ বুঝেছেন। তাহ'লে কি এণ্টেরিক জাতীয় জ্বর? কিন্তু পেটফাঁপ ইত্যাদিও তো কিছু নেই। অবশ্য সে সব পরেও হ'তে পারে। তবে—?

ডাক্তার কিছুক্ষণ বিমূঢ় ভাবে বসে থেকে একটা মিক্সচার ও একটা পাউডার দিয়ে চলে গেলেন। কিছুই ঠিক বুঝতে পারছেন না যখন তখন সব দিক আগলে সাধারণ কতকগুলো ওষুধ দেওয়াই ভাল। এখন আর কিছুই করবার নেই। হরিশবাবুকে একটা থার্মোমিটার কিনে এনে জ্বরটা নিয়মিত লিখে রাখার নির্দেশ দিলেন। একশো চার থেকে যদি কিছুতে কমতে না চায় তো মাথায় বরফ চালাতে

হবে একথাও জানিয়ে দিয়ে গেলেন।

জ্বর সারাদিনে একবারও নামল না। নামবে না তা মনোরমা তো জানেনই, সে জন্য খুব বেশী বিচলিত হলেন না। তিনি বিচলিত অন্য কারণে; আসন্ন রাত্রি ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে একপা একপা ক'রে। দুরূহ পরীক্ষা সামনে। মনোরমা কি পারবেন সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে? কী করতে হবে, ঠিক কতটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তাঁকে সেটাও যদি জানতেন। অজানা বিপদকে অজ্ঞাত সঙ্কটকেই যে বেশী ভয়।

তবু প্রস্তুত হলেন তিনি সাধ্যমতো। মা কামাখ্যার রক্তবস্ত্র নিয়ে আঁচলে বাঁধলেন, কালীঘাটের নির্মাল্য আনিয়ে রাখলেন ছেলের বালিশের নিচে। নিজে দ্বিপ্রহরের পর আর জলবিন্দুটুকু গ্রহণ করলেন না, পাছে প্রাকৃতিক কারণে উঠতে হয়। কোনো কারণেই ছেলের বিছানা ছাড়া যাবে না—গুরুদেবের এ নির্দেশ তিনি ভোলেন নি। তিনি যে কিছু খেলেন না তাতে অবশ্য বিস্মিতও হ'ল না কেউ, কারণ ছেলে কিছু খাচ্ছে না—এ অবস্থায় মার গলা দিয়ে কিছু না-নামাই তো স্বাভাবিক।

সন্ধ্যার পর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই কাটল। কোনো অঘটনই ঘটল না। রোগী অবশ্য তেমনি বেহুঁশ অবস্থাতেই পড়ে আছে। ভেতরে ভেতরে যে কষ্ট হচ্ছে একটা, মধ্যে মধ্যে সামান্য অস্পষ্ট একটা গোঙানিতে সেটা বোঝা যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে শুকনো ঠোঁট দুটো বিস্ফারিত ক'রে কী যেন বলতে চাইছে—জল চাইছে অনুমান ক'রেই জল দিচ্ছেন মনোরমা এক এক চামচ। ডাবের জল, গ্লুকোজের জল সবই তৈরী—কিন্তু খেতে না পারলে খাওয়াবেন কেমন ক'রে।

বসেছিলেন হরিশবাবুও—সন্ধ্যা পর্যন্ত জ্বর না কমতে বড় ডাক্তার ডাকতে চেয়েছিলেন, মনোরমাই ডাকতে দেন নি। বলেছিলেন, 'অন্য কোনো রোগের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না—বড় ডাক্তার এসেও কিছু বুঝবেন না। একটা দিন যাক, তখন ডাকলেই হবে। ইনিও, বেশ বুঝতে পারছি, আঁধারে ঢিল ছুঁড়েছেন—যাঁকে ডাকবে তিনিও তাই করবেন।'

অগত্যা হরিশবাবু সে চেষ্টা করতে পারেন নি। বসেই ছিলেন চুপ ক'রে, আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় জ্বর দেখছিলেন—মনোরমাই জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলেন একটু শুতে।

'দুজনেই রাত জেগে তো লাভ নেই। বরং তুমি এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে রাখলে কাল দিনের বেলায় দেখতে পারবে, আমি তখন গড়াতে পারব। আর যখন কেউ নেই, আমাদের দুজনকেই দেখতে হবে—তখন যাতে একটু খাড়া থাকতে পারি সেদিকটাতেও লক্ষ্য রাখা দরকার তো।'

তবু তখনই যেতে পারেন নি। মনোরমার পীড়াপীড়িতে বলেছিলেন, 'তা তুমিই না হয় রাতটা একটু বিশ্রাম নাও না, আমিই না হয় বসি—'

'না', দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন মনোরমা। 'রাত্তিরবেলা ছেলেকে কারুর হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা হবে না, তোমার হাতেও না।'

অগত্যা আরও খানিকটা দেখে পাশের ঘরে শুতে গিয়েছিলেন হরিশবাবু। মনোরমা একাই ছিলেন ছেলের পাশে। ভয় খুবই হচ্ছিল কিন্তু তাঁর এটা উভয়-সঙ্কট। কী না জানি ঘটবে—সেটা হরিশবাবুর সামনে না ঘটাই ভাল। নানান্ প্রশ্ন, উদগ্র কৌতূহলের সামনে মনোরমার কথাটা চেপে থাকা শক্ত হবে হয়তো। আবার ভয় হচ্ছে, একা সেই অজানা ভয়ঙ্করের সম্মুখীন হ'তে পারবেন তো? এতটা ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে বিপদ বাড়িয়েই তুলছেন না তো?···

এই দ্বিধার টানাটানিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষ অবধি যে যুক্তি তিনি হরিশ-বাবুকে দেখিয়েছিলেন, সেই যুক্তিই সজোরে আঁকড়ে ধরলেন। সত্যিই দুজনে রাত জাগলে মুশকিল—কাল দিনের বেলায় দুজনেই অবসন্ন হয়ে পড়বেন, তখন দেখবে কে? মেয়েদের কাছে টেলিগ্রাম গেছে বটে তবে যত তাড়াতাড়িই হোক কাল সন্ধ্যার আগে তারা পৌঁছতে পারবে না।

রাত বারোটারও বেশ খানিকটা পরে সমীরের সেই বেহুঁশ ভাবটা যেন অনেকটা কেটে এল। সে চোখ মেলে মার মুখের দিকে চেয়ে যেন চিনতেও পারল তাঁকে। এবার আর ঠোঁট নেড়ে নয়—কথা কয়েই জানাল, 'জল। জল দাও।'

সব হাতের কাছেই গুছিয়ে নিয়ে বসেছিলেন মনোরমা। তাড়াতাড়ি ফিডিং কাপে একটু গ্লুকোজ গুলে নিয়ে খাওয়াতে গেলেন কিন্তু সে জল ওর মুখে যাওয়ার আগেই এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেল।

ঘরের দরজার দিকে মুখ ক'রে শুয়ে ছিল সমীর। চোখ মেলে পাশে মার মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল—এবার জল খাওয়ার জন্য মুখটা সোজা করতেই চোখটা গেল দরজার দিকে—আর সঙ্গে সঙ্গে বিকট একটা চিৎকার ক'রে উঠল।

তার আগে বা পরে চিৎকার অনেক শুনেছেন মনোরমা কিন্তু এরকম আর কখনও শোনেন নি। তাকে বিকট বললে কিছুই বলা হয় না। পৈশাচিক বলতে কি বোঝায় তা মনোরমা অবশ্য জানেন না—তবে একটা যা অস্পষ্ট ধারণা হয়, এ তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী ভয়াবহ। সে চিৎকার শুনলে সমস্ত শরীর যেন কেমন অবশ হয়ে আসে, বুকের মধ্যে কাঁপুনি লাগে। মনোরমার মনে হ'ল তাঁর মাথা থেকে মেরুদণ্ড বেয়ে যেন বরফের মতো কি একটা জিনিস নেমে গেল।

আরও অবিশ্বাস্য—এই চিৎকার কি সত্যিই তাঁর সমীরের গলা দিয়ে বেরোল? এ যে সুস্থ শরীরেও ওর পক্ষে গলা দিয়ে বার করা সম্ভব বলে মনে করেন না মনোরমা। তবে এখন, এই প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা প্রবল জ্বর ভোগার পর এ চিৎকার বেরোল কী ক'রে?

কিন্তু এত কিছুও ভাববার অবসর পেলেন না মনোরমা।

কারণ আবারও—প্রায় প্রথম চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই, আরও দুবার চিৎকার

ক'রে উঠল সমীর। তেমনিই পৈশাচিক, তেমনিই ভয়াবহ—তেমনিই গায়ের-রক্ত-জল-করা। সে চিৎকারে সত্যি সত্যিই হাত-পা অবশ হয়ে গেল তাঁর—সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হ'ল মাথার চুলগুলোও বোধহয় খাড়া হয়ে উঠেছে।

অথচ একটি মুহূর্তও সময় পেলেন না মনোরমা নিজের শিথিল স্নায়ুকে গুছিয়ে শক্ত ক'রে নেবার। কারণ শুধু তো চিৎকারই নয়—ঐ দোরের দিকে ফিরে চিৎকার করতে করতেই সে উঠে পড়বার চেষ্টা করল, উঠে বসলও সে চোখের নিমেষে।

সময় নেই, একটুও সময় নেই আর।

হে গুরুদেব, হে গুরুদেব, রক্ষা কর, বল দাও।

মনোরমা বোধহয় প্রাণপণ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগেই শুধু হাত-পাগুলোকে যেন কোনমতে কর্মক্ষম ক'রে তুললেন। আর কিছু ভেবে না পেয়ে দু'হাতে ছেলের গলা জড়িয়ে ধ'রে ঝুলে পড়লেন একেবারে।

তবু কী ধ'রে রাখতে পারেন! একে জোয়ান ছেলে তায় তখন যেন পাগল হয়ে উঠেছে! মত্ত হস্তীর বল বলতে গেলে। 'পাগলের বল হাতীর বল' বলতেন মনোরমার বাবা, সেই কথাটা অত দুঃখের মধ্যেও মনে পড়ে গেল।

পারতেন না হয়তো কিছুতেই যদি না সেই বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে ওঘর থেকে হরিশবাবু আর বাইরে থেকে কেষ্ট চাকর ছুটে আসত। ওরাও চেপে ধরল দুজনে। কিন্তু তবু যেন ধ'রে রাখা যায় না! তেড়ে তেড়ে ওঠে বার বার আর চিৎকার করতে থাকে। কেষ্ট চাকর দোরের বাইরেই বারান্দায় শুয়ে ছিল—ঘুম ভেঙ্গে ভয় পেয়ে ভেতরে এসেছে সে ভেজানো দোর খুলে—আবার বন্ধ করবার তার অবসরও হয় নি, মনেও ছিল না। এখন সেই খোলা দোরের দিক চেয়ে যেন চিৎকারের উগ্রতা ও ভয়াবহতা আরও বেড়ে গেল। সেও ভয় পেয়েছে, প্রবল ভয় কিছু। কিন্তু এত ভয়ে কি গলা দিয়ে এরকম প্রচণ্ড শব্দ বেরোয়? মনোরমার মনে হ'ল ওর মধ্যে যেন অশরীরী কোনো দ্বিতীয় প্রাণীর ভর হয়েছে—এ আওয়াজ তারই।

হরিশবাবু বললেন, 'কোনমতে তোমরা ধরে থাক, আমি ডাক্তার ডাকি—'

'না না'—কেঁপে উঠলেন মনোরমা, আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, 'ওকে ছেড়ে যেও না। কিছুতেই উঠতে দিও না বিছানা ছেড়ে—কিছুতেই না ওঠে—'

অবশ্য তখন নিচে থেকে ঠাকুরও ছুটে এসেছে। না এসে উপায় নেই। সে চিৎকারে পাথর ছাড়া কারুর ঘুমনো সম্ভব নয়। আশপাশে বহু বাড়িরই জানলায় জানলায় আলো জ্বলে উঠেছে—কৌতূহলী উৎসুক মুখ দেখা যাচ্ছে। নেহাৎ কলকাতা বলে তাই—দেশে-ঘাটে হ'লে লোক ছুটে চলে আসত এতক্ষণে।

হরিশবাবু ঠাকুরকেই পাঠালেন পাড়ার ডাক্তারকে ডেকে আনতে। কিন্তু ততক্ষণে শুধু চিৎকারই নয়, ভুল বকাও শুরু হয়েছে। ভয় পাওয়ারই কথা সে সব।

'না—না—না। আমি না, আমি না। আমি যাব না। আমি যাব না!—সরে যা। সরে যা। চলে যা সামনে থেকে। মা আমাকে বাঁচাও। মা আমাকে বাঁচাও!'

আবার কখনও বলে, 'যাচ্ছি। যাচ্ছি। দোহাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। মেরো না। আমি যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি।'

এমনি ধরণের ভুল বকা আর মাঝে মাঝে সেই অবর্ণনীয় চিৎকার।

এইভাবেই কাটল সারারাত। রাত তিনটে নাগাদ ডাক্তার এসে কড়া ঘুমের ওষুধ ইঞ্জেকশ্যন দিলেন, মাথায় বরফ চেপে ধরে মাথা ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না—ঘুম তো দূরের কথা, একটু অবসাদ পর্যন্ত এল না।

অবশেষে একেবারে শেষ রাত্রে, আকাশের পূর্বপ্রান্তে ঊষার আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর, যেন নিতান্ত শারীরিক শ্রান্তিতেই এলিয়ে পড়ল সমীর। কিংবা বোধ করি সেই ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়া এতক্ষণে শুরু হ'ল তার স্নায়ুতে। কিন্তু তবু, মনোরমার মনে হ'ল, এও ঘুম নয় ঠিক, গত কাল দিনের বেলার মতো বেহুঁশ হয়েই আছে শুধু।

হরিশবাবু সকালে ছুটোছুটি ক'রে বড় ডাক্তার আনলেন। বৃথা জেনেও মনোরমা বাধা দিতে পারলেন না, কারণ তা'হলে অনেক জবাবদিহির মধ্যে পড়তে হবে। বড় ডাক্তার এসে লম্বা প্রেসক্রিপশ্যন্ করলেন, ওষুধে ইঞ্জেকশ্যনে ডাক্তারের ফীয়ে দেখতে দেখতে শ' দুই টাকা খরচ হয়ে গেল কিন্তু সে ডাক্তারও স্বীকার করলেন যে, রোগ এখনও তিনি ধরতে পারেন নি। মেনিনজাইটিস, অথবা টিউমার কি টিউবার-ক্লোমা অথবা ম্যালিগন্যোণ্ট ম্যালেরিয়া অথবা অন্য কোন অজানা রোগ। পরীক্ষার জন্য রক্ত চাই, মলমূত্র চাই, মেরুমজ্জার রস চাই। যতক্ষণ না সে সব পরীক্ষা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ আটঘাট-বাঁধা ওষুধ দিয়ে ফেলে রাখতে হবে, উপায় কি?…

মনোরমা দুপুরে শোবার চেষ্টা করেছিলেন—ঘুম হয় নি। এ অবস্থায় ঘুমনো সম্ভব নয়। হরিশবাবুও জানতেন তা। তাই আবার যখন সন্ধ্যার আগেই তোড়-জোড় ক'রে রাত্রের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছেলের বিছানায় এসে বসলেন মনোরমা তখন তিনি স্ত্রীর শ্রান্ত শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সোদ্বেগে বললেন, 'উঁহু উঁহু—তুমি এখন থেকেই আর এখানে এসো না। ঘুম না হয় এমনি একটু শুয়ে নাও। আমি তো আছিই—। বরং বেশী রাত্রে তুলে দেব'খন—। আজ আর বিশেষ কিছু গোল-মাল হবে বলে আমার মনে হয় না। ডাক্তারবাবু খুব স্ট্রং হিপ্‌নটিক ড্রাগ দিয়ে গেছেন, বলেছেন নিঃসাড়ে পড়ে থাকবে আজ। তাছাড়া—এরা তো সব আছেই।'

এরা অর্থাৎ মেয়েরা বিকেলেই এসে গেছে, সেইসঙ্গে তাদের মাসীমা-মেসো-মশাইও। খবর পেয়ে সমীরের ছোট কাকাও এসেছেন। তিনিও রাত্রে থাকবেন। পাড়ার দুটি ছেলে—সমীরের বন্ধু—রাত্রে থাকবার কথা বলেছিল, অনাবশ্যক বোধে তাদের নিবৃত্ত করেছেন হরিশবাবু; তাদেরও ডাকলেই পাওয়া যাবে।

সবই জানেন মনোরমা কিন্তু তিনি তার বেশীও কিছু জানেন যে। স্বামীর দিকে মুখ তুলে না চেয়েই বললেন, 'আমি রাত্রে আর কারুর ওপর ছাড়তে পারব না। তুমি কেন স্বয়ং ভগবান এলেও না। কাজেই ওকথা বলে কোন লাভ নেই।··· তুমিই বরং একটু গড়িয়ে নাও গে।'

শান্ত কণ্ঠেই বললেন মনোরমা, তবু হরিশবাবু বুঝলেন যে এর কোন প্রতিবাদ কি অন্যথা সম্ভব নয়। তিনি চুপ ক'রে গেলেন।

সেদিন শুরু হ'ল ঠিক বারোটা থেকে। বড় দেওয়াল-ঘড়িটায় ঘণ্টা বাজা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। সেই চিৎকার, তেড়ে তেড়ে ওঠা এবং ভয়ার্ত ভুল বকুনি। চিৎকারের তীব্রতা বরং—আরও বেশী হওয়া সম্ভব কি না তা মনোরমা জানেন না—মনে হ'ল আগের দিনের চেয়েও বেশী। বকুনির মধ্যেও কাতর অনুনয়—কাকুতি-মিনতি। কোন অজ্ঞাত ঘাতকের কাছ থেকে যেন অব্যাহতি পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা।

সকলে মিলে ধরে রইলেন কোন রকমে। সে দৃশ্য চোখে দেখা যায় না, সে চিৎকার কানে শোনা যায় না। বড় মেয়ে চিত্রা অজ্ঞান হয়ে গেল, ছোট জয়া থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। সমীরের মেসোমশাই খুব সাহসী মানুষ, তবু তাঁরও মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। ওর কাকা ছুটে গেলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার এলেনও— কিন্তু যে পরিমাণ সিডেটিভ ওষুধ দেওয়া হয়ে গেছে আগেই, তারপর আর কিছু দিতে সাহস করলেন না।

আবার সেই একেবারে ভোররাত্রে শান্ত হয়ে এল রোগী। সেদিন কিন্তু মনো-রমার মনের জোর অনেকটা বেড়েছে, তিনি স্নান পুজো সেরে একটু চা খেয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। হরিশবাবু যে তিন চার জন বড় ডাক্তার ডেকে বাড়িতে প্রায় মেডিক্যাল বোর্ড বসিয়ে ফেললেন সে খবরও তিনি রাখলেন না। তাঁর এই শান্ত প্রতীক্ষাকে নিরুদ্বিগ্নতা বলে মনে ক'রে তাঁর দিদি ও মেয়েরা বিস্মিত হলেন—হরিশবাবুও জিজ্ঞাসু নেত্রে বার বার চেয়ে দেখলেন, অথচ ঠিক কী প্রশ্ন করবেন—কি জানতে চান ঠিক করতে না পারায় কিছুই বলতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত।

সারাদিন যে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে রইল, সন্ধ্যার আগে থেকেই কিন্তু তার মুখ-চোখের চেহারা গেল 'বদলে। মনোরমা পুজো সেরে নির্মাল্য প্রভৃতি নিয়ে যখন এসে আবার ছেলের বিছানায় বসলেন তখনকার ক্লিষ্ট মুখ-ভাবটাও সকলের চোখে পড়ল। তিন রাত্রির কথা বলেছেন গুরুদেব, আজই সেই তৃতীয় ও শেষ রাত্রি। আজকের চাপটাই সর্বাধিক পড়বে এটুকু বেশ বুঝতে পেরেছেন মনোরমা। পারবেন কি সে চরম আক্রমণ সামলাতে? কূলে এসে তরী ডুববে না তো? কোন অদৃশ্য ও অদেহী শক্তি তাঁর সর্বনাশের জন্য বদ্ধপরিকর, এটা আজ আর অজানা নেই মনোরমার—আর সেই জন্যই তাঁর এত দুশ্চিন্তা। হে গুরু, হে ভগবান, এই

শেষ রাত্রিটা সামলাবার মতো শক্তি দাও।

সেদিন শুরু হ'ল খানিকটা আগে থেকেই। আরও প্রচণ্ড, আরও তীব্র। এক-সময় মনে হ'তে লাগল মনোরমার যে এ রাত বোধহয় আর পোহাবে না, শেষ হবে না এই নিদারুণ পরীক্ষার। হরিশবাবু, তিনি, দিদি, ওর কাকা সকলে মিলেও চেপে রাখতে পারছেন না। আরও বিপদ এই যে, তাঁর এ বিছানা ছাড়া চলবে না কোনমতেই—একথাটা ওদের মাথাতে ঢোকাতে পারছেন না তেমন ক'রে। বিনা কৈফিয়তে কথাটার ওপর জোর দেওয়া শক্ত।

যাই হোক সে রাত্রিও কাটল শেষ পর্যন্ত। আবারও শ্রান্তিতে এলিয়ে পড়ল সমীর—আজ আর অন্য দিনের মতো বেহুঁশ নয়, সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল। মনোরমাও এই তিন দিন মনকে প্রাণপণে কঠিন ক'রে রাখলেও আর পারলেন না—বিছানা ছেড়ে উঠে ঠাকুরের সামনে প্রণাম করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

সেই দিনই জ্বর কমে গেল সমীরের, সন্ধ্যার দিকে একেবারেই ছেড়ে গেল। ডাক্তার এসে নিজের চিকিৎসার কৃতিত্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওষুধপত্র যেমন চলছে তেমনি চলুক—এখনই কমানো চলবে না। এখনও ক'দিন খুব সাব-ধানে ওআচ্ করতে হবে। উইক তো খুবই, হার্টের অবস্থাও তত ভাল নয়—গার্ড ক'রে যাওয়া চাই। নার্সিংটাও সাবধান।'

মনোরমা কিন্তু আর অকারণে ঐ সাংঘাতিক বিষগুলো ছেলেকে খাওয়াতে রাজী হলেন না। ডাক্তার চলে যেতে সবগুলো কুড়িয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে—সকলে হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠা সত্ত্বেও। বললেন, 'ওদের দৌড় বুঝে নিয়েছি। কী অসুখ তাও বোঝে না, কেন সারল তাও জানে না। বাহাদুরি নেবার বেলায় ঠিক আছে। গুরুর কৃপাতেই ওর জ্বর ছেড়েছে—তাঁর কৃপা থাকলেই ভাল হয়ে উঠবে।'

এ ক'দিন সাবধানে থেকে এসে এইটেই মস্ত ভুল ক'রে ফেললেন তিনি। আরও একটা ভুল করলেন, সেদিন আর সন্ধ্যাবেলা ছেলের ধারে-কাছেও গেলেন না। তাঁর আচরণ এবং কথাবার্তাও একেবারে উদ্বেগহীন, নিশ্চিন্ত। অথচ সেটা আদৌ স্বাভাবিক নয়।

তাঁর আচার আচরণ এবং কথাবার্তা ক'দিন ধরেই কেমন কেমন লাগছিল—আজ তো দস্তুরমতো দুর্জ্ঞেয় বলে বোধ হ'ল। এই অসুখটার মূলে একটা কিছু রহস্য আছে, আর সে রহস্যের চাবি মনোরমার কাছেই। এ সংশয়টা ক'দিন সমূহ দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার মধ্যে কতকটা আকারহীন অস্পষ্ট ভাবে ছিল—এবার যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিপদ যত কমতে লাগল কৌতূহলটাও তত বাড়তে লাগল।

কেন?

কেন?

কেন ?

অবিরাম কতকগুলো 'কেন' বর্ষিত হ'তে শুরু হ'ল চারিদিক থেকে। অন্তহীন প্রশ্ন ও কৈফিয়ৎ। অতি সাবধানে সেই প্রশ্নের শরজাল থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়, তার চেয়েও বড় কথা ছেলেকে রক্ষা করতে হয়। খুব কড়া শাসন ক'রে দিয়েছেন মনোরমা—ছেলের কী রকম অসুখ করেছিল তা যেন কেউ না ঘুণাক্ষরে তাকে জানায় বা তাকে প্রশ্ন করে। তাঁর এই অতিসাবধানতা অনেকের কাছেই বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে—সেরকম বাঁকা মন্তব্যও করেছেন কেউ কেউ, বিশেষতঃ দিদি জামাইবাবু, তাঁরা তো নিজেদের রীতিমতো অপমানিত বোধ করেই চলে গেলেন। 'অকৃতজ্ঞ' বলে মনোরমাকে গাল দিতেও কসুর করলেন না।

নিরুপায় মনোরমার এ যেন পড়ে মার খাওয়া। যাকে বলে কিল খেয়ে কিল চুরি করা। কথাটা যদি আর একজনকেও অন্ততঃ জানাতে পারতেন—পরামর্শ করতে পারতেন কারুর সঙ্গে—তাহ'লেও এই দুঃসহ বোঝাটা অনেকখানি হাল্কা বোধ হ'ত। সব চেয়ে—যদি অন্তত ছেলের বাবাকেও খুলে বলতে পারতেন কথাটা! সেইখানেই যে হয়েছে ওঁর বেশী বিপদ। তাঁকে সামলানো, তাঁর অভি-মানকে শান্ত করাটাই সর্বাধিক কঠিন কাজ হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে ওঠে। দুজনেরই বিরক্তি সীমা লঙ্ঘন করে—একটা ইতর চেহারা নিয়ে প্রকাশ পায় সেটা—তবু মনোরমা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেন সব। সহজ সরল উত্তরটা বার বার ঠোঁটের কাছে এসেও ফিরে যায়—কিছুতেই খুলে বলতে পারেন না।

কিন্তু কৌতূহল তাঁরও তো বড় কম নয়।

তিনিও তো সবটা জানেন না। গুরুদেব যা বলে গিয়েছেন তাই হয়েছে, এইটুকু শুধু জানা আছে তাঁর কিন্তু কী হয়েছে তা তো জানেন না আজও। কী দেখেছিল সমীর, কী দেখে এত ভয় পেয়েছিল? কার কাছেই বা এত কাকুতি-মিনতি করেছিল? কেন—সে কী কোন আত্মা, অশরীরী বিদেহী কোন শক্তি? ভূত প্রেত বা পিশাচ কেউ? অথবা কোন দেবতাকে দেখেছিল? সত্যবানের মতো সাক্ষাৎ যমদূতকেই চোখে দেখতে পেয়েছিল নাকি?

প্রতিদিন এই প্রশ্নটাও প্রাণপণে বুকের মধ্যে চেপে রাখতে হয় তাঁকে—সহজাত উদগ্র কৌতূহলের সঙ্গে লড়াই করতে হয়।

এমনি ক'রেই দিন সপ্তাহ মাস কেটে যায় কয়েকটা। স্মৃতি ঝাপ্সা হয়ে আসে মনের মধ্যে আর সেই সঙ্গে ভয়ের উগ্রতাটাও যায় কমে। ক্রমে ক্রমে সবটাই কেমন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। মনে হয়—যতটা তখন মনে হয়েছিল অতটা কিছু নয়। গুরুদেব সত্যিই এসেছিলেন কিনা—এক একসময় সে সম্বন্ধেও একটা সূক্ষ্ম সন্দেহ দেখা দেয় মনের মধ্যে।

এদিকে ছেলে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে। আগের মতোই খেলাধুলো করছে। ইতিমধ্যে পরীক্ষা দিয়ে কী একটা ভাল সরকারী চাকরিও পেয়েছে। হরিশবাবু

চারিদিকে পাত্রী খ‍ুঁজছেন—সেটাও তার অজানা নেই। তাতে কোন আপত্তি আছে বলেও মনে হয় না। এক কথায়—স্বাস্থ্যে আনন্দে উৎসাহে আশায় সে টলমল করছে যেন। একটা অপরিসীম প্রাণপ্রাচুর্য তার দেহের পাত্র উপছে নিরন্তর যেন চারিদিকে বিকীরিত হচ্ছে—চতুর্দিকের সমস্ত মান‍ুষকে স‍ুখ প্রাণচঞ্চল ক'রে তুলছে। আজ তার দিকে চাইলে সেদিনের কথাটা কিছ‍ুতেই বিশ্বাস হ'তে চায় না। অস‍ুখটা ঠিকই, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু তার ম‍ূলে কোন অলৌকিক কারণ আছে কিনা সে সম্বন্ধেও এরই মধ্যে মনের কোথায় একটা দ্বিধা দেখা দিয়েছে।

এই দ্বিধা ও সংশয়ের মধ্যেই একটা কর্মহীন অলস-অবসরের স‍ুযোগে কথাটা কখন উঠে পড়েছিল তা অত ব‍ুঝতেও পারেন নি মনোরমা। কথায় কথায় বলে ফেলেছিলেন, 'উঃ, সে যা দিন গিয়েছে আমাদের, অতিবড় শত্র‍ুরও না অমন হয়!'

অবিশ্বাসে ভ্র‍ু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে সমীরের, সে ওঁর কোলের মধ্যে এলিয়ে পড়ে বলে, 'যাঃ!…এত অস‍ুখ করেছিল আমার? কৈ, আমার তো মনে পড়ে না।'

'তোমার আর মনে থাকবে কী ক'রে বল। তোমার কি হ‍ুঁশপর্ব ছিল কিছ‍ু। প্রবল জ্বর, অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছ, ভুল বকছ আর বিকট চিৎকার করছ। বারোটা বাজল তো আর রক্ষা নেই, তুলোরাম খেলারাম দেখিয়ে দিলে একেবারে।'

'বাবা এমন কাণ্ড! কৈ কখনও বলো নি তো।…আচ্ছা বারোটা বাজলে কী হ'ত মা?'

'আর কী হবে—বিকট চিৎকার শ‍ুর‍ু ক'রে দিতে, আর তেড়ে তেড়ে উঠতে। সে কী যে সে কাণ্ড, আমরা চার পাঁচ জনে ধরে রাখতে পারতুম না—'

'আশ্চর্য। এসব কিছ‍ুই আমার মনে পড়ে না!'

'কিছ‍ু মনে পড়ে না?—দোরের দিকে চেয়ে কেন ওভাবে চেঁচিয়ে উঠতিস আর ভুল বকতিস—কিছ‍ু মনে নেই? কাউকে দেখতিস কিনা—কিংবা আর কিছ‍ু মনে হত কিনা—মনে নেই একট‍ুও?'

'দোরের দিকে চেয়ে?…কাউকে দেখতুম?…দাঁড়াও দাঁড়াও—ঝাপসা ঝাপসা যেন মনে আসছে—'

তারপরই চিৎকার ক'রে উঠল একটা।

সেই চিৎকার—ব‍ুকের-রক্ত জল করা ভয়াবহ পৈশাচিক আওয়াজ একটা! সেই অস‍ুখের রাতের মতো।

নিমেষে যেন ম‍ুখ চোখের চেহারাও পালটে গেল। চোখ দ‍ুটো হয়ে উঠল করমচার মতো লাল, ম‍ুখের ভাবটা উদ্‌ভ্রান্ত। চুলগ‍ুলো খাড়া হয়ে উঠেছে মাথায়—এমন খাড়া চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত, অমন নরম ঢেউখেলানো চুলের এই পরিণাম হ'তে পারে।

প্রথমবারের চিৎকারের রেশ মিলোতে না মিলোতেই আর একটা তেমনি ভয়ঙ্কর তেমনি সাংঘাতিক।

এটা এতই আকস্মিক, এত অপ্রত্যাশিত যে মনোরমা খানিকক্ষণ বিহ্বল হয়ে

বসে রইলেন। কী করবেন, কী করা উচিত কিছুই ভেবে পেলেন না কয়েক মুহূর্ত। আর তারই মধ্যে, দ্বিতীয়বারের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে তেড়ে উঠে বোধকরি বাইরে যাবার চেষ্টা করতে গিয়েই অকস্মাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সমীর। কাঠের মতো হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

ততক্ষণে বাড়ির লোকজন সবাই ছুটে এসেছে বৈকি! ছুটে এসেছেন হরিশবাবুও। বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি তার পরিপূর্ণ আতঙ্কের চেহারা নিয়ে সকলের মনেই জেগে উঠেছে আবার—এক নিমেষের মধ্যে।

ছুটে এসে ছেলেকে তুলতে গিয়েই আবার ফেলে দিলেন হরিশবাবু। এবার চিৎকারের পালা তাঁর। আর এ চিৎকার সহজে থামবেও না, বোধহয় ইহজীবনেও নয়।

সমীরের ঐ কাঠের মতো দেহটায় শুধু যে জ্ঞানের লক্ষণ নেই তাই নয়—প্রাণের লক্ষণও নেই আর।

ওপারের কৃতজ্ঞতা

কথা হচ্ছিল পরলোক নিয়ে। একজন বলছিলেন যে, 'দয়া মায়া স্নেহ প্রেম কৃতজ্ঞতা, মানবমনেরই বৃত্তি এগুলো, এবং মানবদেহের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ দেহ ত্যাগ ক'রে যারা চলে গেল তাদের আবার ও বৃত্তিগুলো আসবে কোথা থেকে? কারণ জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গে ওগুলোর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ—স্বর্গের বিবরণ তো ছেলেবেলা থেকেই পুঁথি-পুরাণে পড়ে আসছ, সেখানে সুখও নেই দুঃখও নেই। আর দেহ না থাকলে, দেহের প্রয়োজন না থাকলে সুখ-দুঃখই বা থাকবে কেন? কাজেই মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব যদি বা থাকে—রাগ দ্বেষ হিংসা এসব থাকা সম্ভব নয়। প্রতিহিংসা, প্রেতের ঐ ধরণের অনুভূতির কথা আমি একদম বিশ্বাস করি না। স্রেফ বাজে কথা!'

মুখুজ্জে মশাই এককোণে বসে এতক্ষণ নিঃশব্দে বিড়ি টানছিলেন, এইবার যেন একটু নড়েচড়ে বসলেন। মনে হ'ল কিছু বলবেন তিনি।

মুখুজ্জে মশাই আমাদের মিঃ ব্যানার্জির শ্বশুর, আবগারীর দারোগা ছিলেন, কিছুদিন হ'ল রিটায়ার করেছেন, ছেলে নেই ভদ্রলোকের—চারটি মেয়ে, পর্যায়ক্রমে বছরের কয়েকটা মাস মেয়েদের বাড়ীতে কাটান। তা মেয়েগুলিও সৎপাত্রে পড়েছে, ভাল ভাল শহরেই থাকে। দিল্লী, বোম্বাই, পুণা, বাঙ্গালোর। তবে পুজা-প্যাণ্ডেলটিতেই দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় কাটান। কথাবার্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত ব'লে আমরাও কোন অসুবিধা বোধ করি না—অর্থাৎ নিঃসঙ্কোচে আড্ডা দিতে বাধে না। ধূমপান সম্বন্ধেও এঁর উদারতা বিখ্যাত, নিজেই বয়ো-কনিষ্ঠদের হাতে জোর ক'রে সিগারেট বিড়ি গুঁজে দিয়ে সে বিষয়ে সঙ্কোচ দূর

ক'রে দিয়েছেন। যাত্রা থিয়েটারেও উৎসাহ খুব। নিজে কিছুই করেন না—কিন্তু রিহার্স্যালে প্রতিদিন উপস্থিত থাকা চাই। এক কথায় মুখুজ্জে মশাই আমাদের মনের মানুষ।

সুতরাং সকলেই আমরা উৎসুক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

মুখুজ্জে মশাই ধীরে ধীরে কথা বলেন ঃ সেই ভাবেই শুরু করলেন, 'এ বিষয়ে এতকাল আমিও ফণুবাবুর সঙ্গে একমত ছিলাম। কিন্তু আজ এইমাত্র হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। এতদিন দুটো ঘটনার মধ্যে কোন যোগাযোগ কল্পনা করি নি কিন্তু কে জানে কেন—এখন ফণুবাবুর কথাটা শুনতে শুনতে দুটো ঘটনাই একসঙ্গে পর পর মনে পড়ে গেল এবং মনে হ'ল যে এ দুটোর মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকা বিচিত্র নয়। আর অত ভূমিকাতে কাজ কি—আমি সব খুলে বলছি, আপনারা বরং বিচার করুন—'

এই পর্যন্ত বলে মুখুজ্জে মশাই তাঁর অর্ধ সমাপ্ত বিড়িটা শেষ করার উদ্দেশ্যে আবার মুখে তুললেন। কিন্তু তার অন্তরবহ্নি ভোক্তার উৎসাহের অভাবে ইতিমধ্যেই নিভে গিয়েছিল, বিরক্ত হয়ে সেটা ফেলে দিয়ে তিনি কাহিনীটাই শুরু করলেন ঃ

যে দুটি ঘটনার কথা আজ এইমাত্র মনে পড়ল, তার প্রথমটি যখন ঘটে তখন আমার মোটে কুড়ি বছর বয়স, সবে বি-এ পাশ ক'রে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছি। একদিন একটি গলায়-দড়ির মড়া এল 'পোস্টমর্টেম' পরীক্ষার জন্য। পনেরো-ষোল বছরের কুমারী মেয়ে একটি ; সম্ভবতঃ বিয়ে হয় নি, বাবা গরীব বলে টাকার যোগাড় করে উঠতে পারেন নি, সেই দুঃখেই কুরূপা মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে—এই অনুমান ক'রে আমরা প্রথমটা উদাসীন ছিলাম। স্নেহলতার সেই ঘটনার পর এই কথা মনে পড়াই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু হঠাৎ দুটি কথা কানে যেতে আমরা—অর্থাৎ তরুণ ছাত্ররা বিশেষ চঞ্চল ও কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। মেয়েটি নাকি খুব সুন্দরী এবং তার গর্ভে মাস-চারেকের একটি ভ্রূণ পাওয়া গেছে।

শুনে আমরা ভিড় ক'রে মর্গে দেখতে গেলাম।

সত্যিই মেয়েটি সুশ্রী, এমন কি সুন্দরীও বলা যায়। গলায় দড়ি দেওয়ার ফলে মুখের চেহারাটা বিকৃত হয়ে উঠেছে, তৎসত্বেও তার অসামান্য রূপ সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে নি। এখনও ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে আমার, একটি কালাপাড় শাড়ীতে দেহটা ঢাকা,—সুগোল সুগৌর হাতের মণিবন্ধে দুগাছি মাঠা বালা, রুক্ষ চুলের রাশ চারিদিকে ছড়ানো—সবটা জড়িয়ে কেমন একটা করুণারই উদ্রেক করল আমার তরুণ মনে। আমি বলে ফেললাম, 'আহা বেচারী। কেনই বা এ কাজ করতে গেল! সামান্য ভুলের এত বড় প্রায়শ্চিত্ত করার কি দরকার ছিল ওর!'

আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ত পঞ্চানন বলে, সে বিদ্রূপ ক'রে বলল, 'না ক'রে কি করত। এ কলঙ্ক জানাজানি হ'লে আর কি কেউ বিয়ে করত ওকে? মাঝখান থেকে ওর সমস্ত ফ্যামিলির ওপর একটা কালি লাগত, তাঁরা সমাজে ঠাঁই

পেতেন না।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'এ তোমার বাজে কথা পঞ্চানন, এমন সুন্দর মেয়ে—কেউ কি আর বিয়ে করত না। আজকালকার শিক্ষিত ছেলেদের মন উদার, কেউ না কেউ বিয়ে করতই। সামান্য একটা ক্ষণিকের ভুল—'

'কেউ করত না। যার যতই উদারতা থাক, এ ঘটনা জানলে কেউ বিয়ে করতে চাইত না। এমন উদার লোক একটি বার করতে পারো ? যে এই সামান্য ভুলই ভুলতে পারে ?'

'এই তো আমিই আছি!' ঝোঁকের মাথায় বলে বসলাম, 'ও যদি বেঁচে থাকত তো আমি ওকে বিয়ে করতাম!'

পাষণ্ড পঞ্চাননটা অবশ্য তা বিশ্বাস করল না। হো হো ক'রে হেসে সকলের সামনে আমাকে অধোবদন ক'রে দিলে একেবারে। বলল, 'ভায়ার আমার চাঁদপানা মেয়েটাকে বড্ডই মনে ধরেছে। তবে কি জানো, সে অকেশ্যান্ হ'ল না তাই খুব বুক ঠুকে বলছ, কিন্তু ঠিক এমন অবস্থা দাঁড়ালে তখন আর রাজী হ'তে পারতে না, তা পাত্রী যতই সুন্দর হোক। শুধু কি আর সমাজের ভয়, আমার স্ত্রীর দেহ এবং মন দুই-ই এর আগে অন্যত্র অর্পিত হয়েছে এ জানলে পুরুষ কখনও উদারতা দেখাতে পারে না।'

'আমি পারতুম।' তবুও জিদ ক'রে বলি, 'এবং ভবিষ্যতে এ রকম ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লে পিছিয়ে যাবো না। সামান্য মুহূর্তের ভুলে এতবড় একটা সম্ভাবনা নষ্ট হতে দেওয়া উচিত—এ আমি মানতে প্রস্তুত নই। ভেবে দ্যাখো দিকি, এই মেয়েটি বেঁচে থাকলে আনন্দ দিয়ে, সেবা দিয়ে গৃহিণীত্ব দিয়ে একটি গোটা সংসারকেই সুখী করতে পারত।'

পঞ্চানন মুখে একটু 'ফুঃ' ক'রে শব্দ ক'রে সবটাই উড়িয়ে দিলে।

এই পর্যন্ত গেল প্রথম ঘটনার কথা। এত সামান্য এটা, আমার জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক এত কম যে, আজ এতকাল পরে কেমন ক'রে যে কথাটা মনে পড়ল এই ভেবেই অবাক হচ্ছি।...

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে—তখন আমার বয়স চল্লিশ কি একচল্লিশ হবে। প্রথম ঘটনার কুড়ি একুশ বছর পরের কথা। আপনারা অনেকেই জানেন—ডাক্তারী পড়া আমার কেন হয় নি। সেকেণ্ড ইয়ারে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা মারা গেলেন। সংসার ঘাড়ে এসে পড়ল—চাকরি করা ছাড়া উপায় রইল না। চাকরি আগে একটা যেমন তেমন জুটিয়ে নিয়েছিলাম, তারপরই এল বিবাহের প্রস্তাব ; শ্বশুর আবগারীর লাইনেই বড় চাকরী করতেন, তাঁর মেয়েকে বিয়ে করব প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে তিনি আমাকে এই লাইনে কাজ ক'রে দিলেন। আমিও বেঁচে গেলাম—কারণ আমার বাবারও কন্যাভাগ্য কম ছিল না, তার মধ্যে একটিকে মাত্র তিনি পার ক'রে যেতে পেরেছিলেন—বাকী চারটিই আমার ঘাড়ে পড়েছিল। শ্বশুরের দৌলতেই

অল্প দিনের মধ্যে একেবারে ইন্সপেক্টরের র‍্যাঙ্ক পেয়ে গেলেম ; আমার বরাত খারাপ তাই তিনিও তাড়াতাড়ি মারা গেলেন, নইলে আমি আরও উন্নতি করতে পারতাম।…যাই হোক—ইন্সপেক্টর হ'তে পেরেছিলাম তবু রক্ষা—নইলে বাবার অতগুলি এবং নিজের এতগুলিকে পার করতে পারতাম না।

আপনারা হাসছেন, কিন্তু সত্যিই বলছি আমি, বিশ্বাস করুন—এই মায়ের পুজোমণ্ডপে বসে বলছি, ঘুষ খাওয়া যাকে বলে তা আমি কখনও খাই নি। অর্থাৎ চাপ দিয়ে কি মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করি নি। তা করলে আজ আমার কলকাতা শহরে চার-পাঁচখানা বাড়ী থাকত, আটটা মেয়ের বিয়ে দিয়েও। তবে হ্যাঁ —আমাদের এ লাইনে একটা মাসকাবারী বন্দোবস্ত আছে, প্রত্যেক ভেণ্ডারই প্রত্যেক দারোগাকে মাসিক একটা থোক টাকা দিয়ে থাকে। তা নইলে কোন রকম চুরি না ক'রেও বেচারারা চুরির দায়ে ধরা পড়তে পারে,—তেমন দারোগা হ'লে নাস্তানাবুদ খাইয়ে দেবে। অনেক সময় আবহাওয়ার গতিকেই মালের ওজন বাড়ে কমে, দারোগা যদি হঠাৎ এসে ওজন করতে বসে তাহলে বেশী-কমের জন্যে কৈফিয়ৎ দেওয়া শক্ত হয়ে পড়ে বৈকি। এই সব কারণেই সকলে একটা মাসকাবারী বন্দোবস্ত ক'রে রাখে —নিশ্চিন্ত। এটা আমি জানতুম না, প্রথম যেদিন সনৎ চৌধুরী আমার হাতে পাঁচখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে গেল, সেদিন আমি অবাক। আমি ফিরিয়ে দিতেও গিয়েছিলাম কিন্তু চৌধুরী হাত জোড় ক'রে বললে, 'মুখুজ্জে মশাই, ছাপোষা লোক আমি—দয়া ক'রে এটা নিন, নইলে সোয়াস্তি পাবো না।' তবু আমি কি বলতে যাচ্ছিলুম, আমার পিওন চোখ টিপে থামিয়ে দিলে। চৌধুরী চলে যেতে সে ব্যাটা বললে, 'যে কাজের যা দস্তুর বাবু, না নিলে চলবে কেন। এ আপনার হক্কের পাওনা, নিন।'

সেই থেকে ঐ হক্কের পাওনাটুকু শুধু নিয়েছি, আর তাতেই আপনাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে দিন কেটে গেছে আমার, খুব বড়মানুষী চালে না কাটলেও ভদ্রতা বজায় রেখে চলতে পেরেছি।

কিন্তু তবু সেবার এক ঘুষের মামলাতেই পড়ে গেলাম।

তখন থাকি উত্তরবঙ্গের এক মহকুমা শহরে। সেখানে আমার মামলা যা কিছু প্রায় সবই ওঠে এক হাকিমের এজলাসে—তিনি অনাহারী মানে কিনা অবৈতনিক হাকিম হ'লেও তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ, কারণ তিনি স্থানীয় জমিদারও বটে। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার ছিল তাঁর, অনেক কিছুই করতে পারতেন।

ওখানে যাবার পর দিনকতক বেশ সদ্ভাবেই কাটল। কিন্তু কাল করলুম আমিই—ভদ্রলোক বোতলেশ্বরীর উপাসক এই খবর পেয়ে দুটি বোতল ভাল 'মাল' উপহার দিয়ে।

ভারি খুশী হাকিম সাহেব। তিনিও মুরগীটা খাসিটা পাঠান। মকদ্দমা গেলেই আমার দিকে রায় হয়ে যায়। কিন্তু ওদিকে যে কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো হয়েছিল অতটা আমি বুঝি নি। কদিন যেতে না যেতেই 'বন্ধু-বান্ধবদের

পার্টি দিয়েছেন' এই অজুহাতে আর দুবোতল 'মাল' চেয়ে পাঠালেন। তাও দিলাম। এক সপ্তাহ যেতে না যেতে আবার। তারপর ঘন-ঘন।

অত দিই কোথা থেকে ? অত মাল সত্যিই কিছু বাড়তি হয় না। একদিন বিনয় বচনে ফিরিয়ে দিলাম তাঁর চাপরাশীকে। দুপুররাত্রে তাঁর এক চিঠি নিয়ে লোকটা এল আবার। মাল চাই-ই, যেখান থেকে হোক।

এবার আর রাগ সামলাতে পারলাম না। কড়া কথা ব'লে ফিরিয়ে দিলাম।

ব্যস্! আর যাবে কোথায়!

পরের দিনই কোর্টে গিয়ে দেখি সবাই আমার ওপর বিরূপ। যারা প্রত্যহ দেখা হ'লেই আত্মীয়তা জানাত, তারা ভাল ক'রে কথাও কইছে না।...ব্যাপারটা কি হ'ল বুঝতেই পারি না, শেষে এক সময় থানার দারোগাবাবু চুপিচুপি ডেকে বললেন, 'ও মশাই করেছেন কি, জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ!...যান মিটিয়ে ফেলুন গে তাড়াতাড়ি।'

আমি বললাম, 'সে উপায় নেই। তাহ'লে আমার ঘটিবাটি বেচতে হবে!'

খুলে বললাম সব কথা তাঁকে। শুনে বললেন, 'এই যখন অবস্থা, তখন আপনার ওপর-পড়া হয়ে অত বদান্যতা দেখাতে যাওয়া ঠিক হয় নি। এখন লোভ বেড়ে গেছে—কী করবেন!'

'আমি তো ভাল ভেবেই করতে গিয়েছিলাম কিন্তু ও'র যে মরুভূমির পিপাসা, অত তো বুঝি নি! আর পয়সারই বা অভাব কি! কিনে খেলেই তো পারেন।'

'দূর মশাই। মুফৎ পেলে কি কেউ দাম দিয়ে কিনে খেতে চায় ?...বেশ করেছেন! এখন বুঝুন ঠেলা।'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'তাহলে এখন উপায় ?'

দারোগাবাবু মুসলমান, ওপর দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, 'খোদাকে ডাকুন, আমি তো আর কিছু পথ দেখছি না!'...

উনি যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হ'ল।

সেদিনের মামলাতেই দেখলাম বাঁকা সুর। হাকিম নিজে আসামীপক্ষের হয়ে আমার সাক্ষীদের জেরা করতে লাগলেন।

সেদিনের মামলা ডিস্‌মিস হয়ে গেল। পরের দিন, একটা বড় কেস ছিল, হাতে নাতে ধরেছি একটা মদ-চোলাইয়ের ব্যাপার, জ্বলজ্যান্ত সাক্ষীরা রয়েছে। ও হরি! আগের দিন রাত্রে পর্যন্ত সাক্ষীদের গড়ে-পিঠে ঠিক ক'রে রেখেছি—পরের দিন সকালে দেখি সব সাক্ষীই উল্‌টো পাল্‌টা বলছে! একজন তো পরিষ্কার বললে, 'দারোগাবাবু আমাকে এমনি বলতে শিখিয়ে দিয়েছেন!'

সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল, ওরা সব কজনই হাকিম বাহাদুরের প্রজা। আমি তো কাল পর্যন্ত গড়ে-পিঠে রেখেছি—আজ সকালে নিশ্চয় কাছারীবাড়ীতে ডেকে ওদের নতুন পাঠ দেওয়া হয়েছে।

পরে শুনেও ছিলাম যে আমার অনুমানই সত্য,—কিন্তু তখন আর উপায় কি—বসে বসে আঙ্গুল কামড়ে অনুতাপ করা ছাড়া। কথাটা আমার আগেই মনে পড়া উচিত ছিল।

ইস।

ফল যা হ'ল তা বুঝতেই পারছেন। অলমিতি বিস্তারেন।

মামলা তো কেঁচে গেলই, তার ওপর রায় লেখা হ'ল—সাজানো মামলা, সম্ভবত বিদ্বেষবশতঃই আমি এই মামলা এনেছি। বলাবাহুল্য রায়ের নকল সদরে আমার ওপরওলাদের কাছেও পাঠানো হ'ল।

এ কিন্তু শুরু—এখানেই শেষ নয়।

পাঁচ সাতদিনের মধ্যে আমার যা অবস্থা হ'ল তা অবর্ণনীয়। কোন মামলাই দাঁড়ায় না। এমনি তো আমাদের মামলার সাক্ষীসাবুদ বিশেষ থাকা মুস্কিল, সাধারণত দারোগার রিপোর্টের ওপরেই মামলা চলে। তারও পরে যে সব কেসে সাক্ষীসাবুদ আছে, সেসব কেসও দাঁড় করাতে পারি না।

লম্বা লম্বা তারিখ নিয়ে কোনমতে শেষের মামলাগুলো পিছিয়ে দিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে দুর্নাম নিয়ে চাকরী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে—আর সন্তানদের হাত ধরে পথে পথে ভিক্ষা করতে হবে—এ সম্বন্ধে আর কোন সংশয় রইল না মনে মনে।

এই তো অবস্থা, এর মধ্যে স্ত্রী পড়লেন অসুখে। বেশ বাঁকা ধরনের অসুখ—অবস্থা দেখে ডাক্তারও ভয় পেয়ে গেলেন।

ফলে একদিনের 'টুর' প্রোগ্রাম বন্ধ রাখতে হ'ল। এমন যে বন্ধ হয় না তা নয়—। হয়, ওপরওলারাও তা জানেন, এবং সুবিধা-অসুবিধা বুঝে চোখ বুজেই থাকেন তাঁরা।

যেদিন যাবার কথা, সেইদিনই রাত্রে ওপরওলা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছ থেকে চাপরাশী এল—সাহেব এখনই ডাকছেন।

মিনতি ক'রেই বললাম, স্ত্রীর অবস্থা খুব খারাপ—ছোট ছোট মেয়েদের ভরসায় ফেলে রেখে যাই কী ক'রে ?

চাপরাশী ফিরে গেল কিন্তু আবার ঠিক ভোরবেলায় এসে হাজির। সাহেব এখনই ডাকছেন।

বিরক্ত হ'লেও উপায় নেই। যেতেই হ'ল। আমার এই বড় মেয়ের তখন সবে তেরো বছর বয়স, বাকি তো আরও ছোট ছোট, তবু ওদের হাতেই ঐ শক্ত রুগী ছেড়ে দিয়ে চললাম সাহেবের বাংলায়।

সাধারণত অত ভোরে সাহেবদের ওঠবার কথা নয়। বুঝলাম আমাকে জব্দ করবার জন্যেই উঠেছেন। ফলে মেজাজ নিশ্চয়ই আরও খারাপ হয়ে আছে। তবু কোন্ পথে ফাঁড়াটা আসবে তখনও বুঝি নি।

গিয়ে দাঁড়াতেই বিনা ভূমিকাতে প্রশ্ন করলেন, 'ডায়েরী এনেছেন ?'

এই ডায়েরীটা আমাদের চাকরীর একটা প্রধান অঙ্গ, এটি সর্বদা কাছে রাখতে হয় এবং আপটুডেট্ হয়ে থাকা চাই। ওপরওয়ালা যখনই দেখতে চাইবেন তখনই দেখাতে হবে—আর সব এন্ট্রি ঠিক রাখতে হবে। নইলে ব্ল্যাক-মার্ক পড়বে চাকরীর খাতায়।

ডায়েরী সঙ্গে ছিল, বার করে দিলাম।

না খুলেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল ইন্সপেক্শ্যানে গিয়েছিলেন।'

কী যে দুর্মতি হ'ল মশায়—কতকটা ভয়ে ভয়েই বলে ফেললাম, 'হ্যাঁ।'

'তা কৈ—ডায়েরীতে এন্ট্রি করেন নি তো!'

খুলতে খুলতেই এই প্রশ্ন। অর্থাৎ খবর নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে।

আর এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই একটা তথ্য মনে পড়ে গেল, সাহেব আমার সেই 'পরম বন্ধু' হাকিম বাহাদুরের শালা!

কথাটা বহুদিন আগে শুনেছিলাম বলেই মনে ছিল না। অথচ মনে পড়া উচিত ছিল। কারণ সাহেব তদ্বির ক'রেই এইখানে বদ্লি হয়ে এসেছেন এটাও জানতাম।

বুঝলাম অমন নির্জলা মিথ্যে কথাটা বলা ঠিক হয় নি। কিন্তু তখন আর উপায় কি ? হাতের পাশা আর মুখের কথা—একবার বেরিয়ে গেলে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

অগত্যা ঢোঁক গিলে বললাম, 'বাড়ীতে বড্ড অসুখ স্যার, তাইতেই—'

'এ এন্ট্রি তো ইন্সপেক্শ্যানে গিয়ে সেইখানে বসেই করবার কথা। অসুখ তো আপনার বাড়ীতে। তাছাড়া—অসুবিধে থাকলে ছুটি নিলে পারতেন। যতক্ষণ তা না নিচ্ছেন, সরকারী কাজ সাফার করতে পারে না তো!'

নীরবে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তিনি একবার নিঃশব্দে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে শুধু বললেন, 'এখনই লিখে ফেলুন!'

কী আর করব ? লিখলাম বসে—কাল্পনিক ইন্সপেক্শ্যানের কতকগুলো বানানো মনগড়া বিবরণ।

তিনি বিনা বাক্যে ডায়েরীটা পকেটে ফেলে বললেন, 'আপনি এখন যেতে পারেন। এটা আমার কাছেই থাকবে।'

চলে এলাম বাড়ীতে।

সেদিন আর একটা ইন্সপেক্শ্যান্ ছিল। এটায় আর ডুব মারতে সাহস হ'ল না।

একটা কথা মনে রাখবেন—এখনকার চেয়ে তখন কাজ অনেক বেশী ছিল

আমাদের লাইনে। কারণ তখন নন্দও আমাদের সঙ্গে ছিল—আলাদা হয়ে যায় নি। ঠাসা প্রোগ্রাম থাকত প্রায়ই।

বাড়ীতে অমন অসুখ—কিন্তু কী আর করব, ছুটির দরখাস্ত করলে তখনই তো আর মঞ্জুর হচ্ছে না! সে ছুটি এসে পৌঁছতে স্ত্রী হয় ভাল হয়ে উঠবেন, নয় তো আমার দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের পথ সুগম ক'রে দিয়ে সরে পড়বেন।

ইন্সপেক্শ্যন্ ছিল আঠারো মাইল দূরের এক গ্রাম্য বাজারে। গোরুর গাড়ীতে যেতে হবে। গাড়ী তৈরী করতে খবর পাঠিয়ে অফিসের কাজ সারতে বসলাম। মনটা খারাপ ছিল, ফলে যত তাড়াতাড়ি করতে চাই, ততই যেন দেরি হয়ে যায়। এই করতে করতে যখন রওনা হতে পারলাম শেষ পর্যন্ত, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

গোরুর গাড়ীর মন্থর যাত্রা। পিওন-কাম-চাপরাশী বটকৃষ্ণ আছে সঙ্গে, সে বকতে বকতে চলেছে, আমি মুখ বুজে কত কি ভাবছি! এইভাবে যেতে যেতে বিকেলের দিকে এক মাঠ পার হচ্ছি—দেখি পিছন থেকে কে ডাক্ছে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখি আমার বন্ধু সেই মুসলমান দারোগা, প্রাণপণে সাইকেল ঠেলে আসছেন।

গাড়ী দাঁড় করিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। দারোগাবাবু আমাকে ওরই মধ্যে একটু তফাতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'ও মশাই, করেছেন কি? ইন্স্-পেক্শ্যনে না গিয়েই ফলস্ রিপোর্ট দিয়েছেন—এ যে বিশ্রী কেসে পড়বেন একেবারে!'

তখন তাঁকে সব কথা খুলে বললাম। শুনে তিনি উত্তর দিলেন, 'সব তো বুঝলাম কিন্তু কি করা যাবে বলুন! সাহেব তখনই লোক পাঠিয়ে খবর নিয়েছেন—মৌখিক নয়, লিখিত-পড়িত। সাক্ষীদের সইসাবুদ পর্যন্ত সব প্রস্তুত। আপনি ডায়েরীতে লিখে ফল্স্ রিপোর্ট দাখিল করেছেন—এই সুদ্ধ যদি কমিশনার সাহেবের কাছে পাঠায়'—এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে, গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন দারোগাবাবু, 'বিশ্রী ব্যাপার হবে কিন্তু, সাস্পেনশ্যন তো বটেই—আরও গোলমাল হতে পারে! আমি এইটে শুনেই ছুটতে ছুটতে এসেছি!'

শুষ্ক ক্ষীণ কণ্ঠে একটা ধন্যবাদ দিলাম তাঁকে। আর কিছুই বলতে পারলাম না। তিনিও হয়ত অবস্থাটা বুঝলেন, বিশেষ কিছু না বলে আমার হাতটা ধরে সহানুভূতিসূচক একটা চাপ দিয়ে চলে গেলেন।

আমিও এসে আবার গাড়ীতে চাপলাম।

গন্তব্যস্থানে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা তো পেরিয়ে গেছেই, রাতও বেশ থমথম করছে। পাড়াগাঁয়ের বাজার, অধিকাংশ দোকানপাটই তখন বন্ধ হয়ে গেছে, কেবল কেউ কেউ ঝাঁপের আড়ালে বসে তখনও খাতাপত্রের কাজ সারছে। আমাদের যিনি ভেণ্ডার তাঁর আরও অনেক কারবার আছে। একই চালার নিচে পাশাপাশি

অনেকগুলো দোকান, সবই বন্ধ, কেবল কাপড়ের দোকানটা তখনও একটু খোলা ছিল, অর্থাৎ মালিক সেইখানেই বসে মুহুরীর সঙ্গে কী একটা হিসেব দেখছিলেন।

আমাদের আদর-অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হ'ল না, তা বলাই বাহুল্য। দোকানদার ভদ্রলোক সবিনয়ে জানালেন যে তাঁর স্ত্রীপুত্র কেউ এখানে নেই, তাঁর ব্রাহ্মণ মুহুরী রান্না করে—তাঁরা দুজনে খান। অসুবিধা অবশ্যই হবে—তবু এত রাত্রে অন্য কোন ব্যবস্থা তো করা সম্ভব নয়। ঐখানেই একসঙ্গে দুটো ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিচ্ছেন—অপরাধ না নিয়ে তাইতেই যেন আমি সন্তুষ্ট থাকি।

আমার তখন খাওয়ার মত মানসিক অবস্থা নয়। তবু বাগ্‌বিতণ্ডা করতেও ইচ্ছা হল না এই নিয়ে, তা ছাড়া বটকৃষ্ণ আছে, গাড়োয়ান আছে, ওদেরও ব্যবস্থা হওয়া চাই। সুতরাং তাঁর প্রস্তাবেই সম্মত হয়ে মুহুরী মশাইয়ের সাহায্যের জন্য বটুকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর মুখ হাত ধুয়ে পাশের মিষ্টান্নের দোকান থেকে সংগৃহীত চা-জলখাবার খেয়ে মাথা ধরার অছিলায় বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। মালিক মশাইকে বললাম, 'আপনি ততক্ষণে হাতের কাজটা সেরে ফেলুন, আমি একটু ফাঁকায় ঘুরে আসি, মাথাটা যদি ছাড়ে।'

কাজ তাঁর সত্যিই ছিল, তিনি দেখলুম খুশীমনে রাজী হয়ে গেলেন আমার প্রস্তাবে।

বাজারের সংকীর্ণ রাস্তাটা পেরিয়ে ফাঁকা রাস্তায় এসে পড়লাম। দুদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ, মাঝখান দিয়ে আধপাকা রাস্তা। দূরে, বহুদূরে গাছপালার ঘনকৃষ্ণ-রেখার মধ্যে গ্রামের আলো দু একটা দেখা যাচ্ছে। এদিকটা কিন্তু একেবারেই ফাঁকা আর নির্জন।

বাইরে বেরিয়ে অনেকটা ভাল লাগল। মাথাটা সত্যিই ধরেছিল। ধরে আছে সেই বিকেল থেকেই। খবরটা পাবার পর থেকে সমস্ত মাথাটা কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে, নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার মত। এতক্ষণ কিছুই পরিষ্কার ভাবতে পারি নি—কোন কিছুই।

এইবার একটু একটু ক'রে চিন্তাশক্তি বা বিচারশক্তি ফিরে পেলাম যেন।

কী করব?

করবার তো একটি মাত্র পথই খোলা আছে। বন্দুকটা সঙ্গেই আছে।

আত্মহত্যা ছাড়া এ অপমানের হাত এড়াবার আর কোন পথ নেই। চারিদিক থেকে বিপদ এসে যেভাবে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, তাতে পরিত্রাণের আর কোন পথ নেই। এতকাল যথাসম্ভব সৎপথে থেকে কর্তব্য পালন করার যদি এই পুরস্কার হয় তো—আমি আর কি করতে পারি। মিথ্যা এতবড় দুর্নামে চাকরি যাবে, হয়ত অন্য কোন শাস্তিও হ'তে পারে—তারপর কি আর কোথাও কাজ পাব? আর পেলেও মুখ দেখাব কি ক'রে? এরপর, এমন কি আমার স্ত্রী বা মেয়েরাও হয়ত আমার কথা বিশ্বাস করবে না, ভাববে আমারও খানিকটা দোষ ছিল।

না, আর কোন পথ নেই—মৃত্যুর পথ ছাড়া।

ওদের কি হবে ? তা জানি না। হাজার কতক টাকার জীবনবীমা আছে—এই পর্যন্ত। আমার স্ত্রীর পিতৃদত্ত সামান্য কিছু গয়নাও আছে। ওঁর ভাই ভাল লোক, বিধবা বোনকে হয়ত দেখবেও।···কিন্তু দেখুক বা না দেখুক, আমি বেঁচে থেকেই বা কি করতে পারতাম ? সত্যি সত্যিই ভিক্ষে করা তো আর সম্ভব নয়।···

মন স্থির ক'রতে পেরে অনেকটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলাম।

এখানে কেলেঙ্কারী ক'রে এদের বিপদে ফেলব না। কাল যাবার পথে গাড়ীতেই কাজ সারা যাবে।

আরও নিশ্চিন্ত হয়ে এবার বাজারের দিকে ফিরলাম। শুক্লপক্ষের রাত কিন্তু আকাশে পাতলা মেঘ থাকায় আলোটা কিছু ম্লান। তবু পথঘাট দেখার পক্ষে যথেষ্ট বই কি !

ফাঁকা রাস্তাটা ছেড়ে বাজারের মুখটায় এসেছি, হঠাৎ চমকে উঠলাম ! সামনে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, প্রায় আমার পথ জোড়া ক'রেই।

এইখানে এত রাতে—মেয়ে !

একে মেঘলা আলো, তার উপর সেখানটায় কতকগুলো চালার ছায়া—বেশ আলো-আঁধারি-মতোই হয়েছিল। তবু আকার-ইঙ্গিতে মনে হ'ল কোন ভদ্রলোকের কুমারী মেয়ে হবে। বয়সও সম্ভবত খুব বেশী নয়।

কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়ে এই নির্জন বাজারের পথে একা কি করছে ? আর আমার পথজোড়া ক'রেই বা কেন ?

মেয়েটি কিন্তু নিঃশব্দে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই রইল, আমাকে একেবারে সামনে আসতে দেখেও নড়ল না।

কী আপদ !

এখন করি কি ? কী মতলব এর ? খারাপ মেয়ে-টেয়ে নয় তো ? এসব দেশে বাজারের সঙ্গে সঙ্গেই বদ্-পাড়াটা থাকে। একি সেই ঘরেরই কেউ—আমাকে শিকার ধরতে এসেছে ?

বিরক্ত হয়ে উঠলাম। বেশ বড় ক'রে বিরক্তিসূচক গলাখ্যাঁকারিও দিলাম একটা।

এবার সে মেয়েটি নড়ল। কিন্তু দূরে সরে গেল না, পিছুও হঠ্‌ল না। বরং বেশ সপ্রতিভ ভাবেই এগিয়ে এসে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে একটা কী কাগজ গুঁজে দিয়ে—আমি বিস্ময়টা সামলে নেবার আগেই—পিছন ফিরে বাজারের ছায়ান্ধকার পথে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল !

এ কী কাণ্ড রে বাবা !

আমি তো অবাক্! কোন প্রশ্ন করব, কি কাগজটা ফিরিয়ে দেব—কিছু একটা করার আগেই মেয়েটি যেন বাতাসে উবে গেল !

প্রথম বিস্ময়ের বিহ্বলতা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ একটা ভয় আমাকে পেয়ে বসল, অজ্ঞাত একটা আতঙ্ক। সমস্ত শরীর হিম হয়ে এল যেন, বুকের মধ্যে গুর-গুর করতে লাগল।

আরও ভয় হ'ল—যখন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল,—হাতে কাগজটা গ‍ুঁজে দেবার সময় ঐ মেয়েটার হাতের কোন স্পর্শ পেলাম না তো।

প্রথমটা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার পরেই মনকে শাসন করলাম, 'আমি লেখাপড়া জানা লোক, আমার এ কী মেয়েদের মতো অহেতুক ভয়। ...তাছাড়া আমি ব্রাহ্মণ, পৈতাটা আছে, দ‍ুবেলা গায়ত্রীও জপ করি সাধ্যমত—আমার কে কি করবে?'

মনে একট‍ু সাহস এল। নিজের অজ্ঞাতসারেই কতকটা—গায়ত্রী জপ করতে করতে জোরে জোরে পা ফেলে দোকানে এসে উঠলাম।

দোকানে এসে ওখানকার আলোতে কাগজটা মেলে ধরে অবাক হয়ে গেলাম।

এ যে হাকিম বাহাদ‍ুরের হাতের লেখা।

আরে, এ যে সেই চিঠি, দ‍ুপ‍ুররাতে যেটা পাঠিয়েছিলেন, মদ না দেওয়াতে রাগ ক'রে লিখেছিলেন, যেখান থেকে হোক মাল তাঁকে দিতেই হবে। বন্ধ‍ুবান্ধবদের ডেকে এনে তাঁকে যদি অপ্রস্তুত হ'তে হয় তো ফল ভাল হবে না—এমন একটা ইঙ্গিতও সে চিঠিতে ছিল।

ওঃ, এই চিঠিটা তারপর কত যে খ‍ুঁজেছি!

তখন রাগ ক'রে চিঠিটা ম‍ুচড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, তারপর আর বহ‍ু চেষ্টা ক'রেও খ‍ুঁজে পাই নি। সমস্ত কাগজপত্র, ঘরের প্রত্যেকটি কোণ, মায় আস্তাকুঁড় পর্যন্ত তন্নতন্ন ক'রে খ‍ুঁজে দেখেছি।

এতকাল পরে এ চিঠি কোথা থেকে এল?

আর ঐ মেয়েটিই বা কে?...

বেশীক্ষণ ভাববারও সময় নেই—দোকানের মালিক কৌত‍ূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কার চিঠি দারোগাবাব‍ু?'

কথাটা চেপে গিয়ে বললাম, 'এ প‍ুরোনো চিঠি, পকেটে পড়ে ছিল। হঠাৎ হাতে ঠেক্‌ল তাই দেখছি।'

পরের দিন যথাসম্ভব দ্রুত কাজ সেরে ফিরে এলাম। মরা আর হ'ল না। আর দরকারও ছিল না মরবার।

বাসায় এসে স্ত্রীর খবর নিলাম—তিনি একট‍ু ভালই আছেন দেখলাম। ওখান থেকে সোজা এসে উঠলাম সাহেবের বাংলোয়।

সাহেব আমাকে দেখে বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'কী?'

দ্বিতীয় শব্দও উচ্চারণ করতে যেন অস‍ুবিধা হ'ল তাঁর।

যথাসম্ভব সবিনয় ভাব বজায় রেখে বললাম, 'আমার ডায়েরীটা চাই, আজকের এন‍্‌ট্রিটা লেখা দরকার।'

'ডায়েরী এখন ফেরত পাবেন না, আর আপনার এতে কিছ‍ু লেখবার দরকারও হবে না। আমি সদরে কমিশনার সাহেবের কাছেই ওটা পাঠিয়ে দিচ্ছি—**with the**

note যে আপনি মিথ্যা রিপোর্ট করেছেন এবং ডায়েরীতেও মিথ্যা কথা লিখেছেন।'

তিনি বোধহয় আশা করেছিলেন যে, এর পর আমি একেবারে তাঁর জুতোপরা পায়ে আছড়ে পড়ব ; সেই প্রত্যাশাতেই যেন আরও কঠিনভাবে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি কিন্তু খুব উৎফুল্ল ভাব দেখালাম। বললাম, 'ভালই হ'ল, আপনাদের কীর্তিটা নিজে থেকে তাঁকে জানাতে বাধছিল, এবার আর বাধা রইল না, আত্মপক্ষ সমর্থনে সবই বলা যায়।'

মুখে অবিচলিত ভাব বজায় রাখলেও কণ্ঠস্বরে বুঝলাম যে তিনি বেশ একটু অবাক হয়েছেন ; প্রশ্ন করলেন, 'তার মানে ?'

হাকিম সাহেবের চিঠিখানা বার ক'রে দূর থেকে মেলে ধরলাম। বললাম, 'এই আমার ব্রহ্মাস্ত্র।...তাঁকে জানাব যে ম্যাজিস্ট্রেট আমার কাছ থেকে বে-আইনী মদ ঘুষ চেয়েছিলেন, আমি দিই নি—সেই জন্যেই তিনি বিরূপ হয়ে আমাকে জব্দ করতে চাইছেন এবং যেহেতু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁর আত্মীয় সেইহেতু তাঁকে হাত ক'রে আমাকে মিথ্যে চার্জে ফেলেছেন।'

সাহেবের মুখ এবার বিবর্ণ হয়ে গেল।

'কৈ দেখি।' বলে চিঠিটার দিকে হাত বাড়ালেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে আর একটু পিছিয়ে বেশ নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে বললাম, 'মাপ করবেন, দেখাতে হয় তো বড় সাহেবকেই দেখাব।'

এই বলে তাঁকে সেলাম ক'রে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। বাঘের গুহায় বেশীক্ষণ থাকা ঠিক নয়। এবার একেবারে সোজা বাড়ী। ক'দিনের উদ্বেগ দুশ্চিন্তা পথশ্রম—সব মিলিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম, বাড়ী ফিরেই শুয়ে পড়লাম।...

শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে থাকব, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে। উঠে দরজা খুলে দেখি সেই হাকিম বাহাদুর স্বয়ং।

'আসুন, আসুন।' অতি কষ্টে হাসি চেপে অভ্যর্থনা করলুম, 'কী সৌভাগ্য আমার!...কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো, খুব জরুরী কোনো হুকুম কি ?'...

'হ্যাঁ, একটু জরুরী দরকারই আছে—'

'তা আমাকে ডেকে পাঠালেই তো হ'ত। আপনার আবার এত কষ্ট ক'রে—'

'না, না। কষ্ট আর কি।' একটু কাষ্ঠ হাসি হাসলেন তিনি, 'শুনলাম আপনার স্ত্রীর খুব অসুখ। তাঁর খবর নেওয়াটাও তো উচিত।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে, কেশে গলাটা সাফ্ ক'রে নিয়ে বললেন, 'গিয়েছিলাম একটু এই আপনাদের সাহেবের বাংলাতেই।...উনি আবার আমার আত্মীয় হন কিনা!...দেখুন দিকি কাণ্ড, গিয়ে শুনি আপনার ডায়েরীতে কী একটু ইরেগুলারিটি হয়েছে—উনি একেবারে সেটা সদরে বড় সাহেবের কাছে পাঠাতে যাচ্ছিলেন।...আমি বুঝিয়ে বলে সেটা নাকচ্ ক'রে এলাম। ভুল-ভ্রান্তি

একটু মানুষের হয়ই—না কী বলেন ?—সে সব ভুলকে খুব বড় ক'রে দেখার আবশ্যক আছে কি ?···যাক্ উঠি, আপনার স্ত্রী তাহ'লে এখন একটু ভাল—বটুর মুখে যা শুনলাম। শুয়ে পড়ুন—কিছু মনে-টনে করবেন না। অসময়ে ঘুম ভাঙ্গালুম। কাল তো আপনার একটা কেস্ আছে না ?···ব্যাটারা বড্ডই বাড়িয়েছে, ওদের এক্‌জাম্প্‌লারী সাজা হওয়া দরকার।···আচ্ছা আসি। নমস্কার।'

একটানা এবং একতরফা এই অভিনয় ক'রে হাকিম বাহাদুর চলে গেলেন। আমিও নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

এটা যে ক্ষমা-প্রার্থনাই—সেটা বুঝতে বাকী রইল না।

এই পর্যন্ত বলে মুখুজ্জে মশাই আবার একটি বিড়ি বার করলেন।

ফণুবাবু সাগ্রহে বসে শুনছিলেন, এইবার বলে উঠলেন, 'তারপর ?'

'তারপর আর কি। কিছুই না।···সব গণ্ডগোল মিটে গেল। হাকিম পরের দিন থেকে যা ব্যবহার করতে লাগলেন, যেন সে লোকই না। কেস গেলেই আমার পক্ষে রায়। আদালতেও খাতির বাড়ল, কেবল আমার বন্ধু সেই দারোগা আমার ওপর একটু বিরূপ হয়ে রইলেন।'

'কেন ?'

'মানে উনি আমাকে কেবলই জিজ্ঞাসা করতেন যে কী ক'রে আমি কি ম্যানেজ করলুম, কিন্তু সত্যি কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না, ভাবতেন আমি কিছু গোপন করছি, নয়তো ঠাট্টা করছি।'

মুখুজ্জে মশাই চুপ ক'রে গেলেন আবার।

আমাদের দলপতি অপূর্ববাবু প্রশ্ন করলেন, 'তা এটার সম্বন্ধে আপনার কি মত।'

'না ভাই, মত-টত কিছু নেই আমার। ব্যাপারটা যে কী তা আমি আজও জানি না। তবে একটা কথা এইমাত্র ঐ ফণুবাবুর কথা শুনতে শুনতেই মনে পড়ল—আর সেইজন্যেই গল্পটা বললুম, যে সেই রাত্রে সেই মেয়েটির বেশভূষা অল্পক্ষণের জন্যে দেখলেও দুটি জিনিস তখনই আমার নজরে পড়েছিল—সেটা হচ্ছে ওর পরনে কালাপাড় দেশী শাড়ী আর দু'গাছি মাঠা বালা।···কথাটা কিন্তু এর আগে এমন ক'রে কোনদিন মনে পড়ে নি—আশ্চর্য !'

মুখুজ্জে মশাই এবার জুৎ ক'রে বিড়িটি ধরালেন।

অঘটন ?

দু' একটা মিরাক্‌ল্ যে চোখে দেখি নি তা নয়—মানে আমার নিজের জীবনেই এমন ঘটনা ঘটেছে, যাকে মিরাক্‌ল্ বলাই উচিত। সে সব কাহিনী লিখেওছি—

এক পূজাসংখ্যা 'যুগান্তরে'—'কাকতালীয় ?' এই নাম দিয়ে। শুনেওছি কিছু কিছু।

এক সাধুর মুখে শুনেছি, একটি সব্‌জিওলা বর্ধমান স্টেশনে বসেছিল, লোকাল ট্রেনে মাল নিয়ে কলকাতা আসবে বলে। মাল বলতে বিশেষ কিছু ছিল না সেদিন, কিছু শাক ছিল মাত্র। তার মধ্যে কচি চড়ুই শাক বা চাঁপানটেই প্রধান। পাশে বসে ছিলেন এক বৃদ্ধা-মতো মহিলা, পাড়াগাঁয়ের সদাকুণ্ঠিত জড়োসড়ো বয়স্কা একটি মেয়েছেলে। তিনি বারবারই সেই শাকগুলিতে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলেন, যেন তিনি স্পর্শেই ওদের স্বাদ অনুভব করছেন, আর মুখে বলতে লাগলেন, 'বাঃ বাঃ, অনেক দিন এমন টাটকা শাক দেখি নি বাবা, তা যা বলব !'

বুড়ীর রকমসকম দেখে মায়া হ'ল শাকও'লার। বললে, 'তা নাও না বুড়ীমা, দু আঁটি তিন আঁটি—যা ইচ্ছে ! স্বচ্ছন্দে নাও, পয়সা লাগবে না।'

মহিলা মাথা নেড়ে বললেন, 'না বাবা, এখন নিতে পারব না। এখন ঘরকে যাচ্ছি না।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'তুমি কোথায় যাবে বললে ? শ্যামবাজারে যাও শাক বেচতে ? তা বাবা, যদি তোমার দয়া হয়, একদিন বরং আমার ঘরে দু আঁটি শাক ফেলে দিয়ে এসো। যেদিন বাঁচবে-টাঁচবে—'

'আমি ঠিকানা পাবো কোথায় ?'

'কিছু না, শ্যামবাজারের বাজার থেকে বেরিয়ে একটু উত্তুরে—বাগবাজার, মুখে যেয়ে জিজ্ঞেস করো মার বাড়িটা কোথায়, কেউ না কেউ দেখিয়ে দেবেই—'

তা গিছল সে লোকটি। বাজারে যাবার আগেই গিছল। আলাদা ক'রে চাঁপানটে একটা ছেঁড়া কাপড়ে বেঁধে নিয়ে। বাড়ী খুঁজে বের করতেও কোনো অসুবিধে হয় নি। কিন্তু মুশকিল হ'ল—লোকটি যখন বলল, 'এই ঠিকানায় একটি বুড়ো-মতো মেয়েছেলে থাকে, আমাকে বলেছেল একটু লটে শাক দিয়ে যেতে—তাই আমি এনেছি।'

সেটা আসলে মঠ, সাধুরা থাকেন। তাঁরা তো অবাক। না বাপু, এখানে কেউ মেয়েছেলেটেলে থাকে না। দেখতে পাচ্ছ তো সাধুদের আস্তানা—এখানে মেয়ে-ছেলে থাকবেই বা কেন ? নিশ্চয় তোমার ভুল হয়েছে।'

তবু লোকটি বারবারই বলতে লাগল, 'না, সে বুড়ীমা আমাকে অনেক ক'রে বলেছেল যে—'

বলতে বলতেই নজরে পড়ল, সিঁড়ির বাঁকে বিশ্বজননী সারদামণির নানা বয়সের ছবি—এক ফ্রেমে বাঁধানো—সে বলে উঠল, 'বা রে ! এই তো ! এই বুড়ীমাই তো আমাকে লটে শাকের কথা বলেছেল—আপনারা বলছ তিনি এখানে থাকে না !'

সাধুরা তো অবাক ! মাগো, তোমার দুটো শাক খাবার ইচ্ছে হয়েছিল তো আমাদের বলো নি কেন !

আর একটি কাহিনী 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় লিখেছিলেন স্বয়ং জ্ঞানাত্মানন্দ, পূজনীয় সুধীর মহারাজ।

উনি আর এক সাধু বেলুড় মঠে অফিস বাড়ীর সিঁড়িতে বসে এক বিকেলে কথা কইছেন, এক সাহেবের প্রবেশ।

'কী চাই?' ওঁরা শুধুলেন।

সাহেব বললেন, 'পথে এক সাধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, মাঝবয়সী লোক একজন, সাদা কাপড় পরা—তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব ভাল লেগেছিল তাঁর। পরিষ্কার ইংরেজী বলেন, অথচ সেকালের লোক ধুতির ওপর কোট পরা—কিন্তু জ্ঞানের কথা যা বললেন, আধুনিকতম পাশ্চাত্ত্য ফিলজফী মনে হ'ল তাঁর কাছে জলবৎ সরল। ঠিকানা চাইতে উনি এই ঠিকানা দিলেন। নামটাও বলেছিলেন—সে কাগজটা হারিয়ে গেছে। ওঁরা কি বলতে পারেন এমন কোনো সাধুর খোঁজ!'

ওঁরা তো অনেক ভেবেও বুঝতে পারলেন না লোকটি কে। বয়স্ক এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনে পণ্ডিত হলে অবশ্যই গেরুয়া পরা হবে—সাদা কাপড় পরা হলে কোনো ব্রহ্মচারী, তাহলে তো বয়েস বেশী হবে না!

তবু ওঁরা দু'চারজন সাধুকে এনে আলাপ করিয়ে দিলেন। সাহেব ঘাড় নাড়লেন, না, এঁরা কেউ নন।

হতাশ হয়ে সাহেব ফিরে যাচ্ছেন—সাধুরা বললেন, 'আর দশ মিনিট থেকে যান না। এখনই মন্দিরের দোর খুলবে, দর্শন করে যান।'

সাহেব বললেন, 'কিন্তু আমি তো বিজাতীয় বিধর্মী খ্রীশ্চান, দর্শন করতে দেবেন আপনারা?'

এঁরা বললেন, 'আমাদের ঠাকুর বা গুরু এসব ধর্মের গণ্ডী মানতেন না। আমাদের কাছে জাতধর্মে কোনো কিছু এসে যায় না। শুধু আপনাকে জুতোটা খুলতে হবে—সিঁড়ির নিচেয়।'

থেকে গেলেন সাহেব।

কিন্তু মন্দিরের দরজা খুলতে সাহেব ভেতরে ঢুকেই একটা যেন চিৎকার ক'রে উঠলেন।

'এই তো! এই তো সে ভদ্রলোক—বা সাধু—যাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল!'

তাঁকে কিছুতেই বোঝানো গেল না যে ইনি বহু, বহুদিন আগে গত হয়েছেন।

এইবার আমরা আসছি একেবারে সাম্প্রতিক কালে।

এ ঘটনাকে আপনারা মিরাক্‌ল্‌ বলবেন কি যোগাযোগ বলবেন, কি ভুল-বোঝা বলবেন—তা আপনারাই জানেন। শুধু যা ঘটেছিল তাই বলছি।

পাড়ার একটি কালীবাড়ি, প্রায় বছর পঁচিশ আগে একরকম ভিক্ষে দুঃখু ক'রে ভক্তদের আপ্রাণ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—এখন বহু ভক্ত সমাগম হয়—পুজোর

প্রণামী ও চাঁদায় তার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। অনেকটা জমি নিয়ে বড় নাটমন্দির, সেখানে ভগবৎকথা, সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা হয়—পালে-পার্বণে পূজার্থীরা এসে জড়ো হতে পারেন।

আমি যেদিনের কথা বলছি, সেদিনটা শ্যামাপূজারই দিন, বিশেষ পূজো রাত্রে, তবু সকাল থেকেই বহুলোক আসছে, পূজোও দিচ্ছে, দর্শন ক'রে চলে যাচ্ছে কেউ কেউ শুধু প্রণামী দিয়ে।

আমাদের চেনা একটি মেয়ে—নাম ধরুন নন্দা—সে রাত অবধি উপোস করতে পারবে না। রাত্রে বেরোতেও পারবে না বলে ছেলেকে নিয়ে পূজো দিতে এসেছিল। পূজো আর কি, বাক্স ক'রে দু-তিন টাকার মিষ্টি, তার সঙ্গে ওর নাম, ঠিকানা লেখা একটা কাগজের স্লিপ, একটা টাকা দক্ষিণাও সেই সঙ্গে। এমনিই দিয়ে যায় বহু ভক্ত, দিনের পূজো সাঙ্গ হলে এই সব বাক্স আবার ভক্তদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কেউ বা নিজেরাই পরে এসে নিয়ে যান, কেউ বা অপরকে বরাত দিয়ে যান।

নন্দা সকাল ক'রেই এসেছে, কিন্তু ঢুকে দেখল এবার বড্ড যেন ভীড়। এরই মধ্যে বহু মেয়েছেলে জড়ো হয়েছে—রেকাবি ও বাক্সে বহু লোকের পূজোও পৌঁছে গেছে। নন্দার বেশীক্ষণ থাকার উপায় নেই, বাড়ির কর্তা বিদেশে ঘোরেন, যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন, তাছাড়া যা দিনকাল—খালি বাড়ি এক ঘণ্টা পড়ে থাকলেও চুরি হতে পারে।

সে কোনমতে এক পাশ দিয়ে গিয়ে পূজারীর সহকারীকে পূজোটা জিম্মা ক'রে দিয়ে নেমে এল নাটমন্দির থেকে।

কিন্তু বিষম গোল বাধাল তার ছেলে।

সে প্রচণ্ড বায়না ধরল, 'কৈ, পেসাদ কৈ ? পেসাদ দিলে না ? পেসাদ খাবো আমি, মিষ্টি খাবো—'

যত তাকে বোঝায় নন্দা, 'পূজো হোক, একটু পরে এসে প্রসাদ নিয়ে যাবো, তখন তুমি যত খুশী খেয়ো।' ততই তার কান্না বেড়ে যায়। দু-বছরের ছেলে, সে অত ভোগ-পূজো বোঝে না। সে চায় মিষ্টি খেতে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে কাঁদতে শুরু করে। টেনে নিয়ে যেতে গেলেও হিতে বিপরীত হয়।

এই যখন অবস্থা, লজ্জায় উৎকণ্ঠায় নন্দা ঘেমে উঠেছে—ওদিক থেকে একটি আধবয়সী মহিলা নেমে এসে বললেন, 'নেন ভাই, আপনার বাক্স, আমি ঠাকুরমশাইকে বলে আগে একটু উচ্ছুগ্যু করায়ে আনলাম। আহা, ও কি অত বোঝে, শিশু—মিষ্টি খাবে, সেইটাই বোঝে।'

লজ্জিত হলেও বেঁচে গেল নন্দা, বাক্সর দিকে চেয়ে দেখল, ওরই বাক্স বটে, পাড়ার দোকানের ছাপা বাক্স, ওর হাতে লেখা স্লিপ। ছেলেও শান্ত হয়ে উঠে ওর হাত ধরে মন্দিরের বাইরে এল। বাক্স খুলে অবশ্য একটু ধোঁকা লেগেছিল একবার, কারণ নন্দার যতদূর মনে আছে, সে সাধারণ কস্তুরো সন্দেশ কিনেছিল। এখন

দেখছে বড় 'আবার খাবো' সন্দেশ, এগুলো একটাকা ক'রে দাম। চারটে আছে। ওর তো বরাত ছিল তিন টাকার সন্দেশ।

হয়ত মাধব দোকানীই শুনতে ভুল করেছে। কাল ওকে একটা টাকা দিয়ে দিলেই হবে।

প্রসাদ ছেলেও খেল, ছেলের মাও খেল। পূজার চিহ্নস্বরূপ বেলপাতা, জবা-ফুলের পাপড়ি, একটু সিঁদুরমাখা ফুল—পূজারী ঠাকুরের কিছুই ভুল হয় নি।

তারপর রান্না শেষ ক'রে, ছেলেকে চান করিয়ে খাইয়ে—নিজে খেতে বসতে যাবে, পাশের বাড়ির সরোদিদি এসে নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

'কী ব্যাপার দিদি! আপনি— ?'

'তুই পেসাদ আনতে যাস্ নি—ঠাকুর মশায়ের ছেলে নাম ডাকছে বার বার—তাই আমিই চেয়ে নিয়ে এলুম, বলি আমাকেই দিন, আমি পৌঁছে দেব তাকে। ভুলে গেছিস বুঝি ?'

বলতে বলতে সরোদিদি ওর হাতে বাক্সটা দিয়ে চলে গেলেন।

নন্দা অবাক হয়ে দেখল, সেই বাক্স, সেই ওর হাতে লেখা স্লিপ।

খুলে দেখল, ভেতরে ছটা কস্তুরো সন্দেশ। তিন টাকারই। মাধব দোকানীর কিছুমাত্র ভুল হয় নি।

অতীতের তীর

কথাটা এতদিন যে কাউকে বলি নি তার কারণ আমি নিজেই ওটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি। এখনও করি না। কী যে ঘটেছিল তাও জানি না, হলপ ক'রে বলতে পারব না। আমি যে ভাবে ঘটনাটাকে চোখে দেখেছি, ওর ইতিহাসের সঙ্গে আমি যতটুকু জড়িত, সেইটুকুই শুধু বলতে পারি কিন্তু তাতে লাভ কি? আপনাদের ওষ্ঠপ্রান্তে যেটুকু পরিহাসের হাসি ফুটে উঠবে তা তো আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি, আর তার জন্য দোষও দিই না বিশেষ। কারণ আমাকে এমন গল্প বলতে এলে আমিও ঠিক অমনি ক'রেই অবিশ্বাস ও পরিহাসের হাসি হাসতুম।

তবুও আজ যে বলতে বসেছি তার কারণ এই যে, কথাটা কাউকে না বলে আর থাকতে পারছি না। দীর্ঘ তিন বছর হয়ে গেল রহস্যটা মনের মধ্যেই চেপে রেখেছি; মানুষের পক্ষে সম্ভব এত দীর্ঘদিন এমন একটা চমকপ্রদ ইতিহাস একা একা অন্তরে বহন করা ? তা'ছাড়া, আমি যা জানি না, আমি যা বিশ্বাস করি না, তাই যে সব উড়িয়ে দিতে হবে তারই বা মানে কি ? আমি যে অর্থ খুঁজে পাই নি, যে রহস্য উদ্‌ঘাটিত করা সম্ভব হয় নি আমার দ্বারা, তা যে আপনাদের দ্বারা হবে না তা কে বললে ?

আমাদের সন্তু মাস্টারকে কে না চেনে! অবশ্য আমাদের এই পাড়া বা গ্রামের কথাই বলছি। তবে হ্যাঁ, কলকাতায়ও বহুলোকে চিনত বৈ কি!

হালদারদের ছেলে সন্তু, রোগা লিক্‌লিকে, শ্যামবর্ণ, মাথায় ঘন চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, চোখে সর্বদা একটা উৎসাহের দীপ্তি এবং মুখে একটা সবিনয় সলজ্জ হাসি। বাবার অবস্থা ওর মন্দ ছিল না, কী একটা মার্চেণ্ট অফিসে ভাল চাকরি করতেন, চাই কি সন্তু লেখাপড়া শিখুক আর না শিখুক, ওকেও সে অফিসে ঢুকিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন। আর আজ তাহ'লে সন্তুর দেড়শ দুশ টাকা মাইনে হয়ে যেত।

কিন্তু সন্তু সে ধার দিয়েই গেল না। লেখাপড়া তো শিখলই না, ক্লাস নাইনে বার দুই ফেল ক'রে একেবারে ও-পাট চুকিয়ে দিলে—চাকরিতে ঢুকতেও রাজী হ'ল না। মাথায় ঢুকল—ও গান গাইবে। গান রীতিমতো কিছুই শেখে নি, বাড়ীতে হারমোনিয়ম পর্যন্ত ছিল না—তবু অপরের মুখে শুনে শুনে ও গান শিখতে লাগল এবং যেখানে সেখানে গায়ে পড়ে গান শোনাতে শুরু করল। তখনও আমরা কেউ ওটা নিয়ে মাথা ঘামাই নি, ছেলেমানুষ পাগ্‌লামি ক'রে বেড়াচ্ছে, বেড়াক্‌। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই ঝোঁকটা যেন বেড়ে চলল। কাজের মধ্যে পাড়ার যত রাজ্যের ছেলেমেয়ে জড়ো ক'রে স্বদেশী গানের তালিম দিতে থাকে, আর কোন একটা ছুতো পেলেই, তা কে জানে স্বাধীনতা দিবস আর কে জানে মে দিবস—দলবল নিয়ে প্রভাত ফেরীতে বেরিয়ে পড়ে। এ ছাড়া আর একটা কাজ ছিল, রেডিওতে ভাল গান থাকলেই চৌধুরী মশাইয়ের চায়ের দোকানে গিয়ে শোনা, নয়ত দত্তদের গ্রামোফোনের দোকানের সামনে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা।

সবচেয়ে বেচারীর কষ্ট হ'ত একটা হারমোনিয়মের জন্যে। ধীরেনের বাড়ী গিয়ে তার খোশামুদি ক'রে হারমোনিয়মের পর্দাগুলো চিনে নিয়েছিল কিন্তু সে-ও যন্ত্রে হাত দিতে দিত না। না বাজালে শিখ্‌বে কি ক'রে, অথচ কে-ই বা ভরসা ক'রে ওর মতো আনাড়িকে ঘাঁট্‌তে দেবে যন্ত্র?

শেষ পর্যন্ত পাড়ার কেষ্ট জ্যাঠামশাইকে ধরল ও চেপে, 'আপনি যদি বাবাকে বলে দেন, চল্লিশটা টাকা হ'লেই ভাল সেকেণ্ডহ্যাণ্ড একটা হবে।'

জ্যাঠামশাই ভালমানুষ লোক, সরল বিশ্বাসে বলতে গেলেন, 'আহা, ছেলে-মানুষ ঝোঁক্‌ হয়েছে, দাও না বাপু কিনে একটা। গানবাজনা ক'রেও তো আজ-কাল অনেকে টাকা রোজগার করছে! ক্ষতি কি।'

কিন্তু সন্তুর বাবা যেন ক্ষেপে উঠলেন একেবারে, 'ক্ষতি নেই, বলছেন কি? গানবাজনা করে কারা? হাড়বকাটে হতভাগা ছেলেরা। আমি বাপ হয়ে ওকে ঐসব কিনে দেব? কোনদিন বলে বসবে, বাবা টাকা দাও, একটা মেয়েমানুষ রাখব! আপনি এসব কিছু বোঝেন না, কথা কইতে আসেন কেন? হারমোনিয়ম কিনবে! বলুন আগে নিজের ভাতের ব্যবস্থা ক'রে তবে ওসব করতে। আমার বাড়ী থেকে গানবাজনা করা চলবে না!'

অগত্যা সে আশা ছাড়তে হ'ল। মোদ্দা সন্তু হাল ছাড়ল না। শুনেছিল কলকাতায় হ্যারিসন রোডের উপর এক বড় ওস্তাদ থাকেন, তিনি গান শেখান। ও অতি কষ্টে মাকে বলে সাত সিকে দিয়ে একটা মান্থলি টিকিট কিনে রোজ কলকাতা যেতে শুরু করল। ওস্তাদের বাড়ীর নিচে এক খালি রক আছে, সেইখানে বসে থাকত আর কান পেতে শুনত ওস্তাদ কি শেখাচ্ছে। তবে তাতেও মুশ্কিল হ'ল, গলাটা সাধে কোথায়? শেষে স্থির করল নস্করদের ঝিলের ধারে গিয়ে ভোরবেলা সাধবে। না হারমোনিয়ম, না তানপুরা, বেসুরো হচ্ছে কিনা ঠিক করবার উপায় নেই, শুধু বসে হাঁ-হাঁ ক'রে চীৎকার করে। ঝিলের ধারে বিশেষ লোকজন ছিল না তখন তাই রক্ষা, নইলে বোধহয় ওকে পাগল ভেবে তাড়া করত।

এইভাবে বছরখানেক চিৎকার করার পর একটা কথা ওর মাথায় গেল। টিউশ্যনি করলে কি হয়? কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, যারা গান শিখবে তারা ওর মতো কালোয়াতী শিখতে চায় না—দু'চারখানা চল্‌তি ফ্যাশানেব্‌ল্ গান শিখতে পারলেই খুশী। সেদিকে সন্তুর ভাঁড়ার একেবারেই খালি। তা'ছাড়া হারমোনিয়মটা চাই-ই, নইলে শেখাবে কি ক'রে? আগে নিজেকে গান তুলে নিতে হবে তো। ওর মা-বাবা দুজনেই বিষম কড়া, তা'ছাড়া বাবা পয়সাকড়ি কখনই মার হাতে দেন না যে, সেখান থেকে কিছু আদায় করবে।

হতাশার ক্ষোভে ও প্রায় পাগল হ'তে বসেছে এমন সময় আমিই একটা সুযোগ ক'রে দিলাম। আমাদের থিয়েটার ক্লাবে একটা হারমোনিয়ম কেনা হ'ল। আমি ক্লাবের সেক্রেটারী হিসাবে ওকে অনুমতি দিলাম দুপুরবেলা ক্লাবঘরে এসে হারমোনিয়ম শেখবার। অবিশ্যি তার বদলে তাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেবারও ব্যবস্থা করলাম বৈ কি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও ক্লাব খুলে বসবে যতক্ষণ না কর্তাস্থানীয় কেউ যান এবং যাবতীয় পার্ট ও প্রম্‌প্‌ট্ করবার সাঁটগুলো কপি করবে। হাতের লেখাটা ওর ভালই ছিল।

এইবার জয়যাত্রা শুরু হয়ে গেল সন্তু মাস্টারের দিকে দিকে। গলা ওর খুব ভালো ছিল না কিন্তু সুরজ্ঞান কিছু ছিল সত্যিই। রেডিও এবং অসংখ্য গ্রামোফোনের দোকানের কল্যাণে চলতি রেকর্ডের গান তোলা কিছুমাত্র কঠিন নয়। তা'ছাড়া তার সুর ঠিক নিখুঁত হ'ল কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাবেই বা কে? মেয়ের বাবাদের লক্ষ্য, কোনমতে বিয়ের বাজারে চলে গেলেই হ'ল। আর আজকাল যে আধুনিক কাব্য-সঙ্গীত হয়েছে তার মধ্যে সঙ্গীতাংশ তো বিশেষ কিছু নেই, কোনমতে নাকিসুরে খানিক কেঁদে গেলেই হ'ল। সুতরাং সন্তুর টিউশ্যনির অভাব হ'ল না। সস্তায় যাঁরা মেয়েকে বিয়ের বাজারে চলনসই করতে চান তাঁরা সকলেই ওকে লুফে নিলেন। টাকার অত খাঁই ছিল না সন্তুর—বেশী চাইবার সাহসই ছিল না। ওর কাছে গান শিখে কেউ আবার সেজন্য টাকা দেবে এটা ভাবতেই যেন কেমন বিস্ময় লাগে ওর। সুতরাং পাঁচ টাকা আট টাকা যে-যা দিত তাই নিত ও। কোনোটা সকালে, কোনোটা রাত্রে, কোনোটা দুপুরে। সপ্তাহে তিন

দিন বা চার দিন—কাজেই সব কটা জড়িয়ে শিগ্‌গিরই ওর প্রায় মাসিক ত্রিশ টাকা আয় হয়ে গেল। অর্থাৎ নিজস্ব একটা হারমোনিয়মের স্বপ্নও আর ওর কাছে দুরাশা রইল না।

কিন্তু সবচেয়ে ওর বিজয়গৌরবের দিন হ'ল সেইদিন, যেদিন ওর বাবার বড়-বাবু বাবাকে ডেকে বললেন, 'হ্যাঁ হে সুবোধ, তোমার ছেলেটি নাকি খুব যত্ন ক'রে গান শেখায় শুনলুম! আমাকে শরৎ বলছিল যে, অন্য মাস্টারদের মতো ফাঁকি দিতে চায় না, খুব খাটে। তা একবার জিজ্ঞাসা ক'রো না, আমার ছোট মেয়েটাকে শেখাতে পারবে কিনা?'

সুবোধবাবু তো অবাক। বড়বাবুকে সন্তুষ্ট করবার এমন একটা সুযোগ ঐ হতভাগা ছেলেটাকে দিয়ে পাওয়া যাবে তা তিনি আশাও করেন নি কখনও। তিনি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'তা স্যার, ছেলেটা খাটে খুব। ফাঁকি স্যার আমরা কখনও দিতে শিখি নি। আমার কাছেই তো ওর শিক্ষা।'

'তা একবার জিজ্ঞাসা ক'রো।'

'ওর আর জিজ্ঞাসা করাকরি কি স্যার। আপনি যখন বলছেন—'

'না, মানে সময় হবে কিনা।'

'সময় ক'রে নেবে। না হয় অন্য টিউশ্যনি ছেড়ে দেবে।'

এইবার সুবোধবাবুর কাছে ছেলের কিছু দাম হ'ল। বড়বাবুও বলা চলে, ছোট সাহেবও। এহেন মনিব যদি ছেলের সুখ্যাতি করেন তাহলে আর বখাটে বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে কি ক'রে?

তবু বাড়ী এসে গাম্ভীর্য বজায় রেখেই ছেলের কাছে কথাটা পাড়তে হয়, 'তুমি তো আমার কোন কথাই শোন না কিন্তু আমার একটা কর্তব্য আছে তো। যতদিন আছি ততদিন না হয় ভাতের ভাবনা নেই, তারপর তো অগাধ জলে? যাক্‌ গে, বড়বাবুকে বলে-কয়ে মত করিয়েছি, ওঁর মেয়েকে গান শেখাবার জন্য, তোমাকে রাখতে রাজী হয়েছেন। ভাল ক'রে খেটে মোটামুটি খুশী করতে পারো তো আখেরে ভাবনা থাকবে না। কাল সকালেই ওঁর সঙ্গে দেখা করো—সময়-সুবিধে ঠিক্‌ ক'রে এসো।'

সন্তু তো অবাক!

এতবড় সুখের দিন ওর বহুকাল আসে নি। বাবা ওকে ডেকে গান শেখানোর কথা কয়েছেন। ওর প্রতিভাকে স্বীকার করেছেন। আবার একটা টিউশ্যনিও ঠিক ক'রে এসেছেন। ওর অধ্যবসায়ের ফল তাহ'লে মিলল। এখন তাহ'লে ঘরেই গলা সাধা চলবে।

পরের দিন থেকেই সে বড়বাবুর বাড়ী বাহাল হয়ে গেল। বালিগঞ্জে তাঁর বাড়ী—ওদের বাড়ী থেকে খুব বেশী দূরে নয়। আধুনিক হালফ্যাসানের কেতা-দুরস্ত ঘরদোর—ছেলেমেয়েরাও তেমনি। এ রকম কোনো জায়গায় যে কোনদিন ওর

মতো মাস্টারের ডাক পড়বে সন্তু তা আশা করে নি। ও যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। সুবোধবাবুর মেয়ে মিলি ওর কাছে গান শিখে যেন ওকেই ধন্য করবে—সন্তুর মনোভাব কতকটা এই রকম।

অবশ্য মিলি বেশ ঠাণ্ডা মেয়ে, গানবাজনার কিছু জানে না, জানবার চেষ্টাও নেই। আরও অনেক বাঙালী মেয়ের মতোই সে বাপ-মায়ের ইচ্ছার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে। সুবোধবাবুও তা জানতেন, সেই জন্যই বেশী পয়সা খরচ ক'রে ভাল মাস্টার রাখার চেষ্টা করেন নি, সস্তার কথাটাই শুধু চিন্তা করেছেন। কিন্তু গোল বাধল অপর জায়গায়।

মিলিদের বাড়ীতে আর একটি মেয়ে ছিল, মিলিরই পিসতুতো বোন, নাম সুমিত্রা। বাপ-মরা মেয়ে মামার বাড়ীতে আদরে মানুষ হয়েছে। আদর এইজন্য যে, ওর বিধবা মায়ের হাতে যথেষ্ট পয়সা ছিল, সুমিত্রাও একমাত্র মেয়ে, আদর দেবার কোনো অসুবিধা নেই।

ছিপছিপে মেয়ে সুমিত্রা। খুবই রোগা, যেমন আজকালকার অধিকাংশ ইস্কুল কলেজের মেয়ে হয়, মানে বাংলা দেশের মেয়ে—তেমনি। স্বাস্থ্যের চিহ্ন কোথাও নেই, কম খায় এবং কুপথ্য খায়। রংটা খুবই ফরসা, তাতেই পাতলা চামড়ার মধ্য দিয়ে নীল শিরা গোনা যায়—অস্বাস্থ্যের একটা ফ্যাকাশে ভাব মুখে। ডাগর চোখে রীমলেস চশমা, শৌখিন বাহারী শাড়ী দিনে-রাতে বহুবার বদল হয়। কথা কয় সিনেমার সুরে, বাংলা দেশের ছবিতে ও রেডিওতে অভিনেত্রীরা যেমন একটা বিশেষ সুরে কথা বলে—তারই নকল ওটা। সর্বদাই একটা ক্লান্ত ভাব, এটাও নাকি আভি-জাত্যের লক্ষণ। এহেন মেয়েকে দেখে যদি সন্তু একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে তো—বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি?

আরও বিপদ হচ্ছে এই যে, মিলিকে গান শেখাবার সময় সুমিত্রা প্রায়ই এসে বসত। প্রথম দিনই প্রশ্ন করেছিল, 'মাস্টার মশাই, আপনি রেডিওতে গান দেন না।'

অপ্রতিভ সন্তু মাথা চুলকে জবাব দিয়েছিল, 'না।'

'কেন?' তারপর একটুখানি থেমে উত্তরের অপেক্ষা ক'রে আবার বললে, 'আজকাল তো সবাই রেডিওতে গান দেয়। আমি যার কাছে শিখেছিলুম তিনি প্রায়ই গান রেডিওতে। যে কোন রকমের চলনসই গাইয়েই তো রেডিওতে গায়। আমিও শিগ্‌গিরই গাইব!'

'আ—আপনি কার কাছে শিখেছিলেন গান?' ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে প্রশ্ন করে সন্তু, না ক'রে পারে না।

'আমি?···সুরেশ দত্তের নাম শোনেন নি? বিখ্যাত গাইয়ে হিরন্ময় দত্তের ভাই? উনি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গানই গেয়ে থাকেন। আজকাল আবার রবীন্দ্র-নাথের গান গাওয়াটাই ফ্যাশান হচ্ছে কিনা!···এসব কাব্য-সঙ্গীত আর চলে না।'

এমনি ক'রে সুমিত্রা ওকে গুঁড়ো ক'রে দেয়, চুরমার ক'রে দেয় ওর অভিমান।

শৌখিনতা ও উন্নাসিকতা এত সহজ সুমিত্রার পক্ষে যে, সন্তু তার দোষ দিতে পারে না, নিজেরই মাথা হেঁট হয়ে আসে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চায়। এ ব্যবহার যেন কতকটা সে নিজের প্রাপ্য ব'লেই মেনে নেয়। সুমিত্রাকে কেউ মিলির অভিভাবকত্ব করতে বলে নি, সন্তুর পরীক্ষা নেবারও কথা নয়—এমন কি ওর সেখানে উপস্থিত থাকারও প্রয়োজন নেই—তবু হাতে অপর কোনো কাজ না থাকায় সুমিত্রা প্রায়ই ওখানে এসে বসে এবং নানাভাবে সন্তুর অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। ওর ফরমাশে দু'চারটে চলতি রবীন্দ্রনাথের গান শিখে এসে শেখাবার চেষ্টা করে সন্তু কিন্তু সুমিত্রা তাতেও নাক তোলে, 'এ মা, ও গান তো আজকাল সবাই জানে, এ বুঝি কেউ শেখে! আপনি ঐটে জানেন না, অমুক গানটা? ওটা শেখান না!'

এমন গানের লাইন বলে যা সন্তু তো শোনেইনি, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলেও মনে করতে পারতেন কি না সন্দেহ।

কিংবা বলে বসে, 'ওটা তো ঠিক সুর হচ্ছে না মাস্টার মশাই। ভাল ক'রে শিখে নেবেন। আপনি সুরেশদার কাছে শেখেন না কেন? খুব ভাল সুর জানেন সুরেশদা, হিরন্ময়বাবু শান্তিনিকেতন থেকে সুর আনান কি না।'

এগুলোই সবচেয়ে অপমানকর। অথচ প্রতিবাদ করতে পারে না, সন্তু প্রশ্ন করতে পারে না যে আসল সুরটা কী রকম হবে দেখিয়ে দিন—শুধু ছাত্রীর সামনে এই অপমানে ওর কান মুখ রাঙা হয়ে আসে।

অথচ সুমিত্রার গানও শুনেছে সন্তু। সেই মামুলি রেডিও ও রেকর্ডের চলতি গান। তাও সুর ঠিক হয় না। কিন্তু সেটা সাহস ক'রে মুখের ওপর বলে কে? সুমিত্রার এমনই একটা সবজান্তা ভাব, এত ওপর থেকে সে সর্বদা কথা বলে যে, তাকে প্রতিবাদ করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না সন্তু। বিশেষত গাইবার আগে সুমিত্রা যা তোড়জোড় এবং আদিখ্যেতা করে—এমন চিঁচিঁ গলায় গায় যে ওকে পাকা গাইয়ে বলে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই!

কিন্তু দুঃখের এইখানেই শেষ নয়—সন্তুর জীবনে গভীরতর দুঃখের কারণ হয়ে উঠল সুমিত্রা।

কবিরা বলেন—আকাশের চাঁদ নাকি মাটির চন্দ্রমল্লিকাকে ভালবাসে। এটা খুব অসম্ভব নয়, স্বীকার করি। কিন্তু কোনো ব্যাঙ সাপকে ভালবেসেছে বলে আজ পর্যন্ত শুনি নি কিংবা কোন বইতে এমন কথাও লেখা নেই যে জলের মাছ বকের প্রেমে পড়েছে।

ঠিক এমনি কাণ্ডটাই ঘটে গেল পৃথিবীতে। কবে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে, নিজের অজ্ঞাতসারেই সন্তু ভালবেসে ফেলল সুমিত্রাকে। অথচ, সে ভাল ক'রেই জানত যে, এটা ওর কাছে বামনের চন্দ্রলাভেচ্ছার চেয়েও দুরাশা। কিন্তু তার ভীরু মনে সুমিত্রারূপিণী চন্দ্রের আকর্ষণে যে জোয়ার উত্তাল হয়ে উঠেছে তার গতিবেগ

রোধ করে এমন সাধ্য কার। সন্তুর সে ক্ষমতাও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না।

সুতরাং এ মনোভাবের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ, সন্তু উঠে পড়ে লাগল যে, সে অন্ততঃ সুরেশ দত্তের যোগ্যতা অর্জন করবে। সে রেডিওতে গেল 'অডিশান' দিতে—তাঁরা ওকে পছন্দ করলেন না। সে শুনেছিল যে ওখানে নাকি কিছু ধর-পাকড়ের ব্যাপার আছে, তা নইলে সত্যি সত্যিই সে এমন কিছু খারাপ গায় না, ওর মতো গাইয়ে আরও দু-চারজন গেয়ে থাকে রোজই—কিন্তু ওর হয়ে ধর-পাকড় করবে কে?

যাই হোক—সন্তু হাল ছাড়ল না, ঐ একটা গুণ ছিল ওর, অধ্যবসায়ের অভাব ছিল না কোনদিন। রবীন্দ্রনাথের গান শেখায় এমন যে দুটি তিনটি ইস্কুল হয়েছে তাদের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। তাতে একটু বিলম্ব হবার সম্ভাবনা রইল বটে···কিন্তু উপায় কি? সোজাসুজি ইস্কুলে ভর্তি হলে শিক্ষক-রূপে যে সম্মান যায়। রেডিওতে রবিবার আধঘন্টা গান শেখাবার ব্যবস্থা আছে। তা হ'লে কি হবে, বাড়ীতে তো রেডিও নেই, ছাত্রদের বাড়ী গিয়ে শিখতে পারে না, তারা কি মনে করবে?

এধারে আর একটি কান্ড হয়ে গেল।

সুরেশদা যোগ্যতার আর এক ধাপ ওপরে উঠে গেলেন। তাঁর একটি রেকর্ড বেরিয়ে গেল বাজারে। রেকর্ডের সেই প্রুফ কপিখানা এনে সুমিত্রা ওদের সামনে টেবিলে ফেলে ঠোঁট উলটে বললে, 'এখন গ্রামোফোন রেকর্ডের কী-ই বা মূল্য! যে-সেই তো রেকর্ড দিচ্ছে। একটু গাইতে জানলেই হ'ল। কী যে সুরেশদার শখ! এতে ক'রে উনি আরও ছোট, আরও সাধারণ হয়ে গেলেন!'

সন্তুর শীর্ণ মুখের সমস্তটা ঘামে ভেসে যায়। এ এমন একটা আঘাত, যার বেদনা একা-একা নিঃশব্দে হজম করা ছাড়া উপায় থাকে না। অথচ সে জানে, মানে এতদিনে জেনেছে যে, এজন্যে ওর লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, সুমিত্রার মতো মিলি ধনী নয়, সস্তায় হবে বলেই মিলির বাবা ওকে রেখেছেন। তা'ছাড়া, সুরেশদার মতো যোগ্যতা যদি সে অর্জন করতে নাও পারে তো কোনো ক্ষতি নেই। কারণ করলেই বা কী? সুমিত্রা আই-এ পাস ক'রে বি-এ পড়ছে, সে বড়লোকের মেয়ে, তার রূপ (?) আছে···তার পক্ষে সন্তুকে ভালবাসা বা বিয়ে করা একে-বারেই অসম্ভব। কোনো উন্মাদের কল্পনাতেও এমন কথা কোনদিন যাবে না। সুতরাং দরকার কি এ নিয়ে মাথা ঘামাবার! সুমিত্রার দৃষ্টিতে একটু শ্রদ্ধার আলো জ্বালাবার জন্য এ আপ্রাণ চেষ্টা কেন ওর? লাভ কি?

এ প্রশ্ন নিজেকেও ক'রে দেখেছে ও, উত্তর পায় নি। অন্ধ, অবোধ দুর্নিবার একটা ইচ্ছা, অকারণ একটা লজ্জা ওকে ঠেলে দিয়েছে শুধু অন্তঃসারশূন্য একটা মেয়ের অন্তরে মূল্যহীন-শ্রদ্ধার আসন অধিকার করার চেষ্টায়।

এসব অবশ্য আমরা কেউ কিছু জানতুম না। পরে জানলুম, একটু একটু

ক'রে, কিছু বা প্রশ্নের উত্তরে, কিছু বা সন্তুর স্বেচ্ছাকৃত স্বীকারোক্তিতে।

অথচ সবার অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে ছেলেটা নিজেকে ক্ষয় করছিল।

অসংখ্য টিউশ্যানি ধরেছিল পয়সার জন্য। বেশ-বিন্যাসটাও সুরেশদার মতো হওয়া চাই তো! তাছাড়া ইদানীং বাবাও সংসারের জন্যে কিছু টাকা দাবী করছিলেন। এর ওপর নিজের শিক্ষার অমানুষিক সাধনা চলছিল। শিখেও ফেলেছিল খুব। সত্যি কথা বলতে কি ইদানীং সে সুরেশের চেয়ে ঢের ভাল গাইত রবীন্দ্রনাথের গান, কিন্তু তাতে কি ? সুমিত্রা তো আর গান বুঝে সুরেশের প্রশংসা করে না। সন্তু যদি ভালবাসায় অন্ধ হয়ে না যেত, সুমিত্রা যদি তার মিথ্যা উন্নাসিকতায় অমন ক'রে ওর চোখ ধাঁধিয়ে না দিত, তাহলে এ প্রচেষ্টার অসারতা ওর নিজের কাছেই ধরা পড়ত একদিন। কিন্তু তা হ'ল না।

ইতিমধ্যে কঠোর পরিশ্রমে এবং আত্মঘাতী চিন্তায় ওর শরীর যে ভেঙে এসেছিল তা কেউ বুঝতে পারে নি। সামান্য একটু সর্দি-জ্বর থেকে দাঁড়াল প্লুরিসি, সেও যদি বা সেরে উঠল তো শুরু হ'ল ঘুষঘুষে জ্বর। সে জ্বর আর গেল না। প্লুরিসির পর ঘুষঘুষে জ্বরের অর্থ কি তা সবাই জানত…আর ডাক্তারও তাই বললেন, সাংঘাতিক দুটি অক্ষর সংক্ষেপে উচ্চারণ ক'রে ওর আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রেম-অনুভূতি-স্বপ্ন-কল্পনার ওপর যেন কঠিন শীতল একটা আস্তরণ টেনে দিলেন—'টি বি।'

ওর বাবার অবস্থা খুব খারাপ না হ'লেও কোনো স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে রাজকীয় চিকিৎসা করাবার সঙ্গতি ছিল না। বাড়ীতেই টুকটাক্ ক'রে চিকিৎসা হ'তে লাগল। দামী ডাক্তারী ইন্‌জেক্‌শ্যানই বা কিনবে কে ? তবু আমি উদ্যোগী হয়ে ওর সব ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ী থেকে কিছু কিছু চাঁদা তুললুম, বলা বাহুল্য তার মধ্যে সবচেয়ে কম টাকা দিলেন মিলির বাবা, কারণ তাঁর অবস্থাই ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। আমাদের ক্লাব থেকেও একটা চ্যারিটি শোর বন্দোবস্ত করা হ'ল। তাতে চারশ' পঞ্চান্ন টাকা টিকিট বিক্রী হ'ল বটে কিন্তু দেখা গেল যে, চারশ' টাকার ওপর খরচই হয়ে গেছে। বাকী টাকাটা মেম্বরদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে এবং ক্লাব ফান্ড থেকে কিছুটা দিয়ে দেড়শ' টাকা ক'রে দেওয়া হ'ল। নইলে ক্লাবের প্রেস্টিজ থাকে না।

এরই মধ্যে একদিন যেন ঈশ্বরের নিষ্ঠুর পরিহাসেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এমন যোগাযোগ দৈবাৎ হয়। একই ডাকে সন্তুর নামে তিনখানা চিঠি এল। একখানা রেডিওর কনট্রাক্ট ফর্ম—আগামী মাসের শেষে একটা তারিখ দিয়ে ওর জন্য সময় নির্দেশ করা হয়েছে—রবীন্দ্রসঙ্গীত ; হিন্দুস্থান গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে রেকর্ড তোলবার জন্য এক আমন্ত্রণ এবং সর্বশেষ বিস্ময় ও সর্বাপেক্ষা আঘাত, সুমিত্রার বিয়ের চিঠি। সুরেশ দত্তর সঙ্গে বিয়ে। এটা অবশ্য আমি কানাঘুষোয় আগেই শুনেছিলাম যে মা ও মামার অমতে নিজে জোর ক'রে সুরেশ দত্তকে বিয়ে করছে সুমিত্রা। নিমন্ত্রণ পত্রেও দেখলাম, সুমিত্রা নিজে নিমন্ত্রণ করেছে। ওর

বিবাহোৎসবে সন্তুকে যে স্মরণ করেছে এটা বিদ্রূপ না করুণা ঠিক বুঝলুম না; কিংবা কঠিন নিষ্ঠুরতা।

চিঠিখানা পেয়ে সন্তুর রোগ-পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখ বিবর্ণতর হয়ে উঠল, যে হাতে চিঠিখানা ধরা ছিল সে হাতখানা কাঁপছিল থর্ থর্ ক'রে। কিন্তু মুখে সে কিছুই বলল না। অনেকক্ষণ পরে খামখানা হাতে নিয়ে শুধু প্রশ্ন করল—'এটা ওর নিজের হাতে লেখা, না? এই ঠিকানাটা?'

তারপর অবশ্য উত্তরের আশা না ক'রেই খামে মুড়ে সযত্নে বালিশের তলায় রেখে দিয়ে ক্লান্তভাবে চোখ বুজল।

সন্ধ্যার সময় আবার যেতে একটুখানি ম্লান হেসে বলল, 'গ্রামোফোন কোম্পানীকে চিঠির জবাব দিয়ে দিলাম জগুদা, লিখে দিলাম যে, এ কাঠামোতে আর ওদের কাছে রেকর্ড তোলানো সম্ভব হবে না।'

ভেবেছিলাম আমাকেই হয়ত এ চিঠিগুলোর জবাব লিখতে হবে। যাক, ও তাহ'লে নিজেই লিখতে পেরেছে।

প্রশ্ন করলুম, 'অমনি রেডিওতে একটা লিখে দিয়েছ তো?'

মুখখানা কেমন যেন সলজ্জ হয়ে গেল ওর, খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলল, 'ওদের কন্‌ট্রাক্টটা সই ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'ছি ছি! এ কী করলে!' ব্যস্ত হয়ে উঠি। তাড়াতাড়ি হাত দুটো চেপে ধরে বলে, 'কিছু বলবেন না জগুদা, এইটি শুধু মাপ করুন, লক্ষ্মীটি। আমায় বকবেন না। ও আমি যেমন ক'রে হোক গিয়ে গেয়ে আসব। ওদের ঐ টাকা দিয়ে সুমিত্রাদের একটা বিয়ের প্রেজেণ্ট কিনে পাঠাব, এই আমার শেষ শখ।'

'তাতে যে তোমার শরীর বিষম খারাপ হয়ে পড়বে। এই বুক নিয়ে গাওয়া কি সহজ কথা! তুমি এমনিই প্রেজেণ্ট পাঠাও না, কী পাঠাবে?'

'না-না…ঐ টাকায় যা হয়। বেশী কিছু পাঠাব না। এমনি একটা শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি একখানা লিখে দিয়েছি।…মরতেই তো চলেছি, শরীর একদিন একটু বেশী খারাপ হ'লেই বা ক্ষতি কি?'

বুঝতেই তো পারছি যে ওর পক্ষে এ কন্‌ট্রাক্ট রাখা সম্ভব হবে না। মিছিমিছি ওর মনে ব্যথা দিয়ে লাভ নেই। অগত্যা চুপ ক'রে গেলাম।

কিন্তু এর পর যেন ওর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি শুরু হ'ল। পরের মাসে এমন অবস্থা হ'ল যে, শুধু কোনমতে জ্যামিতির বিন্দুর মতো অস্তিত্বটুকু মাত্র রইল ওর, শয্যা থেকে আলাদা ক'রে যেন কিছু দেখাই যায় না।

ছেলেটাকে বড় ভালবেসে ফেলেছিলুম ইদানীং—মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। একটু আধটু শেষ চেষ্টা যে না করলুম তা নয় কিন্তু কিছুই ফল হ'ল না। ক্রমে সবাই বুঝতে পারল যে আর বেশী দিন নয়। সুবোধবাবুও শেষ মুহূর্তে ধার-দেনা ক'রে কিছু রাজকীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন কিন্তু তাতে ওঁর মানসিক

সান্ত্বনা ছাড়া কোনো লাভ হ'ল না।

আমরা সবাই ওকে নিয়েই ব্যস্ত, ওর সে রেডিও কনট্রাক্টের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ও কিন্তু ভোলে নি। সেদিন মঙ্গলবার সেটা মনে আছে; সকালবেলাই ক্ষীণকণ্ঠে তারিখটা জানতে চাইল। তারপর চোখ বুজে খানিকটা মনে মনে কী যেন হিসাব ক'রে বললে, 'আজই আমার গাইবার কথা। হ'ল না জগুদা। এ শখটাও মিটল না। একবার যদি কোনরকম ক'রেও যেতে পারতাম, একখানা গানও—'

বেচারী! ওর আকৃতি দেখে চোখে জল এসে গেল।

কিন্তু আজ যা অবস্থা ওর, হাতই নাড়তে পারছে না। মনে হচ্ছে মুখটা ঘোরাতেও কষ্ট হচ্ছে। সন্তুর নিজের বিশ্বাস এখনও কিছুদিন বাঁচবে অবশ্য, তবে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আজ-কালের মধ্যেই শ্বাস উঠবে।...

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে বেরোতে আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ট্রামে এসে গড়িয়াহাটের মোড়ে নেমে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি, হঠাৎ সামনের জুতোর দোকানের রেডিওটার দিকে কান গেল।

এ যেন পরিচিত নাম!

ঐ তো পরিষ্কার বললে, 'এবার আপনাদের একখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে শোনাচ্ছেন সনৎকুমার হালদার—যাবার বেলায় পিছু ডাকে!'

আমি কি ভুল শুনেছি? খোয়াব দেখ্‌ছি জেগে জেগে?

বাস্‌ এসে চলে গেল। আমার ওঠা হ'ল না।

আরে—ঐ তো অতি পরিচিত সেই কণ্ঠ! বহুবার ওর গান শুনেছি, ভুল হবার নয়! কী ক'রে গেল সে? ঐ দেহ, রেডিও কর্তৃপক্ষই বা কি বলে অনুমতি দিলেন!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত গানটি শুনলাম, তারপর যখন চমক ভাঙল দেখি আর কার গান হচ্ছে।

আর বাসের জন্য অপেক্ষা করলুম না। ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রায় দৌড় দিলুম সন্তুর বাড়ীর উদ্দেশে। মিনিট পনেরো পরে যখন ওদের বাড়ী পৌঁছলুম তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, ওর মা সবে সন্ধ্যা দিয়ে আলো নিয়ে এ ঘরে আসছেন! আমি তিরস্কারের সুরে বললুম, 'রুগীকে এখনও পর্যন্ত অন্ধকারে ফেলে রেখেছেন মাসীমা!'

'কী করি বাবা, দেরি হয়ে গেল। একা মানুষ তো! তা ছাড়া ও আবার এক-একদিন আলো জ্বালতেই দেয় না!'

দুজনে একই সঙ্গে ঘরে ঢুকলুম।

নিথর হয়ে কাঠের মতো পড়ে আছে সন্তু। কাছে যেতেই বুঝতে পারলুম ব্যাপারটা। সব শেষ হয়ে গেছে।

ওর মা আছড়ে পড়লেন চিৎকার ক'রে। পাড়ার লোকজন ছুটে এল। শোকের প্রাথমিক অভিভূত ভাবটা কাটতে কর্তব্যের কথা মনে পড়ল। সংকারের ব্যবস্থা

করবার সময় শব সরাতে গিয়ে বালিশের নিচে দ্বটি জিনিস পেলাম—একটি সেই সুমিত্রার বিয়ের চিঠি, আর একটি রেডিওর একখানা চেক্। সেই তারিখের, মায় পিছনে সন্তুর সইসুদ্ধ।

চেকখানা সরিয়ে রেখে দিলাম। সেটা ভাঙিয়ে কতগুলো বই কিনে পাঠিয়ে দিলাম সন্তুর নাম ক'রে সুমিত্রার কাছে—ওর যে শেষ ইচ্ছা ঐ ছিল, তাও জানিয়ে দিলাম।

কিন্তু আসল প্রশ্নটারই কোনো মীমাংসা করতে পারি নি আজ পর্যন্ত। সন্তু গেল কী ক'রে রেডিও স্টেশনে, আর ফিরেই বা এল কি ক'রে আমি আসবার আগে।

এর উত্তর আর জীবনে পাবও না কোনদিন।

শুনেছি একাগ্র কামনার পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু এতটাও সম্ভব হয় কি? কে জানে।

—দশম স্তবক সমাপ্ত—